মিত্র-ঘোষ পেপার-ব্যাক ক্লাসিক্‌স

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

মাতৃদেবীকে

এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল : ফাল্গুন, ১৩৩৮ সাল

অপরাজিত

সম্পূর্ণ গ্রন্থ

APARAJITA

a novel by
Bibhutibhusan Banerjee
Published by Mitra & Ghosh
Publishers Private Limited
10, S. C. Dey Street, Cal 73
Paper back Edition

Price Rs 12/50

পেপার-ব্যাক সংস্করণ

মুদ্রণ সংখ্যা ৫৫০০

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬
হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সাড়ে বারো টাকা

এযাবৎ আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পেপারব্যাক ক্লাসিক্‌স্‌-এর সম্পূর্ণ তালিকা

পথের পাঁচালী	:	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ইছামতী	:	ঐ
আরণ্যক	:	ঐ
কলকাতার কাছেই	:	গজেন্দ্রকুমার মিত্র
উপকণ্ঠে	:	ঐ
আমি কান পেতে রই	:	ঐ
পৌষ-ফাল্গুনের পালা	:	ঐ
কেরী সাহেবের মুন্সী	:	প্রমথনাথ বিশী
লালকেল্লা	:	ঐ
স্থাবর	:	বনফুল
পথে-প্রবাসে	:	অন্নদাশঙ্কর রায়
মহাপ্রস্থানের পথে	:	প্রবোধকুমার সান্যাল
মরুতীর্থ হিংলাজ	:	অবধূত
সাহেব বিবি গোলাম	:	বিমল মিত্র
গণদেবতা	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঝাণু	:	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা	:	শঙ্কু মহারাজ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

এযাবৎ আমাদের প্রকাশিত পকেট বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অধরা মাধুরী। আশাপূর্ণা দেবীর দূরের জানলা, রেল লাইন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কারণে অকারণে, মালবী-মালঞ্চ। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গোত্রীশ্বর, আফ্রিদী মুল্লুকে। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের তারা ভৈরবী, তবু মনে রেখো, স্বর্ণমৃগ। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের স্বর্ণাঙ্কুর। জরাসন্ধর তিলোত্তমা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সখী ঠাকরুণ। তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর জীবনের ওপার থেকে। দেবল দেববর্মার সাপ নিয়ে খেলা। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সুরের বাঁধনে। নীহাররঞ্জন গুপ্তের রাতের গাড়ি, কাগজের ফুল, নিরালা প্রহর। ডঃ এন আর. গুপ্তের কন্যা কেশবতী, রূপ ও প্রসাধন। নিশাচরের ক্ষুধিত জিঘাংসা। পরিমল গোস্বামীর বেনামী চিঠি ও হীরের আংটি। প্রমথনাথ বিশীর শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ। প্র-না-বি'র হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স। প্রবোধকুমার সান্যালের রূপে রঙে রসে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অষ্টপ্রহর। বিমল মিত্রের ফুল ফুটুক, যে যেমন। বিমল করের স্বপ্নের নবীন ও সে। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের আরো একটি। বাণী রায়ের অর্গানের দিন। ভৃগুজাতকের নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন, ভাগ্য কখন খুলবে। লীলা মজুমদারের ফেরারী। শঙ্কু মহারাজের কেঁদুলির মেলায়। সন্তোষকুমার অপার্থিব। সুবোধকুমার চক্রবর্তীর তারা ভেসে চলেছে। সুমথনাথ ঘোষের রক্তগোলাপ, ফাগুন কখনো যাবে না, মরণের পরে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীল-লোহিতের চেনা-অচেনা। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ছলনার জাল, স্বর্ণচাঁপার দিন, মৃত্যুর ঠিকানা।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

অপরাজিত

দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে। রায়চৌধুরীদের বাড়ির বড় ফটকে রবিবাসরীয় ভিখারীদের ভিড় এখনও ভাঙে নাই। বীরু মুহুরীর উপর ভিখারীর চাউল দিবার ভার আছে, কিন্তু ভিখারীদের মধ্যে পর্যন্ত অনেকে সন্দেহ করে যে, জমাদার শম্ভুনাথ সিংহের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে তাহারা ন্যায্য প্রাপ্য হইতে প্রতিবারই বঞ্চিত হইতেছে। ইহা লইয়া তাহাদের ঝগড়া দ্বন্দ্ব কোনকালেই মেটে নাই। শেষ পর্যন্ত দারোয়ানেরা রাগিয়া ওঠে, রামনিহোরা সিং দু-চারজনকে গলাধাক্কা দিতে যায়। তখন হয় বুড়ো খাজাঞ্চি মহাশয়, নয়তো গিরীশ গোমস্তা আসিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দেয়। প্রায় কোন রবিবারই ভিখারী-বিদায় ব্যাপারটা বিনা গোলমালে নিষ্পন্ন হয় না।

রান্না-বাড়িতে কি একটা লইয়া এতক্ষণ রাঁধুনীদের মধ্যে বচসা চলিতেছিল। রাঁধুনী বামনী মোক্ষদা থালায় নিজের ভাত সাজাইয়া লইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়াতে সেখানকার গোলমালও একটুও কমিল। রাঁধুনীদের মধ্যে সর্বজয়ার বয়স অপেক্ষাকৃত কম—বড়লোকের বাড়ি—শহর-বাজার জায়গা, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বলিয়া ইহাদের এসব কথাবার্তায় সে বড় একটা থাকে না। তবুও মোক্ষদা বামনী তাহাকে মধ্যস্থ মানিয়া সদু-ঝিয়ের কি অবিচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল। যখন যে দলে থাকে, তখন সে দলের মন যোগাইয়া কথা বলাটা সর্বজয়ার একটা অভ্যাস, এজন্য তাহার উপর কাহারও রাগ নাই। মোক্ষদা সরিয়া পড়ার পর সর্বজয়াও নিজের ভাত বাড়িয়া লইয়া তাহার থাকিবার ছোট ঘরটাতে ফিরিল। এ বাড়িতে প্রথম আসিয়া বছর-দুই ঠাকুরদালানের পাশের যে ঘরটাতে সে থাকিত, এ ঘরটা সেটা নয়; তাহারই সামনাসামনি পশ্চিমের বারান্দার কোণের ঘরটাতে সে এখন থাকে—সেই রকমই অন্ধকার, সেই ধরণেরই সঁ্যাতসেঁতে মেজে, তবে সে ঘরটার মত ইহার পাশে আস্তাবল নাই, এই একটু সুবিধার কথা।

সর্বজয়া তখনও ভাল করিয়া ভাতের থালা ঘরের মেজেতে নামায় নাই, এমন সময় সদু-ঝি অগ্নিমূর্তি হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—বলি, মুখি বামনী কী পর্‌চেয় দিচ্ছিল তোমার কাছে শুনি? বদমায়েশ মাগী কোথাকার, আমার নামে যখন-তখন যার-তার কাছে লাগিয়ে করবে কি জিগেস করি? ব'লে দেয় যেন বড় বৌরানীর কাছে—যায় যেন বলতে—তুমিও দেখে নিও ব'লে দিচ্ছি বাছা, আমি যদি গিন্নিমার কাছে ব'লে ওকে এ বাড়ি থেকে

না তাড়াই তবে আমি রামনিধি ভড়ের মেয়ে নই—নই—নই—এই তোমায় বলে দিলুম।

সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল, না সদু-মাসী, সে বললেই অমনি আমি শুনবো কেন? তা ছাড়া ওর স্বভাব তো জানো—ওই রকম, ওর মনে কোন রাগ নেই, মুখে হাউ-হাউ ক'রে বকে—এমন তো কিছু বলেও নি—আর তা ছাড়া আমি আজ দু'মাস দশ মাস তো নয়, তোমায় দেখচি আজ তিন বছর—বললেই কি আর আমি শুনি? তিন বচ্ছর এ বাড়িতে ঢুকিচি, কৈ তোমার নামে—

সদু-ঝি একটু নরম হইয়া বলিল, অপু কোথায়, দেখচি নে—আজ তো রবিবার—ইস্কুল তো আজ বন্দ—

সর্বজয়া প্রতিদিন রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিয়া তবে স্নান করে, তেলের বাটিতে বোতল হইতে নারিকেল তেল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, কোথায় বেরিয়েচে। ওই শেঠেদের বাড়ির পাশে কোন এক বন্ধুর বাড়ি, সেখানে ছুটির দিন যায় বেড়াতে। তাই বুঝি বেরিয়েচে। ছেলে তো নয়, একটা পাগল—দুপুর রোদ্দুর রোজ মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া চাই তার। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না মাসী!

সদু বলিল, না, তুমি খাও, আর বসবো না—ভাবলুম, যাই কথাটা গিয়ে শুনে আসি, তাই এলুম। বোলো ওবেলা মুখি বামনীকে একটু বুঝিয়ে দিও—খোকাবাবুর ভাতে সেই দইয়ের হাঁড়ি বে-করা মনে নেই বুঝি? সদুর পেটে অনেক কথা আছে, বুঝলে? দেখতেই ভালমানুষটি, বোলো বুঝিয়ে—

সদু-ঝি চলিয়া গেলে সর্বজয়া তেল মাখিতে বসিল। একটু পরে দোরের কাছে পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ওঃ, রোদ্দুরে ঘুরে তোর মুখ যে একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েচে! বোস্ বোস্—আয়—ওমা আমার কি হবে!

অপু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একেবারে সোজা বিছানায় গিয়া একটা বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িল। হাত-পাখাখানা সজোরে নাড়িয়া মিনিটখানেক বাতাস খাইয়া লইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখনও নাও নি? বেলা তো দুটো—

সর্বজয়া বলিল, ভাত খাবি দুটো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—

—খা না দুটোখানি? ভাল ছানার ডালনা আছে, সকালে শুধু তো ডাল আর বেগুনভাজা দিয়ে খেয়ে গিইচিস্। ক্ষিদে পেয়েচে আবার এতক্ষণ—

অপু বলিল, দেখি কেমন?

পরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া মেজেতে ভাতের থালার ঢাকনি উঠাইতে গেল। সর্বজয়া বলিল, ছুঁস নে, ছুঁস নে—থাক এখন, নেয়ে এসে দেখাচ্চি।

অপু হাসিয়া বলিল, ছুঁস নে ছুঁস নে কেন? কেন? আমি বুঝি মুচি? ব্রাহ্মণকে বুঝি অমনি বলতে আছে? পাপ হয় না?

--যা হয় হবে। ভারি আমার বামুন, সন্ধ্যে নেই, আহ্নিক নেই, বাচবিচের জ্ঞান নেই, এঁটো জ্ঞান নেই—ভারি আমার—

খানিকটা পরে সর্বজয়া স্নান সারিয়া আসিয়া ছেলেকে বলিল, আমার পাতে বসিস্ এখন।

অপু মুখে হাসি টিপিয়া বলিল, আমি কারুর পাতে বসচি নে, ব্রাহ্মণের খেতে নেই কারুর এঁটো।

সর্বজয়া খাইতে বসিলে অপু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সুর নিচু করিয়া বলিল, আজ এক জায়গায় একটা চাকরির কথা বলেচে মা একজন। ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, গাড়ি যখন এসে লাগবে—লোকেদের কাছে নতুন পাঁজি বিক্রী করতে হবে। পাঁচ টাকা মাইনে আর জলখাবার। ইস্কুলে পড়তে পড়তেও হবে। একজন বলছিল।

ছেলে যে চাকুরির কথা একে ওকে জিজ্ঞাস করিয়া বেড়ায় সর্বজয়া একথা জানে। চাকুরি হইলে সে মন্দ কথা নয়, কিন্তু অপুর মুখে চাকুরির কথা তাহার মোটেই ভাল লাগে না। সে তো এমন কিছু বড় হয় নাই। তাহা ছাড়া রৌদ্র আছে, বৃষ্টি আছে। শহর-বাজার জায়গা, পথে ঘাটে গাড়িঘোড়া—কত বিপদ! অত বিপদের মুখে ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে সে রাজী নয়।

সর্বজয়া কথাটা তেমন গায়ে মাখিল না। ছেলেকে বলিল, আয় বোস্ পাতে—হয়েচে আমার। আয়—

অপু খাইতে বসিয়া বলিল, বেশ ভাল হয়, না মা? পাঁচ টাকা ক'রে মাইনে। তুমি জমিও। তারপর মাইনে বাড়াবে বলেচে। আমার বন্ধু সতীনদের বাড়ির পাশে খোলার ঘর ভাড়া আছে দু'টাকা মাসে। সেখানে আমরা যাবো—এদের বাড়ি তোমার যা খাটুনি! ইস্কুল থেকে অমনি চলে যাবো ইস্টিশানে—খাবার সেখানেই খাবো। কেমন তো?

সর্বজয়া বলিল—রুটি ক'রে দেবো, বেঁধে নিয়ে যাস্।

দিন দশেক কাটিয়া গেল। আর কোন কথাবার্তা কোনো পক্ষেই উঠিল না।

তাহার পর বড়বাবু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত সঙ্গীন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার দিন-পনেরো কাটিল। বাড়িতে সকলের মুখে, ঝি-চাকর-দারোয়ানদের মুখে বড়বাবুর অসুখের বিভিন্ন অবস্থার কথা ছাড়া আর অন্য কথা নাই।

বড়বাবু সামলাইয়া উঠিবার দিনকয়েক পর একদিন অপু আসিয়া হাসি-হাসি মুখে মাকে বলিল, আজ মা, বুঝলে, একটা ঘড়ির দোকানে বলেচে যদি আমি ব'সে ব'সে ঘড়ি জুড়ে দি আঠা দিয়ে, তারা সাত টাকা ক'রে মাইনে আর রোজ দু'খানা করে ঘড়ি দেবে। মস্ত ঘড়ির দোকান, ঘড়ি তৈরী ক'রে কলকাতায় চালান দেয়—সোমবারে যেতে বলেচে—

এ আশার দৃষ্টি, এ হাসি এ সব জিনিস সর্বজয়ার অপরিচিত নয়। দেশে নিশ্চিন্দিপুরের ভিটাতে থাকিতে কতদিন, দীর্ঘ পনেরো-ষোল বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে কতবার স্বামীর মুখে এই ধরণের কথা সে শুনিয়াছে। এই সুর, এই কথার ভঙ্গি সে চেনে। এইবার একটা কিছু লাগিয়া যাইবে—এইবার ঘটিল, অল্পই দেরি। নিশ্চিন্দিপুরের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া পথে বাহির হওয়ার মূলেও সেই সুরেরই মোহ।

চারি বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, এই দশা ইহার মধ্যে। কিন্তু সর্বজয়া চিনিয়াও চিনিল না। আজ বহুদিন ধরিয়া তাহার নিজের গৃহ বলিয়া কিছু নাই, অথচ নারীর অন্তর্নিহিত নীড় বাঁধিবার পিপাসাটুকু ভিতরে ভিতরে তাহাকে পীড়া দেয়। অবলম্বন যতই তুচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর হউক, মন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যায়, নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

তাহা ছাড়া পুত্রের অনভিজ্ঞ মনের তরুণ উল্লাসকে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার চাপে শ্বাসরোধ করিয়া মারিতে মায়াও হয়।

সে বলিল, তা যাস্ না সোমবারে! বেশ তো,—দেখে আসিস্। হ্যাঁ শুনিস নি, মেজ বৌরানী যে শীগ্‌গির আসচেন, আজ শুনছিলাম রান্না-বাড়িতে—

অপুর চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, কবে মা, কবে?

—এই মাসের মধ্যেই আসবেন। বড়বাবুর শরীর খারাপ, কাজ-টাজ দেখতে পারেন না, তাই মেজবাবু এসে থাকবেন দিন-কতক।

লীলা আসিবে কি-না একথা দুই-দুইবার মাকে বলি বলি করিয়াও কি জানি

কেন সে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বাহিরে যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল, তাদের বাড়ির সবাই আসচে, মা বাবা আসচে, আর সে কি সেখানে পড়ে থাকবে? সে-ও আসবে—ঠিক আসবে।

পরদিন সে স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের ঘরটাতে ঢুকিতেই তাহার মা বলিল, অপু, আগে খাবার খেয়ে নে। আজ একখানা চিঠি এসেচে. দেখাচ্চি।

অপু বিস্মিতমুখে বলিল, চিঠি? কোথায়? কে দিয়েচে মা?

কাশীতে তাহার বাবার মৃত্যুর পর হইতে এ পর্যন্ত আজ আড়াই বৎসরের উপর এ বাড়ীতে তাহারা আসিয়াছে, কই, কেহ তো একখানা পোস্টকার্ডে একছত্র লিখিয়া তাহাদের খোঁজ করে নাই? লোকের যে পত্র আসে, একথা তাহারা তো ভুলিয়াই গিয়াছে!

সে বলিল, কই দেখি?

পত্র—তা আবার খামে! খামটার উপরে মায়ের নাম লেখা! সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খাম হইতে বাহির করিয়া অধীর আগ্রহের সহিত সেখানাকে পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ করিয়া বুঝিতে-না-পারার দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ভবতারণ চক্রবর্তী কে মা?—পরে পত্রের উপরকার ঠিকানাটা আর একবার দেখিয়া বলিল, কাশী থেকে লিখেচে।

সর্বজয়া বলিল, তুই তো ও'কে নিশ্চিন্দিপুরে দেখেচিস!—সেই সেবার গেলেন, দুগ্‌গাকে পুতুলের বাক্স কিনে দিয়ে গেলেন, তুই তখন সাত বছরের। মনে নেই তোর? তিনদিন ছিলেন আমাদের বাড়ি।

—জানি মা, দিদি বলতো তোমার জ্যাঠামশায় হন—না? তা এতদিন তো আর কোনও—

—আপন নয়, দূর সম্পর্কের। জ্যাঠামশায় তো দেশে বড়-একটা থাকতেন না, কাশী-গয়া, ঠাকুর-দেবতার জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন. এখনও বেড়ান। ও'দের দেশ হচ্চে মনসাপোতা, আড়ংঘাটার কাছে। সেখেন থেকে ক্রোশ দুই—সেবার আড়ংঘাটায় যুগল দেখতে গিয়ে ও'দের বাড়ি গিয়ে ছিলাম দু'দিন। বাড়িতে মেয়ে-জামাই থাকত। সে মেয়ে-জামাই তো লিখেচেন মারা গিয়েচে—ছেলেপিলে কারুর নেই—

অপু বলিল, হ্যাঁ, তাই তো লিখেচেন। নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে আমাদের খোঁজ করেচেন। সেখানে শুনেচেন কাশী গিইচি। তারপর কাশীতে গিয়ে আমাদের সব খবর জেনেচেন। এখানকার ঠিকানা নিয়েচেন বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুপুরবেলা খেয়ে একটু বলি গড়াই—ক্ষেমি-ঝি বললে তোমার একখানা চিঠি আছে। হাতে নিয়ে দেখি আমার নাম—আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। তারপর খুলে পড়ে দেখি এই—নিতে আসবেন লিখচেন শীগ্‌গির। দ্যাখ্‌ দিকি, কবে আসবেন লেখা আছে কিছু?

অপু বলিল, বেশ হয়, না মা? এদের এখেনে একদণ্ড ভাল লাগে না। তোমার খাটুনিটা কমে—সেই সকালে উঠে রান্না-বাড়ি ঢোকো, আর দুটো তিনটে—

ব্যাপারটা এখনও সর্বজয়া বিশ্বাস করে নাই। আবার গৃহ মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে, নিজের মনোমত ঘর গড়া চলিবে! বড়লোকের বাড়ির এ রাঁধুনীবৃত্তি, এ ছন্নছাড়া জীবনযাত্রায় কি এতদিনে—বিশ্বাস হয় না। অদৃষ্ট তেমন নয় বলিয়া ভয় করে।

তাহার পর দুজনে মিলিয়া নানা কথাবার্তা চলিল। জ্যাঠামশায় কি রকম, লোক সেখানে যাওয়া ঘটিলে কেমন হয়,—নানা কথা উঠিবার সময় অপু বলিল—শেঠেদের বাড়ির পাশে কাঠগোলায় পুতুলনাচ হবে একটু পরে। দেখে আসবো মা?

—সকাল সকাল ফিরবি, যেন ফটক বন্ধ ক'রে দেয় না, দেখিস—

পথে যাইতে যাইতে খুশিতে তাহার গা কেমন করিতে লাগিল। মন যেন শোলার মত হাল্‌কা। মুক্তি, এতদিন পরে মুক্তি! কিন্তু লীলা যে আসিতেছে? পুতুলনাচের আসরে বসিয়া কেবলই লীলার কথা মনে হইতে লাগিল। লীলা আসিয়া তাহার সহিত মিশিবে তো? হয়ত এখন বড় হইয়াছে, হয়ত আর তাহার সঙ্গে কথা বলিবে না।

পুতুলনাচ আরম্ভ হইতে অনেক দেরি হইয়া গেল। না দেখিয়াও সে যাইতে পারিল না। অনেক রাত্রে যখন আসর ভাঙিয়া গেল, তখন তাহার মনে পড়িল, এত রাত্রে বাড়ি ঢোকা যাইবে না, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে, বড়লোকের বাড়ির দারোয়ানেরা কেহ তাহার জন্য গরজ করিয়া ফটক খুলিয়া দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বড় ভয়ও হইল। রাত্রিতে এ রকম একা সে বাড়ির বাহিরে কাটায় নাই। কোথায় এখন সে থাকে? মা-ই বা কি বলিবে!

আসরের সব লোক চলিয়া গেল। আসরের কোণে একটা পান-লেমনেডের দোকানে তখনও বেচা-কেনা চলিতেছে। সেখানে একটা কাঠের বাক্সের উপর সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না, ঘুম ভাঙিয়া দেখিল ভোর হইয়া গিয়াছে, পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

সে একটু বেলা করিয়া বাড়ি ফিরিল। ফটকের কাছে বাড়ির গাড়ি দুইখানি তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেউড়িতে ঢুকিয়া খানিকটা আসিয়া দেখিল বাড়ির তিন-চার জন ছেলে সাজিয়া গুজিয়া কোথায় চলিয়াছে। নিজেদের ঘরের সামনে নিস্তারিণী ঝিকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাসীমা, এত সকালে গাড়ি যাচ্ছে কোথায়? মেজবাবুরা কি আজকে আসবেন?

নিস্তারিণী বলিল, তাই তো শুনছি। কাল চিঠি এসেচে—শুধু মেজবাবু আর বৌরানী আসবে, লীলা দিদিমণি এখন আসবেন না—ইস্কুলের এগ্‌জামিন। সেই বড়দিনের সময় তবে আসবে। গিন্নীমা বলছিলেন বিকেলে—

অপুর মনটা একমুহূর্তে দমিয়ে গেল। লীলা আসিবে না। বড়দিনের ছুটিতে আসিলেই বা কি—সে তো তাহার আগে এখান হইতে চলিয়া যাইবে। যাইবার আগে একবার দেখা হইয়া যাইত এই সময় আসিলে। কতদিন সে আসে নাই।

তাহার মা বলিল, বেশ ছেলে তো, কোথায় ছিলি রাত্তিরে? আমার ভেবে সারারাত চোখের পাতা বোজে নি কাল।

অপু বলিল, রাত বেশী হয়ে গেল, ফটক বন্ধ ক'রে দেবে জানি, তাই আমার এক বন্ধু ছিল, আমার সঙ্গে পড়ে, তাদেরই বাড়িতে—। পরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না মা, সেখানে পানের দোকানে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স পড়ে ছিল, তার উপর শুয়ে—

সর্বজয়া বলিল, ওমা, আমার কি হবে! এই সারারাত ঠাণ্ডায় সেখেনে—লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, যেও তুমি ফের কোনদিন সন্দোর পর কোথাও—তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না?

অপু হাসিয়া বলিল—তা আমি কি ক'রে ঢুকবো বলো না? ফটক ভেঙে ঢুকবো?

রাগটা একটু কমিয়া আসিলে সর্বজয়া বলিল—তারপর জ্যাঠামশায় তো কাল এসেচেন। তুই বেরিয়ে গেলে একটু পরেই এলেন, তোর খোঁজ করলেন, আজ ওবেলা আবার আসবেন। বললেন, এখেনে কোথায় তাঁর জানাশুনো লোক আছে, তাদের বাড়ি থাকবেন। এদের বাড়ি থাকবার অসুবিধে—পরশু নিয়ে যেতে চাচ্চেন।

অপু বলিল, সত্যি? কি কি বল না মা, কি সব কথা হ'ল?

আগ্রহে অপু মায়ের পাশে চৌকির ধারে বসিয়া পড়িয়া মায়ের মুখের দিকে

চাহিল। দু'জনের অনেক কথাবার্তা হইল। জ্যাঠামশায় বলিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, ইহাদেরই উপর সব ভার দিয়া তিনি কাশী যাইবেন। অনেকদিন পরে সংসার পাতিবার আশায় সর্বজয়া আনন্দে উৎফুল্ল। ইহাদের বাড়ি হইতে নানা টুকটাক্ গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস নানা সময় সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। একটা বড় টিনের টোম দেখাইয়া বলিল, সেখেনে রান্নাঘরে জ্বালবো—কত বড় লম্পটা দেখেচিস? দু'পয়সার তেল ধরে।

দুপুরের পর সে মায়ের পাতে ভাত খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় দুয়ারের সামনে কাহার ছায়া পড়িল। চাহিয়া দেখিয়া সে ভাতের গ্রাস আর মুখে তুলিতে পারিল না।

লীলা!

পরক্ষণেই লীলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল; কিন্তু অপুর দিকে চাহিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। অপুকে যেন আর চেনা যায় না—সে তো দেখিতে বরাবরই সুন্দর, কিন্তু এই দেড় বৎসরে কি হইয়া উঠিয়াছে সে? কি গায়ের রং, কি মুখের শ্রী, কি সুন্দর স্বপ্ন-মাখা চোখদুটি! লীলার যেন একটু লজ্জা হইল। বলিল, উঃ, আগের চেয়ে মাথাতে কত বড় হয়ে গিয়েচ!

লীলার সম্বন্ধেও অপুর ঠিক সেই কথাই মনে হইল। এ যেন সে লীলা নয়, যাহার সঙ্গে সে দেড় বৎসর পূর্বে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া কত গল্প ও খেলা করিয়াছে। তাহার তো মনে হয় না লীলার মত সুন্দরী মেয়ে সে কোথাও দেখিয়াছে—রাণুদিও নয়। খানিকক্ষণ সে যেন চোখ ফিরাইতে পারিল না।

দু'জনেই যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল।

অপু বলিল, তুমি কি ক'রে এলে? আমি আজ সকালেও জিজ্ঞেস করিচি! নিস্তারিণী মাসী বললে, তুমি আসবে না, এখন স্কুলের ছুটি নেই—সেই বড়দিনের সময় নাকি আসবে?

লীলা বলিল, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

—না, তা কেন? তারপর এতদিন পরে বুঝি—বেশ—একেবারে ডুমুরের ফুল—

—ডুমুরের ফুল আমি, না তুমি? খোকামণির ভাতের সময় তোমাকে যাওয়ার জন্যে চিঠি লেখালাম ঠাকুরমায়ের কাছে, এ বাড়ির সবাই গেল, যাও নি কেন?

অপু এসব কথা কিছুই জানে না। তাহাকে কেহ বলে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, খোকামণি কে?

লীলা বলিল, বাঃ আমার ভাই! জানো না?···এই একবছরের হলো।

লীলার জন্য অপুর মনে একটু দুঃখ হইল। লীলা জানে না যাহাকে সে এত আগ্রহ করিয়া ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এ বাড়িতে তাহার স্থান কোথায় বা অবস্থা কি। সে বলিল—দেড় বছর আসো নি—না? পড়চ কোন ক্লাসে?

লীলা তক্তপোশের কোণে বসিয়া পড়িল। বলিল, আমি আমার কথা কিছু বলবো না আগে—আগে তোমার কথা বলো। তোমার মা ভাল আছেন? তুমিও তো পড়ো—না?

—আমি এবারে মাইনর ক্লাসে উঠবো—পরে একটু গর্বিত মুখে বলিল, আর বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেচি, প্রাইজ দিয়েচে।

লীলা অপুর দিকে চাহিল। বেলা তিনটার কম নয়। এত বেলায় সে খাইতে বসিয়াছে? বিস্ময়ের সুরে বলিল, এখন খেতে বসেচ, এত বেলায়?

অপুর লজ্জা হইল। সে সকালে সরকারদের ঘরে বসিয়া খাইয়া স্কুলে যায়—শুধু ডাল-ভাত,—তাও শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর বেগার-শোধ ভাবে দিয়া যায়, খাইয়া পেট ভরে না, স্কুলেই ক্ষুধা পায়, সেখান হইতে ফিরিয়া মায়ের পাতে ভাত ঢাকা থাকে, বৈকালে তাহাই খায়। আজ ছুটির দিন বলিয়া সকালেই মায়ের পাতে খাইতে বসিয়াছে।

অপু ভাল করিয়া উত্তর দিতে পারিল না বটে, কিন্তু লীলা ব্যাপারটা কতক না বুঝিল এমন নহে। ঘরের হীন আসবাব-পত্র, অপুর হীন বেশ—অবেলায় নিরুপকরণ দু'টি ভাত সাগ্রহে খাওয়া—লীলার কেমন যেন মনে বড় বিঁধিল। সে কোন কথা বলিল না।

অপু বলিল, তোমার সব বই এনেচ এখেনে? দেখাতে হবে আমাকে। ভাল গল্প কি ছবির বই নেই?

লীলা বলিল, তোমার জন্যে কিনে এনেচি আসবার সময়। তুমি গল্পের বই ভালোবাসো ব'লে একখানা 'সাগরের কথা' এনেচি, আরও দু-তিনখানা এনেচি। আনচি, তুমি খেয়ে ওঠো।

অপুর খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছিল, খুশিতে বাকিটা কোনো রকমে শেষ

করিয়া উঠিয়া পড়িল। লীলা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সে পাতের সবটা এমন করিয়া খাইয়াছে, পাতে একটা দানাও পড়িয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর লীলার কেমন একটা অপূর্ব মনের ভাব হইল—সে ধরণের অনুভূতি লীলার জীবনে এই প্রথম, আর কাহারও সম্পর্কে সে ধরণের কিছু তো কখনও হয় নাই।

একটু পরে লীলা অনেক বই আনিল। অপুর মনে হইল, লীলা কেমন করিয়া তাহার মনের কথাটি জানিয়া, সে যাহা পড়িতে জানিতে ভালবাসে সেই ধরণের বইগুলি আনিয়াছে। 'সাগরের কথা' বইখানাতে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। সাগরের তলায় বড় বড় পাহাড় আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, প্রবাল নামক এক প্রকার প্রাণী আছে, দেখিতে গাছপালার মত—কোথায় এক মহাদেশ নাকি সমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া আছে—এই সব।

লীলা একখানা পুরাতন খাতা দেখাইল। তাহার ঝোঁক ছবি আঁকিবার দিকে; বলিল—সেই তোমায় একবার ফুলগাছ এঁকে দেখতে দিলাম মনে আছে? তারপর কত এঁকেচি দেখবে?

অপুর মনে হইল লীলার হাতের আঁকা আগের চেয়ে এখন ভাল হইয়াছে। সে নিজে একটা রেখা কখনো সোজা করিয়া টানিতে পারে না—ড্রইংগুলি দেখিতে দেখিতে লীলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেশ এঁকেচো তো। তোমাদের ইস্কুলে করায়, না এমনি আঁকো?

এতক্ষণ পরে অপুর মনে পড়িল লীলা কোন্ স্কুলে পড়ে, কোন্ ক্লাসে পড়ে সে কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বলিল—তোমাদের কি ইস্কুল? এবার কোন্ ক্লাসে পড়চো?

—এবার মাইনর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেচি—গিরীন্দ্রমোহিনী গার্লস্ স্কুল—আমাদের বাড়ির পাশেই—

অপু বলিল, জিজ্ঞেস করবো?

লীলা হাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

অপু বলিল, আচ্ছা বলো—চট্টগ্রাম কর্ণফুলির মোহনায়—কি ইংরেজি হবে?

লীলা ভাবিয়া বলিল, চিট্টাগং ইজ্ অন্ দি মাউথ অফ্ দি কর্ণফুলি।

অপু বলিল, ক'জন মাস্টার তোমাদের সেখেনে?

—আটজন, হেড মিস্ট্রেস্ এন্ট্রান্স পাশ, আমাদের গ্রামার পড়ান। পরে সে বলিল—মা'র সঙ্গে দেখা করবে না?

—এখন যাবো, না একটু পরে যাবো? বিকেলে যাবো এখন, সেই ভাল।

—তাহার পরে সে একটু থামিয়া বলিল, তুমি শোন নি লীলা, আমরা যে এখান থেকে চলে যাচ্চি!

লীলা আশ্চর্য হইয়া অপুর দিকে চাহিল। বলিল—কোথায়?

—আমার এক দাদামশায় আছেন, তিনি এতদিন পরে আমাদের খোঁজ পেয়ে তাঁদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছেন।

অপু সংক্ষেপে সব বলিল।

লীলা বলিয়া উঠিল—চলে যাবে? বাঃ রে!

হয়তো সে কি আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, যাওয়া না-যাওয়ার উপর অপুর তো কোনও হাত নাই, কোনও কথাই এক্ষেত্রে বলা চলিতে পারে না।

খানিকক্ষণ কেহই কথা বলিল না।

লীলা বলিল, তুমি বেশ এখানে থেকে ইস্কুলে পড়ো না কেন? সেখানে কি ইস্কুল আছে? পড়বে কোথায়? সে তো পাড়াগাঁ।

—আমি থাকতে পারি কিন্তু মা তো আমায় এখেনে রেখে থাকতে পারবে না, নইলে আর কি—

—না হয় এক কাজ কর না কেন? কলকাতায় আমাদের বাড়ি থেকে পড়বে। আমি মাকে বলবো, অপূর্ব আমাদের বাড়িতে থাকবে; বেশ সুবিধে—আমাদের বাড়ির সামনে আজকাল ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হয়েছে—এঞ্জিনও নেই, ঘোড়াও নেই, এমনি চলে—তারের মধ্যে বিদ্যুৎ পোরা আছে, তাতে চলে।

—কি রকম গাড়ি? তারের ওপর দিয়ে চলে?

একটা ডাণ্ডা আছে। তারে ঠেকে থাকে, তাতেই চলে। কলকাতা গেলে দেখবে এখন—ছ-সাত বছর হ'ল ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হয়েছে, আগে ঘোড়ায় টানতো—

আরও অনেকক্ষণ দু'জনের কথাবার্তা চলিল।

বৈকালে সর্বজয়ার জ্যাঠামশায় ভবতারণ চক্রবর্তী আসিলেন। অপুকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ঠিক করিলেন, দুইদিন পরে বুধবারের দিন লইয়া যাইবেন। অপু দু-একবার ভাবিল লীলার প্রস্তাবটা একবার মায়ের কাছে তোলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা আর কার্যে পরিণত হইল না।

সকালের রৌদ্র ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উলা স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতেই মনসাপোতা যাইবার সুবিধা। ভবতারণ চক্রবর্তী

পূর্ব হইতেই পত্র দিয়া গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাল রাত্রে একটু কষ্ট হইয়াছিল। এক্সপ্রেস ট্রেনখানা দেরিতে পৌঁছানোর জন্য ব্যাণ্ডেল হইতে নৈহাটীর গাড়িখানা পাওয়া যায় নাই। ফলে বেশী রাত্রে নৈহাটীতে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সারারাত্রি জাগরণের ফলে অপু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানে না। চক্রবর্তী মহাশয়ের ডাকে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল একটা স্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ি লাগিয়াছে। সেখানেই তাদের নামিতে হইবে। কুলীরা ইতিমধ্যে তাহাদের কিছু জিনিসপত্র নামাইয়াছে।

গোরুর গাড়িতে উঠিয়া চক্রবর্তী মহাশয় অনবরত তামাক টানিতে লাগিলেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইবে. একহারা পাতলা চেহারা. মুখে দাড়ি গোঁফ নাই, মাথার চুল সব পাকা। বলিলেন—জ্যা. ঘুম পাচ্ছে না তো?

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল. আমি তো নৈহাটীতে ঘুমিয়ে নিইচি আধঘণ্টা, অপুও ঘুমিয়েচে। আপনারই ঘুম হয় নি—

চক্রবর্তী মহাশয় খুব খানিকটা কাশিয়া লইয়া বলিলেন,—ওঃ. সোজা খোঁজটা করেছি তোদের! আর-বছর বোশেখে মেয়েটা গেল মারা. হরিধন তো তার আগেই। এই বয়সে হাত পুড়িয়ে রেঁধেও খেতে হয়েছে,—কেউ নেই সংসারে। তাই ভাবলাম হরিহর বাবাজীর তো নিশ্চিন্দিপুর থেকে উঠে যাবার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকেই. যাই এখানেই নিয়ে আসি। একটু ধানের জমি আছে. গৃহ-দেবতার সেবাটাও হবে! গ্রামে ব্রাহ্মণ তেমন নেই.—আর আমি তো এখানে থাকব না। আমি একটু কিছু ঠিক ক'রে দিয়েই কাশী চলে যাবো। একরকম ক'রে হরিহর নেবেন চালিয়ে। তাই গেলাম নিশ্চিন্দিপুর—

সর্বজয়া বলিল. আপনি বুঝি আমাদের কাশী যাওয়ার কথা শোনেন নি?

—তা কি ক'রে শুনবো? তোমাদের দেশে গিয়ে শুনলাম তোমরা নেই সেখানে। কেউ তোমাদের কথা বলতে পারে না—সবাই বলে তারা এখান থেকে বেচে-কিনে তিন-চার বছর হ'ল কাশী চলে গিয়েছে। তখন কাশী যাই। কাশী আমি আছি আজ দশ বছর। খুঁজতেই সব বেরিয়ে পড়লো। হিসেব ক'রে দেখলাম হরিহর যখন মারা যান. তখন আমিও কাশীতেই আছি, অথচ কখনো দেখাশুনো হয় নি, তা হলে কি আর—

অপু আগ্রহের সুরে বলিল. নিশ্চিন্দিপুরে আমাদের বাড়িটা কেমন আছে, দাদামশায়?

—সেদিকে আমি গেলাম কৈ! পথেই সব খবর পেলাম কি-না। আমি আর সেখানে দাঁড়াই নি। কেউ ঠিকানা দিতে পারলে না। ভুবন মুখুয্যে মশায় অবিশ্যি খাওয়া-দাওয়া করতে বললেন, আর তোমার বাপের একশো নিন্দে —বুদ্ধি নেই, সাংসারিক জ্ঞান নেই—হেন তেন। যাক্ সেসব কথা, তোমারা এলে ভাল হ'ল। যে ক'ঘর যজমান আছে তোমাদের বছর তাতে কেটে যাবে। পাশেই তেলিরা বেশ অবস্থাপন্ন, তাদের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা আছে। আমি পুজো-টুজো করতাম অবিশ্যি, সেটাও হাতে নিতে হবে ক্রমে। তোমাদের নিজেদের জিনিস দেখে শুনে নিতে হবে—

উলা গ্রামের মধ্যেও খুব বন, গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথেও বনঝোপ। সূর্য আকাশে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। চারিধারে প্রভাতী রৌদ্রের মেলা, পথের ধারে বনতুলসীর জঙ্গল, মাঠের ঘাসে এখনও স্থানে স্থানে শিশির জমিয়া আছে, কোন্ রূপকথার দেশের মাকড়সা যেন রূপালী জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে কিসের একটা গন্ধ, বিশেষ কোনো ফুল ফুলের গন্ধ নয় কিন্তু। শিশিরসিক্ত ঘাস, সকালের বাতাস, অড়হরের ক্ষেত, এখানে ওখানে বনজ গাছপালা, সবসুদ্ধ মিলাইয়া একটা সুন্দর সুগন্ধ।

অনেকদিন পরে এই সব গাছপালার প্রথম দর্শনে অপুর প্রাণে একটা উল্লাসের ঢেউ উঠিল। অপূর্ব, অদ্ভুত, সুতীব্র; মিনমিনে ধরণের নয়, পান্‌সে পান্‌সে জোলো ধরণের নয়। অপুর মন সে শ্রেণীরই নয় আদৌ, তাহা সেই শ্রেণীর যাহা জীবনের সকল অবদানকে, ঐশ্বর্যকে প্রাণপণে নিংড়াইয়া চুষিয়া আঁটিসার করিয়া খাইবার ক্ষমতা রাখে। অল্পেই নাচিয়া ওঠে, অল্পে দমিয়াও যায়—যদিও পুনরায় নাচিয়া উঠিতে বেশী বিলম্ব করে না।

মনসাপোতা গ্রামে যখন গাড়ি ঢুকিল তখন বেলা দুপুর। সর্বজয়া ছইয়ের পিছন দিকের ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিতেছে তাহার নূতনতম জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবার স্থানটা কি রকম। তাহার মনে হইল গ্রামটাতে লোকের বাস একটু বেশী, একটু যেন বেশী ঠেসাঠেসি, ফাঁকা জায়গা বেশী নাই, গ্রামের মধ্যে বেশী বনজঙ্গলের বালাইও নাই। একটা কাহাদের বাড়ি, বাহির-বাটীর দাওয়ায় জনকয়েক লোক গল্প করিতেছিল, গোরুর গাড়িতে কাহারা আসিতেছে দেখিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। উঠানে বাঁশের আলনায় মাছ ধরিবার জাল শুকাতেই দিয়াছে। বোধ হয় গ্রামের জেলেপাড়া।

আরও খানিক গিয়া গাড়ি দাঁড়াইল। ছোট্ট উঠানের সামনে একখানি

মাঝারি গোছের চালা ঘর, দু'খানা ছোট্ট দোচালা ঘর, উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ও একপাশে একটা পাতকুয়া। বাড়ির পিছনে একটা তেঁতুল গাছ—তাহার ডালপালা বড় চালাঘরখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সামনের উঠানটা বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা। চক্রবর্তী মহাশয় গাড়ি হইতে নামিলেন। অপু মাকে হাত ধরিয়া নামাইল।

চক্রবর্তী মহাশয় আসিবার সময় যে তেলিবাড়ির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈকালের দিকে তাহাদের বাড়ির সকলে দেখিতে আসিল। তেলি-গিন্নী খুব মোটা, রং বেজায় কালো। সঙ্গে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে, দুটি পুত্রবধূ। প্রায় সকলেরই হাতে মোটা মোটা সোনার অনন্ত দেখিয়া সর্বজয়ার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর হইতে দু'খানা কুশাসন বাহির করিয়া আনিয়া সলজ্জ ভাবে বলিল, আসুন আসুন, বসুন।

তেলি-গিন্নী পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলে ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূরাও দেখাদেখি তাহাই করিল। তেলি-গিন্নী হাসিমুখে বলিল, দুপুরবেলা এলেন মা-ঠাকরুণ একবার বলি যাই। এই যে পাশেই বাড়ি, তা আসতে পেলাম না। মেজছেলে এল গোয়াড়ী থেকে—গোয়াড়ী দোকান আছে কি-না! মেজ বৌমার মেয়েটা ন্যাওটো, মা দেখতে ফুরসৎ পায় না, দুপুরবেলা আমাকে একেবারে পেয়ে বসে—ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বেলা দুটো। ঘুঙড়ি কাশি, গুপী কবরেজ বলেছে ময়ূরপুচ্ছ পুড়িয়ে মধু দিয়ে খাওয়াতে। তাই কি সোজাসুজি পুড়ুলে হবে মা, চৌষট্টি ফেজৎ—কাঁসার ঘটির মধ্যে পোরো, তা ঘুঁটের জ্বাল করো, তা টিমে আঁচে চড়াও। হ্যারে হাজরা, ভোদা গোয়াড়ী থেকে কাল মধু এনেছে কি-না জানিস্?

আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া কথার উত্তর দিবার পূর্বেই তেলি-গিন্নী তাহাকে দেখাইয়া বলিল, ওইটি আমার মেজ মেয়ে—বহরমপুরে বিয়ে দিয়েচি। জামাই বড়বাজারে এদের দোকানে কাজকর্ম করেন। নিজেদেরও গোলা, দোকান রয়েচে কালনা—বেয়াই সেখানে দেখেন শোনেন। কিন্তু হলে হবে কি মা—এমন কথা ভূভারতে কেউ কখনো শোনে নি। দুই ছেলে, নাতি নাতনী, বেয়ান মারা গেলেন ভাদ্দর মাসে, মাঘ মাসে বুড়ো আবার বিয়ে ক'রে আনলে। এখন ছেলেদের সব দিয়েচে ভেন্ন করে। জামাইয়ের মুশকিল, ছেলেমানুষ—তা উনি বলেচেন, তা এখন তুমি বাবা আমাদের দোকানেই থাকো, কাজ দেখো শোনো শেখো, ব্যবসাদারের ছেলে, তারপর একটা হিল্লে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

বড় পুত্রবধূ এতক্ষণ কথা বলে নাই। সে ইহাদের মত হুড্ বার্নিস নয়, বেশ টকটকে রং। বোধ হয় শহর-অঞ্চলের মেয়ে। এ-দলের মধ্যে সে-ই সুন্দরী, বয়স বাইশ-তেইশ হইবে। সে নীচের ঠোঁটের কেমন চমৎকার এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া বলিল, এ'রা এসেচেন সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি, এ'দের আজকের সব ব্যবস্থা তো করে দিতে হবে? বেলাও তো গিয়েছে, এ রা আবার রান্না করবেন।

এই সময় অপু বাড়ির উঠানে ঢুকিল। সে আসিয়াই গ্রামখানা বেড়াইয়া দেখিতে বাহিরে গিয়াছিল। তেলি-গিন্নী বলিল—কে মা-ঠাকরুণ? ছেলে বুঝি? এই এক ছেলে? বাঃ, চেহারা যেন রাজপুত্তুর।

সকলেরই চোখ তাহার উপর পড়িল। অপু উঠানে ঢুকিয়াই এতগুলি অপরিচিতের সম্মুখে পড়িয়া কিছু লজ্জিত ও সংকুচিত হইয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেছিল, তাহার মা বলিল, দাঁড়া না এখেনে। ভারি লাজুক ছেলে মা—এখন ওইটুকুতে দাঁড়িয়েচে—আর এক মেয়ে ছিল, তা—সর্বজয়ার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। গিন্নী ও বড় পুত্রবধূ একসঙ্গে বলিল, নেই, হ্যাঁ মা? সর্বজয়া বলিল, সে কি মেয়ে মা! আমায় ছলতে এসেচিল, কি চুল, কি চোখ, কি মিষ্টি কথা? বকো-ঝকো, গাল দাও, মা'র মুখে উঁচু কথাটি কেউ শোনে নি কোনদিন।

ছোটবৌ বলিল, কত বয়সে গেল মা?

—এই তেরোয় পড়েই—ভাদ্রমাসে তেরোয় পড়ল, আশ্বিন মাসের ৭ই—দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেল।

তেলি-গিন্নী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—আহা মা, তা কি করবে বলো, সংসারে থাকতে গেলে সবই···তাই উনি বল্লেন—আমি বল্লাম আসুন তাঁরা—চক্কোত্তি মশায় পুজো-আচ্চা করেন—তা উনি মেয়েজামাই মারা যাওয়ার পর থেকে বড় থাকেন না। গাঁয়ে একঘর বামুন নেই—কাজকর্মে সেই গোয়াড়ী দৌড়তে হয়—থাকলে ভালো! বীরভূম না বাঁক্ড়ো জেলা থেকে সেবার এল কি চাটুয্যে। কি নামটা রে পাঁচী? বললে বাস করবো। বাড়ি থেকে চালডাল সিধে পাঠিয়ে দিই। তিন মাস রইল, বলে আজ ছেলেপিলে আন্‌ব—কাল ছেলেপিলে আন্‌ব—ও মা এক মাগী গোয়ালার মেয়ে উঠোন ঝাঁট দিত আমাদের, তা বলি বামুন মানুষ এসেছে, ও'রও কাজটা করে দিস। ঘেন্নার কথা শোনো মা, আর বছর শিবরাত্রির দিন—তাকে নিয়ে—

বউ-দু'টি ও মেয়েরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সর্বজয়া অবাক্ হইয়া বলিল, পালালো নাকি ?

—পালালো কি এমন তেমন পালালো মা ? সেই সঙ্গে আমাদের এক প্রস্ত বাসন। কিছুই জানি নে মা, সব নিজের ঘর থেকে···বলি আহা বামুন এসেচে, —সরুক, আছে বাড়তি। তা সেই বাসন সবসুদ্দ নিয়ে দু'জনে নিউদ্দিশ ! যাক্ সে সব কথা মা, উঠি তাহলে আজ ! রান্নার কি আছে না-আছে বলো মা, সব দিই বন্দোবস্ত করে।

আট-দশ দিন কাটিয়া গেল ; সর্বজয়া ঘরবাড়ি মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে। দেওয়াল উঠান নিকাইয়া পুঁছিয়া লইয়াছে। নিজস্ব ঘরদোর অনেকদিন ছিল না, নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধিই নাই—এতদিন পরে একটা সংসারের সমস্ত ভার হাতে পাইয়া সে গত চার বৎসরের সঞ্চিত সাধ মিটাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

জ্যাঠামশায় লোক মন্দ নহেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই সর্বজয়া দেখিল তিনি একটু বেশী কৃপণ। ক্রমে ইহাও বোঝা গেল—তিনি যে নিছক পরার্থপরতার ঝোঁকেই ইহাদের এখানে আনিয়াছেন তাহা নহে, অনেকটা আনিয়াছেন নিজের গরজে। তেলিদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরটি পূজা না করিলে সংসার ভাল রূপ চলে না, তাহাদের বার্ষিক বৃত্তিও বন্ধ হইয়া যায়। এই বার্ষিক বৃত্তি সম্বল করিয়াই তিনি কাশী থাকেন। পাকা লোক, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তবে তিনি ইহাদের আনিয়া তুলিয়াছেন। সর্বজয়াকে প্রায়ই বলেন—জয়া, তোর ছেলেকে বল কাজকর্ম সব দেখে নিতে। আমার মেয়াদ আর কতদিন ? ওদের বাড়ির কাজটা দিক না আরম্ভ ক'রে—সিধের চালেই তো মাস চলে যাবে।

সর্বজয়া তাহাতে খুব খুশী।

সকলের তাগিদে শীঘ্রই অপু পূজার কাজ আরম্ভ করিল—দু'টি একটি করিয়া কাজকর্ম আরম্ভ হইতে হইতে ক্রমে এপাড়ায় ওপাড়ায় অনেক বাড়ি হইতেই লক্ষ্মীপূজায় মাকালপূজায় তাহার ডাক আসে। অপু মহা উৎসাহে প্রাতস্নান করিয়া উপনয়নের চেলীর কাপড় পরিয়া নিজের টিনের বাক্সের বাংলা নিত্যকর্ম-পদ্ধতিখানা হাতে লইয়া পূজা করিতে যায়। পূজা করিতে বসিয়া আনাড়ীর মত কোন্ অনুষ্ঠান করিতে কোন্ অনুষ্ঠান করে। পূজার কোন পদ্ধতি জানে না—বার বার বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে কি লেখা আছে—'বজ্রায় হুং' বলিবার পর শিবের মাথায় বজ্রের কি গতি করিতে হইবে—'ওঁ ব্রহ্মপৃষ্ঠ

ঋষি সুতলছন্দঃ কূর্মো দেবতা' বলিয়া কোন্ মুদ্রায় আসনের কোণ কি ভাবে ধরিতে হইবে—কোনরকমে গোঁজামিল দিয়া কাজ সারিবার মত পটুত্বও তাহার আয়ত্ত হয় নাই, সুতরাং পদে পদে আনাড়ীপনাটুকু ধরা পড়ে।

একদিন সেটুকু বেশী করিয়া ধরা পড়িল ওপাড়ার সরকারদের বাড়ি। যে ব্রাহ্মণ তাহাদের বাড়িতে পূজা করিত, সে কি জন্য রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, গৃহদেবতা নারায়ণের পূজার জন্য তাহাদের লোক অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ির বড় মেয়ে নিরুপমা পূজার যোগাড় করিয়া দিতেছিল, চৌদ্দ বৎসরের ছেলেকে চেলী পরিয়া পুঁথি বগলে গম্ভীর মুখে আসিতে দেখিয়া সে একটু অবাক্ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পুজো করতে পারবে? কি নাম তোমার? চক্কত্তি মশায় তোমার কে হন? মুখচোরা অপুর মুখে বেশী কথা যোগাইল না, লাজুক মুখে সে গিয়া আনাড়ীর মত আসনের উপর বসিল।

পূজা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে নিরুপমার কাছে পূজারীর বিদ্যা ধরা পড়িয়া গেল। নিরুপমা হাসিয়া বলিল, ওকি? ঠাকুর নামিয়ে আগে নাইয়ে নাও, তবে তো তুলসী দেবে?—অপু থতমত খাইয়া ঠাকুর নামাইতে গেল।

নিরুপমা বসিয়া পড়িয়া বলিল—উঁহু, তাড়াতাড়ি ক'রো না। এই টাটে আগে ঠাকুর নামাও—আচ্ছা, এখন বড় তাম্র কুণ্ডুতে জল ঢালো—

অপু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বইয়ের পাতা উল্টাইয়া স্নানের মন্ত্র খুঁজিতে লাগিল। তুলসীপত্র পরাইয়া শালগ্রামকে সিংহাসনে উঠাইতে যাইতেছে, নিরুপমা বলিল, ওকি? তুলসীপাতা উপুড় ক'রে পরাতে হয় বুঝি? চিৎ ক'রে পরাও—

ঘামে রাঙামুখ হইয়া কোনরকমে পূজা সাঙ্গ করিয়া অপু চলিয়া আসিতেছিল, নিরুপমা ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে আসন পাতিয়া বসাইয়া ভোগের ফলমূল ও সন্দেশ জলযোগ করাইয়া তবে ছাড়িয়া দিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল।

অপুর কেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব মায়ারূপ এখানকার কিছুতেই নাই। এই গ্রামে নদী নাই, মাঠ থাকিলেও সে মাঠ নাই, লোকজন বেশী, গ্রামের মধ্যেও লোকজন বেশী। নিশ্চিন্দিপুরের সেই উদার স্বপ্নমাখানো মাঠ, সে নদীতীর এখানে নাই, তাদের দেশের মত গাছপালা, কত ফুলফল, পাখি, নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব বন-বৈচিত্র্য, কোথায় সে সব? কোথায় সে নিবিড় পুষ্পিত ছাতিম বন, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর ছড়ানো সন্ধ্যা?

সরকার বাড়ি হইতে আজকাল প্রায়ই পূজা করিবার ডাক আসে। শান্তস্বভাব সুন্দর ও চেহারার গুণে অপুকেই আগে চায়। বিশেষ বারব্রতের দিনে পূজাপত্র সারিয়া অনেক বেলায় সে ধামা করিয়া নানাবাড়ির পূজার নৈবেদ্য ও চাল-কলা বহিয়া বাড়ি আনে। সর্বজয়া হাসিমুখে বলে, ওঃ, আজ চাল তো অনেক হয়েচে! —দেখি! সন্দেশ কাদের বাড়ির নৈবিদ্যিতে দিল রে!

অপু খুশির সহিত দেখাইয়া বলে, কুণ্ডুবাড়ি থেকে কেমন একছড়া কলা দিয়েচে, দেখেচো মা?

সর্বজয়া বলে, এবার বোধহয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েচেন, এদের ধরে থাকা যাক্‌ গিন্নী লোক বড় ভালো। মেজছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে তত্ত্ব পাঠিয়েচে—অসময়ের আম—অমনি আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়েচে—খাস্‌ এখন দুধ দিয়ে।

এত নানারকমের ভাল জিনিস সর্বজয়া কখনো নিজের আয়ত্তের মধ্যে পায় নাই। তাহার কতকালের স্বপ্ন! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে কত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে, উঠানের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া বাঁশবনের পত্রস্পন্দনে, ঘুঘুর ডাকে, তাহার অবসন্ন অন্যমনস্ক মন যে অবাস্তব সচ্ছলতার ছবি আপন মনে ভাঙিত গড়িত—হাতে খরচ নাই, ফুটা বাড়িতে জল পড়ে বৃষ্টির রাত্রে, পাড়ায় মুখ পায় না, সকলে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না—সে সব দিনের স্মৃতির সঙ্গে, আমরুল শাকের বনে পুরানো পাঁচিলের দীর্ঘছায়ার সঙ্গে যে সব দূরকালের দুরাশার রঙে রঙিন ভবিষ্যৎ জড়ানো ছিল—এই তো এতদিনে তাহারা পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে।

পূজার কাজে অপুর অত্যন্ত উৎসাহ। রোজ সকালে উঠিয়া সে কলু-পাড়ার একটা গাছ হইতে রাশীকৃত কাঁচ কাঁচ বেলপাতা পাড়িয়া আনে। একটা খাতা বাঁধিয়াছে, তাহাতে সর্বদা ব্যবহারের সুবিধার জন্য নানা দেব-দেবীর স্তবের মন্ত্র, স্নানের মন্ত্র, তুলসীদান প্রণালী লিখিয়া লইয়াছে। পাড়ায় পূজা করিতে নিজের তোলা ফুল-বেলপাতা লইয়া যায়, পূজার সকল পদ্ধতি নিখুঁতভাবে জানা না থাকিলেও উৎসাহ ও একাগ্রতায় সে সকল অভাব পূরণ করিয়া লয়।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপু একদিন মাকে বলিল যে, সে স্কুলে পড়িতে যাইবে।

সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোন ইস্কুল রে?

—কেন, এই তো আড়বোয়ালেতে বেশ ইস্কুল রয়েচে।

—সে তো এখেন থেকে যেতে-আসতে চার ক্রোশ পথ। সেখেনে যাবি হেঁটে পড়তে?

সর্বজয়া কথাটা তখনকার মত উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু ছেলের মুখে কয়েকদিন ধরিয়া বার বার কথাটা শুনিয়া সে শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, যা খুশি করো বাপু, আমি জানি নে। তোমরা কোনো কালে কারুর কথা তো শুনলে না? শুনবেও না—সেই একজন নিজের খেয়ালে সারাজন্ম কাটিয়ে গেল, তোমারও তো সে ধারা বজায় রাখা চাই! ইস্কুলে পড়বো! ইস্কুলে পড়বি তো এদিকে কি হবে? দিব্যি একটা যাহোক্ দাঁড়াবার পথ তবু হয়ে আসছে—এখন তুমি দাও ছেড়ে—তারপর ইদিকেও যাক্, ওদিকেও যাক্—

মায়ের কথায় সে চুপ করিয়া গেল। চক্রবর্তী মহাশয় গত পৌষ মাসে কাশী চলিয়া গিয়াছেন, আজকাল তাহাকেই সমস্ত দেখিতে শুনিতে হয়। সামান্য একটু জমি-জমা আছে, তাহার খাজনা আদায়, ধান কাটাইবার বন্দোবস্ত, দশকর্ম, গৃহদেবতার পূজা। গ্রামে ব্রাহ্মণ নাই, তাহারাই একঘর মোটে। চাষী কৈবর্ত ও অন্যান্য জাতির বাস, তাহা ছাড়া এ-পাড়ার কুণ্ডুরা ও ও-পাড়ার সরকারেরা। কাজে কর্মে ইহাদের সকলেরই বাড়ি অপুকে ষষ্ঠীপূজা, মাকালপূজা করিয়া বেড়াইতে হয়। সবাই মানে, জিনিসপত্র দেয়।

সেদিন কি একটা তিথি উপলক্ষে সরকার-বাড়ি লক্ষ্মীপূজা ছিল। পূজা সারিয়া খানিক রাত্রে জিনিসপত্র একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া সে পথ বাহিয়া বাড়ির দিকে আসিতেছিল; খুব জ্যোৎস্না, সরকার বাড়ির সামনে নারিকেল গাছে কাঠঠোক্রা শব্দ করিতেছে। শীত বেশ পড়িয়াছে; বাতাস খুব ঠাণ্ডা, পথে ক্ষেত্র কাপালির বেড়ায় আমড়া গাছে বউল ধরিয়াছে। কাপালিদের বাড়ির পিছনে বেগুনক্ষেতের উঁচুনিচু জমিতে এক জায়গায় জ্যোৎস্না পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে, —পাশের খাদটাতেই অন্ধকার। অপু মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে যাইতেছিল যে, উঁচু জায়গাটা একটা ভালুক, নিচুটা জলের চৌবাচ্চা; তার পরের উঁচুটা নুনের ঢিবি। মনে মনে ভাবিল—কমলালেবু দিয়েচে, বাড়ি গিয়ে কমলালেবু খাবো। মনের সুখে শহরে-শেখা একটা গানের একটা চরণ সে গুন্ গুন্ করিয়া ধরিল—

সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরী মালা—

অনেকদিনের স্বপ্ন যেন আবার ফিরিয়া আসে। নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে ইছামতীর তীরের বনে, মাঠে কত ধূসর অপরাহ্নের, কত জ্যোৎস্না-রাতের সে সব

স্বপ্ন! এই ছোট্ট চাষাগাঁয়ের চিরকালই এ রকম ষষ্ঠীপূজা মাকালপূজা করিয়া কাটাইতে হইবে?

সারাদিনের রোদে-পোড়া মাটি নৈশ শিশিরে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এখন শীতের রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহারই সুগন্ধ।

অপুর মনে হইল রেলগাড়ির চাকায় চাকায় যেমন শব্দ হয়—ছোট্‌ঠাকুর-পো—বট্‌ঠাকুর-পো—ছোট্‌ঠাকুর-পো—বট্‌ঠাকুর-পো—

দুই-এক দিনের মধ্যে সে মায়ের কাছে কথাটা আবার তুলিল। এবার শুধু তোলা নয়, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল। আড়বোয়ালের স্কুল দুই ক্রোশ দূরে, তাই কি? সে খুব হাঁটিতে পারিবে এটুকু। সে বুঝি চিরকাল এই রকম চাষাগাঁয়ে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরপূজা করিবে? বাহিরে যাইতে পারিবে না বুঝি!

তবু আরও মাস দুই কাটিল। স্কুলের পড়াশোনা সর্বজয়া বোঝে না, সে যাহা বোঝে তাহা পাইয়াছে। তবে আবার ইস্কুলে পড়িয়া কি লাভ? বেশ তো সংসার গুছাইয়া উঠিতেছে। আর বছর কয়েক পরে ছেলের বিবাহ—তারপরই একঘর মানুষের মত মানুষ।

সর্বজয়ার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু অপুর তাহা হয় নাই। তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না—শ্রাবণের প্রথমে সে আড়বোয়ালের মাইনর স্কুলে ভর্তি হইয়া যাতায়াত শুরু করিল।

এই পথের কথা সে জীবনে কোনোদিন ভোলে নাই—এই একটি বৎসর ধরিয়া কি অপরূপ আনন্দই পাইয়াছিল—প্রতিদিন সকালে-বিকালে এই পথ হাঁটিবার সময়টাতে।···নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধি এত আনন্দ আর হয় নাই।

ক্রোশ দুই পথ। দুধারে বট, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ, মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাকা আকাশ। স্কুলে বসিয়া অপুর মনে হইত সে যেন একা কতদূর-বিদেশে আসিয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিত—ছুটির পরে নির্জন পথে বাহির হইয়া পড়িত।—বৈকালের ছায়ায় ঢ্যাঙা তাল-খেজুরগাছগুলা যেন দিগন্তের আকাশ ছুঁইতে চাহিতেছে—পিড়িং পিড়িং পাখির ডাক—হু হু মাঠের হাওয়ায় পাকা ফসলের গন্ধ আনিতেছে—সর্বত্র একটা মুক্তি, একটা আনন্দের বার্তা।··

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সে আনন্দ পাইত পথ-চলতি লোকজনের সঙ্গে কথা কহিয়া। কত ধরণের লোকের সঙ্গে পথে দেখা হইত—কত দূর-গ্রামের লোক পথ দিয়া হাঁটিত, কত দেশের লোক কত দেশে যাইত। অপু সবেমাত্র একা পথে বাহির

হইয়াছে, বাহিরের পৃথিবীটার সহিত নতুন ভাবে পরিচয় হইতেছে. পথে ঘাটে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের কথা জানিতে তাহার প্রবল আগ্রহ। পথ চলিবার সময়টা এইজন্য বড় ভালো লাগে, সাগ্রহে সে ইহার প্রতীক্ষা করে, স্কুলের ছুটির পর পথে নামিয়াই ভাবে—এইবার গল্প শুনবো। পারে ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া আসিয়া কোনো অপরিচিত লোকের নাগাল ধরিয়া ফেলে। প্রায়ই চাষালোক, হাতে হুঁকোকল্কে। অপু জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্ছ, হ্যাঁ কাকা? চলো আমি মনসাপোতা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাবো। মামজোয়ান গিইছিলে? তোমাদের বাড়ি বুঝি? না? শিকড়ে? নাম শুনেচি, কোন্‌দিকে জানি নে। কি খেয়ে সকালে বেরিয়েচ, হ্যাঁ কাকা?···

তারপর সে নানা খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞাসা করে—কেমন সে গ্রাম, ক'ঘর লোকের বাস, কোন্‌ নদীর ধারে? ক'জন লোক তাদের বাড়ি, কত ছেলেমেয়ে, তারা কি করে?···

কত গল্প, কত গ্রামের কিংবদন্তী, সেকাল-একালের কত কথা, পল্লী-গৃহস্থের কত সুখদুঃখের কাহিনী—সে শুনিয়াছিল এই এক বৎসরে। সে চিরদিন গল্প-পাগলা, গল্প শুনিতে শুনিতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়—যত সামান্য ঘটনাই হোক, তাহার ভাল লাগে। একটা ঘটনা মনে কি গভীর রেখাপাতই করিয়াছিল!

কোন্‌ গ্রামের এক ব্রাহ্মণবাড়ির বৌ এক বাগ্‌দীর সঙ্গে কুলের বাহির হইয়া গিয়াছিল—আজ অপুর সঙ্গীটি এইমাত্র তাকে শামুকপোতার বিলে গুগ্‌লি তুলিতে দেখিয়া আসিয়াছে। পরণে ছেঁড়া কাপড়, গায়ে গহনা নাই, ডাঙায় একটি ছোট ছেলে বসিয়া আছে, বোধ হয় তাহারই। অপু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার দেশের মেয়ে? তোমায় চিনতে পারলে?

হ্যাঁ, চিনিতে পারিয়াছিল। কত কাঁদিল, চোখের জল ফেলিল, বাপ-মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। অনুরোধ করিল যেন এসব কথা দেশে গিয়া সে না বলে। বাপ-মা শুনিয়া কষ্ট পাইবে। সে বেশ সুখে আছে। কপালে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে।

সঙ্গীটি উপসংহারে বলিল, বামুন-বাড়ির বৌ, হলুদের মত গায়ের রঙ—যেন ঠাকুরুণের পিরতিমে!

দুর্গা-প্রতিমার মত রূপসী একটি গৃহস্থবধূ ছেঁড়া কাপড় পরণে শামুক-পোতার বিলে হাঁটুজল ভাঙিয়া চুপড়ি হাতে গুগ্‌লি তুলিতেছে—কত কাল ছবিটা তাহার মনে ছিল!

সেদিন সে স্কুলে গিয়া দেখিল স্কুলসুদ্ধ লোক বেজায় সন্ত্রস্ত! মাস্টারেরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন। স্কুল-ঘর গাঁদা ফুলের মালা দিয়া সাজানো হইতেছে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় খামোকো একটা সুবৃহৎ সিঁড়িভাঙা ভগ্নাংশ কষিয়া নিজের ক্লাসের বোর্ড পুরাইয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ আজ স্কুল-ঘরের বারান্দা ও কম্পাউণ্ড এত সাফ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, যাহারা বারোমাস এস্থানের সহিত পরিচিত, তাহাদের বিস্মিত হইবার কথা। হেডমাস্টার ফণীবাবু খাতাপত্র, এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই লইয়া মহা ব্যস্ত। সেকেণ্ড পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, ও অমূল্যবাবু, চৌঠো তারিখে খাতায় যে নাম সই করেন নি? আপনাকে ব'লে ব'লে আর পারা গেল না। দেরিতে এসেছিলেন তো খাতায় সই ক'রে ক্লাসে গেলেই হ'ত? সব মনে থাকে, এইটের বেলাতেই—

অপু শুনিল একটার সময় ইন্সপেক্টর আসিবেন স্কুল দেখিতে। ইন্সপেক্টর আসিলে কি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসের ছেলেদের সে বিষয়ে তালিম দিতে লাগিলেন।

বারোটার কিছু পূর্বে একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া স্কুলের সামনে থামিল। হেডমাস্টার তখনও ফাইল দুরস্ত শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই বোধ হয়—তিনি এত সকালে ইন্সপেক্টর আসিয়া পড়াটা প্রত্যাশা করেন নাই, জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গাড়ি দেখিতে পাইয়াই উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটিলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্ট ভেকের মত সজীব হইয়া উঠিয়া তারস্বরে ও মহা উৎসাহে (অন্যদিন এই সময়টাই তিনি ক্লাসে বসিয়া মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাটুকু উপভোগ করিয়া থাকেন) দ্রব পদার্থ কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। পাশের ঘরে সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয়ের হুঁকোর শব্দ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল। শিক্ষক বলিলেন, মতি, তোমরা অবশ্যই কমলালেবু দেখিয়াছ, পৃথিবীর আকার—এই হরেন—কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার—

হেডমাস্টারের পিছনে পিছনে ইন্সপেক্টর স্কুল ঘরে ঢুকিলেন। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর হইবে, বেঁটে, গৌরবর্ণ, সাটিন জিনের লম্বা কোট গায়ে, সিল্কের চাদর গলায়, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতা, চোখে চশমা। গলার স্বর ভারী। প্রথমে তিনি অফিস-ঘরে ঢুকিয়া খাতাপত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখার পরে বাহির হইয়া হেডমাস্টারের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে গেলেন। অপুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্

করিতেছিল। এইবার তাহাদের ক্লাসে আসিবার পালা। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় গলার সুর আর এক গ্রাম চড়াইলেন।

ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিয়া বোর্ডের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা কি ভগ্নাংশ ধরেছে? তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাইল; বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, দু' ক্লাসে আমি অংক কষাই কি না। ও ক্লাসেই অনেকটা এগিয়ে দিই—সরল ভগ্নাংশটা শেষ করে ফেলি—

ইন্সপেক্টর এক এক করিয়া বাঙলা রিডিং পড়িতে বলিলেন। পড়িতে উঠিয়াই অপুর গলা কাঁপিতে লাগিল। শেষের দিকে তাহার পড়া বেশ ভাল হইতেছে বলিয়া তাহার নিজেরই কানে ঠেকিল। পরিষ্কার সতেজ বাঁশির মত গলা। রিনরিনে মিষ্টি।

—বেশ, বেশ রিডিং। কি নাম তোমার?

তিনি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তারপর সবগুলি ক্লাস একে একে ঘুরিয়া আসিয়া জলের ঘরে ডাব সন্দেশ খাইলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় অপুকে বলিলেন, তুই হাতে ক'রে এই ছুটির দরখাস্তখানা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, তোকে খুব পছন্দ করেছেন, যেমন বাইরে আসবেন, অমনি দরখাস্তখানা হাতে দিবি —দু'দিন ছুটি চাইবি—তোর কথায় হয়ে যাবে—এগিয়ে যা।

ইন্সপেক্টর চলিয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ি কিছুদূর যাইতে না যাইতে ছেলেরা সমস্বরে কলরব করিতে করিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হেডমাস্টার ফণীবাবু অপুকে বলিলেন, ইন্সপেক্টরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন তোমার ওপর। বোর্ডের একজামিন দেওয়াবো তোমাকে দিয়ে—তৈরী হও, বুঝলে?

বোর্ডের পরীক্ষা দিতে মনোনীত হওয়ার জন্য যত না হউক, ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনের জন্য দুদিন স্কুল বন্ধ থাকিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হইল। অন্য দিনের চেয়ে দেরি হইয়া গিয়াছে। অর্ধেক পথ চলিয়া আসিয়া পথের ধারে একটা সাঁকোর উপর বসিয়া মায়ের দেওয়া খাবারের পুঁটুলি খুলিয়া রুটি, নারিকেলকোরা ও গুড় বাহির করিল। এইখানটাতে বসিয়া রোজ সে স্কুল হইতে ফিরিবার পথে খাবার খায়। রাস্তার বাঁকের মুখে সাঁকোটা, হঠাৎ কোনো দিক হইতে দেখা যায় না, একটা বড় তুঁত-গাছের ডালপালা নত হইয়া ছায়া ও আশ্রয় দুই-ই যোগাইতেছে। সাঁকোর নীচে আমরুল শাকের বনের ধারে একটু একটু জল বাধিয়াছে, মুখ বাড়ালেই জলে ছায়া পড়ে। অপুর কেমন একটা অস্পষ্ট ভিত্তিহীন ধারণা আছে যে, জলটা মাছে ভর্তি, তাই সে একটু

একটু রুটির টুকরা উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে মাছে ঠোকরাইতেছে কি না।

সাঁকোর নীচের জলে হাত মুখ ধুইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল একজন ঝাঁকড়া-চুল কালো-মত লোক রাস্তার ধারের মাঠে নামিয়া লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকটা খুব লম্বা নয়, বেঁটে ধরনের, শক্ত হাত পা, পিঠে একগাছা বড় ধনুক, একটা বড় বোঁচকা, মাথার চুল লম্বা লম্বা, গলায় রাঙা সবুজ হিংলাজের মালা। সে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া ডাকিয়া বলিল, ওখানে কি খুঁজচো? পরে লোকটির সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। সে জাতিতে সাঁওতাল, অনেক দূরে কোথায় দুমকা জেলা আছে, সেখানে বাড়ি। অনেক দিন বর্ধমানে ছিল, বাঁকা বাঁকা বাংলা বলে, পায়ে হাঁটিয়া সেখান হইতে আসিতেছে। গন্তব্য স্থান অনির্দেশ্য—এরূপে যতদূর যাওয়া যায় যাইবে, সঙ্গে তীর ধনুক আছে, পথের ধারে বনে মাঠে যাহা শিকার মেলে—তাহাই খায়। সম্প্রতি একটা কি পাখি মারিয়াছে, মাঠের কোন ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক বড় বড় বেগুনও তুলিয়াছে—তাহাই পুড়াইয়া খাইবার যোগাড়ে শুকনো লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু বলিল, কি পাখি দেখি? লোকটা ঝোলা হইতে বাহির করিয়া দেখাইল একটা বড় হাঁড়িয়াল ঘুঘু। সত্যিকারের তীর ধনুক—যাহাতে সত্যিকারের শিকার সম্ভব হয়—অপু কখনও দেখে নাই। বলিল, দেখি একগাছা তীর তোমার? পরে হাতে লইয়া দেখিল, মুখে শক্ত লোহার ফলা, পিছনে বুনোপাখির পালক বাঁধা—অদ্ভুত কৌতূহলপ্রদ ও মুগ্ধকর জিনিস!—

—আচ্ছা এতে পাখি মরে, আর কি মরে?

লোকটা উত্তর দিল, সবই মারা যায়—খরগোস, শিয়াল, বেঁজী, এমন কি বাঘ পর্যন্ত। তবে বাঘ মারিবার সময় তীরের ফলায় অন্য একটা লতার রস মাখাইয়া লইতে হয়।···তাহার পর সে ভুঁইগাছতলায় শুকনো পাতা লতার আগুন জ্বালিল। অপুর পা আর সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না—মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, লোকটা পাখিটার পালক ছাড়াইয়া আগুনে ঝলসাইতে দিল, বেগুনগুলাও পুড়াইতে দিল।

বেলা অত্যন্ত পড়িলে অপু বাড়ি রওনা হইল। আহার শেষ করিয়া লোকটা তখন তাহার বোঁচকা ও তীর ধনুক লইয়া রওনা হইয়াছে। এ রকম মানুষ সে তো কখনো দেখে নাই। বাঃ—যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে যাওয়া—পথে

পথে তীর ধনুক দিয়া শিকার করা বনের লতাপাতা কুড়াইয়া গাছতলায় দিনের শেষে বেগুন পুড়াইয়া খাওয়া! গোটা আষ্টেক বড় বড় বেগুন সামান্য একটু নুনের ছিটা দিয়া গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়া কি করিয়াই নিমেষের মধ্যে সাবাড় করিয়া ফেলিল!…

মাস কয়েক কাটিয়া গেল। সকালবেলা স্কুলের ভাত চাইতে গিয়া অপু দেখিল রান্না চড়ানো হয় নাই। সর্বজয়া বলিল, আজ যে কুলুইচণ্ডী পুজো—আজ স্কুলে যাবি কি ক'রে?…ওরা বলে গিয়েচে ওদের পুজোটা সেরে দেওয়ার জন্যে—পুজোবারে কি আর স্কুলে যেতে পারবি? বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই বৈকি? আমি পুজো করতে গিয়ে স্কুল কামাই করি আর কি? আমি ওসব পারবো না, পুজোটুজো আমি আর করবো কি ক'রে, রোজই তো পুজো লেগে থাকবে আর আমি বুঝি রোজ রোজ—তুমি ভাত নিয়ে এস, আমি ওসব শুনছিনে—।

—লক্ষ্মী বাবা আমার। আচ্ছা, আজকের দিনটা পুজোটা সেরে নে। ওরা বলে গিয়েচে ওপাড়াসুদ্ধ পুজো হবে। চাল পাওয়া যাবে এক ধামার কম নয়, মানিক আমার, কথা শোনো, শুনতে হয়!

অপু কোন মতেই কথা শুনিল না। অবশেষে না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। সর্বজয়া ভাবে নাই যে, ছেলে সত্যসত্যই তাহার কথা ঠেলিয়া না খাইয়া স্কুলে চলিয়া যাইবে। যখন সত্যই বুঝিতে পারিল, তখন তাহার চোখের জল আর বাধা মানিল না। ইহা সে আশা করে নাই।

অপু স্কুলে পৌঁছিতেই হেডমাস্টার ফণীবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাক দিলেন। ফণীবাবুর ঘরেই স্থানীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট-অফিস, ফণীবাবুই পোস্ট-মাস্টার। তিনি তখন ডাকঘরের কাজ করিতেছিলেন। বলিলেন, এসো অপূর্ব, তোমার নম্বর দেখবে? আজ ইন্সপেক্টর অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েচে—বোর্ডের এগ্‌জামিনে তুমি জেলার মধ্যে প্রথম হয়েচ—পাঁচ টাকার একটা স্কলারশিপ পাবে যদি আরো পড়ো তবে। পড়বে তো?

এই সময় তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ঘরে ঢুকিলেন। ফণীবাবু বলিলেন, ওবে সে কথা এখন বললাম পণ্ডিতমশাই। জিজ্ঞেস করচি আরও পড়বে তো তৃতীয় পণ্ডিত বলিলেন, পড়বে না, বাঃ! হীরের টুক্‌রো ছেলে, স্কুলের নাম রেখেছে। ওরা যদি না পড়ে তো পড়বে কে, কেষ্ট তেলির বেটা গোবর্ধন

কিছু না. আপনি ইন্সপেক্টর অফিসে লিখে দিন যে, ও হাই স্কুলে পড়বে। ওর আবার জিজ্ঞেসটা কি?—ওঃ, সোজা পরিশ্রম করিচি মশাই ওকে ভগ্নাংশটা শেখাতে?

প্রথমটা অপু যেন ভাল করিয়া কথাটা বুঝিতে পারিল না। পরে যখন বুঝিল তখন তাহার মুখে কথা যোগাইল না। হেডমাস্টার একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিলেন—এইখানে একটা নাম সই ক'রে দাও তো। আমি কিন্তু লিখে দিলাম যে. তুমি হাই স্কুলে পড়বে। আজই ইন্সপেক্টর অফিসে পাঠিয়ে দেবো।

সকাল সকাল ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে মায়ের করুণ মুখচ্ছবি বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল। পথের পাশে দুপুরের রৌদ্রভরা শ্যামল মাঠ, প্রাচীন তুঁত বটগাছের ছায়া. ঘন শালপত্রের অন্তরালে ঘুঘুর উদাস কণ্ঠ. সব যেন করুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই অপূর্ব করুণ ভাবটি বড় গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। আজিকার দুপুরটির কথা উত্তর জীবনে বড় মনে আসিত তাহার। কত—কতদিন পরে আবার এই শ্যামচ্ছায়াভরা বীথি. বাল্যের অপরূপ জীবনানন্দ. ঘুঘুর ডাক. মায়ের মনের একদিনের দুঃখটি—অনঙ্গের মণিহারে গাঁথা দানাগুলির একটি, পশ্চিম দিগন্তে প্রতি সন্ধ্যায় ছিঁড়িয়া-পড়া. বহুবিস্মৃত মুক্তাবলীর মধ্যে কেমন করিয়া অক্ষয় হইয়া ছিল।

বাড়িতে তাহার মাও আজ সারাদিন খায় নাই। ভাত চাহিয়া না পাইয়া ছেলে না খাইয়াই চলিয়া গিয়াছে স্কুলে—সর্বজয়া কি করিয়া খাবারের কাছে বসে? কুলুইচণ্ডীর ফলার খাইয়া অপু বৈকালে বেড়াইতে গেল।

গ্রামের বাহিরে ধঞ্চেক্ষেতের ফসল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। চারি ধারে খোলা মাঠ পড়িয়া আছে। আবার সেই সব রঙীন কল্পনা; সে পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে! তার স্বপ্নের অতীত! মোটে এক বছর পড়িয়াই বৃত্তি পাইল।··· সুমুখের জীবনের কত ছবিই আবার মনে আসে! ঐ মাঠের পারে রক্ত আকাশটার মত রহস্যস্বপ্নভরা যে অজানা অকূল জীবন-মহাসমুদ্র!···পুলকে সারাদেহ শিহরিয়া উঠে। মাকে এখনও সব কথা বলা হয় নাই। মায়ের মনের বেদনার রঙে যেন মাঠ, ঘাট, অস্তদিগন্তের মেঘমালা রাঙানো। গভীর ছায়াভরা সন্ধ্যা মায়ের দুঃখভরা মনটার মত ঘুলি-ঘুলি অন্ধকার।

দালানের পাশের ঘরে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় ছেলেকে ওবেলার কুলুইচণ্ডী-ব্রতের চিঁড়ে-মুড়কির ফলার খাইতে দিল।

নিকটে বসিয়া চাঁপাকলার খোসা ছাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, ওরা কত দুঃখু করলে আজ। সরকার-বাড়ি থেকে বলে গেল তুই পুজো করবি—তারা খুঁজতে এলে আমি বললাম, সে স্কুলে চলে গিয়েছে। তখন তারা আবার ভৈরব চক্কত্তিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই অত বেলায়—তুই যদি যেতিস্—

—আজ না গিয়ে ভাল করিচি মা। আজ হেডমাস্টার বল্‌চে আমি এগ্‌জামিনে স্কলারশিপ পেইচি। বড় স্কুলে পড়লে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে পাবো। স্কুলে যেতেই হেডমাস্টার ডেকে বললে—

সর্বজয়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোথায় পড়তে হবে?

—মহকুমার বড় স্কুলে।

—তা তুই কি বল্‌লি?

—আমি কিছু বলি নি। পাঁচটা করে টাকা মাসে মাসে দেবে, যদি না পড়ি তবে তো আর দেবে না। ওতে মাইনেও ফ্রি করে নেবে আর ওই পাঁচ টাকাতে বোর্ডিং-এ থাকবার খরচও কুলিয়ে যাবে।

সর্বজয়া আর কোন কথা বলিল না। কি কথা সে বলিবে? যুক্তি এতই অকাট্য যে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। ছেলে স্কলারশিপ পাইয়াছে, শহরে পড়িতে যাইবে, ইহাতে মা-বাপের ছেলেকে বাধা দিয়া বাড়ি বসাইয়া রাখিবার পদ্ধতি কোথায় চলিত আছে? এ যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন্ দণ্ডী তার নির্মম অকাট্য দণ্ড উঠাইয়াছে, তাহার দুর্বল হাতের সাধ্য নাই যে ঠেকাইয়া রাখে। ছেলেও ঐদিকে ঝুঁকিয়াছে! আজকার দিনটিই যেন কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল সে। ভবিষ্যতের সহস্র সুখস্বপ্ন কুয়াসার মত অনন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে কেন আজকার দিনটিতে বিশেষ করিয়া?

মাসখানেক পরে বৃত্তি পাওয়ার খবর কাগজে পাওয়া গেল।

যাইবার পূর্বদিন বৈকালে সর্বজয়া ব্যস্তভাবে ছেলের জিনিসপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। ছেলে কখনও একা বিদেশে বাহির হয় নাই, নিতান্ত আনাড়ী, ছেলে-মানুষ ছেলে। কত জিনিসের দরকার হইবে, কে থাকিবে তখন সেখানে যে মুখে মুখে সব অভাব যোগাইয়া ফিরিবে, সব জিনিস হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবে? খুঁটিনাটি—একখানা কাঁথা পাতিবার, একখানি গায়ের—একটি জল খাইবার গ্লাস, ঘরের তৈরী এক শিশি সরের ঘি, এক পুঁটুলি নারিকেল নাড়ু;

অপু ফুলকাটা একটা মাঝারি জামবাটিতে দুধ খাইতে ভালবাসে—সেই বাটিটা, ছোট একটা বোতলে মাখিবার চৈ-মিশানো নারিকেল তৈল, আরও কত কি। অপুর মাথার বালিশের পুরানো ওয়াড় বদলাইয়া নূতন ওয়াড় পরাইয়া দিল। দধি-যাত্রায় আবশ্যকীয় দই একটা ছোট পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল। ছেলেকে কি করিয়া বিদেশে চলিতে হইবে সে বিষয়ে সহস্র উপদেশ দিয়াও তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। ভাবিয়া দেখিয়া যেটি বাদ দিয়াছে মনে হয় সেটি তখনি আবার ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল।

—যদি কেউ মারে টারে, কত দুষ্টু ছেলে তো আছে, অমনি মাস্টারকে বলে দিবি—বুঝলি? রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িস নে যেন ভাত খাবার আগে! এ তো বাড়ি নয় যে কেউ তোকে ওঠাবে—খেয়ে তবে ঘুমুবি—নয়তো তাদের বলবি, যা হয়েচে তাই দিয়ে ভাত দাও—বুঝলি তো?

সন্ধ্যার পর সে কুণ্ডুদের বাড়ি মনসার ভাসান শুনিতে গেল। অধিকারী নিজে বেহুলা সাজিয়া পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে—বেশ গানের গলা। খানিকটা শুনিয়া তাহার ভাল লাগিল না। শুধু ছড়া কাটা ও নাচ সে পছন্দ করে না,—যুদ্ধ নাই, তলোয়ার-খেলা নাই, যেন প্যানসে-প্যানসে।

তবুও আজিকার রাতটি বড় ভাল লাগিল তাহার। এই মনসা ভাসানোর আসর, এই নূতন জায়গা, এই অচেনা গ্রাম্য বালকের দল, ফিরিবার পথে তাহাদের পাড়ার বাঁকে প্রস্ফুটিত হেনা ফুলের গন্ধ-ভরা নৈশ বাতাস জোনাকিজ্বলা অন্ধকারে কেমন মায়াময় মনে হয়।···

রাত্রে সে আরও দু-একটা জিনিস সঙ্গে লইল। বাবার হাতের লেখা একখানা গানের খাতা, বাবার উদ্ভট শ্লোকের খাতাখানা বড় পেঁটরাটা হইতে বাহির করিয়া রাখিল—বড় বড় গোটা গোটা ছাঁদের হাতের লেখাটা বাবার কথা মনে আনিয়া দেয়। গানগুলির সঙ্গে বাবার গলার সুর এমনভাবে জড়াইয়া আছে যে, সেগুলি পড়িয়া গেলেই বাবার সুর কানে বাজে। নিশ্চিন্দিপুরের কত ক্রীড়াক্লান্ত শান্ত সন্ধ্যা, মেঘমেদুর বর্ষামধ্যাহ্ন, কত জ্যোৎস্না-ভরা রহস্যময়ী রাত্রি বিদেশ-বিভূঁই-এর সেই দুঃখ-মাখানো দিনগুলির সঙ্গে এই গানের সুর যেন জড়াইয়া আছে—সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের রাণা, কাশীর পরিচিত সেই বাঙাল কথকঠাকুর।

সর্বজয়ার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, হয়ত ছেলে শেষ পর্যন্ত বিদেশে যাইবার মত করিবে না। কিন্তু তাহার অপু যে পিছনের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। সে যে এত খাটিয়া, একে-ওকে বলিয়া কহিয়া তাহার সাধ্যমত

যতটা কুলায়, ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন একটা খাড়া করিয়া দিয়াছিল—ছেলে তাহার পায়ে দাঁড়াইয়া যাইতেছে—কি জানি কিসের টানে! কোথায়? তাহার স্নেহদুর্বল দৃষ্টি তাহাকে দেখিতে দিতেছিল না যে, ছেলের ডাক আসিয়াছে বাহিরের জগৎ হইতে। সে জগৎটা তাহার দাবী আদায় করিতে তো ছাড়িবে না—সাধ্য কি সর্বজয়ার যে চিরকাল ছেলেকে আঁচলে লুকাইয়া রাখে?

যাত্রার পূর্বে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দধির ফোঁটা অপুর কপালে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল—বাড়ি আবার শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসবি কিন্তু, তোদের ইতুপুজোর ছুটি দেবে তো?

—হ্যাঁ, ইস্কুলে বুঝি ইতুপুজোয় ছুটি হয়? তাতে আবার বড় ইস্কুল। সেই আবার আসবো গরমের ছুটিতে।

ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় উচ্ছ্বসিত চোখের জল বহু কষ্টে সর্বজয়া চাপিয়া রাখিল।

অপু মায়ের পায়ের ধুলো লইয়া ভারী বোঁচকাটা পিঠে ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

মাঘ মাসের সকাল। কাল একটু একটু মেঘ ছিল, আজ মেঘ-ভাঙা রাঙা রোদ কুণ্ডুবাড়ির দো-ফলা আম গাছের মাথায় ঝলমল করিতেছে—বাড়ির সামনে বাঁশবনের তলায় চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে বুনোআদার রঙীন ফুল যেন দূর ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের মত সকালের বুকে।

অপরাজিত — দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সবে ভোর হইয়াছে। দেওয়ানপুর গবর্ণমেণ্ট মডেল ইনস্টিটিউশনের ছেলেদের বোর্ডিং-ঘরের সব দরজা এখনও খুলে নাই। কেবল স্কুলের মাঠে দুইজন শিক্ষক পায়চারী করিতেছেন। সম্মুখের রাস্তা দিয়া এত ভোরেই গ্রাম হইতে গোয়ালারা বাজারে দুধ বেচিতে আনিতেছিল, একজন শিক্ষক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—দাঁড়াও, ও ঘোষের পো, কাল দুধ দিয়ে গেলে তা নিছক জল, আজ দেখি কেমন দুধটা!

অপর শিক্ষকটি পিছু পিছু আসিয়া বলিলেন, নেবেন না সত্যেনবাবু, একটু

বেলা না গেলে ভাল দুধ পাওয়া যায় না। আপনি নতুন লোক, এসব জায়গার গতিক জানেন না, যার-তার কাছে দুধ নেবেন না—আমার জানা গোয়ালা আছে. কিনে দেবো বেলা হলে।

বোর্ডিং-বাড়ির কোণের ঘরে দরজা খুলিয়া একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল ও দূরের করোনেশন ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সত্যেনবাবুর সঙ্গী শিক্ষকটির নাম রামপদবাবু. তিনি ডাকিয়া বলিলেন—ওহে সমীর, ওই যে ছেলেটি এবার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে. সে কাল রাত্রে এসেছে না?

ছেলেটি বলিল. এসেছে স্যার, ঘুমুচ্ছে এখনও। ডেকে দেবো?—পরে সে জানালার কাছে গিয়া ডাকিল. অপূর্ব. ও অপূর্ব!

ছিপছিপে পাতলা চেহারা. চোদ্দ পনেরো বৎসরের একটি খুব সুন্দর ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। রামপদবাবু বলিলেন. তোমার নাম অপূর্ব! ও!—এবার আড়বোয়ালের স্কুল থেকে স্কলারশিপ পেয়েছে?—বাড়ি কোথায়? ও! বেশ বেশ, আচ্ছা, স্কুলে দেখা হবে।

সমীর জিজ্ঞাসা করিল. স্যার, অপূর্ব কোন্ ঘরে থাকবে এখনও সেকেন্ মাস্টার মশায় ঠিক করে দেন নি। আপনি একটু বলবেন?

রামপদবাবু বলিলেন, কেন তোর ঘরে তো সীট খালি রয়েছে—ওখানেই থাকবে। সমীর বোধ হয় ইহাই চাহিতেছিল, বলিল,—আপনি একটু বলবেন তাহলে সেকেন্—

রামপদবাবু চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল. ইনি কে? পরে পরিচয় শুনিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল। হয়ত বোর্ডিং-এর নিয়ম নাই এত বেলা পর্যন্ত ঘুমানো, সে না জানিয়া শুনিয়া প্রথম দিনটাতেই হয়ত একটা অপরাধের কাজ করিয়া বসিয়াছে।...

একটু বেলা হইলে সে স্কুল-বাড়ি দেখিতে গেল। কাল অনেক রাত্রে আসিয়া পেঁছিয়াছিল, ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। রাত্রের অন্ধকারে আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া সাদা রং-এর প্রকাণ্ড স্কুল বাড়িটা তাহার মনে একটা আনন্দ ও রহস্যের সঞ্চার করিয়াছিল।

এই স্কুলে সে পড়িতে পাইবে!...কতদিন শহরে থাকিতে তাহাদের ছোট স্কুলটা হইতে বাহির হইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিতে পাইত—হাই স্কুলের

প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছেলেরা সকলেই এক ধরণের পোশাক পরিয়া ফুটবল খেলিতেছে। তখন কতদিন মনে হইয়াছে এত বড় স্কুলে পড়িতে যাওয়া কি তাহার ঘটিবে কোন কালে—এসব বড়লোকের ছেলেদের জন্য। এতদিনে তাহার আশা পূর্ণ হইতে চলিল।

বেলা দশটার কিছু আগে বোর্ডিং-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিধুবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে কোন্ ঘরে আছে, নাম কি, বাড়ি কোথায়, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বলিলেন, সমীর ছোকরা ভাল, একসঙ্গে থাকলে বেশ পড়াশুনো হবে। এখানকার পুকুরের জলে নাইবে না কখনো—জল ভালো নয়, স্কুলের ইন্দারার জলে ছাড়া—আচ্ছা যাও, এদিকে আবার ঘণ্টা বাজবার সময় হল।'

সাড়ে দশটায় ক্লাস বসিল। প্রথম বই খাতা হাতে ক্লাস-রুমে ঢুকিবার সময় তাহার বুক আগ্রহের ঔৎসুক্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। বেশ বড় ঘর, নীচু চৌকির উপর মাস্টারের চেয়ার পাতা—খুব বড় ব্ল্যাকবোর্ড। সব ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁতভাবে সাজানো। চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, ডেস্ক সব ঝক্ঝক্ করিতেছে, কোথাও একটু ময়লা বা দাগ নাই।

মাস্টার ক্লাসে ঢুকিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ নিয়ম পূর্বে সে যে সব স্কুলে পড়িত সেখানে দেখে নাই। কেহ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইবার কথা মাস্টার শিখাইয়া দিতেন। সত্য সত্যই এতদিন পরে সে বড় স্কুলে পড়িতেছে বটে!···

জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল পাশের ক্লাস-রুমে একজন কোট-প্যাণ্টপরা মাস্টার বোর্ডে কি লিখিতে দিয়া ক্লাসের এদিক-ওদিক পায়চারী করিতেছেন—চোখে চশমা, আধপাকা দাড়ি বুকের উপর পড়িয়াছে, গম্ভীর চেহারা। সে পাশের ছেলেকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, উনি কোন্ মাস্টার ভাই?

ছেলেটি বলিল—উনি মিঃ দত্ত, হেডমাস্টার—ক্রিশ্চান, খুব ভালো ইংরিজি জানেন।

অপূর্ব শুনিয়া নিরাশ হইল যে, তাহাদের ক্লাসে মিঃ দত্তের কোন ঘণ্টা নাই। থার্ড ক্লাসের নিচে কোন ক্লাসে তিনি নাকি নামেন না।

পাশেই স্কুলের লাইব্রেরী, ন্যাপ্থালিনের গন্ধ-ভরা পুরোনো বই-এর গন্ধ আসিতেছিল। ভাবিল এ ধরণের ভরপুর লাইব্রেরীর গন্ধ কি কখনো ছোটখাটো স্কুলে পাওয়া যায়?

ঢং ঢং করিয়া ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে—আড়বোয়ালের স্কুলের মত একখণ্ড রেলের পাটির লোহা বাজায় না, সত্যিকারের পেটা ঘড়ি।—কি গম্ভীর আওয়াজটা !···

টিফিনের পরের ঘণ্টায় সত্যেনবাবুর ক্লাস। চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, ইঁহার মুখ দেখিয়া অপুর মনে হইল ইনি ভারী বিদ্বান, বুদ্ধিমানও বটে। প্রথম দিনেই ইঁহার উপর কেমন এক ধরণের শ্রদ্ধা তাহার গড়িয়া উঠিল! সে শ্রদ্ধা আরও গভীর হইল ইঁহার মুখের ইংরিজি উচ্চারণে।

ছুটির পর স্কুলের মাঠে বোর্ডিং-এর ছেলেদের নানা ধরণের খেলা শুরু হইল। তাহাদের ক্লাসের ননী ও সমীর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অন্য সকল ছেলেদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। সে ক্রিকেট খেলা জানে না, ননী তাহার হাতে নিজের ব্যাটখানা দিয়া তাহাকে বল মারিতে বলিল ও নিজে উইকেট্ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া খেলার আইনকানুন বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

খেলার অবসানে যে-যাহার স্থানে চলিয়া গেল। খেলার মাঠে পশ্চিম কোণে একটা বড় বাদাম গাছ, অপু গিয়া তাহার তলায় বসিল। একটু দূরে গবর্ণমেণ্টের দাতব্য ঔষধালয়। বৈকালেও সেখানে একদল রোগীর ভিড় হইয়াছে, তাহাদের নানা কলরবের মধ্যে একটি ছোট মেয়ের কান্নার সুর শোনা যাইতেছে। অপূর্ব কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের মধ্যে এই আজ প্রথম দিন, যেদিনটি সে মায়ের নিকট হইতে বহুদূরে আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রবাসে একা কাটাইতেছে। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ তাহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কত কথা মনে ওঠে, এই সুদীর্ঘ পনেরো বৎসরের জীবনে কি অপূর্ব বৈচিত্র্য, কি ঐশ্বর্য !

সমীর টেবিলে আলো জ্বালিয়াছে। অপুর কিছু ভালো লাগিতেছিল না—বিছানায় গিয়া শুইয়া রহিল। খানিকটা পরে সমীর পিছনে চাহিয়া তাহাকে সে অবস্থায় দেখিয়া বলিল, পড়বে না ?

অপু বলিল, একটু পরে—এই উঠচি।

—আলোটা জ্বালিয়ে রাখো, সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট এখুনি দেখতে আসবে, শুয়ে আছ দেখলে বকবে।

অপু উঠিয়া আলো জ্বালিল। বলিল, রোজ আসেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট? সেকেণ্ড মাস্টার তো—না ?

সমীরের কথা ঠিক। অপু আলো জ্বালিবার একটু পরেই বিধুবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম লাগলো আজ ক্লাসে? পড়াশুনো সব দেখে নিয়েচ তো? সমীর, ওকে একটু দেখিয়ে দিস তো কোথায় কিসের পড়া। ক্লাসের রুটিনটা ওকে লিখে দে বরং—সব বই কেনা হয়েচে তো তোমার?···জিওমেট্রি নেই? আচ্ছা, আমার কাছে পাওয়া যাবে, এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, কাল সকালে আমার ঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসো একখানা।

বিধুবাবু চলিয়া গেলে সমীর পড়িতে বসিল; কিন্তু পিছনে চাহিয়া পুনরায় অপূর্বকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে আসিয়া বলিল, বাড়ির জন্যে মন কেমন করচে—না?

তাহার পর সে খাটের ধারে বসিয়া তাহাকে বাড়ির সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিল, তোমার মা একা থাকেন বাড়িতে? আর কেউ না? তাঁর তো থাকতে কষ্ট হয়।

অপূর্ব বলিল, ও কিসের ঘণ্টা ভাই?

—বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘণ্টা—চলো যাই।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুই-তিনজন ছেলে তাহাদের ঘরে আসিল। এই সময়টা আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভয় নাই, তিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শীতের রাত্রে আর বড় একটা বাহির হন না। ছেলেরা এই সময়ে এঘর-ওঘর বেড়াইয়া গল্পগুজবের অবকাশ পায়। সমীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, এসো নৃপেন, এই আমার খাটে বসো—শিশির যাও ওখানে—অপূর্ব জানো তাস খেলা?

নৃপেন বলিল, হেডমাস্টার আসবে না তো?

শিশির বলিল, হ্যাঁ, এত রাত্তিরে আবার হেডমাস্টার—

অপূর্বও তাস খেলিতে বসিল বটে কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, মায়ের ও দিদির সঙ্গে কত কাল আগে খেলার সে বিদ্যা লইয়া এখানে তাসখেলা খাটিবে না। তাসখেলায় ইহারা সব ঘুণ, কোন্ হাতে কি তাস আছে সব ইহাদের নখদর্পণে। তাহা ছাড়া এতগুলি অপরিচিত ছেলের সম্মুখে তাহাকে তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগে পাইয়া বসিল; অনেক লোকের সামনে সে মোটেই স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলিতে পারে না। মনে হয়, কথা বলিলেই হয়ত ইহারা হাসিয়া উঠিবে। সে সমীরকে বলিল, তোমরা খেলো, আমি দেখি। শিশির ছাড়ে না। বলিল, তিনদিনে শিখিয়ে দোব, ধরো দিকি তাস।

বাহিরে যেন কিসের শব্দ হইল। শিশির সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল এবং হাতের তাস লুকাইয়া পরের পাঁচ মিনিট এমন অবস্থায় রহিল যে সেখানে একটা কাঠের পুতুল থাকিলে সেটাও তাহার অপেক্ষা বেশী নড়িত। সকলেরই সেই অবস্থা। সমীর টেবিলের আলোটা একটু কমাইয়া দিল। আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। নৃপেন একবার দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরের বারান্দাতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিয়া নিজের তাস সমীরের তোশকের তলা হইতে বাহির করিয়া বলিল, ও কিছু না, এস এস—তোমার হাতের খেলা শিশির।

রাত এগারোটার সময় পা টিপিয়া টিপিয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের রোজ এমনি হয় নাকি? কেউ টের পায় না? আচ্ছা, চুপ ক'রে বসেছিল, ও ছেলেটা কে?

ছেলেটাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। ঘরে ঢুকিবার পর হইতে সে বেশী কথা বলে নাই, তাহার খাটের কোণটিতে নীরবে বসিয়া ছিল। বয়স তের-চৌদ্দ হইবে, বেশ চেহারা। ইহাদের দলে থাকিয়াও সে এতদিনে তাসখেলা শেখে নাই, ইহাদের কথাবার্তা হইতে অপূর্ব বুঝিয়াছিল।

পরদিন শনিবার। বোর্ডিং-এর বেশীর ভাগ ছেলেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ছুটি লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। অপূর্ব মোটে দুই দিন হইল আসিয়াছে; তাহা ছাড়া, যাতায়াতে খরচপত্রও আছে, কাজেই তাহার যাওয়ার কথাই উঠিতে পারেনা। কিন্তু তবু তাহার মনে হইল, এই শনিবারে একবার মাকে দেখিয়া আসিলে মন্দ হইত না—সারা শনিবারের বৈকালটা কেমন খালি-খালি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় সে ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিল। ঘরে সে একা, সমীর বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, এ রকম চুণকাম-করা ঘরে একা থাকিবার সৌভাগ্য কখনও তাহার হয় নাই, সে খুশী হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজের খাটে বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, এইবার সমীরের মত একটা টেবিল আমার হয়? একটা টেবিলের দাম কত, সমীরকে জিজ্ঞাসা করবো।

পরে সে আলোটা লইয়া গিয়া সমীরের টেবিলে পড়িতে বসিল। রুটিনে লেখা আছে—সোমবারে পাটীগণিতের দিন। অঙ্ককে সে বাঘ বিবেচনা করে। বইখানা খুলিয়া সভয়ে প্রশ্নাবলীর অঙ্ক কয়েকটি দেখিতেছে, এমন সময় দরজা দিয়া ঘরে কে ঢুকিল। কাল রাত্রের সেই শান্ত ছেলেটি। অপু বলিল—এসো, এসো, ব'সো। ছেলেটি বলিল, আপনি বাড়ি যান নি?

অপু বলিল, না, আমি তো মোটে পরশু এলাম, বাড়িও দূরে। গিয়ে আবার

সোমবারে আসা যাবে না।

ছেলেটি অপুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপু বলিল—বোর্ডিং-এ যে আজ একেবারেই ছেলে নেই, সব শনিবারেই কি এমনই হয়? তুমি বাড়ি যাও নি কেন? তোমার নামটা কি জানি নে ভাই।

—দেবব্রত বসু—আপনার মনে থাকে না। বাড়ি গেলাম না কি ইচ্ছে ক'রে? সেকেন্ মাস্টার ছুটি দিলে না। ছুটি চাইতে গেলাম, বললে, আর শনিবারে গেলে আবার এ শনিবারে কি? হবে না, যাও।

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। তাহার বাড়ি শহর হইতে মাইল বারো দূরে, ট্রেনে যাইতে হয়। সে শনিবারে বাড়ি না গিয়া থাকিতে পারে না, মন হাঁপাইয়া উঠে, অথচ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ছুটি দিতে চায় না। তাহার কথাবার্তার ধরণে অপু বুঝিতে পারিল যে, বাড়ি না যাইতে পারিয়া মন আজ খুবই খারাপ, অনবরত বাড়ির কথা ছাড়া অন্য কথা সে বড় একটা বলিল না।

দেবব্রত খানিকটা বসিয়া থাকিয়া অপুর বালিশটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকটা আপন মনে বলিল, সামনের শনিবারে ছুটি দিতেই হবে, সেকেন্ মাস্টার না দেয় হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে বলবো।

অপু এ ধরনের দূর প্রবাসে একা রাত্রিবাস করিতে আদৌ অভ্যস্ত নয়, চিরকাল মা-বাপের কাছে কাটাইয়াছে, আজকার রাত্রিটা তাহার সম্পূর্ণ উদাস ও নিঃসঙ্গ ঠেকিতেছিল।

দেবব্রত হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল, আপনি দেখেন নি বুঝি? জানেন না? আসুন না আপনাকে দেখাই, আসুন উঠে!

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া পিছনের দেওয়ালের বড় জানালাটার কাছে লইয়া গিয়া দেখাইল, সেটার পাশাপাশি দু'টি গরাদে তুলিয়া ফেলিয়া আবার বসানো চলে। একটা লোক অনায়াসে সেই ফাঁকটুকু দিয়া ঘরে যাতায়াত করিতে পারে। বলিল, শুধু সমীরদা আর গণেশ জানে, কাউকে যেন বলবেন না।

একটু পরে বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল।

খাওয়ার আগে অপু বলিল, আচ্ছা ভাই, এ কথাটার মানে জানো?

একখণ্ড ছাপা কাগজ সে দেবব্রতকে দেখিতে দিল। বড় বড় অক্ষরে কাগজখানাতে লেখা আছে—Literature. এত বড় কথা সে এ পর্যন্ত কমই পাইয়াছে, অর্থটা জানিবার খুব কৌতূহল। দেবব্রত জানে না, বলিল, চলুন, খাওয়ার সময় মণিদাকে জিজ্ঞেস করবো।

মণিমোহন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র, দেবব্রত কাগজখানা দেখাইলে সে বলিল, এর মানে সাহিত্য। এ ম্যাক্‌মিলন কোম্পানীর বইয়ের বিজ্ঞাপন, কোথায় পেলে?

অপু হাত তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, ওই লাইব্রেরীর কোণটায় কুড়িয়ে পেয়েছি, লাইব্রেরীর ভেতর থেকে কেমন ক'রে উড়ে এসেছে বোধ হয়। কাগজখানার আঘ্রাণ লইয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন ন্যাপ্‌থলিনের গন্ধটা!

কাগজখানা সে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল।

হেডমাস্টারকে অপু অত্যন্ত ভয় করে। প্রৌঢ় বয়স, বেশ লম্বা, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ—অনেকটা যাত্রার দলের মুনির মত। ভারী নাকি কড়া মেজাজের লোক, শিক্ষকেরা পর্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন। অপু এতদিন তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া আসিতেছিল। একদিন একটা বড় মজা হইল। সত্যেনবাবু ক্লাসে আসিয়া বাংলা হইতে ইংরেজি করিতে দিয়াছেন, এমন সময় হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেডমাস্টার বইখানা সত্যেন-বাবুর হাত হইতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—আচ্ছা, এই যে এতে ভিক্টর হিউগো কথাটা লেখা আছে, ভিক্টর হিউগো কে ছিলেন জানো?—ক্লাস নীরব। এ নাম কেহ জানে না। পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছেলে, কেহ নামও শোনে নাই।—

কে বলিতে পারো—তুমি—তুমি?

ক্লাসে সূচ পড়িলে তাহার শব্দ শোনা যায়।

অপুর অস্পষ্ট মনে হইল নামটা—যেন তাহার নিতান্ত অপরিচিত নয়, কোথাও যেন সে পাইয়াছে ইহার আগে। কিন্তু তাহার পালা আসিল ও চলিয়া গেল, তাহার মনে পড়িল না। ওদিকের বেঞ্চটা ঘুরিয়া যখন প্রশ্নটা তাহাদের সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে সেই পুরাতন 'বঙ্গবাসী'গুলার মধ্যে কোথায় সে এ-কথাটা পড়িয়াছে—বোধ হয়, সেই 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে হইবে। তাহার মনে পড়িয়াছে! পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ফরাসী দেশের লেখক, খুব বড় লেখক। প্যারিসে তাঁর পাথরের মূর্তি আছে, পথের ধারে।

হেডমাস্টার বোধ হয় এ ক্লাসের ছেলের নিকট এ ভাবের উত্তর আশা করেন নাই, তাহার দিকে চশমা-আঁটা জ্বলজ্বলে চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই অপু অভিভূত ও সঙ্কুচিত অবস্থায় চোখ নামাইয়া লইল। হেডমাস্টার বলিলেন, আচ্ছা, বেশ। পথের ধারে নয়, বাগানের মধ্যে মূর্তিটা আছে—বসো, বসো সব।

সত্যেনবাবু তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ছুটির পর তাহাকে সঙ্গে করিয়ে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। ছোটখাটো বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একাই থাকেন। স্টোভ জ্বালিয়া চা ও খাবার করিয়া তাহাকে দিলেন, নিজেও খাইলেন। বলিলেন, আর একটু ভাল ক'রে গ্রামারটা পড়বে—আমি তোমাকে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেবো!

অপুর লজ্জাটা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, সে আলমারিটার দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওতে আপনার অনেক বই আছে?

সত্যেনবাবু আলমারি খুলিয়া দেখাইলেন। বেশীর ভাগই আইনের বই, শীঘ্রই আইন পরীক্ষা দিবেন। একখানা বই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—এখানা তুমি পড়ো—বাংলা বই, ইতিহাসের গল্প।

অপুর আরও দু'-একখানা বই নামাইয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্যারিল না।

মাস দুই-তিনের মধ্যে বোর্ডিং-এর সকলের সঙ্গে তাহার খুব জানাশোনা হইয়া গেল।

হয়ত তাহা ঘটিত না, কারণ তাহার মত লাজুক ও মুখচোরার প্রকৃতির ছেলে পক্ষে সকলের সহিত মিশিয়া আলাপ করিয়া লওয়াটা একরূপ সম্ভবের বাহিরের ব্যাপার, কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার সহিত যাচিয়া আসিয়া আলাপ করিল। তাহাকে কে খুশী করিতে পারে—ইহা লইয়া দিনকতক যেন বোর্ডিং-এর ছেলেদের মধ্যে একটা পাল্লা দেওয়া চলিল। খাবার-ঘরে খাইতে বসিবার সময় সকলেরই ইচ্ছা—অপু তাহার কাছে বসে, এ তাড়াতাড়ি বড় পিঁড়িখানা পাতিয়া দিতেছে, ও ঘি খাইবার নিমন্ত্রণ করিতেছে। প্রথম প্রথম সে ইহাতে অস্বস্তিবোধ করিত, খাইতে বসিয়া তাহার ভাল করিয়া খাওয়া ঘটিত না, কোনরকমে খাওয়া সারিয়া উঠিয়া আসিত। কিন্তু যেদিন ফার্স্ট ক্লাসের রমাপতি পর্যন্ত তাহাকে নিজের পাতের লেবু তুলিয়া দিয়া গেল, সেদিন সে মনে মনে খুশী তো হইলই, একটু গর্বও অনুভব করিল। রমাপতি বয়সে তাহার অপেক্ষা চার-পাঁচ বৎসরের বড় ইংরেজি ভাল জানে বলিয়া হেডমাস্টারের প্রিয়পাত্র, মাস্টারেরা পর্যন্ত খাতির করিয়া চলেন, একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছেলেও বটে। খাওয়া শেষ করিয়া আসিতে আসিতে সে ভাবিল, আমি কি ওই শ্যামলালের মত? রমাপতিদা পর্যন্ত সেধে লেবু দিল! দেয় ওদের? কথাই বলে না।

দেবব্রত অন্ধকারের মধ্যে কাঁঠালতলাটায় তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। বলিল—আপনার ঘরে যাবো অপূর্ব্বদা, একটা টাস্ক একটু ব'লে দেবেন ?

পরে সে হাসিমুখে বলিল, আজ বুধবার, আর চারদিন পরেই বাড়ি যাবো। শনিবারটা ছেড়ে দিন, মধ্যে আর তিনটে দিন। আপনি বাড়ি যাবেন না, অপূর্ব্বদা ?

প্রথম কয়েকমাস কাটিয়া গেল। স্কুল-কম্পাউণ্ডের সেই পাতাবাহার ও চীনা-জবার ঝোপটা অপুর বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে রবিবারের শান্ত দুপুরে রৌদ্রে পিঠ দিয়া শুক্‌না পাতার রাশির মধ্যে বসিয়া বসিয়া বই পড়ে। ক্লাসের বই পড়িতে তাহার ভাল লাগে না, সে-সব বই-এর গল্পগুলি সে মাস-খানেকের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিয়াছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, স্কুল লাইব্রেরীতে ইংরেজি বই বেশী; যে বইগুলার বাঁধাই চিত্তাকর্ষক, ছবি বেশী, সেগুলা সবই ইংরেজি। ইংরেজি সে ভাল বুঝিতে পারে না, কেবল ছবির তলাকার বর্ণনাটা বোঝে মাত্র।

একদিন হেডমাস্টারের অফিসে তাহার ডাক পড়িল। হেডমাস্টার ডাকিতেছেন শুনিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে ভয়ে অফিস ঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া দেখিল, আর একজন সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। হেডমাস্টারের ইঙ্গিতে সে ঘরে ঢুকিয়া দু'জনের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি ইংরেজিতে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও সামনের একখানা পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিয়া লইয়া একখানি ইংরেজি বই তাহার হাতে দিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, এই বইখানা তুমি পড়তে নিয়েছিলে ?

অপু দেখিল, বইখানা The World of Ice, মাসখানেক আগে লাইব্রেরী হইতে পড়িবার জন্য সে লইয়াছিল। সবটা ভাল বুঝিতে পারে নাই।

সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ইয়েস—

হেডমাস্টার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, ইয়েস স্যার!

অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিতেছিল, থতমত খাইয়া বলিল, ইয়েস স্যার—

ভদ্রলোকটি পুনরায় ইংরেজিতে বলিলেন, শ্লেজ কাকে বলে ?

অপু ইহার আগে কখনও ইংরেজি বলিতে অভ্যাস করে নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া ইংরেজিতে বানাইয়া বলিল, এক ধরণের গাড়ি কুকুরে টানে। বরফের উপর দিয়া যাওয়ার কথাটা মনে আসিলেও হঠাৎ সে ইংরেজি করিতে পারিল না।

—অন্য গাড়ির সঙ্গে স্লেজের পার্থক্য কি ?

অপু প্রথমে বলিল, স্লেজ হ্যাজ—তারপরই তাহার মনে পড়িল—আর্টিকল-সংক্রান্ত কোন গোলযোগ এখানে উঠিতে পারে। 'এ' বা 'দি' কোন্‌টা বলিতে হইবে তাড়াতাড়ির মাথায় ভাবিবার সময় না পাইয়া সোজাসুজি বহুবচনে বলিল, স্লেজেস্‌ হ্যাভ নো হুইল্‌স্‌—

—অরোরা বোরিয়ালিস কাহাকে বলে ?

অপুর চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাইল। মাত্র দিন কতক আগে সত্যেনবাবুর কি একখানা ইংরেজি বইতে সে ইহার ছবি দেখিয়াছিল। সে জায়গাটা পড়িয়া মানে না বুঝিলেও এ-কথাটা খুব গাল-ভরা বলিয়া সত্যেনবাবুর নিকট উচ্চারণ জানিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বলিল, অরোরা বোরিয়ালিস ইজ এ কাইণ্ড অব এ্যাটমোসফেরিক ইলেকট্রিসিটি—

ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিল, আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, আন্‌-ইউজুয়াল ফর এ বয় অব্‌ ফোর্থ ক্লাস। কি নাম বললেন ? এ স্ট্রাইকিংলি হ্যাণ্ডসাম বয়—বেশ বেশ !

অপু পরে জানিয়াছিল তিনি স্কুল-বিভাগের বড় ইন্সপেক্টর, না বলিয়া হঠাৎ স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন।

পরে সে রমাপতির ঘরে আঁক বুঝিতে যায়। রমাপতি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, নিজের সীট বেশ সাজাইয়া রাখিয়াছে। টেবিলের উপর পাথরের দোয়াত-দানি, নতুন নিব পরানো কলমগুলি সাফ করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে, বিছানাটি ধবধবে, বালিসের ওপর তোয়ালে। অপুর সঙ্গে পড়াশুনার কথাবার্তা মিটিবার পর সে বলিল, এবার তোমায় সরস্বতী পুজোতে ছোট ছেলেদের লীডার হ'তে হবে, আর তো বেশী দেরিও নেই, এখন থেকেই চাঁদা আদায়ের কাজে বেরুনো চাই।

উঠিবার সময় ভাবিল, রমাপতিদার মত এইরকম একটা দোয়াতদানি হয় আমার ? চমৎকার ফুলকাটা ? লিখে আরাম আছে। হ্যাঁ, চাঁদা চাইতে যাবো বৈ কি ? ওসব হবে না আমায় দিয়ে।—আসল কথা সে বেজায় মুখচোরা, কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেবব্রত সমীরের টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে। অপু বলিল, কি দেবু, বাড়ি যাও নি আজ ?

দেবব্রত মাথা না তুলিয়াই বলিল, দেখুন না কাণ্ড সেকেন্‌মাস্টারের, ছুটি

দিলে না—ও শনিবারে বাড়ি যাই নি. আপনি তো জানেন অপূর্বদা! বললে, তুমি ফি শনিবারে বাড়ি যাও. তোমার ছুটি হবে না—

দেবব্রতর জন্য অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। বাড়ির জন্য তাহার মনটা সারা সপ্তাহ ধরিয়া কি রকম তৃষিত থাকে অপু সে সন্ধান রাখে। মনে ভাবিল, ওরই ওপর সুপারিণ্টেণ্ডের যত কড়াকড়ি। থাকতে পারে না. ছেলেমানুষ,—আচ্ছা লোক!

অপু বলিল, রমাপতিদাকে দিয়ে আমি একবার বিধুবাবুকে বলাবো?

দেবব্রত ম্লান হাসিয়া বলিল, কাকে বলাবেন? তিনি আছেন বুঝি? মেয়ের জন্যে নিধে বেহারাকে দিয়ে বাজার থেকে কমলালেবু আনালেন. কপি আনালেন। তিনি বাড়ি চলে গিয়েছেন কোন্ কালে. সে দুটোর ট্রেনে—আর এখন বলেই বা কি হবে. আমাদের লাইনের গাড়িও তো চলে গিয়েছে—আজ আর গাড়ি নেই!

অপু তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিল, এসো একটা খেলা করা যাক। তুমি হও চোর. একখানা বই চুরি ক'রে লুকিয়ে থাকো, আমি ডিটেক্‌টিভ হবো, তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবো—কিংবা ওইটে যেন একটা নক্সা. তুমি ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পালাবে. আমি তোমাকে খুঁজে বার করবো—পড়ো নি 'নিহিলিস্ট রহস্য'? চমৎকার বই—উঃ কি সে কাণ্ড? প্রতুলের কাছে আছে, চেয়ে দেবো।

দেবব্রতের খেলাধুলা ভাল লাগিতেছিল না, তবুও অপুর কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া মাথা তুলিয়া বসিল। বলিল. আমি লাইব্রেরীর ওই কোণটায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবো?

—লুকিয়ে থাকতে হবে না. এই কাগজখানা একটা দরকারী নক্সা, তুমি পকেটের মধ্যে নিয়ে যেন রেলগাড়িতে যাচ্চো. আমি বার ক'রে দেখে নেবো, তুমি পিস্তল বার ক'রে গুলি করতে আসবে—

দেবব্রতকে লইয়া খেলা জমিল না. একে সে 'নিহিলিস্ট রহস্য' পড়ে নাই, তাহার উপর তাহার মন খারাপ। নূতন ধরণের যুদ্ধ-জাহাজের নক্সাখানা সে বিনা বাধায় ও এত সহজে বিপক্ষের গুপ্তচরকে চুরি করিতে দিল যে. তাহাকে এসব কার্যে নিযুক্ত করিলে রুশীয় সম্রাটকে পতনের অপেক্ষায় ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিদ্রোহের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। বোর্ডিং-এর পিছনে দেওয়ানী আদালতের

কম্পাউণ্ডে অর্থী-প্রত্যর্থীর ভিড় কমিয়া গিয়াছে। দেবব্রত জানালার দিকে চাহিয়া বলিল, ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে ক'টা বেজেচে দেখুন না একবার? কাউকে বলবেন না অপূর্বদা. আমি এখুনি বাড়ি যাবো।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল. এখন যাবে কিসে? এই যে বললে ট্রেন নেই?

দেবব্রত সুর নিচু করিয়া বলিল—এগারো মাইল তো রাস্তা মোটে.হেঁটে যাবো, একটু রাত যদি হ'য়ে পড়ে জ্যোৎস্না আছে. বেশ যাওয়া যাবে।

—এগারো মাইল রাস্তা এখন এই পড়ন্ত বেলায় হেঁটে যেতে যেতে কত রাত হবে জানো? রাস্তা কখনো হেঁটেচো তুমি? তা ছাড়া না ব'লে যাওয়া—যদি কেউ টের পায়?

কিন্তু দেবব্রতকে নিবৃত্ত করা গেল না। সে কখনও রাস্তা হাঁটে নাই তাহা ঠিক.রাত্রি হইবে তাহা ঠিক.বিধুবাবুর কানে কথাটা উঠিলে বিপদ আছে,সবই ঠিক, কিন্তু বাড়ি সে যাইবেই— সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না—যাহা ঘটে ঘটিবে। অবশেষে অপু বলিল. তা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

দেবব্রত বলিল. তা হ'লে সবাই টের পেয়ে যাবে. আপনি তিন-চার মাস বোর্ডিং ছেড়ে কোথাও যান নি. খাবার-ঘরে না দেখতে পেলে সবাই জানতে পারবে।

দেবব্রত চলিয়া গেলে অপু কাহারও নিকট সে কথা বলিল না বটে. কিন্তু পরদিন সকালে খাওয়ার-ঘরে দেখা গেল দেবব্রতের অনুপস্থিতি অনেকে লক্ষ্য করিয়াছে। রবিবার বৈকালে সমীর আসিলে তাহাকে সে কথাটা বলিল। পরদিন সোমবার দেবব্রত সকলের সম্মুখে কি করিয়া বোর্ডিং-এর কম্পাউণ্ডে ঢুকিবে বা ধরা পড়িলে কৃতকার্যের কি কৈফিয়ৎ দিবে এই লইয়াই দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া দেবব্রতকে সমীরের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে দেখিয়া সে দস্তুরমত অবাক হইয়া গেল। সমীর বাইরে মুখ ধুইতে গিয়াছিল. আসিলে জানা গেল যে. কাল অনেক রাত্রে দেবব্রত আসিয়া জানালায় শব্দ করিতে থাকে। পাছে কেউ টের পায় এজন্য পিছনের জানালার খোলা-গরাদেটা তুলিয়া সমীর তাহাকে ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে।

অপু আগ্রহের সঙ্গে গল্প শুনিতে বসিল। কখন সে বাড়ি পৌঁছিল? রাত কত হইয়াছিল, তাহার মা তখন কি করিতেছিলেন?—ইত্যাদি।

রাত অনেক হইয়াছিল। বাড়িতে রাতের খাওয়া প্রায় শেষ হয় হয়। তাহার

মা ছোট ভাইকে প্রদীপ ধরিয়া রান্নাঘর হইতে বড়ঘরের রোয়াকে পৌঁছাইয়া দিতেছেন এমন সময়—

অপু কত দিন নিজে বাড়ি যায় নাই। মাকে কত দিন সে দেখে নাই। ইহার মত হাঁটিয়া যাতায়াতের পথ হইলে এতদিনে কতবার যাইত। রেলগাড়ি, গহনার নৌকা, আবার খানিকটা হাঁটা-পথও। যাতায়াতে দেড় টাকা খরচ, তাহার এক মাসের জলখাবার। কোথায় পাইবে দেড় টাকা যে, প্রতি শনিবার তো দূরের কথা, মাসে অন্তত একবারও বাড়ি যাইবে? জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া আনা আষ্টেক পয়সা হইয়াছে, আর এক টাকা হইলেই—বাড়ি। হয়ত এক টাকা জমিতে জমিতে গরমের ছুটিই বা আসিয়া যাইবে, কে জানে?

পরদিন স্কুলে হৈ হৈ ব্যাপার। দেবব্রত যে লুকাইয়া কাহাকেও না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল এবং রবিবার রাত্রে লুকাইয়া বোর্ডিং-এ ঢুকিয়াছে, সে কথা কি করিয়া প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। বিধুবাবু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—সে কথা হেডমাস্টারের কানে তুলিয়াছেন। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া সমীরের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গেল, সে-ই যে জানালার ভাঙা গরাদে খুলিয়া দেবব্রতকে তাহাদের ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে, সে কথা হেডমাস্টার জানিতে পারিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? সমীর রমাপতির ঘরে গিয়া অবস্থাটা বুঝিয়া আসিল। দেবব্রত নিজেই সব স্বীকার করিয়াছে, সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু সমীরের জানালা খুলিয়া দেওয়ার কথা কিছুই বলে নাই। বলিয়াছে, সে সোমবার খুব ভোরে চুপি চুপি লুকাইয়া বোর্ডিং-এ ঢুকিয়াছে, কেহ টের পায় নাই। স্কুল বসিলে ক্লাসে ক্লাসে হেডমাস্টারের সার্কুলার গেল যে, টিফিনের সময় স্কুলের হলে দেবব্রতকে বেত মারা হইবে, সকল ছাত্র ও টিচারদের সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকা চাই।

সমীর গিয়া রমাপতিকে বলিল, আপনি একবার বলুন না রমাপতিদা হেডমাস্টারকে, ও ছেলেমানুষ, থাকতে পারে না বাড়ি না গিয়ে, আপনি তো জানেন ও কি রকম home-sick? মিথ্যে মিথ্যে ওকে তিন শনিবার ছুটি দিলে না সেকেন্ মাস্টার, ওর কি দোষ?

উপর-ক্লাসের ছাত্রদের ডেপুটেশনকে হেডমাস্টার হাঁকাইয়া দিলেন। টিফিনের সময় সকলে হলে একত্র হইলে দেবব্রতকে আনা হইল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। হেডমাস্টার বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন যে, এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তিনি শুধু বেত মারিয়াই ছাড়িয়া দিতেছেন নতুবা স্কুল

হইতে তাড়াইয়া দিতেন।—রীতিমত বেত চলিল। কয়েক ঘা বেত খাইবার পরই দেবব্রত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, চুপ! bend this way, bend! মার দেখিয়া বিশেষ করিয়া দেবব্রতের কান্নায় অপুর চোখে জল আসিয়া গেল। মনে পড়িল, লীলাদের বাড়ি এই রকম মার একদিন সেও খাইয়াছিল বড়বাবুর কাছে, সেও বিনা দোষে।

অপু উঠিয়া বারান্দায় গেল। ফিরিয়া আসিতে সমীর ধমক দিয়া চুপি চুপি বলিল, তুই ও-রকম কাঁদছিস্ কেন অপূর্ব? থাম্ না—হেডমাস্টার বকবে—

সরস্বতী পূজার সময় তাহার আট আনা চাঁদা ধরাতে অপু বড় বিপদে পড়িল। মাসের শেষ, হাতেও পয়সা তেমন নাই, অথচ সে মুখে কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না, সরস্বতী পূজার চাঁদা দিয়া হাত একেবারে খালি হইয়া গেল। বৈকালে সমীর জিজ্ঞাসা করিল, খাবার খেতে গেলি নে অপূর্ব?

সে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সমীর তাহার সব খাবার রাখে, বলিল, আমি বরাবর দেখে আসচি অপূর্ব, হাতের পয়সা ভারী বে-আন্দাজি খরচ করিস্ তুই—বুঝেসুজে চললে এরকম হয় না—আট আনা চাঁদা কে দিতে বলেছে?

অপু হাসিমুখে বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, যা তোকে আর শেখাতে হবে না—ভারী আমার গুরুঠাকুর—

সমীর বলিল, না হাসি নয়, সত্যি কথা বলছি। আর এই ননী, ভুলো, রাসবেহারী—ওদের ও-রকম বাজারে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াস্ কেন?

অপু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিল, যাঃ বকিস্ নে—ওরা ধরে খাওয়াবার জন্যে, তা করবো কি?

সমীর রাগ করিয়া বলিল, খাওয়াতে বললেই অমনি খাওয়াতে হবে? ওরাও দুষ্টুর ধাড়ি, তোকে পেয়েছে ওই রকম তাই। অন্য কারুর কাছে তো কই ঘেঁষে না। আড়ালে তোকে বোকা বলে তা জানিস্?

—হ্যাঁ বলে বৈকি!

—আমার মিথ্যে কথা বলে লাভ? সেদিন মণিদার ঘরে তোর কথা হচ্ছিল; ওই বদমায়েস রাসবেহারীটা বলছিল—ফাঁকি দিয়ে খেয়ে নেয়,—আর ও-সব কলার লজেঞ্জুস কিনে এনে বিলিয়ে বাহাদুরি করতে কে বলেছে তোকে।

সমীর নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। জীবনে এই প্রথম নিজের খরচপত্র অপুকে

নিজে বুঝিয়া করিতে হইতেছে, ইহার পূর্বে কখনও পয়সাকড়ি নিজের হাতের মধ্যে পাইয়া নাড়াচাড়া করে নাই—কাজেই সে টাকা-পয়সার ওজন বুঝিতে পারে না, স্কলারশিপের টাকা হইতে বোর্ডিং-এর খরচ মিটাইয়া টাকা-দুই হাতখরচের জন্য বাঁচে—এই দেড় টাকা দু'টাকাকে সে টাকার হিসাবে না দেখিয়া পয়সার হিসাবে দেখিয়া থাকে। ইতিপূর্বে কখনও আটটা পয়সা একত্র হাতের মধ্যে পায় নাই—একশো কুড়িটা পয়সা তাহার কাছে কুবেরের ধনভাণ্ডারের সমান অসীম মনে হয়! মাসের প্রথমে ঠিক রাখিতে না পারিয়া সে দরাজ হাতে খরচ করে—বাঁধানো খাতা কেনে, কালি কেনে, খাবার খায়। প্রায়ই দু'চারজন ছেলে আসিয়া ধরে তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে। তাহার খুব প্রশংসা করে, পড়াশুনার তারিফ করে! অপু মনে মনে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করে, ভাবে—সোজা ভাল ছেলে আমি! সবাই কি খাতির করে! তবুও তো মোটে পাঁচ মাস এসিচি!

মহা খুশীর সহিত তাহাদিগকে বাজারে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়ায়। ইহার উপর আবার কেহ কেহ ধার করিতে আসে, অপু কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না।

এরূপ করিলে কুবেরের ভাণ্ডার আর কিছু বেশী দিন টিকিতে পারে বটে, কিন্তু একশত কুড়িটা পয়সা দশদিনের মধ্যেই নিঃশেষে উড়িয়া যায়, মাসের বাকি দিনগুলিতে কষ্ট ও টানাটানির সীমা থাকে না। দু'দশটা পয়সা সে যাহা ধার লয়, মুখচোরা অপু কাহারও কাছে তাগাদা করিতে পারে না,—প্রায়ই তাহা আর আদায় হয় না।

সমীর ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট হাতে বাহির হইয়া গেল। অপু ভাবিল—বলুক বোকা, আমি তো আর বোকা নই? পয়সা ধার নিয়েচে কেন দেবে না—সবাই দেবে।

পরে সে একখানা বই হাতে লইয়া তাহার প্রিয় গাছপালা-ঘেরা সেই কোণটিতে বসিতে যায়। মনে পড়ে এতক্ষণ সেখানে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে, চীনে-জবা গাছে কচি কচি পাতা ধরিয়াছে। যাইবার সময় ভাবে, দেখি আর ক'টা লজেঞ্জুস্ আছে?—পরে বোতল হইতে গোটাকতক বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া দেয়।—ভাবে, আসছে মাসের টাকা পেলে ঐ যে আনারসের একরকম আছে, তাই কিনে আনবো এক শিশি—কি চমৎকার এগুলো খেতে! এ ধরণের ফলের আস্বাদযুক্ত লজেঞ্জুস্ সে আর কখনও খায় নাই!

কম্প।উণ্ডে নামিয়া লাইব্রেরীর কোণটা দিয়া যাইতে যাইতে সে হঠাৎ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। একজন বেঁটে-মত লোক ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া স্কুলের

কেরানী ও বোর্ডিং-এর বাজার-সরকার গোপীনাথ দত্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছে।

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল···সে কিসের টানে যেন লোকটার দিকে পায়ে পায়ে আগাইয়া গেল···লোকটা এবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে—হাতটা কেমন বাঁকাইয়া আছে, তখনি কথা শেষ করিয়া সে ইঁদারার পাড়ের গায়ে ঠেস্-দেওয়ানো ছাতাটা হাতে লইয়া কম্পাউণ্ডের ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। লোকটাকে দেখিতে অবিকল তাহার বাবার মত।

কতদিন সে বাবার মুখ দেখে নাই। আজ চার বৎসর!

উদ্গত চোখের জল চাপিয়া জবাতলায় গিয়া সে গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিল।

অন্যমনস্কভাবে বইখানা সে উল্টাইয়া যায়। তাহার প্রিয় সেই তিন-রঙা ছবিটা বাহির করিল, পাশের পৃষ্ঠার সেই পদ্যটা।

স্বদেশ হইতে বহুদূরে, আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে, আলজিরিয়ার কর্কশ, বন্ধুর, জলহীন মরুপ্রান্তে একজন মুমূর্ষু তরুণ সৈনিক বালুশয্যায় শায়িত। দেখিবার কেহ নাই। কেবল জনৈক সৈনিকবন্ধু পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুখে চামড়ার বোতল হইতে একটু একটু জল দিতেছে। পৃথিবীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার সময় সম্মুখের এই অপরিচিত, ধূসর উঁচুনিচু বালিয়াড়ি, পিছনের আকাশে সান্ধ্যসূর্যরক্তচ্ছটা, দূরে খর্জুরকুঞ্জ ও উর্ধ্বমুখ উষ্ট্রশ্রেণীর দিকে চোখ রাখিয়া মুমূর্ষু সৈনিকটির কেবলই মনে পড়িতেছে বহুদূরে রাইন নদীতীরবর্তী তাহার জন্মপল্লীর কথা···তাহার মা আছেন সেখানে। বন্ধু, তুমি আমার মায়ের কাছে খবরটা পৌঁছাইয়া দিও, ভুলিও না।···

For my home is in distant Bingen, Fair Bingen on the Rhine!

মাকে অপু দেখে নাই আজ পাঁচ মাস!—সে আর থাকিতে পারে না···বোর্ডিং তাহার ভাল লাগে না, স্কুল আর ভাল লাগে না, মাকে না দেখিয়া আর থাকা যায় না।

এই সব সময়ে এই নির্জন অপরাহ্নগুলিতে নিশ্চিন্দিপুরের কথা কেমন করিয়া তাহার মনে পড়িয়া যায়। সেই একদিনের কথা মনে পড়ে।···

বাড়িতে পাশের পোড়ো ভিটার বনে অনেকগুলো ছাতারে পাখি কিচমিচ

করিতেছিল, কি ভাবিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেই দলের মধ্যে ছোট একটা পাখি ঘাড় মোচড়াইয়া টুপ করিয়া ঝোপের নিচে পড়িয়া গেল, বাকীগুলা উড়িয়া পলাইল। তাহার ঢিলে পাখি সত্য সত্য মরিবে ইহা সে ভাবে নাই, দৌড়িয়া গিয়া মহা আগ্রহে দিদিকে ডাকিল, ওরে দিদি, শীগ্‌গির আয় রে, দেখবি একটা জিনিস, ছুটে আয়—

দুর্গা আসিয়া দেখিয়া বলিল, দেখি, দে-দিকি আমার হাতে! পরে সে নিজের হাতে পাখিটিকে লইয়া কৌতূহলের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, দুর্গার আঙুলে রক্ত লাগিয়া গেল। দুর্গা তিরস্কারের সুরে বলিল, আহা কেন মারতে গেলি তুই?

অপুর বিজয়গর্বে উৎফুল্ল মন একটু দমিয়া গেল।

দুর্গা বলিল, আজ কি বার রে? সোমবার না? তুই তো বামুনের ছেলে—চল, তুই আর আমি একে নিয়ে গিয়ে গাঙের ধারে পুড়িয়ে আসি, এর গতি হয়ে যাবে।

তারপর দুর্গা কোথা হইতে একটা দেশলাই সংগ্রহ করিয়া আনিল, তেঁতুলতলার ঘাটের এক ঝোপের ধারে শুকনো পাতার আগুনে পাখিটাকে খানিক পুড়াইল, পরে আধ-ঝল্‌সানো পাখিটা নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া সে ভক্তিভাবে বলিল—হরিবোল হরি, হরি ঠাকুর ওর গতি করবেন, দেখিস্! আহা, কি ক'রেই ঘাড়টা থেঁতলে দিয়েছিলি? কখ্‌খনো ওরকম করিস নে আর। বনে জঙ্গলে উড়ে বেড়ায়, কারুর কিছু করে না, মারতে আছে, ছিঃ!—

নদী হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া দুর্গা চিতার জায়গাটা ধুইয়া দিল।

সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরিবার সময় কে জানে তাহারা কোন্ মুক্ত বিহঙ্গ আত্মার আশীর্বাদ লইয়া ফিরিয়াছিল!···

দেবব্রত আসিয়া ডাক দিতে অপুর নিশ্চিন্দিপুরের স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

দেবব্রত বলিল, অপূর্বদা এখানে ব'সে আছেন? আমি ঠিক ভেবেচি আপনি এখানেই আছেন—কি কথা ভাবচেন—মুখ ভার ভার—

অপু হাসিয়া বলিল—ও কিছু না, এস ব'সো। কি? চলো দেখি রাসবেহারী কি করছে।

দেবব্রত বলিল, না, যাবেন না অপূর্বদা, কেন ওদের সঙ্গে মেশেন? আপনার নামে লাগিয়েচে, ধোপার পয়সা দেয় না, পয়সা বাকী রাখে এই সব! যাবেন না ওদের ওখানে—

—কে বলেচে এসব কথা ?

—ওই ওরাই বলে। বিনোদ ধোপাকে শিখিয়ে দিচ্ছিল আপনার কাছে পয়সা বাকি না রাখতে। বলছিল, ও আর দেবে না—তিনবারের পয়সা নাকি বাকি আছে ?

অপু বলিল, বা রে, বেশ লোক তো সব! হাতে পয়সা ছিল না তাই দিই নি—এই সামনের মাসে প্রথমেই দিয়ে দেবো—তা আবার ধোপাকে শিখিয়ে দেওয়া—আচ্ছা তো সব।

দেবব্রত বলিল—আবার আপনি ওদের যান খাওয়াতে! আপনার সেই খাতাখানা নিয়ে ওই বদমাইস্ হিমাংশুটা আজ কত ঠাট্টা তামাসা করছিল—ওদের দেখান কেন ওসব ?

অপূর্ব বলিল, এসব কথা আমি জানি নে, আমি লিখছিলাম ননীমাধব এসে বলে—ওটা কি ? তাই একটুখানি পড়ে শোনালাম। কি কি—কি বলছিল ?

—আপনাকে পাগল বলে—যত রাজ্যির গাছপালার কথা নাকি শুধু শুধু খাতায় লেখা! আবোল-তাবোল শুধু তাতেই ভর্তি ? ওরা তাই নিয়ে হাসে। আপনি চুপ ক'রে এইখানে মাঝে মাঝে এসে বসেন বলে কত কথা তুলেছে—

অপুর রাগ হইল, একটু লজ্জাও হইল। ভাবিল, খাতাখানা না দেখালেই হ'ত সেদিন! দেখতে চাইলে তাই তো দেখালাম, নইলে আমি সেধে তো আর—

মাঝে মাঝে তাহার মনে কেমন একটা অস্থিরতা আসে, এসব দিনে বোর্ডিং-এর ঘরে আবদ্ধ থাকিতে মন চাহে না। কোথায় কোন্ মাঠ বৈকালের রোদে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ছায়াভরা নদীজলে কোথায় নববধূর নাকছাবির মত পানকলস শেওলার কুচা কুচা শাদা ফুল ফুটিয়া নদীজল আলো করিয়া রাখিয়াছে, মাঠের মাঝে উঁচু ডাঙায় কোথায় ঘেঁটুফুলের বন···এই সবের স্বপ্নে সে বিভোর থাকে, মুক্ত আকাশ, মুক্ত মাঠ, গাছপালার জন্য মন কেমন করে। গাছপালা না দেখিয়া বেশীদিন থাকা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব! মনে বেশী কষ্ট হইলে একখানা খাতায় সে বসিয়া বসিয়া যত রাজ্যের গাছের ও লতাপাতার নাম লেখে এবং যে ধরণের ভূমিশ্রীর জন্য মনটা তৃষিত থাকে, তাহারই একটা কল্পিত বর্ণনায় খাতা ভরাইয়া তোলে। সেখানে নদীর পাশেই থাকে মাঠ, বাবলা বন, নানা বনজ গাছ, পাখিডাকা সকাল-বিকালের রোদ···ফুল। ফুলের সংখ্যা থাকে না। বোর্ডিং-এর ঘরটায় আবদ্ধ থাকিয়াও মনে মনে সে নানা অজানা মাঠে বনে নদীতীরে বেড়াইতে আসে। একখানা বাঁধা খাতাই সে এভাবে লিখিয়া পুরাইয়া ফেলিয়াছে!

অপু ভাবিল, বলুক গে, আর কখ্‌খনো কিছু দেখাচ্ছি নে। ওদের সঙ্গে এই আমার হয়ে গেল। দেবো আবার কখনো ক্লাসের ট্রানশ্লেসন বলে।

অপরাজিত তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতেই স্কুল-কম্পাউণ্ডের চারিপাশে গাছপালার নতুন পাতা গজাইল। ক্রিকেট খেলার মাঠে বড় বাদাম গাছটার রক্তাভ কচি সবুজ পাতা সকালের রৌদ্রে দেখিতে হইল চমৎকার, শীত একেবারে নাই বলিলেই হয়।

বোর্ডিং-এর রাসবিহারীর দল পরামর্শ করিল মামজোয়ানে দোলের মেলা দেখিতে যাইতে হইবে। মামজোয়ানের মেলা এ অঞ্চলের বিখ্যাত মেলা।

অপু খুশীর সহিত রাসবিহারীদের দলে ভিড়িল। মামজোয়ানের মেলার কথা অনেক দিন হইতে সে শুনিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া পর্যন্ত কোথাও মেলা বা বারোয়ারি আর কখনও দেখা ঘটে নাই।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিধুবাবু দু'দিনের ছুটি দিলেন। অপু অনেকদিন পরে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ক্রোশ তিনেক পথ—মাঠ ও কাঁচা মাটির রাস্তা। ছোট ছোট গ্রাম, কুমারেরা চাক ঘুরাইয়া কলসী গড়িতেছে। পথের ধারের ছোট দোকানে দোকানদার রেড়ির ফলের বীজ ওজন করিয়া লইতেছে—সজিনা গাছ সব ফুলে ভর্তি—এমন চমৎকার লাগে।...ছুটি-ছাটা ও শনি-রবিবারে সীমাবদ্ধ না হইয়া এই যে জীবনধারা পথের দুইপাশে, দিনে রাত্রে, শত দুঃখে সুখে আকাশ বাতাসের তলে, নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া চঞ্চল আনন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে,—এই জীবনধারার সহিত সে নিজেকে পরিচিত করিতে চায়।

মাঠে কাহারা শুকনো খেজুর ডালের আগুনে রস জ্বাল দিতেছে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল—সে তাহাদের কাছে গিয়া খানিকক্ষণ রস জ্বাল দেওয়া দেখিবে, বসিয়া বসিয়া শুনিবে উহারা কি কথাবার্তা বলিতেছে।

ননী বলিল, তোকে পাগল বলি কি আর সাধে? দূর, দূর,—আর কি দেখবি ওখানে? অপু অপ্রতিভ মুখে বলিল, আয় না ওরা কি বলছে শুনি? ওরা কত গল্প জানে, জানিস? আয় না—

রাজ্যু রায়ের পাঠশালার সেই দিনগুলি হইতে বয়স্ক লোকের গল্পের ও কথা-বার্তার প্রতি তাহার প্রবল মোহ আছে—একটা বিস্তৃততর, অপরিচিত জীবনের কথা ইহাদের মুখে শোনা যায়। অপু ছাড়িয়া যাইতে রাজী নয়—রাসবিহারীর দল অগত্যা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোকের ছেলে দেখিয়া মুচিরা খুব খাতির করিল। খেজুর রস খাইতে আসিয়াছে ভাবিয়া মাটির নতুন ভাঁড় ধুইয়া জিরান কাটের টাটকা রস লইয়া আসিল। ইহাদের কাছে অপু আদৌ মুখচোরা নয়। ঘণ্টাখানেকের উপর সে তাহাদের সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গুড় জ্বাল দেওয়া দেখিল।

মানজোয়ানের মেলায় পেঁাছিতে তাহার হইয়া গেল বেলা বারোটা। প্রকাণ্ড মেলা, ভয়ানক ভিড়; রৌদ্রে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মুখ রাঙা হইয়া গিয়াছে, সঙ্গীদের মধ্যে কাহাকেও সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই-ই পাইয়াছে, ভাল খাবার খাইবার পয়সা নাই, একটা দোকান হইতে সামান্য কিছু খাইয়া এক ঘটি জল খাইল। তাহার পর একটা পানীর খেলার তাঁবুর ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—ভিতরে কি খেলা হইতেছে। একজন পশ্চিমা লোক হটাইয়া দিতে আসিল।

অপু বলিল, কত ক'রে নেবে খেলা দেখতে?…দু'পয়সা দেব—দেখাবে?

লোকটি বলিল, এখন খেলা শুরু হইয়া গিয়াছে, আধঘণ্টা পরে আসিতে।

একটা পানের দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাত্রা কবে বসবে জানো?

বৈকালে লোকের ভিড় খুব বাড়িল। দোকানে দোকানে, বিশেষ করিয়া পানের দোকানগুলিতে খুব ভিড়। খেলা ও ম্যাজিকের তাঁবুগুলির সামনে খুব ঢোল ও জয়ঢাক বাজিতেছে। অপু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—একটা বড় তাঁবুর বাহিরে আলকাতরা-মাখা জন দুই লোক বাঁশের মাচার উপর দাঁড়াইয়া কৌতূহলী জনতার সম্মুখে খেলার অত্যাশ্চর্যতা ও অভিনবত্বের নমুনা স্বরূপ একটা লম্বা লাল-নীল কাগজের মালা নানা অঙ্গভঙ্গিসহকারে মুখ হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে।

সে পাশের একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিল, এ খেলা ক'পয়সা জানো?

নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে বাবার বইয়ের দপ্তরে একখানা পুরাতন বই ছিল, তাহার মনে আছে, বইখানার নাম 'রহস্য লহরী'। রুমাল উড়াইয়া দেওয়া, কাটামুণ্ডকে কথা-বলানো, এক ঘণ্টার মধ্যে আম-চারায় ফল-ধরানো প্রভৃতি নানা ম্যাজিকের প্রক্রিয়া বইখানাতে ছিল। অপু বই দেখিয়া দু-একবার চেষ্টা করিতে

গিয়াছিল, কিন্তু নানা বিলাতী ঔষধের ফর্দ ও উপকরণের তালিকা দেখিয়া, বিশেষ করিয়া "নিশাদল" দ্রব্যটি কি বা তাহা কোথায় পাওয়া যায় ঠিক করিতে না পারিয়া, অবশেষে ছাড়িয়া দেয়।

সে মনে মনে ভাবিল—ওই সব দেখেই তো ওরা শেখে! বাবার সেই বইখানাতে কত ম্যাজিকের কথা লেখা ছিল!—নিশ্চিন্দিপুর থেকে আসবার সময় কোথায় যে গেল বইখানা!

চারিধারে বাজনার শব্দ, লোকজনের হাসি-খুশি, খেলো সিগারেটের ধোঁয়া, ভিড়, আলো, সাজানো দোকানের সারি, তাহার মন উৎসবের নেশায় মাতিয়া উঠিল।

একদল ছেলেমেয়ে একখানা গোরুর গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে কৌতূহল ও আগ্রহে মুখ বাড়াইয়া ম্যাজিকের তাঁবুর জীবন্ত বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে যাইতেছে। সকল লোককেই সিগারেট খাইতে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল সেও খায়—একটা পানের দোকানে ক্রেতার ভিড়ের পিছনে খানিকটা দাঁড়াইয়া অবশেষে একটা কাঠের বাক্সের উপর উঠিয়া একজনের কাঁধের উপর দিয়া হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এক পয়সার দাও তো? এই যে এইদিকে—এক পয়সার সিগারেট—ভাল দেখে দিও—যা ভালো।

একটা গাছের তলায় বইয়ের দোকান দেখিয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। চটের থলের উপর বই বিছানো, দোকানী খুব বুড়া, চোখে সুতো-বাঁধা চশমা। একখানা ছবিওয়ালা চটি আরব্য উপন্যাস অপুর পছন্দ হইল—সে পড়ে নাই—কিন্তু দোকানী দাম বলিল আট আনা! হাতে পয়সা থাকিলে সে কিনিত।

বইখানা আর একবার দেখিতে গিয়া হঠাৎ সম্মুখের দিকে চোখ পড়াতে সে অবাক হইয়া গেল। সম্মুখের একটা দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া আছে—পটু! তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যসঙ্গী পটু!

অপু তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া গায়ে হাত দিতেই পটু মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল—প্রথমটা যেন চিনিতে পারিল না—পরে প্রায় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, অপুদা?···এখানে কি ক'রে, কোথা থেকে অপুদা?···

অপু বলিল, তুই কোথা থেকে?

—আমার তো দিদির বিয়ে হয়েচে এই লাউখালি। এইখেন থেকে দু-কোশ। তাই মেলা দেখতে এলাম—তুই কি ক'রে এলি কাশী থেকে?—

অপু সব বলিল। বমুবোরত্যু, বড়লোকর বাড়ি, মনসাপোতা স্কুল।

জিজ্ঞাসা করিল, বিনিদির বিয়ে হয়েছে মামুজোয়ানের কাছে? বেশ তো—

অপুর মনে পড়িল, অনেকদিন আগে দিদির চড়ুইভাতিতে বিনিদির ভয়ে ভয়ে আসিয়া যোগ দেওয়া। গরীব অগ্রদানী বামুনের মেয়ে, সমাজে নিচু স্থান, নম্র ও ভীরু চোখ দু'টি সর্বদাই নামানো, অল্পেই সন্তুষ্ট।

দু'জনেই খুব খুশী হইয়াছিল। অপু বলিল—মেলার মধ্যে বড্ড ভিড় ভাই, চল্ কোথাও একটু ফাঁকা জায়গাতে গিয়ে বসি—অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

বাহিরের একটা গাছতলায় দু'জনে গিয়া বসিল—তাহাদের বাড়িটা কিভাবে আছে?···রাণুদি কেমন?···নেড়া, পটল, নীলু, সতুদা ইহারা?···ইছামতী নদীটা? পটু সব কথায় উত্তর দিতে পারিল না, পটুও আজ অনেকদিন গ্রাম-ছাড়া। পটুর আপন মা নাই, সৎমা। অপুরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর হইতে সে সঙ্গীহীন হইয়া পড়িয়াছিল, দিদির বিবাহের পরে বাড়িতে একেবারেই মন টিকিল না। কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল পড়াশুনার চেষ্টায়। কোথাও সুবিধা হয় নাই। দিদির বাড়ি মাঝে মাঝে আসে, এখানে থাকিয়া যদি পড়াশুনার সুযোগ হয়, সেই চেষ্টায় আছে। অনেকদিন গ্রাম-ছাড়া, সেখানকার বিশেষ কিছু খবর জানে না। তবে শুনিয়া আসিয়াছিল—শীঘ্রই রাণীদির বিবাহ হইবে, সে তিন বছর আগেকার কথা, এতদিন নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে।

পটু কথা বলিতে বলিতে অপুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

রূপকথার রাজপুত্রের মত চেহারা হইয়া উঠিয়াছে অপুদার।···কি সুন্দর মুখ!···অপুদার কাপড়চোপড়ের ধরণও একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

অপু তাহাকে একটা খাবারের দোকানে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়াইল, বাহিরে আসিয়া বলিল, সিগারেট খাবি? তাহাকে ম্যাজিকের তাঁবুর সামনে আসিয়া বলিল, ম্যাজিক দেখিস নি তুই? আয় তোকে দেখাই—পরে সে আট পয়সার দুইখানা টিকিট কাটিয়া উৎসুক মুখে পটুকে লইয়া ম্যাজিকের তাঁবুতে ঢুকিল।

ম্যাজিক দেখিতে দেখিতে অপু জিজ্ঞাসা করিল, হয়ে, আমরা চলে এলে রাণুদি বলতো নাকি কিছু আমাদের—আমার কথা? নাঃ—

খুব বলিত। পটুর কাছে কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে অপু তাহাকে কোনো পত্র লিখিয়াছে কি না, তাহাদের কাশীর ঠিকানা কি? পটু বলিতে পারে নাই। শেষে পটু বলিল, বুড়ো নরোত্তম বাবাজী তোর কথা ভারী বলতো!

অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার বোষ্টমদাদু এখনও বাঁচিয়া

আছে?—এখনও তাহার কথা ভুলিয়া যায় নাই? মধুর প্রভাতের পদ্মফুলের মত ছিল দিনগুলো—আকাশ ছিল নির্মল, বাতাস কি শান্ত, নবীন উৎসাহ ভরা মধুচ্ছন্দ! মধুর নিশ্চিন্দিপুর! মধুর ইছামতীর কলমর্মর!…মধুর তাহার দুঃখী দিদি দুর্গার স্নেহভরা ডাগর চোখের স্মৃতি!…কতদূর, ক—ত দূরে চলিয়া গিয়াছে সে দিনের জীবন। খেলাঘরের দোকানে নোনা-পাতার পান বিক্রী, সেই সতুদার মাকাল ফল চুরি করিয়া দৌড় দেওয়া!…

একবার একখানা বইতে সে পড়িয়াছিল দেবতার মায়ায় একটা লোক স্নানের সময় জলে ডুব দিয়া পুনরায় উঠিবার যে সামান্য ফাঁকটুকু তাহারই মধ্যে ষাট বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনের সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিল—যেন তাহার বিবাহ হইল, ছেলেমেয়ে হইল, তাহারা সব মানুষ হইল, কতক বা মরিয়া গেল, বাকীগুলির বিবাহ হইল, নিজেও সে বৃদ্ধ হইয়া গেল—হঠাৎ জল হইতে মাথা তুলিয়া দেখে—কোথাও কিছু নয়, সে যেখানে সেখানেই আছে, কোথায় বা ঘরবাড়ি, বা ছেলেমেয়ে!…

গল্পটা পড়িয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে সে ভাবে তাহারও ওরকম হয় না? এক-এক সময় তাহার মনে হয় হয়ত বা তাহার হইয়াছে। এ সব কিছু না—স্বপ্ন। বাবার মৃত্যু, এই বিদেশ, এই স্কুলে পড়া—সব স্বপ্ন। কবে একদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিবে সে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে তাহাদের সেই বনের ধারের ঘরটাতে আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—সন্ধ্যার দিকে পাখির কলরবে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভাবিতেছে, কি সব হিজিবিজি অর্থহীন স্বপ্নই না সে দেখিয়াছে ঘুমের ঘোরে!…বেশ মজা হয়, আবার তাহার দিদি ফিরিয়া আসে, তাহার বাবা, তাহাদের বাড়িটা।

একদিন ক্লাসে সত্যেনবাবু একটা ইংরেজি কবিতা পড়াইতেছিলেন, নামটা গ্রেভস্ অফ এ হাউসহোল্ড। নির্জনে বসিয়া সেটা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার চোখ দিয়া জল পড়ে। ভাইবোনেরা এক সঙ্গে মানুষ, এক মায়ের কোলেপিঠে, এক ছেঁড়া কাঁথার তলে। বড় হইয়া জীবনের ডাকে কে কোথায় গেল চলিয়া—কাহারও সমাধি সমুদ্রে, কাহারও কোন্ অজানা দেশের অপরিচিত আকাশের তলে, কাহারও বা ফুল-ফোটা কোন্ গ্রাম্য বনের ধারে।

আপনা-আপনি পথ চলিতে চলিতে এই সব স্বপ্নে সে বিভোর হইয়া যায়! কত কথা যেন মনে ওঠে! যত লোকের দুঃখের দুর্দশার কাহিনী। নিশ্চিন্দি-পুরের জানালার ধারে বসিয়া বাল্যের সে ছবি দেখা—সেই বিপিন্ন বর্ণ, নির্বাসিত

সীতা, দরিদ্র বালক অশ্বত্থামা, পরাজিত রাজা দুর্যোধন, পল্লীবালিকা জোয়ান। বুঝাইয়া বলিবার বয়স তাহার এখনও হয় নাই ; ভাবকে সে ভাষা দিতে জানে না —অল্পদিনের জীবনে অধীত সমুদয় পদ্য ও কাহিনী অবলম্বন করিয়া সে যেভাবে জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছে—অনাবিল তরুণ মনের তাহা প্রথম কাব্য—তার কাঁচা জীবনে সুখে দুঃখে. আশায় নিরাশায় গাঁথা বনফুলের হার।—প্রথম উচ্চারিত ঋক্‌মন্ত্রের কারণ ছিল যে বিস্ময় যে আনন্দ—তাহাদেরই সগোত্র, তাহাদেরই মত ঋদ্ধিশীল ও অবাচ্য সৌন্দর্যময়।

রাগরক্ত সন্ধ্যার আকাশে সত্যের প্রথম শুকতারা।

কে জানে ওর মনের সে-সব গহন গভীর গোপন রহস্য ? কে বোঝে ?

ম্যাজিকের তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দু'জনে মেলার মধ্যে ঢুকিল। বোর্ডিং-এর একটি ছেলের সঙ্গেও তাহার দেখা হইল না, কিন্তু তাহার আমোদের তৃষ্ণা এখনও মেটে নাই, এখনও ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার ইচ্ছা। বলিল—চল্‌ পটু. দেখে আসি যাত্রা বসবে কখন—যাত্রা না দেখে যাস্‌ নে যেন।

পটু বলিল. অপুদা কোন্‌ ক্লাসে পড়িস্‌ তুই ?···

অপু অন্যমনস্কভাবে বলিল. ঐ যে ম্যাজিক দেখলি, ও আমার বাবার একখানা বই ছিল. তাতে সব লেখা ছিল, কি ক'রে করা যায়—জিনিস পেলে আমিও করতে পারি—

—কোন্‌ ক্লাসে তুই—

—ফোর্থ ক্লাসে। একদিন আমাদের স্কুলে চল্‌, দেখে আসবি—দেখবি কত বড় স্কুল—রাত্রে আমার কাছে থাকবি এখন—একটু থামিয়া বলিল—সত্যি এত জায়গায় তো গেলাম. নিশ্চিন্দিপুরের মত আর কিছু লাগে না—কোথাও ভাল লাগে না—

—তোরা যাবি নে আর সেখানে ? সেখানে তোদের জন্যে সবাই দুঃখ করে, তোর কথা তো সবাই বলে—পরে সে হাসিয়া বলিল, অপুদা, তোর কাপড় পরবার ধরণ পর্যন্ত বদলে গেছে, তুই আর সেই নিশ্চিন্দিপুরের পাড়াগেঁয়ে ছেলে নেই—

অপু খুব খুশী হইল। গর্বের সহিত গায়ের শার্টটা দেখাইয়া বলিল, কেমন রংটা, না ? ফার্স্ট ক্লাসের রমাপতিদার গায়ে আছে, তাই দেখে এটা কিনেছি —দেড় টাকা দাম।

সে একথা বলিল না যে শার্টটা যে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া অপরের দেখা-দেখি দরজির দোকান হইতে ধারে কিনিয়াছে, দরজির অনবরত তাগাদা সত্ত্বেও এখনও দাম দিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বেলা বেশ পড়িয়া আসিয়াছে। আলকাৎরা-মাখা জীবন্ত বিজ্ঞাপনটি বিকট চিৎকার করিয়া লোক জড়ো করিতেছে।

পটু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দিদির বাড়ির দিকে রওনা হইল। অপুর সহিত এতকাল পরে দেখা হওয়াতে সে খুব খুশী হইয়াছে। কোথা হইতে অপুদা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! তবুও স্রোতের তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে অপুদা আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে, কিন্তু এই তিন বৎসরকাল সে-ও তো ভাসিয়াই বেড়াইতেছে এক রকম, তাহার কি কোন উপায় হইবে না?

সন্ধ্যার পর বাড়ি পেঁৗছিল। তাহার দিদি বিনির বিবাহ বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরে হয় নাই, মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, খানদুই-তিন ঘর। পশ্চিমের ভিটায় পুরানো আমলের কোঠা ভাঙিয়া পড়িয়া আছে, তাহারই একটা ঘরে বর্তমানে রান্নাঘর, ছাদ নাই, আপাততঃ খড়ের ছাউনি একখানা চাল ইটের দেওয়ালের গায়ে কাৎভাবে বসানো।

বিনি ভাইকে খাবার খাইতে দিল। বলিল—কি রকম দেখলি মেলা?···সে এখন আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, বিশেষ মোটাসোটা হয় নাই, সেই রকমই আছে। গলার স্বর শুধু বদলাইয়া গিয়েছে।

পটু হাসিমুখে বলিল, আজ কি হয়েচে জানিস দিদি, অপুর সঙ্গে দেখা হয়েচে—মেলায়।

বিনি বিস্ময়ের সুরে বলিল, অপু! সে কি ক'রে—কোথা থেকে—

পরে পটুর মুখে সব শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। বলিল—বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে—আহা সঙ্গে ক'রে আন্‌লি নে কেন?···দেখতে বড় হয়েছে?···

—সে অপুই আর নেই। দেখলে চেনা যায় না। আরও সুন্দর হয়েচে দেখতে—তবে সেই রকম পাগলা আছে এখনো—ভারী সুন্দর লাগে—এমন হয়েচে!···এতকাল পরে দেখা হয়ে আমার মেলায় যাওয়াই আজ সার্থক হয়েচে। খুড়িমা মনসাপোতা থাকে বললে।

—সে এখেন থেকে কত দূর?···

—সে অনেক, রেলে যেতে হয়। মামজোয়ান থেকে ন'দশ কোশ হবে।

বিনি বলিল, আহা একদিন নিয়ে আসিস না অপুকে, একবার দেখতে ইচ্ছে করে—

ছাদ-ভাঙা রান্না-বাড়ির রোয়াকে পটু খাইতে বসিল। বিনি বলিল, তোর চক্কত্তি মহাশয়কে একবার বলে দেখিস দিকি কাল? বলিস বছর তিনেক থাকতে দ্যাও, তার পর নিজের চেষ্টা নিজে করবো—

পটু বলিল, বছর তিনেকের মধ্যে পড়া শেষ হয়ে যাবে না—ছ'সাত বছরের কমে কি পাশ দিতে পারব?···অপূদা বাড়িতে পড়ে কত লেখাপড়া জানত—আমি তো তাও পড়ি নি, তুমি একবার চক্কতি মশায়কে বলো না দিদি?

বিনি বলিল—আমিও বলবো এখন। বড্ড ভয় করে—পাছে আবার বট্ ঠাকুরঝি হাত-পা নেড়ে ওঠে—বট্ ঠাকুরঝিকে একবার ধরতে পারিস্? —আমি কথা কইলে তো কেউ শুনবে না, ও যদি বলে তবে হয়—

পটু যে তাহা বোঝে না এমন নয়। অর্থাভাবে দিদিকে ভাল পাত্রের হাতে দিতে পারা যায় নাই, দোজবর, বয়সও বেশি। ও-পক্ষের গুটিকতক ছেলে-মেয়েও আছে, দুই বিধবা ননদ বর্তমান, ইহারা সকলেই তাহার দিদির প্রভু। ভালমানুষ বলিয়া সকলেই তাহার উপর দিয়া ষোল আনা প্রভুত্ব চালাইয়া থাকে। উদয়াস্ত খাটিতে হয়, বাড়ির প্রত্যেকেই বিবেচনা করে তাহাকে দিয়া ব্যক্তিগত ফরমাইশ খাটাইবার অধিকার উহাদের প্রত্যেকেরই আছে, কাজেই তাহাকে কেহ দয়া করে না।

অনেক রাত্রে বিনির স্বামী অর্জুন চক্রবর্তী বাড়ি ফিরিল। মামজোয়ানের বাজারে তাহার খাবারের দোকান আছে, আজকাল মেলার সময় বলিয়া রাত্রে একবার আহার করিতে আসে মাত্র। খাইয়াই আবার চলিয়া যায়, রাত্রেও কেনা-বেচা হয়। লোকটি ভারি কৃপণ; বিনি রোজই আশা করে—ছোট ভাইটা এখানে কয়দিন হইল আসিয়াছে, এ পর্যন্ত কোন দিন একটা রসগোল্লাও তাহার জন্য হাতে করিয়া বাড়ি আসে নাই, অথচ নিজেরই তো খাবারের দোকান। এ রকম লোকের কাছে ভাইয়ের সম্বন্ধে কি কথাই বা সে বলিবে!

তবুও বিনি বলিল। স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া সে সামনে বসিল, ননদেরা কেহ রান্নাঘরে নাই, এ ছাড়া আর সুযোগ ঘটিবে না। অর্জুন চক্রবর্তী বিস্ময়ের সুরে বলিল—পটল? এখানে থাকবে?···

বিনি মরীয়া হইয়া বলিল—ওই ওর সমান অপূর্ব ব'লে ছেলে—আমাদের গাঁয়ের, সেও পড়ছে। এখেনে যদি থাকে তবে এই মামজোয়ান ইস্কুলে গিয়ে পড়তে পারে—একটা হিল্লে হয়—

অর্জুন চক্রবর্তী বলিল—ওসব এখন হবে-টবে না, দোকানের অবস্থা ভাল নয়,

দোলের বাজারে খাজনা বেড়ে গিয়েছে দুনো, অথচ দোকানে আয় নেই। মামজোয়ানে খাঁটি খুলে চার আনা সের ছানা—তাই বিকুচ্ছে দশ আনায়, তা লাভ করবো, না খাজনা দেবো, না মহাজন মেটাবো ? মেলা দেখে বাড়ি চলে যাক্—ও সব ঝক্কি এখন নেওয়া বল্‌লেই নেওয়া—!

দিদি খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বোশেখ মাসের দিকে আসতে বলবো ?

অর্জুন চক্রবর্তী বলিল—বোশেখ মাসের বাকীটা আর কি—আর মাসদেড়েক বৈ তো নয় !···ওসব এখন হবে না, ওসব নিয়ে এখন দিক্ ক'রো না···ভাল লাগে না, সারাদিন খাটুনির পর—বলে নিজের জ্বালায় তাই বাঁচি নে তা আবার—হুঁ—

দিদি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। মনে খুব কষ্ট হইল—ভাইটা আশা করিয়া আসিয়াছিল—দিদির বাড়ি থাকিয়া পড়িতে পাইবে ! বলিল—আচ্ছা, অপু কেমন ক'রে পড়চে রে ?

পটু বলিল—সে যে এস্কলারশিপ পেয়েচে—তাতেই খরচ চলে যায়।

দিদি বলিল—তুই তা পাস নে ? তাহলে তোরও তো—

পটু হাসিয়া বলিল—না পড়েই এস্কলারশিপ পাবো—বা তো—পাশ দিলে তবে পাওয়া যাবে, সে সব আমার হবে না, অপুদা ভাল ছেলে—ও কি আর আমার হবে ?···

দিদি বলিল—তুই অপুকে একবার ব'লে দেখবি ? ও ঠিক একটা কিছু তোকে যোগাড় ক'রে দিতে পারে।

দুজনে পরামর্শ করিয়া তাহাই অবশেষে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল।

সর্বজয়া পিছু পিছু উঠিয়া বড়ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে আসিল, সম্মুখের উঠানে নামিয়া বলিল—মাঝে মাঝে এস বৌমা, বাড়ি আগলে পড়ে থাকতে হয়, নইলে দুপুর বেলা এক একবার ভাবি তোমাদের ওখানে একটু বেড়িয়ে আসি। সেদিন বাপু গয়লাপাড়ায় চুরি হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফেলে যেতে ভরসা পাই নে।

তেলি বাড়ির বড় বধূ বেড়াইতে আসিয়াছিল, তিন বৎসরের ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ সর্বজয়া বেশ ছিল। ইহারা সব দুপুরের পর আসিয়াছিল,

গল্পগুজবে সময়টা তবুও একরকম কাটিল। কিন্তু একা একা সে তো আর থাকিতে পারে না। শুধুই, সব সময়ই, দিন নাই রাত্রি নাই,—অপুর কথা মনে পড়ে। অপুর কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই তাহার মনে স্থান পায় না।

আজ সে গিয়াছে এই পাঁচ মাস হইল। কত শনিবার কত ছুটির দিন চলিয়া গিয়াছে এই পাঁচ মাসের মধ্যে। সর্বজয়া সকালে উঠিয়া ভাবিয়াছে—আজ দুপুরে আসিবে! দুপুর চলিয়া গেলে ভাবিয়াছে বৈকালে আসিবে। অপু আসে নাই!

অপুর কত জিনিস ঘরে পড়িয়া আছে, কত স্থান হইতে কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে—অবোধ পাগল ছেলে!···শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া সর্বজয়া হাঁপায়. অপুর মুখ মনে আনিবার চেষ্টা করে। এক একবার তাহার মনে হয় অপুর মুখ সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। যতই জোর করিয়া মনে আনিবার চেষ্টা করে ততই সে মুখ অস্পষ্ট হইয়া যায়···অপুর মুখের আদলটা মনে আনিলেও ঠোঁটের ভঙ্গিটা ঠিক মনে পড়ে না. চোখের চাহনিটা মনে পড়ে না··· সর্বজয়া একেবারে পাগলের মত হইয়া ওঠে—অপুর. তাহার অপুর মুখ সে ভুলিয়া যাইতেছে!

কেবলই অপুর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। অপু কথা বলিতে জানিত না. কোন্ কথার কি মানে হয় বুঝিত না। মনে আছে···নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে থাকিতে একবার রান্নাবাড়ির দাওয়ায় কাঁঠাল ভাঙিয়া ছেলেমেয়েকে দিতেছিল। দুর্গা বাটি পাতিয়া আগ্রহের সহিত কাঁঠাল-ভাঙা দেখিতেছে অপু দুর্গার বাটিটা দেখাইয়া হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—দিদি কাঁটালের বড় প্রভু. না মা? সর্বজয়া প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই. শেষে বুঝিয়াছিল. 'দিদি কাঁঠালের বড় ভক্ত' এ কথাটি বুঝাইতে 'ভক্ত' কথাটার স্থানে 'প্রভু' ব্যবহার করিয়াছে। তখন অপুর বয়স নয় বৎসরের কম নয় অথচ তখনও সে কাজে-কথায় নিতান্ত ছেলেমানুষ।

একবার নতুন পরণের কাপড় কোথা হইতে ছিঁড়িয়া আসিবার জন্য অপু মার খাইয়াছিল। কতদিনের কথা. তবুও ঠিক মনে আছে। হাঁড়িতে আমসত্ত্ব, কুলচুর রাখিবার জো ছিল না. অপু কোন্ ফাঁকে ঢাকনি খুলিয়া চুরি করিয়া খাইবেই। এই অবস্থায় একদিন ধরা পড়িয়া যায়, তখনকার সেই ভয়ে ছোট-হইয়া-যাওয়া রাঙা মুখখানি মনে পড়ে। বিদেশে একা কত কষ্টই হইতেছে, কে তাহাকে সেখানে বুঝিতেছে!

আর একদিনের কথা সে কখনো ভুলিবে না। অপুর বয়স যখন তিন বৎসর,

তখন সে একবার হারাইয়া যায়। খানিকটা আগে সম্মুখের উঠানের কাঁঠাল-তলায় বসিয়া খেলা করিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে, ইহারই মধ্যে কোথায় গেল! ...পাড়ায় কাহারও বাড়িতে নাই, পিছনের বাঁশবনেও নাই—চারিধারে খুঁজিয়া কোথাও অপুকে পাইল না। সর্বজয়া কাঁদিয়া আকুল হইল—কিন্তু যখন হরিহর বাড়ির পাশের বাঁশতলার ডোবাটা খুঁজিবার জন্য ও-পাড়া হইতে জেলেদের ডাকিয়া আনাইল, তখন তাহার আর কান্নাকাটি রহিল না। সে কেমন কাঠের মত হইয়া ডোবার পাড়ে দাঁড়াইয়া জেলেদের জাল-ফেলা দেখিতে লাগিল। পাড়াশুদ্ধ লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—ডোবার পাড়ে অক্রূর জেলে টানাজালের বাঁধন খুলিতেছিল, সর্বজয়া ভাবিল অক্রূর মাঝিকে চিরকাল সে নিরীহ বলিয়া জানে, ভাল মানুষের মত কতবার মাছ বেচিয়া গিয়াছে তাহাদের বাড়ি—সে সাক্ষাৎ যমের বাহন হইয়া আসিল কি করিয়া? শুধু অক্রূর মাঝি নয়, সবাই যেন যমদূত, অন্য অন্য লোকেরা, যাহারা মজা দেখিতে ছুটিয়াছে, তাহারা—এমন কি তাহার স্বামী পর্যন্ত। সে-ই তো গিয়া ইহাদের ডাকিয়া আনিয়াছে। সর্বজয়ার মনে হইতেছিল যে, ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে—কোন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র।

ঠিক সেই সময়ে দুর্গা অপুকে খুঁজিয়া আনিয়া হাজির করিল। অপু নাকি নদীর ধারের পথ দিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া একা একা সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইতেছিল, অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ফিরিতে গিয়া বোধহয় পথ চিনিতে পারে নাই। বাড়ির কাঁঠাল-তলায় বসিয়া খেলা করিতে করিতে কখন কোন্ ফাঁকে বাহির হইয়া গিয়াছে, কেহ জানে না।

যখন সকলে যে-যাহার বাড়ি চলিয়া গেল, তখন সর্বজয়া স্বামীকে বলিল—এ ছেলে কোনদিন সংসারী হবে না, দেখে নিও—

হরিহর বলিল—কেন?...তা ও-রকম হয়, ছেলেমানুষে গিয়েই থাকে—

সর্বজয়া বলিল—তুমি পাগল হয়েছ!...তিন বছর বয়সে অন্য ছেলে বাড়ির বাইরে পা দেয় না, আর ও কিনা গাঁ ছেড়ে, বাঁশবন, মাঠ ভেঙে গিয়েছে সেই সোনাডাঙার মাঠের রাস্তায়। তাও ফেরবার নাম নেই—হন্ হন্ ক'রে হেঁটেই চলেছে।—কখ্খনো সংসারে মন দেবে না, তোমাকে ব'লে দিলাম—এ আমার কপালেই লেখা আছে!

কত কথা সব মনে পড়ে—নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির কথা, দুর্গার কথা। এ জায়গা ভাল লাগে না, এখন মনে হয়, আবার যদি নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া যাওয়া

সম্ভব হইত! একদিন যে-নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া আসিতে উৎসাহের অবধি ছিল না, এখন তাহাই যেন রূপকথার রাজ্যের মত সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারকার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে প্রথম বসন্তের পুষ্পসুবাসমধুর বৈকাল বহিয়া যায়, অলস অস্ত-আকাশে কত রং ফুটিয়া আবার মিলাইয়া যায়, গাছপালায় পাখি ডাকে। এ রকম একদিন নয়, কতদিন হইয়াছে।

কোন কিছু ভালমন্দ জিনিস পাইলেই সেটুকু সর্বজয়া ছেলের জন্য তুলিয়া রাখে। কুণ্ডুদের বাড়ির বিবাহের তত্ত্বে সন্দেশ আসিলে সর্বজয়া প্রাণ ধরিয়া তাহার একটা খাইতে পারে নাই। ছেলের জন্য তুলিয়া রাখিয়া রাখিয়া অবশেষে যখন হাঁড়ির ভিতর পচিয়া উঠিল তখন ফেলিয়া দিতে হইল। পৌষপার্বণের সময় হয়ত অপু বাড়ি আসিবে, পিঠা খাইতে ভালবাসে, নিশ্চয় আসিবে। সর্বজয়া চাল কুটিয়া সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়া বসিয়া রহিল—কোথায় অপু?

এক সময় তাহার মনে হয়, অপু আর সে অপু নাই। সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে, কই অনেকদিন তো সে মাকে হুঁ-উ-উ করিয়া ভয় দেখায় নাই, অকারণে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে নাই. একোণে ওকোণে লুকাইয়া দুষ্টুমি-ভরা হাসিমুখে উঁকি মারে নাই. যাহা তাহা বলিয়া কথা ঢাকিতে যায় নাই! ভাবিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে—এসব সর্বজয়া পছন্দ করে না। অপুর ছেলেমানুষির জন্য সর্বজয়ার মন তৃষিত হইয়া থাকে, অপু না বাড়ুক, সে সব সময়ে তাহার উপরে একান্ত নির্ভরশীল ছোট্ট খোকাটি হইয়া থাকুক—সর্বজয়া যেন মনে মনে ইহাই চায়। কিন্তু তাহার অপু যে একেবারে বদলাইয়া যাইতেছে!···

অপুর উপর মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত রাগ হয়। সে কি জানে না—তাহার মা কি রকম ছটফট করিতেছে বাড়িতে! একবারটি কি এতদিনের মধ্যে আসিতে নাই? ছেলেবেলায় সন্ধ্যার পর এ-ঘর হইতে ও-ঘরে যাইতে হইলে মায়ের দরকার হইত, মা খাওয়াইয়া না দিলে খাওয়া হইত না—এই সেদিনও তো। এখন আর মাকে দরকার হয় না—না? বেশ—তাহারও ভাবিবার দায় পড়িয়া গিয়াছে, সে আর ভাবিবে না। বয়স হইয়া আসিল, এখন ইষ্টচিন্তা করিয়া কাল কাটাইবার সময়, ছেলে হইয়া স্বর্গে ধ্বজা তুলিবে কি না!

কিন্তু শীঘ্রই সর্বজয়া আবিষ্কার করিল—ছেলের কথা না ভাবিয়া সে একদণ্ড থাকিতে পারে না। এতদিন সে ছেলের কথা প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তে ভাবিয়া আসিয়াছে। অপুর সহিত অসহযোগ করিলে জীবনটাই যেন ফাঁকা, অর্থহীন,

অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়ে—তাহার জীবনে আর কিছুই নাই—এক অপু ছাড়া !...

এক একদিন নির্জন দুপুরে বেলা ঘরে বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদে।

সে দিন বৈকালে সে ঘরে বসিয়া কার্পাস তুলার বীজ ছাড়াইতেছিল, হঠাৎ সম্মুখের ছোট ঘুলঘুলি জানালার ফাঁক দিয়া বাড়ির সামনের পথের দিকে তাহার চোখ পড়িল। পথ দিয়া কে যেন যাইতেছে—মাথার চুল ঠিক যেন অপুর মত, ঘন কালো, বড় বড় ঢেউখেলানো, সর্বজয়ার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল—এ অঞ্চলের মধ্যে এ রকম চুল তো কখনও কারও দেখি নি কোনদিন—সেই শত্তুরের মত চুল অবিকল !...

তাহার মনটা কেমন উদাস অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তুলার বীজ ছাড়াইতে আর আগ্রহ থাকে না।

হঠাৎ ঘরের দরজায় কে যেন টোকা দিল। তখনি আবার মৃদু টোকা। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোর খুলিয়া ফেলে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারে না।

অপু দুষ্টুমি-ভরা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে। নিচু হইয়া প্রণাম করিবার আগেই সর্বজয়া পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে জড়াইয়া ধরিল।

অপু হাসিয়া বলিল—টের পাও নি তুমি, না মা ? আমি ভাবলাম আস্তে আস্তে উঠে দরজায় টোকা দেবো।

সে মামুজোয়ানের মেলা দেখিতে আসিয়া একবার বাড়িতে না আসিয়া থাকিতে পারে নাই। এত নিকটে আসিয়া মা'র সঙ্গে দেখা হইবে না ! পুলিনের নিকট রেলভাড়া ধার লইয়া তবে আসিয়াছে। একটা পুঁটলি খুলিয়া বলিল, তোমার জন্য ছুঁচ আর গুলিসুতো এনেচি—আর এই দ্যাখো কেমন কাঁচা পাঁপর এনেছি মুগের ডালের—সেই কাশীতে তুমি ভেজে দিতে !

অপুর চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। অন্য ধরণের জামা গায়ে—কি সুন্দর মানাইয়াছে ! সর্বজয়া বলে, বেশ জামাটা—এবার বুঝি কিনেচিস ?

মা'র দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া অপু খুব খুশী। জামাটা ভাল করিয়া দেখাইয়া বলিল—সবাই বলে জামাটার রং চমৎকার হয়েছে—চাঁপাফুলের মত হবে ধুয়ে এলে—এই তো মোটে কোরা।

বোর্ডিং-এ গিয়া অপু এই কয় মাস মাস্টার ও ছাত্রদের মধ্যে যাহাকেই মনে মনে প্রশংসা করে, কতকটা নিজের জ্ঞাতসারে কতকটা অজ্ঞাতসারে তাহারই

ভাবভাব, কথা বলিবার ভঙ্গি নকল করিয়াছে। সত্যেনবাবুর, রমাপতির, দেবব্রতের, নতুন আঁকের মাস্টারের ! সর্বজয়ার যেন অপুকে নতুন নতুন ঠেকে। পুরাতন অপু যেন আর নাই। অপু তো এ রকম মাথা পিছনের দিকে হেলাইয়া কথা বলিত না? সে তো পকেটে হাত পুরিয়া এ ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইত না?

সন্ধ্যার সময় মায়ের রাঁধিবার স্থানটিতে অপু পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গল্প করে। সর্বজয়া আজ অনেকদিন পরে রাত্রে রাঁধিতে বসিয়াছে।—সেখানে কত ছেলে একসঙ্গে থাকে? এক ঘরে ক'জন? দু'বেলাই মাছ দেয়? পেট ভরিয়া ভাত দেয় তো? কি খাবার খায় সে বৈকালে? কাপড় নিজে কাচিতে হয়? সে তাহা পারে তো!—পড়াশুনার কথা সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিতে জানে না, শুধু খাওয়ার কথাই জিজ্ঞাসা করে। অপুর হাসিতে, ঘাড় দুলুনিতে, হাত-পা নাড়াতে, ঠোঁটের নিচের ভঙ্গিতে সর্বজয়া আবার পুরানো অপু, চিরপরিচিত অপুকে ফিরিয়া পায়। বুকে চাপিতে ইচ্ছা করে। সে অপুর গল্প শোনে না, শুধু মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে।

—হাতে পায়ে বল পেলাম মা, এক এক সময় মনে হ'ত—অপু ব'লে কেউ ছিল না, ও যেন স্বপ্ন দেখিচি, আবার ভাবতাম—না, সেই চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মুখের তিল—স্বপ্ন নয়, সত্যিই তো—রাঁধতে বসেও কেবল মনে হয় মা, অপুর আসা স্বপ্ন হয় তো, সব মিথ্যে—তাই কেবল ওর মুখেই চেয়ে ঠাউরে দেখি—

অপু চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে সর্বজয়া তেলিগিন্নির কাছে গল্প করিয়াছিল।

পরদিনটাও অপু বাড়ি রহিল।

যাইবার সময় মাকে বলিল—মা, আমাকে একটা টাকা দাও না? কতকগুলো ধার আছে এ মাসে, শোধ করব, দেবে?

সর্বজয়ার কাছে টাকা ছিল না, বিশেষ কখনও থাকে না। তেলিরা ও কুণ্ডুরা জিনিসপত্রটা, কাপড়খানা, সিধাটা—এই রকমই দিয়া সাহায্য করে। নগদ টাকাকড়ি কেহ দেয় না। তবু ছেলের পাছে কষ্ট হয় এজন্য সে তেলিগিন্নির নিকট হইতে একটা টাকা ধার করিয়া আনিয়া ছেলের হাতে দিল।

সন্ধ্যার আগে অপু চলিয়া গেল, ক্রোশ দুই দূরে স্টেশন, সন্ধ্যার পরেই ট্রেন।

বৎসর দুই কোথা দিয়া কাটিয়া গেল।

অপু ক্রমেই বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে, খরচে আয়ে কিছুতেই আর কুলাইতে পারে না। নানাদিকে দেনা—কতভাবে হুঁশিয়ার হইয়াও কিছু হয় না। এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া দুই বেলা খাইল. নিজে সাবান দিয়া কাপড় কাচিল, লজেঞ্জুস্ ভুলিয়া গেল।

পরদিনই আবার বোর্ডিং-এর ছেলেদের দল চাঁদা করিয়া হালুয়া খাইবে। অপু হাসিমুখে সমীরকে বলিল—দু' আনা ধার দিবি সমীর, হালুয়া খাবো? —দু' আনা ক'রে চাঁদা—ওই ওরা ওখানে করছে—কিশমিশ দিয়ে বেশ ভাল ক'রে করচে—

সমীরের কাছে অপুর দেনা অনেক। সমীর পয়সা দিল না।

প্রতিবার বাড়ি হইতে আসিবার সময় সে মায়ের যৎসামান্য আয় হইতে টাকাটা আধুলিটা প্রায়ই চাহিয়া আনে—মা না দিতে চাহিলে রাগ করে, অভিমান করে, সর্বজয়াকে দিতেই হয়।

ইহার মধ্যে আবার পটু মাঝে মাঝে আসিয়া ভাগ বসাইয়া থাকে। সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই পড়াশুনার। নানাস্থানে ঘুরিয়াছে, ভগ্নীপতি অর্জুন চক্রবর্তী তো তাহাকে বাড়ি ঢুকিতে দেয় না। দিদিকে এ সব লইয়া কম গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই বা কম চোখের জল ফেলিতে হয় নাই ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পটু নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব অবস্থায় পথে পথেই ঘোরে, যদিও পড়াশুনার আশা সে এখনও অবধি ছাড়ে নাই। অপু তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সুবিধা করিতে পারে নাই। দু'-তিন মাস হয়ত দেখা নাই, হঠাৎ একদিন কোথা হইতে পুঁটলি বগলে করিয়া পটু আসিয়া হাজির হয়, অপু তাহাকে যত্ন করিয়া রাখে, তিন-চারদিন ছাড়ে না, সে না চাহিলেও যখন যাহা পারে হাতে গুঁজিয়া দেয়—টাকা পারে না, সিকিটা, দুয়ানিটা। পটু নিশ্চিন্দিপুরে আর যায় না—তাহার বাবা সম্প্রতি মারা গিয়াছেন—সৎমা দেশের বাড়িতে তাঁহার দুই মেয়ে লইয়া থাকেন, সেখানে ভাই বোন কেহই আর যায় না। পটুকে দেখিলে অপুর ভারি একটা সহানুভূতি হয়, কিন্তু ভাল করিবার তাহার হাতে আর কি ক্ষমতা আছে?

একদিন রাসবিহারী আসিয়া দু'আনা পয়সা ধার চাহিল। রাসবিহারী গরীবের ছেলে, তাহা ছাড়া পড়াশুনায় ভাল নয় বলিয়া বোর্ডিং-এ খাতিরও পায় না। অপুকে সবাই দলে নেয়, পয়সা দিতে না পারিলেও নেয়। কিন্তু তাহাকে পোঁছেও না। অপু এ সব জানিত বলিয়াই তাহার উপর কেমন একটা করুণা। কিন্তু আজ সে নানা কারণে রাসবিহারীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। বলিল, আমি কোথায় পাবো পয়সা?—আমি কি টাকার গাছ?—দিতে পারবো না যাও।—রাসবিহারী পীড়াপীড়ি শুরু করিল। কিন্তু অপু একেবারে বাঁকিয়া বসিল। বলিল, কক্ষনো দেবো না তোমায়—যা পারো করো।

রমাপতির কাছে ছেলেদের একখানা মাসিক পত্র আসে তাহাতে সে একদিন 'ছায়াপথ' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়িল। 'ছায়াপথ' কাহাকে বলে ইহার আগে জানিত না—এতবড় বিশাল কোন জিনিসের ধারণাও কথনো করে নাই—নক্ষত্রের সম্বন্ধেও কিছু জানা ছিল না। শরতের আকাশে রাত্রে মেঘমুক্ত—বোর্ডিং-এর পিছনে খেলার কম্পাউণ্ডে রাত্রে দাঁড়াইয়া ছায়াপথটা প্রথম দেখিয়া সে কী আনন্দ! জ্বলজ্বলে সাদা ছায়াপথটা কালো আকাশের বুক চিরিয়া কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে—শুধু নক্ষত্রে ভরা!···

কাঁঠাল-তলাটায় দাঁড়াইয়া সে কতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—নবজাগ্রত মনের প্রথম বিস্ময়!···

পৌষ মাসের প্রথমে অপুর নিজের একটু সুবিধা ঘটিল। নতুন ডেপুটীবাবুর বাসাতে ছেলেদের জন্য একজন পড়াইবার লোক চাই। হেডপণ্ডিত তাহাকে ঠিক করিয়া দিলেন। দু'টি ছেলে পড়ানো, থাকা ও খাওয়া।

দুই-তিনদিনের মধ্যেই বোর্ডিং হইতে বাসা উঠাইয়া অপু সেখানে গেল। বোর্ডিং-এ অনেক বাকী পড়িয়াছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তলে তলে হেডমাস্টারের কাছে এসব কথা রিপোর্ট করিয়াছেন, যদিও অপু তাহা জানে না।

বাহিরের ঘরে থাকিবার জায়গা স্থির হইল। বিছানা-পত্র গুছাইয়া পাতিয়া লইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া রাঁধুনী ঠাকুরের ডাকে বাড়ির মধ্যে খাইতে গেল। দালানে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল—একজন কে পাশের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ হইতে তাহার খাওয়া দেখিতেছেন। একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে তিনি সরিয়া আসিলেন। খুব সুন্দরী মহিলা, তাহার মায়ের অপেক্ষাও বয়স অনেক—অনেক কম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাড়ি কোথায়?

অপু ঘাড় না তুলিয়া বলিল, মনসাপোতা—অনেক দূর এখেন থেকে—

—বাড়িতে কে কে আছেন ?

—শুধু মা আছেন, আর কেউ না।

—তোমার বাবা বুঝি—ভাই বোন ক'টি তোমরা ?

—এখন আমি একা। আমার দিদি ছিল—সে সাত-আট বছর হ'ল মারা গিয়েচে।—

কোনো রকমে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া সে উঠিয়া আসিল। শীতকালেও সে যেন ঘামিয়া উঠিয়াছে।

পরদিন সকালে অপু বাড়ির ভিতর হইতে খাইয়া আসিয়া দেখিল, বছর তেরো বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে ছোট্ট একটি খোকার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে দাঁড়াইয়া আছে। অপু বুঝিল—সে কাল রাত্রের পরিচিতা মহিলাটির মেয়ে। অপু আপন মনে বই গুছাইয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল. মেয়েটি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ অপুর ইচ্ছা হইল. এ মেয়েটির সামনে কিছু পৌরুষ দেখাইবে—কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই, শিখায় নাই, আপনা আপনি তাহার মনে হইল। হাতের কাছে অন্য কিছু না পাইয়া সে নিজের অঙ্কের ইনস্ট্রুমেণ্ট বাক্সটা বিনা কারণে খুলিয়া প্রোটেক্টর, সেট্‌স্কোয়ার. কম্পাসগুলোকে বিছানার উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া পুনরায় সেগুলো বাক্সে সাজাইতে লাগিল। কি জানি কেন অপুর মনে হইল, এই ব্যাপারেই তাহার চরম পৌরুষ দেখানো হইবে। মেয়েটি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল. কোনো কথা বলিল না, অপুও কোনো কথা বলিল না।

আলাপ হইল সেদিন সন্ধ্যায়। সে স্কুল হইতে আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছে, মেয়েটি আসিয়া লাজুক চোখে বলিল—আপনাকে মা খাবার খেতে ডাকচেন।

আসন পাতা—পরোটা, বেগুন ভাজা. আলু চচ্চড়ি, চিনি। অপু চিনি পছন্দ করে না, গুড়ের মত জিনিস নাই, কেন ইহারা এমন সুন্দর গরম গরম পরোটা চিনি দিয়া খায় ?···

মেয়েটি কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল---মাকে বলব আর দিতে ?

—না ; তোমরা চিনি খাও কেন ?···গুড় তো ভাল—

মেয়েটি বিস্মিতমুখে বলিল—কেন, আপনি চিনি খান না ?

—ভালবাসি নে—রুগীর খাবার—খেজুরে গুড়ের মত কি আর খেতে ভাল ?—মেয়েটির সামনে তাহার আদৌ লজ্জা ছিল না, কিন্তু এই সময়ে মহিলাটি ঘরে

ঢাকাতে অপুর লম্বা লম্বা কথা বন্ধ হইয়া গেল। মহিলাটি বলিলেন—ওকে দাদা ব'লে ডাকবি নির্মলা, কাছে ব'সে খাওয়াতে হবে রোজ। ও দেখছি যে-রকম লাজুক, এ পর্যন্ত তো আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না —না দেখলে আধপেটা খেয়ে উঠে যাবে।

অপু লজ্জিত হইল। মনে মনে ভাবিল ইঁহাকে সে মা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু লজ্জায় পারিল না, সুযোগ কোথায় ? এমনি খামকা মা বলিয়া ডাকা—সে বড়—সে তাহা পারিবে না।

মাসখানেক ইঁহাদের বাড়ি থাকিতে থাকিতে অপুর কতকগুলি নতুন বিষয়ে জ্ঞান হইল। সবাই ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আটপৌরে পোশাক-পরিচ্ছদও সুদৃশ্য ও সুরুচিসম্মত। মেয়েদের শাড়ি পরিবার ধরণটি বেশ লাগে, একে সবাই দেখিতে সুশ্রী. তাহার উপর সুদৃশ্য শাড়ি-সেমিজে আরও সুন্দর দেখায়। এই জিনিসটা অপু কখনও জানিত না, বড়লোকের বাড়ি থাকিবার সময়ও নহে, কারণ সেখানে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তাহার অনভ্যস্ত চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল—সহজ গৃহস্থ জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারের পর্যায়ে তাহাকে সে ফেলিতে পারে নাই।

অপু যে-সমাজ, যে-আবহাওয়ায় মানুষ—সেখানকার কেহ এ ধরণের সহজ সৌন্দর্যময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়। নানা জায়গায় বেড়াইয়া নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশিয়া তাহার আজকাল চোখ ফুটিয়াছে ; সে আজকাল বুঝিতে পারে নিশ্চিন্দিপুরে তাহাদের গৃহস্থালী ছিল দরিদ্রের. অতি দরিদ্রের গৃহস্থালী। শিল্প নয়. শ্রী ছাঁদ নয়. সৌন্দর্য নয়. শুধু খাওয়া আর থাকা।

নির্মলা আসিয়া কাছে বসিল। অপু অ্যালজেব্রার শক্ত আঁক কষিতেছিল, নির্মলা নিজের বইখানা খুলিয়া বলিল—আমায় ইংরেজিটা একটু ব'লে দেবেন দাদা ? অপু বলিল—এসে জুটলে ? এখন ওসব হবে না, ভারী মুশকিল. একটা আঁকও সকাল থেকে মিললো না !

নির্মলা নিজে বসিয়া পড়িতে লাগিল। সে বেশ ইংরেজি জানে, তাহার বাবা যত্ন করিয়া শিখাইয়াছেন, বাংলাও খুব ভাল জানে।

একটু পড়িয়াই সে বইখানা বন্ধ করিয়া অপুর আঁক কষা দেখিতে লাগিল। খানিকটা আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর আর একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া অপুর কাঁধে হাত দিয়া ডাকিয়া বলিল—এদিকে ফিরুন দাদা, আচ্ছা এই পদ্যটা মিলিয়ে—

অপু বলিল—যাও ! আমি জানি নে. ওই তো তোমার দোষ নির্মলা, আঁক

মিলচে না, এখন তোমার পদ্য মেলাবার সময়—আচ্ছা লোক—

নির্মলা মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—এ পদ্যটা আর মেলাতে হয় না আপনার—বলুন দিকি—সেই গাছ গাছ নয়, যাতে নেই ফল—

অপু আঁক-কষা ছাড়িয়া বলিল—মিলবে না? আচ্ছা দ্যাখো—পরে খানিকটা আপন মনে ভাবিয়া বলিল—সেই লোক লোক নয়, যার নেই বল—হ'ল না?

নির্মলা লাইন দু'টি আপন মনে আবৃত্তি করিয়া বুঝিয়া দেখিল কোথায়ও কানে বাধিতেছে কি না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আচ্ছা এবার বলুন তো আর একটা—

—আমি আর বলব না—তুমি ওরকম দুষ্টুমি কর কেন? আমি আঁকগুলো কষে নিই, তারপর যত ইচ্ছা পদ্য মিলিয়ে দেবো—

—আচ্ছা এই একটা—সেই ফুল ফুল নয়, যার—

—মাকে এখুনি উঠে গিয়ে ব'লে আসবো, নির্মলা—ঠিক বলছি, ওরকম যদি—

নির্মলা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ওবেলা কে খাবার ব'য়ে আনে বাইরের ঘরে দেখবো—

এরকম প্রায়ই হয়, অপু ইহাতে ভয় পায় না। বেশ লাগে নির্মলাকে।

পূজার পর নির্মলার এক মামা বেড়াইতে আসিলেন। অপু শুনিল, তিনি নাকি বিলাতফেরৎ—নির্মলার ছোট ভাই নন্তুর নিকট কথাটা শুনিল। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী নয়, রোগা শ্যামবর্ণ। এ লোক বিলাতফেরৎ!

বাল্যে নদীর ধারে ছায়াময় বৈকালে পুরাতন 'বঙ্গবাসী'তে পড়া সেই বিলাত-যাত্রীর চিঠির মধ্যে পঠিত আনন্দভরা পুরাতন পথ বাহিয়া মরুভূমির পার্শ্বের সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া, নীল ভূমধ্যসাগরমধ্যস্থ দ্রাক্ষাকুঞ্জ-বেষ্টিত কর্সিকা দূরে ফেলিয়া সেই মধুর স্বপ্নমাখা পথ-যাত্রা।

এই লোকটা সেখানে গিয়াছিল? এই নিতান্ত সাধারণ ধরণের মানুষটা—যে দিব্য নিরীহমুখে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মোচার ঘণ্ট দিয়া ভাত খাইতেছে!

দু'এক দিনেই নির্মলার মামা অমরবাবুর সহিত তাহার খুব আলাপ হইয়া গেল।

বিলাতের কত কথা সে জানিতে চায়। পথের ধারে সেখানে কি সব গাছপালা? আমাদের দেশের পরিচিত কোন গাছ সেখানে আছে? প্যারিস খুব বড় শহর? অমরবাবু নেপোলিয়নের সমাধি দেখিয়াছেন? ডোভারের খড়ির

পাহাড় ? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নাকি নানা অদ্ভুত জিনিস আছে—কি কি ? আর ভেনিস ?—ইতালির আকাশ নাকি দেখিতে অপূর্ব ?

পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ছেলে, এত সব কথা জানিবার কৌতূহল হইল কি করিয়া অমরবাবু বুঝিতে পারেন না। এত আগ্রহ করিয়া শুনিবার মত জিনিস সেখানে কি আর আছে ! একঘেয়ে—ধোঁয়া—বৃষ্টি—শীত। তিনি পয়সা খরচ করিয়া সেখানে গিয়াছিলেন সাবান-প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার জন্য, পথের ধারের গাছপালা দেখিতে যান নাই বা ইতালির আকাশের রং লক্ষ্য করিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময়ের প্রাচুর্যও তাঁর ছিল না।

নির্মলাকে অপুর ভাল লাগে, কিন্তু সে তাহা দেখাইতে জানে না। পরের বাড়ি বলিয়াই হউক, বা একটু লাজুক প্রকৃতির বলিয়াই হউক, সে বাহিরের ঘরে শান্তভাবে বাস করে—কি তাহার অভাব, কোন্‌টা তাহার দরকার, সে কথা কাহাকেও জানায় না। অপুর এই উদাসীনতা নির্মলার বড় বাজে, তবুও সে না চাহিতেই নির্মলা তাহার ময়লা বালিশের ওয়াড় সাবান দিয়া নিজে কাচিয়া দিয়া যায়, গামছা পরিষ্কার করিয়া দেয়, ছেঁড়া কাপড় বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া মাকে দিয়া সেলাইয়ের কলে সেলাই করিয়া আনিয়া দেয়। নির্মলা চায় অপূর্ব-দাদা তাহাকে ফাই-ফরমাশ করে, তাহার প্রতি হুকুমজারি করে ; কিন্তু অপু কাহারও উপর কোনো হুকুম কোনোদিন করিতে জানে না—এক মা ছাড়া। দিদি ও মায়ের সেবায় সে অভ্যস্ত বটে, তাও সে-সেবা অযাচিতভাবে পাওয়া যাইত তাই। নইলে অপু কখনও হুকুম করিয়া সেবা আদায় করিতে শিখে নাই। তা ছাড়া সে সমাজের যে স্তরের মধ্যে মানুষ, ডেপুটীবাবুরা সেখানকার চোখে ব্রহ্মলোকবাসী দেবতার সমকক্ষ জীব। নির্মলা ডেপুটীবাবুর বড় মেয়ে—রূপে, বেশভূষায়, পড়াশুনায়, কথাবার্তায় একমাত্র লীলা ছাড়া সে এ পর্যন্ত যত মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছে—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে কি করিয়া নির্মলার উপর হুকুমজারি করিবে ? নির্মলা তাহা বোঝে না—সে দাদা বলিয়া ডাকে, অপুর প্রতি একটা আন্তরিক টানের পরিচয় তাহার প্রতি কাজে—কেন অপূর্ব-দাদা তাহাকে প্রাণপণে খাটাইয়া লয় না, নিষ্ঠুরভাবে অযথা ফাই-ফরমাশ করে না ? তাহা হইলে সে খুশী হইত।

চৈত্র মাসের শেষে একদিন ফুটবল খেলিতে খেলিতে অপুর হাঁটুটা কি ভাবে মচ্‌কাইয়া গিয়া সে মাঠে পড়িয়া গেল। সঙ্গীরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া ডেপুটীবাবুর বাসায় দিয়া গেল। নির্মলার মা ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরে

আসিলেন, কাছে গিয়া বলিলেন—দেখি দেখি, কি হয়েছে? অপুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর মুখ ঘামে ও যন্ত্রণায় রাঙা হইয়া গিয়াছে, ডান পা-খানা সোজা করিতে পারিতেছে না। মনিয়া চাকর নির্মলার মা'র স্লিপ লইয়া ডাক্তারখানায় ছুটিল। নির্মলা বাড়ি ছিল না, ভাইবোনদের লইয়া গাড়ি করিয়া মুন্সেফবাবুর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিল। একটু পরে সরকারী ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সন্ধ্যার আগে নির্মলা আসিল। সব শুনিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিল—কই দেখি. বেশ হয়েছে—দস্যিবৃত্তি করার ফল হবে না? ভারী খুশী হয়েছি আমি—

নির্মলা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। অপু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল—যাক্ না, আর কখনও যদি কথা কই—

আধ ঘণ্টা পরেই নির্মলা আসিয়া হাজির। কৌতুকের সুরে বলিল—পায়ের ব্যথা-ট্যথা জানি নে, গরম জল আনতে ব'লে দিয়ে এলাম. এমন ক'রে সেঁক দেবো —লাগে তো লাগ্‌বে—দুষ্টুমি করার বাহাদুরি বেরিয়ে যাবে—কমলা লেবু খাবেন একটা?—না. তাও না?

মনিয়া চাকর গরম জল আনিলে নির্মলা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ব্যথার উপর সেঁক দিল; নির্মলার ভাইবোনেরা সব দেখিতে আসিয়া ধরিল—ও দাদা. এইবার একটা গল্প বলুন না। অপুর মুখে গল্প শুনিতে সবাই ভালবাসে।

নির্মলা বলিল—হ্যাঁ. দাদা এখন পাশ ফিরে শুতে পারছেন না—এখন গল্প না বল্‌লে চলবে কেন?···চুপ ক'রে ব'সে থাকো সব—নয়তো বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দোব।

পরদিন সকালটা নির্মলা আসিল না। দুপুরের পর আসিয়া বৈকাল পর্যন্ত বসিয়া নানা গল্প করিল, বই পড়িয়া শুনাইল। বাড়ির ভিতর হইতে থালায় করিয়া আখ ও শাঁখ-আলু কাটিয়া লইয়া আসিল। তাহার পর তাহাদের পদ্যমেলানোর আর অন্ত নাই! নির্মলার পদটি মিলাইয়া দিয়াই অপু তাহাকে আর একটা পদ মিলাইতে বলে—নির্মলাও তপে ব'রে ব' মিনিটে তাহার জবাব দিয়া অন্য একটা প্রশ্ন করে।···কেহ কাহাকেও ঠকাইতে পারে না।

ডেপুটীবাবুর স্ত্রী একবার বাহিরের ঘরে আসিতে আসিতে শুনিয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, আর ভাবনা নেই—এখন তোমরা দু'ভাইবোনে একটা কবির দল খুলে দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াও গিয়ে—

অপু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। ডেপুটীবাবুর স্ত্রীর বড় সাধ অপু

তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। সে যে আড়ালে তাঁহাকে মা বলে, তাহা তিনি জানেন—কিন্তু সামনাসামনি অপু কখনো তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে নাই, এজন্য ডেপুটীবাবুর স্ত্রী খুব দুঃখিত।

অপু যে ইচ্ছা করিয়া করে না তাহা নহে। ডেপুটীবাবুর বাসায় থাকিবার কথা একবার সে বাড়িতে গিয়া মায়ের কাছে গল্প করাতে সর্বজয়া ভারী খুশী হইয়াছিল। ডেপুটীবাবুর বাড়ি! কম কথা নয়!···সেখানে কি করিয়া থাকিতে হইবে, চলিতে হইবে সে বিষয়ে ছেলেকে নানা উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিল—ডেপুটীবাবুর বউকে মা ব'লে ডাকবি—আর ডেপুটীবাবুকে বাবা ব'লে ডাকবি—

অপু লজ্জিত মুখে বলিয়াছিল—হঁ্যা, আমি ওসব পারবো না—

সর্বজয়া বলিয়াছিল—তাতে দোষ কি?—বলিস, তাঁরা খুশী হবেন—কম একটা বড়লোকের আশ্রয় তো নয়!—তাহার কাছে সবাই বড় মানুষ।

অপু তখন মায়ের নিকট রাজী হইয়া আসিলেও এখানে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। মুখে কেমন বাধে, লজ্জা করে।

একদিন—অপু তখন একমাস হইল সারিয়া উঠিয়াছে—নির্মলা বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া কি বই পড়িতেছিল, ঘোর বর্ষা সারা দিনটা, বেলা বেশী নাই—বৃষ্টি একটু কমিয়াছে। অপু বিনা ছাতায় কোথা হইতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিতেই নির্মলা বই মুড়িয়া বলিয়া উঠিল—এঃ, আপনি যে দাদা ভিজে একেবারে—

অপুর মনে যে জন্যই হউক খুব স্ফূর্তি ছিল—তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—চট্ ক'রে চা আর খাবার—তিন মিনিট—

নির্মলা বিস্মিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এ রকম তো কখনও হুকুমের সুরে অপুর্দা বলে না! সে হাসিমুখে মুখ টিপিয়া বলিল—পারবো না তিন মিনিটে—ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কিনা একেবারে!

অপু হাসিয়া বলিল—আর তো বেশীদিন না—আর তিনটি মাস তোমাদের জ্বালাবো, তার পর চলে যাচ্ছি—

নির্মলার মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোথায় যাবেন!

—তিন মাস পরেই এগ্‌জামিন—দিয়েই চলে যাবো, কলকাতায় পড়বো পাশ হলে—

নির্মলা এতদিন সম্ভবত এটা ভাবিয়া দেখে নাই, বলিল—আর এখানে থাকবেন না ?

অপু ঘাড় নাড়িল। খানিকটা থামিয়া কৌতুকের সুরে বলিল—তুমি তো বাঁচো, যে খাটুনি—তোমার তো ভাল—ওকি ? বা রে—কি হলো—শোন নির্মলা—

হঠাৎ নির্মলা উঠিয়া গেল কেন—চোখে কি কথায় তাহার এত জল আসিয়া পড়িল, বুঝিতে না পারিয়া সে মনে মনে অনুতপ্ত হইল। আপন মনে বলিল—আর ওকে ক্ষ্যাপাবো না—ভারী পাগল—আহা, ওকে সব সময় খোঁচা দিই—সোজা খেটেছে ও, যখন পা ভেঙে পড়েছিলাম পনেরো দিন ধরে, জানতে দেয় নি যে আমি নিজের বাড়িতে নেই—

ইহার মধ্যে আবার একদিন পটু আসিল। ডেপুটীবাবুর বাসাতে অপু উঠিয়া আসিবার পর সে কখনও আসে নাই। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বাসায় ঢুকিল। এক-পা ধুলো, রুক্ষ চুল, হাতে পুটুলি। সে কোন সুবিধা খুঁজিতে আসে নাই, এদিকে আসিলে অপুর সঙ্গে দেখা না করিয়া সে যাইতে পারে না। পটুর মুখে অনেক দিন পর সে রাণুদির খবর পাইল। পাড়াগাঁয়ের নিঃসহায় নিরুপায় ছেলেদের অভ্যাসমত সে গ্রামের যত মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো শুরু করিয়াছে। বাপের বাড়ির লোক, অনেকের হয়ত বা খেলার সঙ্গী, মেয়েরা আগ্রহ করিয়া রাখে, ছাড়িয়া দিতে চাহে না, যে কয়টা দিন থাকে খাওয়া সম্বন্ধে নির্ভাবনা। কোন স্থানে দু'দিন, কোথাও পাঁচদিন—মেয়েরা আবার আসিতে বলে, যাবার সময় খাবার তৈয়ারী করিয়া সঙ্গে দেয়। এ এক ব্যবসা পটু ধরিয়াছে মন্দ নয়—ইহার মধ্যে সে তাহাদের পাড়ার সব মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে দু-চার বার ঘুরিয়া আসিয়াছে।

এইভাবেই একদিন রাণুদির শ্বশুরবাড়ি সে গিয়াছে—সে গল্প করিল। রাণুদির শ্বশুরবাড়ি রাণাঘাটের কাছে—তাঁহারা পশ্চিমে কোথায় চাকুরি উপলক্ষে থাকেন—পূজার সময় বাড়ি আসিয়াছিলেন, সপ্তমী পূজার দিন অনাহূতভাবে পটু গিয়া হাজির। সেখানে আট দিন ছিল। রাণুদির যত্ন কি ! তাহার দুরবস্থা শুনিয়া গোপনে তিনটা টাকা দিয়াছিল, আসিবার সময় নতুন ধুতি চাদর, এক পুটুলি বাসি লুচি সন্দেশ।

অপু বলিল—আমার কথা কিছু বললে না ?

—শুধুই তোর কথা। যে কয়দিন ছিলাম, সকালে সন্ধ্যাতে তোর কথা।

তারা আবার একাদশীর দিনই পশ্চিমে চলে যাবে, আমাকে রাণুদি বললে, ভাড়ার টাকা দিচ্ছি, তাকে একবার নিয়ে আয় এখানে—দু'বচ্ছর দেখা হয় নি—তা আমার আবার জ্বর হ'ল—দিদির বাড়ি এসে দশ-বারোদিন পড়ে রইলাম—তোর ওখানে আর যাওয়া হ'ল না—ওরাও চলে গেল পশ্চিমে—

—ভাড়ার টাকা দেয় নি?

পটু লজ্জিত মুখে বলিল—হ্যাঁ, তোর আর আমার যাতায়াতের ভাড়া হিসেব ক'রে—সেও খরচ হয়ে গেল, দিদি কোথায় আর পাবে, আমার সেই ভাড়ার টাকা থেকে নেবু ডালিম ওষুধ—সব হ'ল। রাণুদির মতন অমন মেয়ে আর দেখি নি অপুদা, তোর কথা বলতে তার চোখে জল পড়ে—

হঠাৎ অপুর গলা যেন কেমন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—সে তাড়াতাড়ি কি দেখিবার ভান করিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিল।

—শুধু রাণুদি না, যত মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গেলাম, রাণীদি, আশালতা, ওপাড়ার সুনয়নীদি—সবাই তোর কথা আগে জিজ্ঞেস করে—

ঘণ্টা দুই থাকিয়া পটু চলিয়া গেল।

দেওয়ানপুর স্কুলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হয়। খরচ-পত্র করিয়া কোথাও যাইতে হইল না। পরীক্ষার পর হেডমাস্টার মিঃ দত্ত অপুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—বাড়ি যাবে কবে?

এই কয় বৎসরে হেডমাস্টারের সঙ্গে তাহার কেমন একটা নিবিড় সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, দুজনের কেহই এতদিনে জানিতে পারে নাই সে বন্ধন কতটা দৃঢ়।

অপু বলিল—সামনের বুধবারে যাব ভাবছি।

—পাশ হলে কি করবে ভাবছো? কলেজে পড়বে তো?

—কলেজে পড়বার খুব ইচ্ছে, স্যার।

—যদি স্কলারশিপ না পাও?

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে।

—ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, বাইবেলের একটা জায়গা পড়ে শোনাই তোমাকে—

মিঃ দত্ত খৃষ্টান। ক্লাসে কতদিন বাইবেল খুলিয়া চমৎকার চমৎকার উক্তি তাহাদের পড়িয়া শুনাইয়াছেন, অপুর তরুণ মনে বুদ্ধদেবের পীতবাসধারী সৌম্যমূর্তির পাশে, তাহাদের গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষীর পাশে,

বোষ্টমদাদু নরোত্তম দাসের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের পাশে, দীর্ঘদেহ শান্তনয়ন যীশুর মূর্তি কোন্ কালে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল—তাহার মন যীশুকে বর্জন করে নাই, কাঁটার মুকুট পরা, লাঞ্ছিত, অপমানিত এক দেবোন্মাদ যুবককে মনেপ্রাণে বরণ করিতে শিখিয়াছিল।

মিঃ দত্ত বলিলেন—কলকাতাতেই পড়ো—অনেক জিনিস দেখবার শেখবার আছে—কোন কোন পাড়াগাঁয়ের কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না, আমি কলকাতাকেই ভাল বলি।

অপু অনেকদিন হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কলেজে পড়িবে এবং কলিকাতার কলেজেই পড়িবে।

মিঃ দত্ত বলিলেন—স্কুল লাইব্রেরীর 'লে মিজারেব্‌ল্'-খানা তুমি খুব ভালবাসতে—ওখানা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, আমি আর একখানা কিনে নেবো।

অপু বেশী কথা বলিতে জানে না—এখনও পারিল না—মুখচোরার মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হেডমাস্টারের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হেডমাস্টারের মনে হইল—তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের শিক্ষক-জীবনে এ রকম আর কোন ছেলের সংস্পর্শে তিনি কখনও আসেন নাই!—ভাবময়, স্বপ্নদর্শী বালক, জগতে সহায়হীন, সম্পদহীন! হয়ত একটু নির্বোধ, একটু অপরিণামদর্শী —কিন্তু উদার, সরল, নিষ্পাপ, জ্ঞান-পিপাসু ও জিজ্ঞাসু। মনে মনে তিনি বালকটিকে বড় ভালবাসিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে এই একটি আসিয়াছিল, চলিয়া গেল। ক্লাসে পড়াইবার সময় ইহার কৌতূহলী ডাগর চোখ ও আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজীর ঘণ্টায় কত নতুন কথা, কত গল্প, ইতিহাসের কাহিনী বলিয়া যাইতেন—ইহার নীরব, জিজ্ঞাসু চোখ দু'টি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ জোর করিয়া পাঠ আদায় করিয়া লইয়াছে, সেরূপ আর কেহ পারে নাই, সে প্রেরণা সহজলভ্য নয়, তিনি তাহা জানেন।

গত চার বৎসরের স্মৃতি-জড়ানো দেওয়ানপুর হইতে বিদায় লইবার সময়ে অপুর মন ভাল ছিল না। দেবব্রত বলিল—তুমি চলে গেলে অপূর্বদা, এবার পড়া ছেড়ে দেবো।

নির্মলার সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা। ফাল্গুন মাসের অপূর্ব অদ্ভুত দিন-

গুলি। বাতাসে কিসের যেন মৃদু স্নিগ্ধ, অনির্দেশ্য সুগন্ধ। আমের বউলের সুবাস সকালের রৌদ্রকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অপুর আনন্দ সে-সব হইতে আসে নাই—গত কয়েকদিন ধরিয়া সে রাইডার হ্যাগার্ডের 'ক্লিওপেট্রা' পড়িতেছিল। তাহার তরুণ কল্পনাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়াছে বইখানা। কোথায় এই হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন সমাধি—জ্যোৎস্না ভরা নীলনদ, বিস্মৃত 'রা' দেবের মন্দির!—ঔপন্যাসিক হ্যাগার্ডের স্থান সমালোচকের মতে যেখানেই নির্দিষ্ট হউক তাহাতে আসে যায় না—তাহার নবীন, অবিকৃত মন একদিন যে গভীর আনন্দ পাইয়াছিল বইখানা হইতে—এইটাই বড় কথা তাহার কাছে।

নির্মলার সহিত দেখা অপুর মনের সেই অবস্থায়,—অপ্রকৃতিস্থ, মত্ত, রঙীন —সে তখন শুধু একটা সুপ্রাচীন রহস্যময়, অধুনালুপ্ত জাতির দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ক্লিওপেট্রা? হউন তিনি সুন্দরী—তাঁহাকে সে গ্রাহ্য করে না! পিরামিডের অন্ধকার গর্ভগৃহে বহু হাজার বৎসরের সুপ্তি ভাঙিয়া সম্রাট মেঙ্কাউ-রা গ্রানাইট পাথরের সমাধি-সিন্দুকে যখন রোষে পার্শ্বপরিবর্তন করেন—মনুষ্য সৃষ্টির পূর্বেকার জনহীন আদিম পৃথিবীর নীরবতার মধ্যে শুধু সিহোর নদী লিবীয়া মরুভূমির বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়—অপূর্ব রহস্যে ভরা মিশর! অদ্ভুত নিয়তির অকাট্য লিপি! তাহার মন সারা দুপুর আর কিছু ভাবিতে চায় না।

গরম বাতাসে দমকা ধূলোবালি উড়াইয়া আনিতেছিল বলিয়া অপু দরজা ভেজাইয়া বসিয়া ছিল, নির্মলা দরজা ঠেলিয়া ঘরে আসিল। অপু বলিল—এস এস, আজ সকালে তো তোমাদের স্কুলে প্রাইজ হ'ল,—কে প্রাইজ দিলেন,—মুন্সেফবাবুর স্ত্রী, না? ঐ মোটা-মত যিনি গাড়ি থেকে নামলেন, উনিই তো?

—আপনি বুঝি ওদিকে ছিলেন তখন? মাগো, কি মোটা!—আমি তো কখনো—পরে হঠাৎ যেন মনে পড়িল এইভাবে বলিল, তারপর আপনি তো যাবেন আজ, না দাদা?

—হ্যাঁ, দুটোর গাড়ীতে যাবো—রামধারিয়াকে একটু ডেকে নিয়ে এস তো—জিনিসপত্তরগুলো একটু বেঁধে দেবে।

—রামধারিয়া কি আপনার চিরকাল ক'রে দিয়ে এসেছে নাকি? কই, কি জিনিস আগে বলুন না।

দুইজনে মিলিয়া বইয়ের ধুলো ঝাড়িয়া গোছানো, বিছানা বাঁধা চলিল।

নির্মলা অপুর ছোট টিনের তোরঙ্গটা খুলিয়া বলিল—মাগো ! কি ক'রে রেখেছেন বাক্সটা ! কাপড়ে, কাগজে, বইয়ে হাণ্ডুল পাণ্ডুল—আচ্ছা এত বাজে কাগজ কি হবে দাদা ? ফেলে দেবো ?···

অপু বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ—না না—ওসব ফেলো না।

সে আজ দুই-তিন বছরের চিঠি, নানা সময়ে নানা কথা লেখা কাগজের টুকরা সব জমাইয়া রাখিয়াছে। অনেক স্মৃতি জড়ানো সেগুলির সঙ্গে, পুরাতন সময়কে আবার ফিরাইয়া আনে—সেগুলি প্রাণ ধরিয়া অপু ফেলিয়া দিতে পারে না। কবে কোন্ কালে তাহার দিদি দুর্গা নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে আদর করিয়া তাহাকে কোন্ বন হইতে একটা পাখীর বাসা আনিয়া দিয়াছিল, কতকালের কথা, —বাসাটা সে আজও বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে—বাবার হাতের লেখা একখানা কাগজ—আরও কত কি।

নির্মলা বলিল—এ কি ! আপনার মোটে দুখানা কাপড়, আর জামা নেই ?

অপু হাসিয়া বলিল—পয়সাই নেই হাতে তা জামা ! নইলে ইচ্ছা তো আছে সুকুমারের মত একটা জামা করাবো—ওতে আমাকে যা মানায়—ওই রংটাতে—

নির্মলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—থাক থাক, আর বাহাদুরি করতে হবে না। এই রইল চাবি, এখুনি হারিয়ে ফেলবেন না যেন আবার। আমি মিশির ঠাকুরকে বলে দিয়েছি, এখুনি লুচি ভেজে আনবে—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে আপনার গাড়ির কত দেরি ?

—এখনও ঘণ্টা দুই ! মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো, আবার হয়ত কতদিন পরে আসবো তার ঠিক কি ?

—আসবেনই না। আপনাকে আমি বুঝি নি ভাবছেন ? এখান থেকে চলে গেলে আপনি আবার এ-মুখো হবেন ?—কখ্খনো না।

অপু কি প্রতিবাদ করিতে গেল, নির্মলা বাধা দিয়া বলিল—সে আমি জানি ! এই দু'বছর আপনাকে দেখে আসছি দাদা, আমার বুঝতে বাকী নেই, আপনার শরীরে মায়া দয়া কম।

—কম ?—বা রে—এ তো তুমি—আমি বুঝি—

—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে মিশির ঠাকুর কি করছে—তাড়া না দিলে সে কি আর—

নির্মলার মা যাইবার সময় চোখের জল ফেলিলেন। কিন্তু নির্মলা বাড়ির মধ্যে কি কাজে ব্যস্ত ছিল, মায়ের বহু ডাকাডাকিতেও সে কাজ ফেলিয়া বাহিরে

আসিতে পারিল না। অপু স্টেশনের পথে যাইতে যাইতে ভাবিল—নির্মলা আচ্ছা তো! একবার বার হ'ল না—যাবার সময়টা দেখা হ'ত—আচ্ছা খামখেয়ালি!

যখন তখন রেলগাড়িতে চড়াটা ঘটে না বলিয়াই রেলে চড়িলেই তাহার একটা অপূর্ব আনন্দ হয়। ছোট্ট তোরঙ্গ ও বিছানাটার মোট লইয়া জানালার ধারে বসিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে কত কথা মনে আসিতেছিল। এখন সে কত বড় হইয়াছে—একা একা ট্রেনে চড়িয়া বেড়াইতেছে। তারপর এমনি একদিন হয়ত নীল নদের তীরে ক্লিওপেট্রার দেশে—এক জ্যোৎস্না রাতে শত শত প্রাচীন সমাধির বুকের উপর দিয়া অজানা সে যাত্রা!

স্টেশনে নামিয়া বাড়ি যাইবার পথে একটা গাছতলা দিয়া যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে কেমন একটা সুগন্ধ—মাটির, ঝরা পাতার, কোন্ ফুলের। ফাল্গুনের তপ্ত রৌদ্র গাছে গাছে পাতা ঝরাইয়া দিতেছে, মাঠের ধারে অনেক গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে—পলাশের ডালে রাঙা রাঙা নতুন ফোটা ফুল যেন আরতির পঞ্চপ্রদীপের ঊর্ধ্বমুখী শিখার মত জ্বলিতেছে। অপুর মনে যেন আনন্দে শিহরিয়া ওঠে—যদিও সে ট্রেনে আজ সারা পথ শুধু নির্মলা আর দেবব্রতের কথা ভাবিয়াছে···কখনো শুধুই নির্মলা, কখনো শুধুই দেবব্রত—তাহার স্কুলজীবনে এই দুইটি বন্ধু যতটা তাহার প্রাণের কাছাকাছি আসিয়াছিল, অতটা নিকটে অমনভাবে আর কেহ আসিতে পারে নাই, তবুও তাহার মনে হয় আজকার আনন্দের সঙ্গে নির্মলার সম্পর্ক নাই, দেবব্রতের নাই—আছে তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যজীবনের স্নিগ্ধস্পর্শ, আর বহুদূর-বিসর্পিত, রহস্যময় কোন্ অন্তরের ইঙ্গিত—সে মনে বালক হইলেও এ-কথা বোঝে।

প্রথম যৌবনের শুরু, বয়ঃসন্ধিকালে রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে,—এই ছায়া, বকুলের গন্ধ, বনান্তরে অবসন্ন ফাল্গুনদিনে পাখির ডাক, ময়ূরকণ্ঠী রং-এর আকাশটা—রক্তে যেন এদের নেশা লাগে—গর্ব, উৎসাহ, নবীন জীবনের আনন্দভরা প্রথম পদক্ষেপ। নির্মলা তুচ্ছ! আর এক দিক হইতে ডাক আসে—অপু আশায় আশায় থাকে।

নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির এ আহ্বান, রোমান্সের আহ্বান—তার রক্তে মেশানো, এ আসিয়াছে তাহার বাবার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে—বন্ধনমুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হওয়া, মন কি চায় না-বুঝিয়াই তাহার পিছু পিছু দৌড়ানো, এ তাহার নিরীহ শান্ত-প্রকৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পিতামহ রামহরি তর্কালঙ্কারের দান নয়

—যদিও সে তাঁর নিস্পৃহ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়ন-প্রিয়তাকে লাভ করিয়াছে বটে। কে জানে পূর্ব-পুরুষ ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের উচ্ছৃংখল রক্ত কিছু আছে কি-না—

তাই তাহার মনে হয় কি যেন একটা ঘটিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় থাকে।

অপূর্ব গন্ধে-ভরা বাতাসে, নবীন বসন্তের শ্যামলশ্রীতে, অস্তসূর্যের রক্ত আভায় সে রোমান্সের বার্তা যেন লেখা থাকে।

বাড়িতে অপু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিল। কলিকাতায় যদি পড়িতে যায় স্কলারশিপ না পাইলে কি কোন সুবিধা হইবে? সর্বজয়া কখনও জীবনে কলিকাতা দেখে নাই—সে কিছু জানে না। পড়া তো অনেক হইয়াছে আর পড়ার দরকার কি?—অপুর মনে কলেজে পড়িবার ইচ্ছা খুব প্রবল। কলেজে পড়িলে মানুষ বিদ্যার জাহাজ হয়। সবাই বলিবে কলেজের ছেলে।

মাকে বলিল—মা-যদি স্কলারশিপ পাই, তাই বা কি? একরকম ক'রে হয়ে যাবে—রমাপতিদা বলে, কত গরীবের ছেলে কলকাতায় পড়চে, গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই নাকি সুবিধা হয়ে যাবে, ও আমি ক'রে নেবো মা—

কলিকাতায় যাইবার পূর্বদিন রাত্রে আগ্রহে উত্তেজনায় তাহার ঘুম হইল না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করে, বুকের মধ্যেও। গলায় যেন কি আটকাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্য সে কাল এমন সময় কলিকাতায় বসিয়া আছে?··· কলিকাতায়!···কলিকাতা সম্বন্ধে কত গল্প, কত কি সে শুনিয়াছে। অতবড় শহর আর নাই। কত কি অদ্ভুত জিনিস দেখিবার আছে, বড় বড় লাইব্রেরী আছে সে শুনিয়াছে বই চাহিলেই সেখানে বসিয়া পড়িতে দেয়।

বিছানায় শুইয়া সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বাড়ির পিছনের তেঁতুল গাছের ডালপালা অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে, ভোর আর কিছুতেই হয় না। হয়ত তাহার কলিকাতাযাওয়া ঘটিবে না, কলেজে পড়া ঘটিবে না, কত লোক হঠাৎ মারা গিয়াছে, এমনি হয়ত সেও মরিয়া যাইতে পারে। কলিকাতা না দেখিয়া, কলেজে অন্তত কিছুদিন পড়ার আগে যেন সে না মরে!—দোহাই ভগবান!

কলিকাতায় সে কাহাকেও চেনে না, কোথায় গিয়া উঠিবে ঠিক জানা নাই, পথঘাটও জানা নাই। মাসকতক আগে দেবব্রত তাহাকে নিজের এক মেসোমশাইয়ের কলিকাতার ঠিকানা দিয়া বলিয়াছিল, দরকার হইলে এই ঠিকানায় গিয়া তাহার নাম করিলেই তিনি আদর করিয়া থাকিবার স্থান দিবেন। ট্রেনে উঠিবার সময় অপু সে-কাগজখানা বাহির করিয়া পকেটে রাখিল। রেলের পুরানো টাইমটেবলের পিছন হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা কলিকাতা শহরের নক্সা তাহার টিনের তোরঙ্গটার মধ্যে অনেকদিন আগে ছিল, সেখানাও বাহির করিয়া বসিল।

ইহার পূর্বেও অপু শহর দেখিয়াছে, তবুও ট্রেন হইতে নামিয়া শিয়ালদহ স্টেশনের সম্মুখের বড় রাস্তায় একবার আসিয়া দাঁড়াইতেই সে অবাক্ হইয়া গেল। এরকম কাণ্ড সে কোথায় দেখিয়াছে? ট্রামগাড়ি ইহার নাম? আর এক রকমের গাড়ি নিঃশব্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছে, অপু কখনও না দেখিলেও মনে মনে আন্দাজ করিল, ইহারই নাম মোটর গাড়ি। সে বিস্ময়ের সহিত দু-একখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল; স্টেশনের অফিস ঘরে সে মাথার উপর একটা কি চাকার মত জিনিস বন্ বন্ বেগে ঘুরিতে দেখিয়াছে, সে আন্দাজ করিল উহাই ইলেকট্রিক পাখা।

যে-ঠিকানা বন্ধু দিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে এক মহা মুশকিলের ব্যাপার, পকেটে রেলের টাইমটেবলের মোড়ক হইতে সংগ্রহ করা কলিকাতার যে নক্সা ছিল তাহা মিলাইয়া হ্যারিসন রোড খুঁজিয়া বাহির করিল। জিনিসপত্র তাহার এমন বেশী কিছু নহে, বগলে ছোট বিছানাটি ও ডান হাতে ভারী পুঁটুলিটা ঝুলাইয়া পথ চলিতে চলিতে সামনে পাওয়া গেল আমহার্স্ট স্ট্রীট। তাহার পর আরও খানিক ঘুরিয়া সে পঞ্চানন দাসের গলি বাহির করিল।

অখিলবাবু সন্ধ্যার আগে আসিলেন, কালো নাদুস নুদুস চেহারা, অপুর পরিচয় ও উদ্দেশ্য শুনিয়া খুশী হইলেন ও খুব উৎসাহ দিলেন। ঝিকে ডাকাইয়া তখনই খাবার আনাইয়া অপুকে খাইতে দিলেন, সারাদিন খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, নিজে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য আসনখানি মেসের ছাদে পাতিয়াও আহ্নিক করিতে ভুলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সে মেসের ছাদে শুইয়া পড়িল। সারাদিন বেড়াইয়া সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সে তো কলিকাতায় আসিয়াছে—মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ দেখিতে পাইবে তো?···বায়োস্কোপ দেখিবে···এখানে খুব বড় বায়োস্কোপ আছে সে জানে।

তাহাদের দেওয়ানপুরের স্কুলে একবার একটা ভ্রমণকারী বায়োস্কোপের দল গিয়াছিল, তাহাতেই সে জানে বায়োস্কোপ কি অদ্ভুত দেখিতে। তবে এখানে নাকি বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখায়। সেখানে তাহা ছিল না—রেলগাড়ি দৌড়াইতেছে, একটা লোক হাত পা নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া লোক হাসাইতেছে—এই সব। এখানে বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখিতে চায়। অখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, বায়োস্কোপ যেখানে হয়, এখান থেকে কত দূর?

অখিলবাবুর মেসে খাইয়া অপু ইহার-উহার পরামর্শমত নানাস্থানে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল, কোথাও বা থাকিবার স্থানের জন্য, কোথাও বা ছেলে পড়াইবার সুবিধার জন্য, কাহারও কাছে বা কলেজে বিনা বেতনে ভর্তি হইবার যোগাযোগের জন্য। এদিকে কলেজে ভর্তি হইবার সময়ও চলিয়া যায়, সঙ্গে যে কয়টা টাকা ছিল তাহা পকেটে লইয়া একদিন সে ভর্তি হইতে বাহির হইল। প্রেসিডেন্সী কলেজের দিকে সে ইচ্ছা করিয়াই ঘেঁষিল না, সেখানে সবদিকেই খরচ অত্যন্ত বেশী। মেট্রোপলিটান কলেজ গলির ভিতর, বিশেষতঃ পুরানো ধরণের বলিয়া সেখানেও ভর্তি হইতে ইচ্ছা হইল না। মিশনারীদের কলেজ হইতে একদল ছেলে বাহির হইয়া সিটি কলেজে ভর্তি হইতে চলিয়াছিল, তাহাদের দলে মিশিয়া গিয়া কেরানীর নিকট হইতে কাগজ চাহিয়া লইয়া নাম লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটার গড়ন ও আকৃতি তাহার কাছে এত খারাপ ঠেকিল যে, কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবশেষে রিপন কলেজের বাড়ি তাহার কাছে বেশ ভাল ও উঁচু মনে হইল। ভর্তি হইয়া সে আর একটি ছাত্রের সঙ্গে ক্লাস-রুমগুলি দেখিতে গেল। ক্লাসে ইলেকট্রিক পাখা। কি করিয়া খুলিতে হয়? তাহার সঙ্গী দেখাইয়া দিল। সে খুশীর সহিত তাহার নীচে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, এত হাতের কাছে ইলেকট্রিক পাখা পাইয়া বার বার পাখা খুলিয়া বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল।

অখিলবাবুদের মেসে থাকা ও পড়াশুনা দুইয়েরই ঘোর অসুবিধা। এক এক ঘরের মেজেতে তিনটি ট্রাঙ্ক, কতকগুলি জুতার বাক্স, কালি বুরুশ, তিনটি হুঁকা। ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নাই, রাত্রে আলো সবদিন জ্বলে না। ঘর দেখিয়া মনে হয় ইহার অধিবাসিগণের জীবনে মাত্র দুইটি উদ্দেশ্য আছে—অফিসে চাকরি করা ও মেসে আসিয়া খাওয়া ও ঘুমানো। এক এক ঘরে যে তিনটি বাবু থাকেন তাঁহারা ছ'টার সময় অফিস হইতে আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া যে যার বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে থাকেন, একটু আধটু গল্প-

গুজব যা হয়, প্রায়ই অফিস সংক্রান্ত ; তারপরেই আহারাদি সারিয়া নিদ্রা। অখিলবাবু কোথায় ছেলে পড়ান, অফিসের পর সেখান হইতে ফিরিতে দেরি হইয়া যায়। তিনিও সারাদিন খাটুনির পর মেসে আসিয়া শুইয়া পড়েন।

অপু এ রকম ঘরে এতগুলি লোকের সহিত এক বিছানায় কখনও শুইতে অভ্যস্ত নয়, রাত্রে তাহার যেন হাঁপ ধরে. ভাল ঘুম হয় না। কিন্তু অন্য কোথাও কোন রকম সুবিধা না হইলে সে যাইবে কোথায় ? তাহা ছাড়া অপুর আর এক ভাবনা মায়ের জন্য। স্কলারশিপ পাইলে সেই টাকা হইতে মাকে কিছু কিছু পাঠাইবার আশ্বাস সে আসিবার সময় দিয়া আসিয়াছে কিন্তু কোথায় বা স্কলারশিপ. কোথায় বা কি। মা'র কিরূপে চলিতেছে. দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবনাই তাহার আরও প্রবল হইল।

মাসের শেষে অখিলবাবু অপুর জন্য একটা ছেলে পড়ানো ঠিক করিয়া দিলেন, দুইবেলা একটা ছোট ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়াইতে হইবে.মাসে পনেরো টাকা।

অখিলবাবুর মেসে পরের বিছানায় শুইয়া থাকা তাহার পছন্দ হয় না। কিন্তু কলেজ হইতে ফিরিয়া পথে কয়েকটি মেসে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল. পনেরো টাকা মাত্র আয়ে কোনো মেসে থাকা চলে না। তাহার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিলিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত, নিজেরাই রাঁধিয়া খাইত. অপুকে তাহারা লইতে রাজী হইল।

যে তিনটি ছেলে একসঙ্গে ঘর ভাড়া করিয়া থাকে. তাহাদের সকলেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইহাদের মধ্যে সুরেশ্বরের আয় কিছু বেশী. এম-এ ক্লাসের ছাত্র, চল্লিশ টাকার টিউশনি আছে। জানকী যেন কোথায় ছেলে পড়াইয়া কুড়ি টাকা পায়। নির্মলের আয় আরও কম। সকলের আয় একত্র করিয়া যে মাসে যাহা অকুলান হয়. সুরেশ্বর নিজেই তাহা দিয়া দেয়. কাহাকেও বলে না। অপু প্রথমে তাহা জানিত না, মাস দুই থাকিবার পর তাহার সন্দেহ হইল প্রতিমাসে সুরেশ্বর পঁচিশ-ত্রিশটাকা দোকানের দেনা শোধ করে, অথচ কাহারও নিকট চায় না কেন ? সুরেশ্বরের কাছে একদিন কথাটা তুলিলে. সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বেশী এমন কিছু দেয় না, যদিই বা দেয়—তাতেই বা কি ? তাহাদের যখন আয় বাড়িবে তখন তাহারাও অনায়াসে দিতে পারিবে, কেহ বাধা দিবে না তখন।

নির্মল রবিঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ে খুব শক্তি, সুগঠিত মাংসপেশী, চওড়া বুক। অপুর মতই বয়স। হাতের ভিতর

একটা কাগজের ঠোঙা দেখাইয়া বলিল—নূতন মটরশুটি, লঙ্কা দিয়ে ভেজে—

অপু হাত হইতে ঠোঙাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখি? পরে হাসিমুখে বলিল—সুরেশ্বরদা, স্টোভ ধরিয়ে নিন—আমি মুড়ি আনি—ক'পয়সার আনবো? এক-দুই-তিন-চার—

—আমার দিকে আঙুল দিয়ে গুণো না ওরকম—

অপু হাসিয়া নির্মলের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—তোমার দিকেই আঙুল বেশী ক'রে দেখাবো—তিন-তিন-তিন—

নির্মল তাহাকে ধরিতে যাইবার পূর্বে সে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুরেশ্বর বলিল—একরাশ বই এনেছে কলেজের লাইব্রেরী থেকে—এতও পড়তে পারে—মায় মম্‌সেনের রোমের হিস্টি এক ভল্যুম—

অপুর গলা মিষ্টি বলিয়া সন্ধ্যার পর সবাই গান গাওয়ার জন্য ধরে। কিন্তু পুরাতন লাজুকপনা তাহার এখনও যায় নাই, অনেক সাধ্যসাধনার পর একটি বা দুটি গান গাহিয়া থাকে, আর কিছুতেই গাওয়ানো যায় না। কিন্তু রবিঠাকুরের কবিতার সে বড় ভক্ত, নির্মলের চেয়েও। যখন কেহ ঘরে থাকে না, নির্জনে হাত-পা নাড়িয়া আবৃত্তি করে—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত

মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে

একদা ছিলেন সুপ্ত।

ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে অপুর সবচেয়ে ভাল লাগে। সবদিন তাঁহার ক্লাস থাকে না—কলেজের পড়ায় কোন উৎসাহ থাকে না সেদিন। কালো রিবন-ঝোলানো পাঁশ-নে চশমা পরিয়া উজ্জ্বলচক্ষু মিঃ বসু ক্লাসরুমে ঢুকিলেই সে নড়িয়া চড়িয়া সংযত হইয়া বসে, বক্তৃতার প্রত্যেক কথা মন দিয়া শোনে। এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। অপুর ধারণায় মহাপণ্ডিত।—গিবন বা মম্‌সেন বা লর্ড ব্রাইস্‌ জাতীয়। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উত্থানপতনের কাহিনী তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ছবির মত পড়িয়া আছে।

ইতিহাসের পরে লজিকের ঘণ্টা। হাজিরা ডাকিয়া অধ্যাপক পড়ানো শুরু করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে কমিতে শুরু করিল। অপু এ ঘণ্টায় পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়া লাইব্রেরী হইতে লওয়া ইতিহাস, উপন্যাস বা কবিতার বই পড়ে, অধ্যাপকের কথার দিকে এতটুকু মন দেয় না, শুনিতে ভাল লাগে না। সেদিন একমনে অন্য

বই পড়িতেছে, হঠাৎ অধ্যাপক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটা সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু ক্লাস হঠাৎ নীরব হইয়া যাওয়াতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিল সকলেরই চোখ তাহার দিকে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অধ্যাপক বলিলেন—তোমার হাতে ওখানা লজিকের বই ?

অপু বলিল—না স্যর, প্যালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি—

—তোমাকে যদি আমার ঘণ্টায় পার্সেণ্টেজ না দিই ? পড়া শোনো না কেন ?

অপু চুপ করিয়া রহিল। অধ্যাপক তাহাকে বসিতে বলিয়া পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। জানকী চিম্‌টি কাটিয়া বলিল—হ'ল তো ? রোজ রোজ বলি লজিকের ঘণ্টায় আমাদের সঙ্গে পালাতে—তা শোনা হয় না—আয় চলে—

দেড়শত ছেলের ক্লাস। পিছনের বেঞ্চের সামনের দরজাটি ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া খুলিয়া রাখে পালাইবার সুবিধার জন্য। জানকী এদিক ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া সরিয়া পড়িল। তাহার পরে বিরাজ। অপুও মহাজনদের পথ ধরিল। নীচে আসিলে লাইব্রেরীয়ান বলিল—কি রায় মশায়, আমাদের পার্বণীটা কি পাব না ?

অপু খুব খুশী হয়। কে তাহাকে চিনিত পাঁচ মাস আগে ! এতবড় কলকাতা শহর, এতবড় কলেজ, এত ছেলে। এখানেও তাহাকে রায় মশায় বলিয়া খাতির করিতেছে, তাহার কাছে পার্বণী চাহিতেছে ! হাসিয়া বলে—কাল এনে দোব সত্যবাবু, আজ ভুলে গেছি—আপনি এক ভল্যুম গিবন্ দেবেন কিন্তু আজ—

উৎসাহে পড়িয়া গিবন্ বাড়ি লইয়া যায় বটে কিন্তু ভাল লাগে না। এত খুঁটিনাটি বিরক্তিকর মনে হয়। পরদিন সেখানা ফেরত দিয়া অন্য ইতিহাস লইয়া গেল।

পূজার কিছু পূর্বে অপুদের বাসা উঠিয়া গেল। খরচে আয়ে অনেকদিন হইতেই কুলাইতেছিল না, সুরেশ্বরের ভাল টিউশনিটি হঠাৎ হাতছাড়া হইল—কে বাড়তি খরচ চালায় ? নির্মল ও জানকী অন্য কোথায় চলিয়া গেল, সুরেশ্বর গিয়া মেসে উঠিল। অপুর যে মাসিক আয়, কলেজের মাহিনা দিয়া তাহা হইতে বারো টাকা বাঁচে—কলিকাতা শহরে বারো টাকায় যে কিছুতেই চলিতে পারে না, অপুর সে জ্ঞান এতদিনেও হয় নাই। সুতরাং সে ভাবিল বারো টাকাতেই চলিবে,

খুব চলিবে। বারো টাকা কি কম টাকা!

কিন্তু বারো টাকা আয়ও বেশী দিন রহিল না.একদিন পড়াইতে গিয়া শুনিল, ছেলের শরীর খারাপ বলিয়া ডাক্তার হাওয়া বদলাইতে বলিয়াছে, পড়াশুনা এখন বন্ধ থাকিবে। এক মাসের মাহিনা তাহারা বাড়তি দিয়া জবাব দিল।

টাকা কয়টি পকেটে করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া অপু আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ফুটপাথ বাহিয়া চলিল। সুরেশ্বরের মেসে সে জিনিসপত্র রাখিয়া দিয়াছে, সেইখানেই গেস্ট-চার্জ দিয়া খায়, রাত্রে মেসের বারান্দাতে শুইয়া থাকে। টাকা যাহা আছে, মেসের দেনা মিটাইতে যাইবে। সামান্য কিছু হাতে থাকিতে পারে বটে. কিন্তু তাহার পর?

সুরেশ্বরের মেসে আসিয়া নিজের নামের একখানি পত্র ডাকবাক্সে দেখিল। হাতের লেখাটা সে চেনে না—খুলিয়া দেখিল চিঠিখানা মায়ের. কিন্তু অপরের হাতে লেখা। হাতে ব্যথা হইয়া মা বড় কষ্ট পাইতেছেন, অপু কি তিনটি টাকা পাঠাইয়া দিতে পারে? মা কখনো কিছু চান না, মুখ বুজিয়া সকল দুঃখ সহ্য করেন. সে-ই বরং দেওয়ানপুরে থাকিতে নানা ছল-ছুতায় মাঝে মাঝে কত টাকা মায়ের কাছ হইতে লইয়াছে। হাতে না থাকিলেও তেলিবাড়ি হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া মা যোগাড় করিয়া দিতেন। খুব কষ্ট না হইলে কখনো মা তাহাকে টাকার জন্য লেখেন নাই।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিয়া দেখিল সাতাশটি টাকা আছে। মেসের দেনা সাড়ে পনেরো টাকা বাদে সাড়ে এগারো টাকা থাকে। মাকে কত টাকা পাঠানো যায়? মনে মনে ভাবিল—তিনটে টাকা তো চেয়েছেন, আমি দশ টাকা পাঠিয়ে দিই, মনিঅর্ডার পিওন যখন টাকা নিয়ে যাবে. মা ভাববেন, বুঝি তিন টাকা কিংবা হয়তো দুটাকার মনিঅর্ডার—জিজ্ঞেস করবেন, কত টাকা? পিওন যেই বলবে দশ টাকা, মা অবাক হয়ে যাবেন। মাকে তাক্ লাগিয়ে দেবো—ভারী মজা হবে, বাড়িতে গেলে মা শুধু সেই গল্পই করবেন দিনরাত—

অপ্রত্যাশিত টাকা প্রাপ্তিতে মায়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা কল্পনা করিয়া অপু ভারী খুশী হইল। বৌবাজার পোস্টাফিস হইতে টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া সে ভাবিল—বেশ হ'ল! আহা, মাকে কেউ কখনো দশ টাকার মনিঅর্ডার এক সঙ্গে পাঠায় নি—টাকা পেয়ে খুশী হবেন। আমার তো এখন রইল দেড় টাকা, তারপর একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবেই।

কলেজের একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। সেও গরীব ছাত্র,

ঢাকা জেলায় বাড়ি, নাম প্রণব মুখার্জি। খুব লম্বা, গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। কলেজ-লাইব্রেরীতে একসঙ্গে বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে দু'জনের আলাপ। এমন সব বই দু'জনে লইয়া যায়, যাহা সাধারণ ছাত্রেরা পড়ে না, নামও জানে না। ফার্স্ট-ইয়ারের ছেলেকে মমসেন লইতে দেখিয়া প্রণব তাহার দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

অপু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, প্রণবের পড়াশুনা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। অনেক গ্রন্থকারের নামও সে কখনও শোনে নাই—নীট্‌শে, এমার্সন, টুর্গেনিভ, ব্রেস্টেড্—প্রণবের কথায় সে ইহাদের বই পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই উৎসাহে সে পুনরায় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত গিবন্ শুরু করিল, ইলিয়াডের অনুবাদ পড়িল।

অপুর পড়াশুনার কোনও বাঁধাবাঁধি রীতি নাই। যখন যাহা ভাল লাগে, কখনও ইতিহাস, কখনও নাটক, কখনও কবিতা, কখনও প্রবন্ধ, কখনও বিজ্ঞান। প্রণব নিজে অত্যন্ত সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয়। সে বলিল—ওতে কিছু হবে না ওরকম পড় কেন?

অপু চেষ্টা করিয়াও পড়াশুনায় শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না। লাইব্রেরী-ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু বড় বড় বইয়ে ভরা আলমারির দৃশ্য তাহাকে দিশাহারা করিয়া দেয়। সকল বই-ই খুলিয়া দেখিতে সাধ যায়,—Gases of the Atmosphere—স্যার উইলিয়াম র‍্যামজের! সে পড়িয়া দেখিবে কি কি গ্যাস! Extinct Animals—ই. রে. ল্যানকাস্টার, জানিবার তার ভয়ানক আগ্রহ! Worlds Around Us—প্রক্টর! উঃ, বইখানা না পড়িলে রাত্রে ঘুম হইবে না। প্রণব হাসিয়া বলে—দূর! ও কি পড়া? তোমার তো পড়া নয়, পড়া পড়া খেলা—

এত বড় লাইব্রেরী, এত বই! নক্ষত্রজগৎ হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীর জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ আণুবীক্ষণিক প্রাণিকুল, ইতিহাস—সব সংক্রান্ত বই। তাহার অধীর উৎসুক মন চায় এই বিশ্বের সব কথা জানিতে। বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক—একবার বইগুলি খুলিয়া দেখিতেও সাধ যায়। লুপ্ত প্রাণিকুল সম্বন্ধে খানকতক ভাল বই পড়িল—অলিভার লজের Pioneers of Science—বড় বড় নীহারিকাদের ফটো দেখিয়া মুগ্ধ হইল। নীট্‌শে ভাল বুঝিতে না পারিলেও দু-তিনখানা বই পড়িল। টুর্গেনেভ একেবারে শেষ করিয়া ফেলিল, বারোখানা না ষোলখানা বই। চোখের সামনে টুর্গেনেভ এক নতুন জগৎ খুলিয়া

দিয়া গেল—কি অপূর্ব হাসি-অশ্রুমাখানো কল্পলোক !

প্রণবের কাছেই সে সন্ধান পাইল, শ্যামবাজারে এক বড়লোকের বাড়ি দরিদ্র ছাত্রদের খাইতে দেওয়া হয়। প্রণবের পরামর্শে সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল। এ পর্যন্ত কখনও কিছু সে চায় নাই, কাহারও কাছে চাহিতে পারে না; আত্মমর্যাদাবোধের জন্য নহে, লাজুকতা ও আনাড়ীপনার জন্য এতদিন সে-সবের দরকারও হয় নাই, কিন্তু আর যে চলে না !

খুব বড়লোকের বাড়ি ; দারোয়ান বলিল—কি চাই ?

অপু বলিল, এখানে গরীব ছেলেদের খেতে দেয়, তাই জানতে—কাকে বলবো জানো ?

দারোয়ান তাহাকে পাশের দিকে একটা ছোট ঘরে লইয়া গেল।

ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায় একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন—এখানে কি দরকার আপনার ?

অপু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—এখানে কি পুওর স্টুডেণ্টদের খেতে দেওয়া হয় ? তাই আমি—

—আপনি দরখাস্ত করেছিলেন ?

কিসের দরখাস্ত অপু জানে না।

—জুন মাসে দরখাস্ত করতে হয়, আমাদের নাম্বার লিমিটেড কিনা, এখন আর খালি নেই। আবার আসছে বছর—তাছাড়া, আমরা ভাবছি ওটা উঠিয়ে দেবো, এস্টেট রিসিভারের হাতে যাচ্ছে, ও-সব আর সুবিধে হবে না।

ফিরিবার সময় গেটের বাহিরে আসিয়া অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। কখনও সে কাহারও নিকট কিছু চায় নাই, চাহিয়া বিমুখ হইবার দুঃখ কখনও ভোগ করে নাই, চোখে তাহার প্রায় জল আসিল।

পকেটে মাত্র আনা দুই পয়সা অবশিষ্ট আছে—এই বিশাল কলিকাতা শহরে তাহাই শেষ অবলম্বন। কাহাকেই বা সে এখানে চেনে, কাহার কাছে যাইবে ? অখিলবাবুর মেসে দুই মাস সে প্রথম খাইয়াছে, সেখানে যাইতে লজ্জা করে। সুরেশ্বরের নিজেরই চলে না ; তাহার উপর সে কখনও জুলুম করিতে পারিবে না।

আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কোনদিন সুরেশ্বরের মেসে এক বেলা খাইয়া, কোনদিন বা জানকীর কাছে কাটাইয়া চলিতেছিল। একদিন সারাদিন না খাওয়ার পর সে নিরুপায় হইয়া অখিলবাবুর মেসে সন্ধ্যার পর গেল। অখিলবাবু

অনেকদিন পর তাহাকে পাইয়া খুশী হইলেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিলেন। বলি বলি করিয়াও অপু নিজের দুর্দশার কথা অখিলবাবুকে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে হয়তো তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না, সেখানে থাকিতে বাধ্য করিবেন। সে জুলুম করা হয় অনর্থক।

কিন্তু এদিকে আর চলে না! এক জায়গায় বই, এক জায়গায় বিছানা। কোথায় কখন রাত কাটাইবে কিছু ঠিক নাই—ইহাতে পড়াশুনা হয় না। পরীক্ষাও নিকটবর্তী। না খাইয়াই বা কয় দিন চলে!

অখিলবাবুর মেস হইতে ফিরিবার পথে একটা খুব বড় বাড়ি। ফটকের কাছে মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। এই বাড়ির লোকে যদি ইচ্ছা করে তবে এখনি তাহার কলিকাতায় থাকার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে। সাহস করিয়া যদি সে বলিতে পারে, তবে হয়তো এখনি হয়। একবার সে বলিয়া দেখিবে?

কোথাও কিছু সুবিধা না হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিতে হইবে। এই লাইব্রেরী, এত বই, বন্ধুবান্ধব, কলেজ—সব ফেলিয়া হয়তো মনসাপোতায় গিয়া আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। পড়াশুনা তাহার কাছে একটা রোমান্স, একটা অজানা বিচিত্র জগৎ দিনে দিনে চোখের সামনে খুলিয়া যাওয়া, ইহাকে সে চায়, ইহাই এতদিন চাহিয়া আসিয়াছে; কলেজ হইতে বাহির হইয়া চাকরি, অর্থোপার্জন—এসব কথা সে কোনদিন ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যে কোনদিন এসব সাংসারিক কথা ঢোকে নাই—সে চায় এই অজানার রোমান্স—এই বিচিত্র ভাবধারার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। প্রাচীন দিনের জগৎ, অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদল, বিশাল শূন্যের দৃশ্য, অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্ররাজি, ফরাসী বিদ্রোহ—নানা কথা। এই সব ছাড়িয়া শালগ্রাম হাতে মনসাপোতার বাড়ি-বাড়ি ঠাকুর পুজা···!

অপুর মনে হইল—এই রকমই বড় বাড়ি আছে লীলাদের, কলিকাতারই কোন জায়গায়। অনেকদিন আগে লীলা তাহাকে বলিয়াছিল, কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়িতে। সে ঠিকানা জানে না—কোথায় লীলাদের বাড়ি, কে-ই বা এখানে তাহাকে বলিয়া দিবে, তাহা ছাড়া সে-সব আজ ছয় সাত বছরের কথা হইয়া গেল, এতদিন কি-আর লীলা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে? কোন্ কালে ভুলিয়া গিয়াছে।

অপু ভাবিল—ঠিকানা জানলেই কি আর আমি সেখানে যেতে পারতাম, না, গিয়ে কিছু বলতে—সে আমার কাজ নয়—তার ওপর এই অবস্থায়! দূর, তা

কখনও হয়? তাছাড়া লীলার বিয়ে-থাওয়া হয়ে এতদিন সে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে। সে-সব কি আর আজকের কথা?

ক্লাসে জানকী একদিন একটা সুবিধার কথা বলিল। সে ঝামাপুকুরে কোন্ ঠাকুরবাড়িতে রাত্রে খায়। সকালে কোথায় ছেলে পড়াইয়া একবেলা তাহাদের সেখানে খায়। সম্প্রতি সে বোনের বিবাহে বাড়ি যাইতেছে, ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপু রাত্রে রাজবাড়িতে তাহার বদলে খাইতে পারে। বাড়ি যাইবার পূর্বে ঠাকুরবাড়ির সেবাইতকে বলিয়া কহিয়া সে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবে এখন। অপু রাজী আছে?

রাজী? হাতে স্বর্গ পাওয়া নিতান্ত গল্পকথা নয় তাহা হইলে!

ঠাকুরবাড়ির খাওয়া নিতান্ত মন্দ নয়, অপুর কাছে তাহা খুব ভাল লাগে। আলোচালের ভাত, টক, কোনও কোনও দিন ভোগের পায়সও পাওয়া যায়, তবে মাছ-মাংসের সম্পর্ক নাই, নিরামিষ।

কিন্তু এ তো আর দু'বেলা নয়; শুধু রাত্রে। দিনমানটাতে বড় কষ্ট হয়। দুই পয়সার মুড়ি ও কলের জল। তবুও তো পেটটা ভরে! কলেজ হইতে বাহির হইয়া বৈকালে তাহার এত ক্ষুধা পায় যে গা ঝিম্ ঝিম্ করে, পেটে যেন এক ঝাঁক বোলতা হুল ফুটাইতেছে—পয়সা জুটাইতে পারিলে অপু এ সময়টা পথের ধারের দোকান হইতে এক পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া খায়।

সব দিন পয়সা থাকে না, সেদিন সন্ধ্যার পরেই ঠাকুরবাড়ি চলিয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরের আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে খাইতে দিবার নিয়ম নাই—তাও একবার নয়, দুইবার দুটি ঠাকুরের আরতি। আরতির কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, সেবাইত ঠাকুরের মর্জি ও সুবিধামত রাত আটটাতেও হয়, ন'টাতেও হয়, দশটাতেও হয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যার পরেই হয়।

কলেজে যাইতে সেদিন মুরারি বলিল—সি. সি. বি.-র ক্লাসে কেউ যেও না—আমরা সব স্ট্রাইক করেছি।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, কেন, কি করেছে, সি. সি. বি.?

মুরারি হাসিয়া বলিল,—করে নি কিছু, পড়া জিজ্ঞেস করবে বলেছে রোমের হিস্ট্রির। একপাতাও পড়ি নি, না পারলে বকুনি দেবে কি রকম জানো তো?

গজেন বলিল—আমার তো আরও মুশকিল। রোমের হিস্ট্রির বই-ই যে আমি কিনি নি!

মন্মথ আগে সেন্ট্ জেভিয়ারে পড়িত, সে বিলাতী নাচের ভঙ্গিতে হাত লম্বা

করিয়া বার কয়েক পাক খাইয়া একটা ইংরাজি গানের চরণ বার দুই গাহিল। অপু বলিল—কিন্তু পার্সেণ্টেজ যাবে যে ?

প্রতুল বলিল—ভারী একদিনের পার্সেণ্টেজ ! তা আমি ক্লাসে নাম প্রেজেণ্ট ক'রেও পালিয়ে আসতে পারি—সে তো আর তুমি পারবে না ?

অপু বলিল—খুব পারি। পারবো না কেন ?

প্রতুল বলিল—সে তোমার কাজ নয়, সি. সি. বি-র চোখ ভারী ইয়ে—আমরা বলে তাই এক একদিন সরষেফুল দেখি, তা তুমি ! পারো পালিয়ে আসতে ?

—এখখুনি। দ্যাখো সবাই দাঁড়িয়ে—পারি কি না পারি, কিন্তু যদি পারি খাওয়াতে হবে ব'লে দিলাম—

অপু উৎসাহে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া গেল। গজেন বলিল—কেন ওকে আবার ওসব শেখাচ্ছিস্ ?

—শেখাচ্ছি মানে ? ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না—ভারী সাধু !

মুরারি বলিল—না, না, তোমরা জানো না, অপূর্ব ভারী Pure spirit ! সেদিন—

—হঁ্যা হঁ্যা, জানি, ও-রকম সুন্দর চেহারা থাকলে আমাদেরও কত সার্টিফিকেট আসতো—বাবা, বঙ্কিমবাবু কি আর সাধে সুন্দর মুখের গুণ গেয়ে গেছেন ?

—কি বাজে বক্‌ছিস প্রতুল ? দিন দিন ভারী ইতর হয়ে উঠ্‌ছিস্ কিন্তু—

প্রিন্সিপ্যালের গাড়ি কলেজের সামনে আসিয়া লাগাতে যে যেদিকে সুবিধা পাইল সরিয়া পড়িল।

মিঃ বসুর ক্লাসে নামটা প্রেজেণ্ট করিয়াই আজ অপু পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। বাঁ দিকের দরজাটা একদম খোলা, প্রোফেসারের চোখ অন্যদিকে। সুযোগ খুঁজিতে খুঁজিতে প্রোফেসারের চোখ আবার তাহার দিকে পড়িল, কাজেই খানিকক্ষণ ভালমানুষের মত নিরীহ-মুখে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল। এইবার একবার অন্যদিকে চোখ পড়িলেই হয় ! হঠাৎ প্রোফেসার তাহাকেই প্রশ্ন করিলেন, —Was Merius justified in his action ?

সর্বনাশ ! মেরিয়াস কে ! একদিনও সে যে রোমের ইতিহাসের লেক্‌চার শোনে নাই !

উত্তর না পাইয়া প্রোফেসার অন্য একটা প্রশ্ন করিলেন—What do you think of Sulla's—

অপু বিপন্নমুখে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাস্কেল্ মণিলালটা মুখে কাপড় গুঁজিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে!

প্রোফেসার বিরক্ত হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

—You, You there—you behind the pillar—

এবার মণিলালের পালা। সে থামের আড়ালে সরিয়া বসিবার বৃথা চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল সুল্লা বা মেরিয়াসের সম্বন্ধে অপুর সহিত তাহার মতের কোন পার্থক্য নাই, সমানই নির্বিকার। মণিলালের দুর্গতিতে অপু খুব খুশী হইয়া পাশের ছেলেকে আঙুলের খোঁচা দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—Rightly served! ভারী হাসি হচ্ছিল—

—চুপ চুপ—এখুনি আবার এদিকে চাইবে সি সি. বি. কথা শুনলে—

—এবার আমি সোজা—

পিছন হইতে নৃপেন ব্যস্তস্বরে বলিল—এইবার আমায় জিজ্ঞেস্ করবে—ডেটটা ভাই দে না শীগ্গির ব'লে—শীগ্গির—

অপুর পাশের ছেলেটি বলিল—কে কাকে ডেট বলে দাদা—মেরিভেল প্লারের বইয়ের রং কেমন এখনও চাক্ষুষ দেখি নি—কেটে পড়ো না সোজা—

অপু খানিকক্ষণ হইতেই প্রোফেসারের দৃষ্টির গতি একমনে লক্ষ্য করিতেছিল, সে বুঝিতে পারিল ও-কোণ হইতে একবার এদিকে ফিরিলে পালানো অসম্ভব হইবে, কারণ এদিকে এখনও অনেক ছেলেকে প্রশ্ন করিতে বাকী। এই সুবর্ণ-সুযোগ। বিলম্ব করিলে…।

দু'একবার উসখুস করিয়া, একবার এদিক ওদিক চাহিয়া অপু সাঁ করিয়া খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পিছু পিছু হরিদাস—অল্প পরেই নৃপেন।…

তিনজনেই উপরের বারান্দাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে একতলায় নামিয়া আসিল।

অপু পিছন ফিরিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—হি-হি-হি—উঃ—আর একটু হলেই—

নৃপেন বলিল—আমাকে তো—মিনিট-দুই দেরি—কাল হয়েছে কি বুঝলে?—

অপু বলিল—যাক, এখানে আর দাঁড়িয়ে খোশগল্প করার কোনও দরকার দেখছি নে। এখুনি প্রিন্সিপ্যাল নেমে আসবেন, গাড়ি লাগিয়েছে দরজায়—

কমনরুমে বরং এস—

একটু পরে সকলে বাহির হইয়া পড়িল। আজ আর ক্লাস ছিল না। কে গ্রাহ্য করে বুড়ো সি. সি. বি. ও তাঁহার রোমের ইতিহাসের যত বাজে প্রশ্ন?

অপু কিন্তু কিছু নিরাশ হইল। ক্লাস হইতে পালাইতে পারিলে প্রতুলের দল খাওয়াইবে বলিয়াছিল। কিন্তু লাইব্রেরীয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহারা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে।—কোন্ সকালে দুই পয়সার মুড়ি ও একটা ফুলুরি খাইয়া বাহির হইয়াছে—পেট যেন দাউ দাউ জ্বলিতেছিল, কিছু খাইতে পারিলে হইত! ক্লাসে এতক্ষণ বেশ ছিল, বুঝিতে পারে নাই, বাহিরে আসিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে পকেটে একটাও পয়সা নাই। সে ভাবিল—ওরা আচ্ছা তো? বললে খাওয়াবো, তাই তো আমি পালাতে গেলাম নিজেরা এদিক সরে পড়েছে কোন্ কালে!··· —এখন কিছু খেলে তবুও রাত অবধি থাকা যেতো—আজ সোমবার,আটটার মধ্যেই আরতি হয়ে যাবে—উঃ ক্ষিদে যা পেয়েছে!—

অপরাজিত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এ ধরণের কষ্ট করিতে অপু কখনও অভ্যস্ত নয়। বাড়ির এক ছেলে, চিরকাল বাপ-মায়ের আদরে কাটাইয়াছে। শহরে বড়লোকের বাড়িতে অন্য কষ্ট থাকিলেও খাওয়ার কষ্টটা অন্ততঃ ছিল না। তাছাড়া সেখানে মাথার উপর ছিল মা, সকল আপদবিপদে সর্বজয়া ডানা মেলিয়া ছেলেকে আড়াল করিয়া রাখিতে প্রাণপণ করিত, কোনও কিছু আঁচ লাগিতে দিত না। দেওয়ানপুরে স্কলারশিপের টাকায় বালক-বুদ্ধিতে যথেষ্ট শৌখিনতা করিয়াছে—খাইয়াছে, খাওয়াইয়াছে, ভাল ভাল জামা কাপড় পরিয়াছে,—তখন সেসব জিনিস সস্তাও ছিল।

কিন্তু শীঘ্রই অপু বুঝিল—কলিকাতা দেওয়ানপুর নয়। এখানে কেহ কাহাকেও পোঁছে না। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া গত কয়েক মাসের মধ্যে কাপড়ের দাম এত চড়িয়াছে যে, কাপড় আর কেনা যায় না। ভাল কাপড় তাহার মোটে আছে একখানা, একটি টুইল শার্ট সম্বল। ছেলেবেলা হইতেই ময়লা কাপড় পরিতে সে ভালবাসে না, দু-তিনদিন অন্তর সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া শুকাইলে,

তাহাই পরিয়া বাহির হইতে পারে। সবদিন কাপড় ঠিক সময়ে শুকায় না, কাপড় কাচিবার পরিশ্রমে এক-একদিন আবার ক্ষুধা এত বেশী পায় যে, মাত্র দু'পয়সার খাবারে কিছুই হয় না—ক্লাসে লেকচার শুনিতে বসিয়া মাথা যেন হঠাৎ শোলার মত হালকা বোধ হয়।

এদিকে থাকার কষ্টও খুব। সুরেশ্বর এম-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহার মেসে আর থাকিবার সুবিধা নাই। যাইবার আগে সুরেশ্বর একটা ঔষধের কারখানার উপরে একটা ছোট ঘরে তাহার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিয়া গিয়াছে। ঐ কারখানায় সুরেশ্বরের জানাশোনা একজন লোক কাজ করে ও রাত্রে ওপরের ঘরটাতে থাকে। ঠিক হইয়াছে, যতদিন কিছু একটা সুবিধা না হইতেছে, ততদিন অপু ওই ঘরটাতে লোকটার সঙ্গে থাকিবে। ঘরটা একে ছোট, তাহার উপর অর্ধেকটা ভর্তি ঔষধ-বোঝাই প্যাকবাক্সে। রাশিকৃত জঞ্জাল বাক্সগুলির পিছনে জমানো, কেমন একটা গন্ধ! নেংটি ইঁদুরের উৎপাতে কাপড়-চোপড় রাখিবার জো নাই, অপুর একমাত্র টুইল শার্টটার দু' জায়গায় কাটিয়া ফুটা করিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘরময় আরসোলার উৎপাত। ঘরের সে লোকটা যেমন নোংরা তেমনই তামাকপ্রিয়, রাত্রে উঠিয়া অন্ততঃ তিনবার তামাক সাজিয়া খায়। তাহার কাশির শব্দে ঘুম হওয়া দায়। ঘরের কোণে তামাকের গুল রাশিকৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। অপু নিজে বার দুই পরিষ্কার করিয়াছিল। এক টুকরা রবারের ফিতার মতই ঘরের নোংরামিটা স্থিতিস্থাপক—পূর্বাবস্থায় ফিরিতে এতটুকু দেরি হয় না। খাওয়া-পরা-থাকিবার কষ্ট অপু কখনও করে নাই, বিশেষ করিয়া একলা যুঝিতে হইতেছে বলিয়া কষ্ট আরও বেশী।

অন্যমনস্কভাবে যাইতে যাইতে সে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির মোড়ে আসিল। যুদ্ধের নূতন খবর বাহির হইয়াছে বলিয়া কাগজওয়ালা হাঁকিতেছে। শেয়ালদার একটা ট্রাম হইতে লোকজন নামা-উঠা করিতেছে। একটি চোখে-চশমা তরুণ যুবকের দিকে একবার চাহিয়াই মনে হইল—চেনা-চেনা মুখ! একটু পরে সেও অপুর দিকে চাহিতে দুইজনে চোখাচোখি হইল। এবার অপু চিনিয়াছে—সুরেশদা! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির পাশের সেই পোড়ো ভিটার মালিক নীলমণি জ্যাঠামশায়ের ছেলে সুরেশ!

সুরেশও চিনিয়াছিল। অপু তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া হাসিমুখে বলিল, সুরেশদা যে!

যেবার দুর্গা মারা যায়, সে বৎসর শীতকালে ইহারা যা কয়েক মাসের জন্য

দেশে গিয়াছিল, তাহার পর আর কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। সুরেশ আকৃতিতে যুবক হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ দেহ, সুগঠিত হাত পা। বাল্যের সে চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

সুরেশ সহজ-সুরেই বলিল—আরে অপূর্ব? এখানে কোথা থেকে?

সুরেশের খাঁটি শহুরে গলার সুরে ও উচ্চারণ-ভঙ্গিতে অপু একটু ভয় খাইয়া গেল।

সুরেশ বলিল—তারপর এখানে কি চাকরি-টাকরি করা হচ্ছে?

—না—আমি যে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে রিপনে—

—তাই নাকি? তা এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

অপু সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, জ্যেঠিমা কোথায়?

—এখানেই, শ্যামবাজারে। আমাদের বাড়ি কেনা হয়েছে সেখানে—

সুরেশের সহিত সাক্ষাতে অপু ভারী খুশী হইয়াছিল। তাহাদের বাড়ির পাশের যে পোড়ো ভিটার বনঝোপের সহিত তাহার ও দিদি দুর্গার আবাল্য অতিমধুর পরিচয়, সেই ভিটারই লোক ইহারা। যদিও কখনও সেখানে ইহারা বাস করে নাই, শহরে শহরেই ঘোরে, তবুও তো সে ভিটারই লোক, তাহা ছাড়া দশ রাত্রির জ্ঞাতি, অতি আপনার জন।

অপু বলিল—অতসীদি এখানে আছে? সুনীল? সুনীল কি পড়ে?

—এবার সেকেন ক্লাসে উঠেছে—আচ্ছা, যাই তা'হলে, আমার ট্রাম আসছে—

সুরেশের সুরে কোনও আগ্রহ বা আন্তরিকতা ছিল না, সে এমন সহজ সুরে কথা বলিতেছিল, যেন অপুর সঙ্গে তাহার দুইবেলা দেখা হয়। অপু কিন্তু নিজের আগ্রহ লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে, সুরেশের কথাবার্তার সে-দিকটা তাহার কাছে ধরা পড়িল না।

—আপনি কি করেন সুরেশদা?

—মেডিকেল কলেজে পড়ি, এবার থার্ড ইয়ার—

—আপনাদের ওখানে একদিন যাব সুরেশদা—জ্যেঠিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবো—

সুরেশ ট্রামের পা-দানিতে পা দিয়া উঠিতে উঠিতে অনাসক্ত সুরে বলিল, বেশ বেশ, আমি আসি এখন—

এতদিন পর সুরেশদার সহিত দেখা হওয়াতে অপুর মনে এমন বিস্ময় ও

আনন্দ হইয়াছিল যে, ট্রামটা ছাড়িয়া দিলে তাহার মনে পড়িল—সুরেশদার বাড়ির ঠিকানাটা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নাই !

সে চলন্ত ট্রামের পাশে ছুটিতে ছুটিতে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা—ও সুরেশদা, ঠিকানাটা যে—

সুরেশ মুখ বাড়াইয়া বলিল—চব্বিশ-এর দুই সি, বিশ্বকোষ লেন, শ্যামবাজার—

পরের রবিবার সকালে স্নান করিয়া অপু শ্যামবাজারে সুরেশদার ওখানে যাইবার জন্য বাহির হইল। আগের দিন টুইল শার্টটা ও কাপড়খানা সাবান দিয়া কাচিয়া শুকাইয়া লইয়াছিল, জুতার শোচনীয় দুরবস্থা ঢাকিবার জন্য একটি পরিচিত মেসে এক সহপাঠীর নিকট হইতে জুতার কালি চাহিয়া নিজে বুরুশ করিয়া লইল। সেখানে অতসীদি ইত্যাদি রহিয়াছেন, দীনহীন বেশে কি যাওয়া চলে ?

ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে দেরি হইল না। ছোটখাটো দোতলা বাড়ি, আধুনিক ধরণের তৈয়ারী। ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে, বাহিরের বৈঠকখানা, দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। সুরেশ বাড়ি ছিল না, ঝিয়ের কাছে সে পরিচয় দিতে পারিল না, বৈঠকখানায় তাহাকে বসাইয়া ঝি চলিয়া গেল। ঘড়ি, ক্যালেণ্ডার, একটা পুরোনো রোল-টপ্ ডেস্ক, খানকতক চেয়ার। ভারী সুন্দর বাড়ি তো ! এঃ আপনার জনের কলিকাতায় এরকম বাড়ি আছে, ইহাতে অপু মনে মনে একটু গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিল। টেবিলে একখানা সেদিনের অমৃতবাজার পড়িয়া ছিল, উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া যুদ্ধের খবর পড়িতে লাগিল।

অনেক বেলায় সুরেশ আসিল।

তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে অপূর্ব, কখন এলে ?

অপু হাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আসুন সুরেশদা—আমি, আমি অনেকক্ষণ ধরে—বেশ বাড়িটা তো আপনাদের—

—এটা আমার বড়মামা—যিনি পাটনার উকিল, তিনি কিনেছেন ; তাঁরা তো কেউ থাকেন না, আমরাই থাকি। বসো, আমি আসি বাড়ির মধ্যে থেকে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এবার সুরেশদা বাড়ির ভেতর গিয়ে বললেই জ্যেঠিমা ডেকে পাঠাবে, এখানে খেতে বলবে—

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুরেশ বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইল না। সে যখন পুনরায় আসিল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া

বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্ত সুরে বলিল, তারপর?···বলিয়াই খবরের কাগজখানা হাতে তুলিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। অপু দেখিল সুরেশ পান চিবাইতেছে। খাওয়ার আগে এত বেলায় পান খাওয়া অভ্যাস, না-কি খাওয়া হইয়া গেল!

দুই চারিটা প্রশ্নের জবাব দিতে ও খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে একটা বাজিল। সুরেশের চোখ ঘুমে বুজিয়া আসিতেছিল; সে হঠাৎ কাগজখানা টেবিলে রাখিয়া দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি না হয় বসে কাগজ পড়ো, আমি একটুখানি শুয়ে নি। একটা ডাব খাবে?—

ডাব খাইবে কি রকম, এত বেলায়, এ অবস্থায়? অপু ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ডাব? না থাক, এত বেলায়—ইয়ে - না।

সেই যে সুরেশ বাড়ি ঢুকিল—একটা - দুইটা আড়াইটা, আর দেখা নাই। ইহারা কত বেলায় খায়! রবিবার বলিয়া বুঝি এত দেরি? কিন্তু যখন তিনটা বাজিয়া গেল, তখন অপুর মনে হইল, কোথাও কিছু ভুল হইয়াছে নিশ্চয়। হয় সে-ই ভুল বুঝিয়াছে, না হয় উহারা ভুল করিয়াছে। তাহার এত ক্ষুধা পাইয়াছিল যে, সে আর বসিতে পারিতেছে না। উঠিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় সুরেশের ছোট ভাই সুনীল বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। অপু ডাকিবার পূর্বেই সে সাইকেল লইয়া বাড়ির বাহিরে কোথায় চলিয়া গেল।

সেই সুনীল—যাহাকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে ছাঁদা বাঁধিবার দরুন জ্যেঠিমা তাহাকে ফলারে-বামুনের ছেলে বলিয়াছিলেন! ইঁহাদের যে এতদিন পর আবার দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা যেন অপু ভাবে নাই। সুনীলকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হইল। এ যেন কেমন একটা ঠিক বুঝানো যায় না—

ইহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার মূলে অপুর কোন স্বার্থসিদ্ধি বা সুযোগ-সন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল না, বা ইহা যে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার মত দেখাইতেছে—একবারও সে-কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই। এখানে তাহার আসিবার মূলে সেই বিস্ময়ের ভাব—যাহা তাহার জন্মগত। কে আবার জানিত, খাস কলিকাতা শহরে এতদিন পরে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির পাশের পোড়ো ভিটাটার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। এই ঘটনাটুকু তাহাকে মুগ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এ যেন জীবনের কোন্ অপরিচিত বাঁকে পত্রপুষ্পে সজ্জিত অজানা কোন কুঞ্জবন—বাঁকের মোড়ে ইহাদের অস্তিত্ব যেন সম্পূর্ণ

অপ্রত্যাশিত।

বিস্ময় মনের অতি উচ্চ ভাব এবং উচ্চ বলিয়াই সহজলভ্য নয়। সত্যকার বিস্ময়ের স্থান অনেক উপরে—বুদ্ধি যার খুব প্রশস্ত ও উদার, মন সব সময় সতর্ক—নূতন ছবি নূতন ভাব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখে—সে-ই প্রকৃত বিস্ময়-রসকে ভোগ করিতে পারে। যাদের মনের যন্ত্র অলস, মিনমিনে—পরিপূর্ণ, উদার বিস্ময়ের মত উচ্চ মনোভাব তাদের অপরিচিত থাকিয়া যায়।

বিস্ময়কে যাঁহারা বলিয়াছেন Mother of Philosophy তাঁহারা একটু কম বলেন। বিস্ময়ই আসল Philosophy, বাকীটা তাহার অর্থসঙ্গতি মাত্র।

তিনটার পর সুরেশ বাহির হইয়া আসিল। সে হাই তুলিয়া বলিল—কাল রাত্রে ছিল নাইট-ডিউটি, চোখ মোটে বোজে নি—তাই একটু গড়িয়ে নিলাম—চল, মাঠে ক্যালকাটা টিমের হকি খেলা আছে—একটু দেখে আসা যাক্—

অপু মনে মনে সুরেশদাকে ঘুমের জন্য অপরাধী ঠাওর করিবার জন্য লজ্জিত হইল। সারারাত কাল বেচারী ঘুমায় নাই—তাহার ঘুম আসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই তো!...

সে বলিল—আমি মাঠে যাবো না সুরেশদা, কাল এগজামিন আছে, পড়া তৈরী হয় নি মোটে—আমি যাই—ইয়ে—জ্যেঠিমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেলে হতো—

সুরেশ বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ—বেশ তো—এসো না—

অপু সুরেশের সঙ্গে সঙ্কুচিত ভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। সুরেশের মা ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন—সুরেশ গিয়া বলিল—এ সেই অপূর্ব মা—নিশ্চিন্তিপুরের হরিকাকার ছেলে—তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

অপূর্ব পায়ের ধূলো লইয়া প্রণাম করিল—সুরেশের কথার ভাবে তাহার মনে হইল, সে যে এতক্ষণ আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে সে কথা সুরেশদা বাড়ির মধ্যে আদৌ বলে নাই।

জ্যেঠিমার মাথার চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে বলিয়া অপুর মনে হইল। অপুর প্রণামের উত্তরে তিনি বলিলেন, এস—এস—থাক্, থাক্—কলকাতায় কি করো?

অপু ইতিপূর্বে কখনো জ্যেঠিমার সম্মুখে কথা বলিতে পারিত না। গম্ভীর ও গর্বিত (যেটুকু সে ধরিতে পারিত না) চালচলনের জন্য জ্যেঠিমাকে সে ভয় করিত। আনাড়ী ও অগোছালো সুরে বলিল, এই এখানে পড়ি, কলেজে পড়ি

জ্যেঠিমা যেন একটু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, কলেজে পড় ? ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছ ?

—আর বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছি—

—তোমার বাবা কোথায় ?—তোমরা তো সেই কাশী চলে গিয়েছিলে, না ?

—বাবা তো নেই—তিনি তো কাশীতেই···

তারপর অপু সংক্ষেপে বলিল সব কথা। এই সময়ে পাশের ঘর হইতে একটি বাইশ-তেইশ বছরের তরুণী এ ঘরে ঢুকিতেই অপু বলিয়া উঠিল, অতসীদি না ?···

অতসী অনেক বড় হইয়াছে, তাহাকে চেনা যায় না। সে অপুকে চিনিতে পারিল, বলিল, অপূর্ব কখন এলে ?

আর একটি মেয়ে ও-ঘর হইতে আসিয়া দোরের কাছে দাঁড়াইল। পনেরো ষোল বৎসর বয়স হইবে বেশ সুশ্রী, বড় বড় চোখ। কথা বলিতে বলিতে সেদিকে চোখ পড়াতে অপু দেখিল, মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। খানিকটা পরে অতসী বলিল—মণি, দেখে এসো তো দিদি, কুর্শকাটাগুলো ও-ঘরের বিছানায় ফেলে এসেছি কি না ?

মেয়েটি চলিয়া গেল এবং একটু পরেই আবার দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—না বড়দি দেখলাম না তো ?

জ্যেঠিমা অল্প দুই চারিটা কথার পরই কোথায় উঠিয়া গেলেন। অতসী অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। তারপর সেও চলিয়া গেল। অপু ভাবিতেছিল, এবার সে উঠিবে কিনা। কেহই ঘরে নাই, এ সময় ওঠাটা কি উচিত হইবে ?···ক্ষুধা একবার উঠিয়া পড়িয়া গিয়াছে এখন ক্ষুধা আর নাই, তবে গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। যাওয়ার কথা কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়া যাইবে ?···

দোরের কাছে গিয়া সে দেখিল সেই মেয়েটি বারান্দা দিয়া ও-ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছে—আর কেহ কোথাও নাই, তাহাকেই না বলিলে চলে না। উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল—এই গিয়ে—আমি যাচ্ছি, আমার আবার কাজ—

মেয়েটি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—চলে যাবেন ? দাঁড়ান, পিসিমাকে ডাকি—চা খেয়েছেন ?

অপু বলিল চা তা—থাক্, বরং অন্য একদিন—

মেয়েটি বলিল—বসুন, বসুন—দাঁড়ান চা আনি—পিসিমাকে ডাকি দাঁড়ান।

—কিন্তু খানিকটা পরে মেয়েটিই এক পেয়ালা চা ও একটা প্লেটে কিছু হালুয়া আনিয়া তাহার সামনে বসিল। অপু ক্ষুধার মুখে হালুয়াটুকু গো-গ্রাসে গিলিল। গরম চা খাইতে গিয়া প্রথম চুমুকে মুখ পুড়াইয়া ফেলিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া খাইতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল—আপনি বুঝি ওদের খুড়তুতো ভাই? থাক্ প্লেটটা এখানেই—আর একটু হালুয়া আনব?

—হালুয়া? নাঃ—ইয়ে তেমন খিদে নেই—হ্যাঁ, সুরেশদার বাবা আমার জ্যাঠামশাই হতেন, জ্ঞাতি সম্পর্ক—

এই সময় অতসী ঘরে ঢোকাতে মেয়েটি চায়ের বাটি ও প্লেট লইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়িতে খাইয়া অনেক রাত্রে সে নিজের থাকিবার স্থানে ফিরিয়া দেখিল আজও একজন লোক সেখানে রাতের জন্য আশ্রয় লইয়াছে। মাঝে মাঝে এরূপ আসে, কারখানার লোকের দু-একজন আত্মীয়-স্বজন মাঝে মাঝে আসে ও দু-চার দিন থাকিয়া যায়। একে ছোট ঘর, থাকিবার কষ্ট, তাহাতে লোক বাড়িলে এইটুকু ঘরের মধ্যে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। পরনের কাপড় এমন ময়লা যে, ঘরের বাতাসে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। অপু সব সহ্য করিতে পারে, এক ঘরে এ-ধরনের নোংরা স্বভাবের লোকের ভিড়ের মধ্যে শুইতে পারে না, জীবনে সে তা কখনো করে নাই—ইহা তাহার অসহ্য। কোথায় রাত্রে আসিয়া নির্জনে একটু পড়াশুনা করিবে—না, ইহাদের বক্‌বকের চোটে সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নতুন লোকটি বড়বাজারের আলু-পোস্তায় আলুর চালান লইয়া আসে—হুগলী জেলার কোন জায়গা হইতে, অপু জানে, আরও একবার আসিয়াছিল। লোকটি বলিল, কোথায় যান, ও মশায়? খাবার বেরোন না-কি?

অপু বলিল, এইখানটাতে দাঁড়িয়ে—বেজায় গরম আজ···

একটু পরে লোকটা বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিছানাটা কি মহাশয়ের? আসুন, আসুন, সরিয়ে ন্যান্ একটু—এঃ—হুকোর জলটা গেল গড়িয়ে পড়ে—দুত্তোর—না—

অপু বিছানা সরাইয়া পুনরায় বাহিরে আসিল। সে কি বলিবে? এখানে তাহার কি জোর খাটে? উহারাই উপরোধে পড়িয়া দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছে

এখানে। মুখে কিছু না বলিলেও অপু অন্যদিন হয়তো মনে মনে বিরক্ত হইত, কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিল। বাহিরের বারান্দায় জীর্ণ কাঠের রেলিং ধরিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল—সুরেশদাদের কেমন চমৎকার বাড়ি কলিকাতায়! ইলেকট্রিক পাখা, আলো, ঘরগুলি কেমন সাজানো, মেয়েটির কেমন সুন্দর কাপড় পরনে। চারিটা না বাজিতে চা, জলখাবার, চারিদিকে যেন লক্ষ্মীশ্রী, কিছুরই অভাব নাই।

তাহাদেরই যে কি হইয়াছে, কোথায় মা আছে একটেরে পড়িয়া, কলিকাতা শহরে এই রকম ছন্নছাড়া অবস্থায় সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পেট পুরিয়া আহার জোটে না, পরনে নাই কাপড়!···

দিন তিনেক পরে জগদ্ধাত্রী পূজা। কলিকাতায় এত উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজায়, তা সে জানিত না। দেশে কখনও এ পূজা কোথাও হইত না—কোথাও দেখে নাই। গলিতে গলিতে, সর্বত্র উৎসবের নহবৎ বাজিতেছে, কত দুয়ারের পাশে কলাগাছ বসানো, দেবদারুর পাতার মালা টাঙানো।

কাঠের কারখানার পাশের গলিটার মধ্যে একজন বড়লোকের বাড়িতে পূজা। সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সারি বাঁধিয়া বাড়িটার মধ্যে ঢুকিতেছে—অপু ভাবিল, সেও যদি যায়!···কতকাল নিমন্ত্রণ খায় নাই! কে তাহাকে চিনিবে?··· খুব লোভও হইল, ভয়ও হইল।

শীতকালের দিকে একদিন কলেজ ইউনিয়নে প্রণব একটা প্রবন্ধ পাঠ করিল। ইংরেজীতে লেখা, বিষয়—'আমাদের সামাজিক সমস্যা'; বাছিয়া বাছিয়া শক্ত ইংরেজীতে সে নানা সমস্যার উল্লেখ করিয়াছে; বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। সে প্রত্যেক সমস্যাটি নিজের দিক হইতে দেখিতে চাহিয়াছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সনাতন প্রথার স্বপক্ষেই মত দিয়াছে। প্রণবের উচ্চারণ ও বলিবার ভঙ্গি খুব ভাল, যুক্তির ওজন অনুসারে সে কখনও ডান হাতে ঘুষি পাকাইয়া, কখনও মুঠাদ্বারা বাতাস আঁকড়াইয়া, কখনও বা সম্মুখের টেবিলে

সশব্দে চাপড় মারিয়া বাল্য বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও স্ত্রীশিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করিয়া দিল। প্রণবের বন্ধুদলের ঘন ঘন করতালিতে প্রতিপক্ষের কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল।

অপর পক্ষে উঠিল মন্মথ—সেই যে-ছেলেটি পূর্বে সেণ্ট জেভিয়ারে পড়িত। লাটিন জানে বলিয়া ক্লাসে সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে, তাহার সামনে কেহ ভয়ে ইংরেজী বলে না, পাছে ইংরেজীর ভুল হইলে তাহার বিদ্রূপ শুনিতে হয়। সাহেবদের চাল-চলন, ডিনারের এটিকেট, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ক্লাসের মধ্যে সে অথরিটি—তাহার উপর কারুর কথা খাটে না। ক্লাসের এক হতভাগ্য ছাত্র সাহেবপাড়ার কোন রেস্তোরাঁতে তাহার সহিত খাইতে গিয়া ডান হাতে কাঁটা ধরিবার অপরাধে এক সপ্তাহকাল ক্লাসে সকলের সামনে মন্মথর টিট্‌কারি সহ্য করে। মন্মথর ইংরেজী আরও চোখা, কম আড়ষ্ট, উচ্চারণও সাহেবী ধরনের। কিন্তু একেই তাহার উপর ক্লাসের অনেকের রাগ আছে, এদিকে আবার সে বিদেশী বুলি আওড়াইয়া সনাতন হিন্দুধর্মের চিরাচরিত প্রথার নিন্দাবাদ করিতেছে; ইহাতে একদল ছেলে খুব চটিয়া উঠিল—চারিদিক হইতে 'shame shame,—withdraw, withdraw,' রব উঠিল—তাহার নিজের বন্ধুদল প্রশংসাসূচক হাত-তালি দিতে লাগিল—ফলে এত গোলমালের সৃষ্টি হইয়া পড়িল যে, মন্মথ বক্তৃতার শেষের দিকে কি বলিল সভার কেহই তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

প্রণবের দলই ভারী। তাহারা প্রণবকে আকাশে তুলিল, মন্মথকে স্বধর্মবিরোধী নাস্তিক বলিয়া গালি দিল, সে যে হিন্দুশাস্ত্র একছত্রও না পড়িয়া কোন্ স্পর্ধায় বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় কথা বলিতে সাহস করিল, তাহাতে কেহ কেহ আশ্চর্য হইয়া গেল। লাটিন-ভাষার সহিত তাহার পরিচয়ের সত্যতাও দু'-একজন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল (লাটিন জানে বলিয়া অনেকের রাগ ছিল তাহার উপর)।—একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—প্রতিপক্ষের বক্তার সংস্কৃতে যেমন অধিকার, যদি তাঁহার লাটিন ভাষার অধিকারও সেই ধরনের—

আক্রমণ ক্রমেই ব্যক্তিগত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সভাপতি—অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ দে বলিয়া উঠিলেন—Come, come, Manmatha has never said that he is a Seneca or a Lucretius—have the goodness to come to the point.

অপু এই প্রথম এ-রকম ধরনের সভায় যোগ দিল—স্কুলে এসব ছিল না, যদিও

হেডমাস্টার প্রতিবারই হইবার আশ্বাস দিতেন। এখানে এদিনকার ব্যাপারটা তাহার কাছে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ঠেকিল। ওসব মামুলি কথা মামুলিভাবে বলিয়া লাভ কি? সামনের অধিবেশনে সে নিজে একটা প্রবন্ধ পড়িবে। সে দেখাইয়া দিবে ওসব একঘেয়ে মামুলি বুলি না আওড়াইয়া কি ভাবে প্রবন্ধ লেখা যায়। একেবারে নূতন এমন বিষয় লইয়া সে লিখিবে, যাহা লইয়া কখনও কেহ আলোচনা করে নাই।

এক সপ্তাহ খাটিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিল। নাম—'নূতনের আহ্বান; সকল বিষয়ে পুরাতনকে ছাঁটিয়া একেবারে বাদ। কি আচার-ব্যবহার, কি সাহিত্য, কি দেখিবার ভঙ্গি—সব বিষয়েই নূতনকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অপু মনে মনে অনুভব করে, তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা খুব বড়, খুব সুন্দর। তাহার উনিশ বৎসরের জীবনের প্রতিদিনের সুখদুঃখ, পথের যে-ছেলেটি অসহায় ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কবে এক অপরাহ্নের ম্লান আলোয় যে পাখিটা তাহাদের দেশের বনের ধারে বসিয়া দোল খাইত, দিদির চোখের মমতা-ভরা দৃষ্টি, লীলার বন্ধুত্ব, রাণুদি, নির্মলা, দেবব্রত, রৌদ্রদীপ্ত নীলাকাশ, জ্যোৎস্না রাত্রি—নানা কল্পনার টুকরা, কত কি আশা-নিরাশার লুকোচুরি—সবসুদ্ধ লইয়া এই যে উনিশটি বৎসর—ইহা তাহার বৃথা যায় নাই—কোটি কোটি যোজন দূর শূন্যপার হইতে সূর্যের আলো যেমন নিঃশব্দ জ্যোতির অবদানে শীর্ণ শিশু-চারাকে পত্র-পুষ্পফলে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে, এই উনিশ বৎসরের জীবনের মধ্য দিয়ে শাশ্বত অনন্ত তেমনি ওর প্রবর্ধমান তরুণ প্রাণে তাহার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছে—ছায়ান্ধকার তৃণভূমির গন্ধে, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর-মাখানো অপরূপ সন্ধ্যায়; উদার কল্পনায় ভরপুর নিঃশব্দ জীবনমায়ায়।—সে একটা অপূর্ব শক্তি অনুভব করে নিজের মধ্যে—এটা যেন বাহিরে প্রকাশ করিবার জিনিস—মনে-মনে ধরিয়া রাখার নয়। কোথায় থাকিবে প্রণব আর মন্মথ?···সবাই মামুলি কথা বলে। সকল বিষয়ে এই মামুলি ধরণ যেন তাহাদের দেশের একচেটে হইয়া উঠিতেছে—যেমন গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া সারা পৃথিবীটার রস-ভাণ্ডার গ্রাস করিতে ছুটিতেছে, সে তীব্র আগ্রহ-ভরা পিপাসার্ত নবীন মনের সকল কল্পনা তাহাতে তৃপ্ত হয় না। ইহারই বিরুদ্ধে, ইহাদের সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে, সব ওলট-পালট করিয়া দিবার নিমিত্ত সংঘবদ্ধ হইতে হইবে তাহাদিগকে এবং সে-ই হইবে তাহার অগ্রণী।

দিন কতক ধরিয়া অপু ক্লাসে ছেলেদের মধ্যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধরনে গর্ব

করিয়া বেড়াইল যে, এমন প্রবন্ধ পড়িবে যাহা কেহ কোনদিন লিখিবার কল্পনা করে নাই, বেহ কখনও শোনে নাই ইত্যাদি। লজিকের ছোকরা-প্রোফেসার ইউনিয়নের সেক্রেটারী, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ব'লে নোটিশ দেবো তোমার প্রবন্ধের হে, বিষয়টা কি ?

পরে নাম শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেশ, বেশ ! নামটা বেশ দিয়েছ—but why not—পুরাতনের বাণী ? অপু হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। নির্দিষ্ট দিনে যদিও ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের সভাপতি হইবার কথা নোটিশে ছিল, তিনি কার্য-বশতঃ আসিতে পারিলেন না। ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে সভাপতির আসনে বসিতে সকলে অনুরোধ করিল। ভিড় খুব হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় অনেক লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছু করা অপুর এই প্রথম। প্রথমটা তাহার পা কাঁপিল, গলাও খুব কাঁপিল, কিন্তু ক্রমে বেশ সহজ হইয়া আসিল। প্রবন্ধ খুব সতেজ—এ বয়সে যাহা কিছু দোষ থাকে- উচ্ছ্বাস, অনভিজ্ঞ আইডিয়ালিজম্, ভাল মন্দ নির্বিশেষে পুরাতনকে ছাঁটিয়া ফেলিবার দম্ভ—বেপরোয়া সমালোচনা, তাহার প্রবন্ধে কোনটাই বাদ যায় নাই। প্রবন্ধ পড়িবার পরে খুব হৈ-চৈ হইল। খুব তীব্র সমালোচনা হইল। প্রতিপক্ষ কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। কিন্তু অপু দেখিল অধিকাংশ সমালোচকই ফাঁকা আওয়াজ করিতেছে। সে যাহা লইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও কিছু অভিজ্ঞতাও নাই, বলিবার বিষয়ও নাই, তাহারা তাহাকে মন্মথর শ্রেণীতে ফেলিয়া দেশদ্রোহী, সমাজ-দ্রোহী বলিয়া গালাগালি দিতে শুরু করিয়াছে।

অপু মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। হয়তো সে আরও পরিস্ফুট করিয়া লিখিলে ভাল করিত। জিনিসটা কি পরিষ্কার হয় নাই ? এত বড় সভার মধ্যে তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু'একজন বন্ধু ছাড়া সকলেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, —টিটকারি গালাগালি অংশের জন্য মন্মথকে হিংসা করার তাহার কিছুই নাই। শেষে সভাপতি তাহাকে প্রতিবাদের উত্তর দিবার অধিকার দেওয়াতে সে উঠিয়া ব্যাপারটা আরও খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিল। দু'চারজন সমালোচক—যাহাদের প্রতিবাদ সে বসিয়া নোট করিয়া লইয়াছিল, তাহাদিগকে উত্তর দিতে গিয়া যুক্তির খেই হারাইয়া ফেলিল। অপর পক্ষ এই অবসরে আর এক পালা হাসিয়া লইতে ছাড়িল না। অপু রাগিয়া গিয়াছিল, এইবার যুক্তির পথ না ধরিয়া উচ্ছ্বাসের পথ ধরিল। সকলকে সংকীর্ণমনা বলিয়া গালি দিল, একটা বিদ্রূপাত্মক গল্প বলিয়া অবশেষে টেবিলের উপর একটা কিল মারিয়া এমার্সনের

একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বক্তৃতার উপসংহার করিল।

ছেলেদের দল খুব গোলমাল করিতে করিতে হলের বাহির হইয়া গেল। বেশীর ভাগ ছেলে তাহাকে যা-তা বলিতেছিল—নিছক বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা ছাড়া তাহার প্রবন্ধ যে অন্য কিছুই নহে, ইহাও অনেকের মুখে শোনা যাইতেছে। সে শেষের দিকে এমার্সনের এই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিল—

'I am the owner of the sphere
Of the seven stars and the solar year.'

তাহাতেই অনেকে তাহাকে দাম্ভিক ঠাওরাইয়া নানারূপ বিদ্রূপ ও টিটকারি দিতেও ছাড়িল না। কিন্তু অপু ও-কবিতাটায় নিজেকে আদৌ উদ্দেশ করে নাই, যদিও তাহার নিজেকে জাহির করার স্পৃহাও কিছু কম ছিল না বা মিথ্যা গর্ব প্রকাশে সে ক্লাসের কাহারও অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী।

তাহার নিজের দলের কেহ কেহ তাহাকে ঘিরিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিল। ভিড় একটু কমিয়া গেলে সে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলেজ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, গেটের কাছে একটি সতেরো-আঠারো বছরের লাজুক প্রকৃতির ছেলে তাহাকে বলিল—একটুখানি দাঁড়াবেন?

অপু ছেলেটিকে চেনে না, কখনও দেখে নাই। একহারা, বেশ সুশ্রী, পাতলা সিল্কের জামা গায়ে, পায়ে জরির নাগরা জুতা।

ছেলেটি কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—আপনার প্রবন্ধটা আমায় একটু পড়তে দেবেন? কাল আবার আপনাকে ফেরত দেব।

অপুর আহত আত্মাভিমান পুনরায় হঠাৎ ফিরিয়া আসিল। খাতাখানা ছেলেটির হাতে দিয়া বলিল,—দেখবেন কাইণ্ডলি, যেন হারিয়ে না যায়—আপনি বুঝি—সায়েন্স?—ও।

পরদিন কলেজ বসিবার সময় ছেলেটি গেটেই দাঁড়াইয়াছিল—অপুর হাতে খাতাখানা ফিরাইয়া দিয়া ছোট একটি নমস্কার করিয়াই ভিড়ের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। অন্যমনস্ক ভাবে ক্লাসে বসিয়া অপু খাতাখানা উল্টাইতেছিল, একখানা কি কাগজ খাতাখানার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ইলেকট্রিক পাখার হাওয়ায় খানিকটা উড়িয়া গেল। পাশের ছেলেটি সেখানা কুড়াইয়া তাহার হাতে দিলে সে পড়িয়া দেখিল, পেন্সিলে লেখা একটি কবিতা—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া:—

শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার রায়

করকমলেষু—

বাঙ্গালী সমাজ যেন পঙ্কময় বদ্ধ জলাশয়
নাহি আলো স্বাস্থ্যভরা, বহে হেথা বায়ু বিষময়
জীবন-কোরকগুলি, অকালে শুকায়ে পরে ঝরি,
বাঁচাবার নাহি কেহ, সকলেই আছে যেন মরি।
নাহি চিন্তা, নাহি বুদ্ধি, নাহি ইচ্ছা, নাহি উচ্চ আশা,
সুখদুঃখহীন এক জড়পিণ্ড, নাহি মুখে ভাষা।
এর মাঝে দেখি যবে কোনো মুখ উজ্জ্বল সরস,
নয়নে আশার দৃষ্টি, ওষ্ঠপ্রান্তে জীবন হরষ—
অধরে ললাটে ভ্রূতে প্রতিভার সুন্দর বিকাশ,
স্থির দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ইচ্ছাশক্তি প্রত্যক্ষ প্রকাশ,
সম্ভ্রমে হৃদয় পূরে, আনন্দ ও আশা জাগে প্রাণে,
সম্ভাষিতে চাহে হিয়া বিমল প্রীতির অর্ঘ্যদানে ;
তাই এই ক্ষীণ-ভাষা ছন্দে গাঁথি দীন উপহার
লজ্জাহীন অসঙ্কোচে আনিয়াছি সম্মুখে তোমার,
উচ্চলক্ষ্য, উচ্চআশা বাঙ্গালায় এনে দাও বীর
সুযোগ্য সন্তান যে রে তোরা সবে বঙ্গ জননীর।

গুণমুগ্ধ
শ্রী—

ফার্স্ট ইয়ার, সায়েন্স, সেক্সন বি।

অপু বিস্মিত হইল। আগ্রহের ও ঔৎসুক্যের সহিত আর একবার পড়িল—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একে চায় তো আরে পায়,—একেই নিজের কথা পরকে জাঁক করিয়া বেড়াইতে সে অদ্বিতীয়, তাহার উপর তাহারই উদ্দেশে লিখিত এক অপরিচিত ছাত্রের এই পত্র পাইয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে সে ভুলিয়া গেল যে, ক্লাসে স্বয়ং মিঃ বসু ইতিহাসের বক্তৃতায় কোন এক রোমান সম্রাটের অমানুষিক ঔদারিকতার কাহিনী সবিস্তারে বলিতেছেন। সে পাশের ছেলেকে ডাকিয়া পত্রখানা দেখাইতে যাইতেই জানকী খোঁচা দিয়া বলিল,
—এই ! সি সি বি এক্ষুনি বকে উঠবে—তোর দিকে তাকাচ্ছে, সামনে চা—এই !
আঃ—কতক্ষণে সি. সি. বি.-র এই বাজে বকুনি শেষ হইবে !—বাহিরে গিয়া

সকলকে চিঠিখানা দেখাইতে পারিলে যে সে বাঁচে!—ছেলেটিকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

ছুটির পর গেটের কাছেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হইল। বোধ হয় সে তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। কলেজের মধ্যে এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্ত পাইয়া অপু মনে মনে গর্ব অনুভব করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগ! তবে তাহার পক্ষে একটু সাহসের বিষয় এই দাঁড়াইল যে, ছেলেটি তাহার অপেক্ষাও লাজুক। অপু গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাহার হাত ধরিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল। কেহই কাগজে লেখা পদ্যটার কোনও উল্লেখ করিল না, যদিও দুজনেই বুঝিল যে, তাহাদের আলাপের মূলে কালকের সেই চিঠিখানা। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বলিল,—চলুন কোথাও বেড়াতে যাই, কলকাতার বাইরে কোথাও মাঠে—শহরের মধ্যে হাঁপ ধরে—কোথাও একটা ঘাস দেখবার জো নেই—

কথাটা শুনিয়াই অপুর মনে হইল, এ ছেলেটি তো সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। ঘাস না দেখিয়া কষ্ট হয় এমন কথা তো আজ প্রায় এক বৎসর কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কলেজের কোন বন্ধুর মুখে শোনে নাই।

সাউথ সেকশনের ট্রেনে গোটাচারেক স্টেশন পরে তাহারা নামিল। অপু কখনও এদিকে আসে নাই। ফাঁকা মাঠ, কেয়া ঝোপ, মাঝে মাঝে হোগলা বন। সরু মেঠো পথ ধরিয়া দুজনে হাঁটিয়া চলিতেছিল—ট্রেনের অল্প আধঘণ্টার আলাপেই দুজনের মধ্যে একটা নিবিড় পরিচয় জমিয়া উঠিল। মাঠের মধ্যে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপরে দুজনে গিয়া বসিল।

ছেলেটি নিজের ইতিহাস বলিতেছিল—

হাজারিবাগ জেলায় তাহাদের এক অভ্রের খনি ছিল, ছেলেবেলায় সে সেখানেই মানুষ। জায়গাটার নাম বড়বনী, চারিধারে পাহাড় আর শাল-পলাশের বন, কিছু দূরে দারুকেশ্বর নদী! নিকটে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝর্ণা।...পড়ন্ত বেলায় শালবনের পিছনের আকাশটা কত কি রঙে রঞ্জিত হইত—প্রথম বৈশাখে শাল-কুসুমের ঘন সুগন্ধ দুপুরে রৌদ্রকে মাতাইত, পলাশবনে বসন্তের দিনে যেন ডালে ডালে আরতির পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিত—সন্ধ্যার পরই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বাঘেরা আসিত ঝর্ণার জল পান করিতে—বাংলো হইতে একটু দূরে বালির উপর কতদিন সকালে বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ দেখা গিয়াছে।

সেখানকার জ্যোৎস্না রাত্রি! সে রাত্রির বর্ণনা নাই, ভাষা যোগায় না। স্বর্গ

যেন দূরের নৈশ কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণীর ওপারে—ছায়াহীন, সীমাহীন, অনন্তরস-ক্ষরা জ্যোৎস্না যেন দিক্‌চক্রবালে তাহারই ইঙ্গিত দিত।

এক-আধদিন নয়, শৈশবের দশ-দশটি বৎসর সেখানে কাটিয়াছে। সে অন্য জগৎ, পৃথিবীর মুক্ত প্রসারতার রূপ সেখানে চোখে কি মায়া-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে—কোথাও আর ভাল লাগে না! অভ্রের খনিতে লোকসান হইতে লাগিল, খনি অপরে কিনিয়া লইল, তাহার পর হইতেই কলিকাতায়। মন হাঁপাইয়া উঠে—খাঁচার পাখির মত ছট্‌ফট্‌ করে। বাল্যের সে অপূর্ব আনন্দ মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

অপু এ ধরনের কথা কাহারও মুখে এ পর্যন্ত শোনে নাই—এ যে তাহারই অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি। গাছপালা, নদী, মাঠ ভালবাসে বলিয়া দেওয়ানপুরে তাহাকে সবাই বলিত পাগল। একবার মাঘ মাসের শেষে পথে কোন গাছের গায়ে আলোকলতা দেখিয়া রমাপতিকে বলিয়াছিল,—কেমন সুন্দর! দেখুন দেখুন রমাপতিদা—

রমাপতি মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিয়াছিল মনে আছে—ওসব যার মাথায় ঢুকেছে তার পরকালটি একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে।

পরকালটা কি জন্য যে ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে, একথা সে বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু ভাবিয়াছিল রমাপতিদা স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, অবশ্যই তাহার অপেক্ষা ভাল জানে। এ পর্যন্ত কাহারও নিকট হইতেই সে ইহার সায় পায় নাই, এই এতদিন পরে ইহাকে ছাড়া। তাহা হইলে তাহার মত লোকও আছে!...সে একেবারে সৃষ্টিছাড়া নয়!...

অনিল বলিল—দেখুন, এই এত ছেলে কলেজে পড়ে, অনেকের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখেছি—ভাল লাগে না—dull, unimaginative mind; পড়তে হয় পড়ে যাচ্ছে, বিশেষ কোন বিষয়ে কৌতূহলও নেই, জানবার একটা সত্যিকার আগ্রহও নেই। তাছাড়া, এত ছোট কথা নিয়ে থাকে যে, মন মোটে—মানে, কেমন যেন,—যেন মাটির উপর hop ক'রে বেড়ায়! প্রথম সেদিন আপনার কথা শুনে মনে হ'ল, এই একজন অন্য ধরনের, এ দলের নয়।

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। এসব সে-ও নিজের মনের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিয়াছে, অপরের সঙ্গে নিজের এ পার্থক্য মাঝে মাঝে তাহার কাছে ধরা পড়িলেও সে নিজের সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয় বলিয়া এ জিনিসটা বুঝিতে পারিত না। তাহা ছাড়া অপুর প্রকৃতি আরও শান্ত,

উগ্রতাশূন্য ও উদার,—পরের তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণের ধাতই নাই তাহার একেবারে!— কিন্তু তাহার একটা মহৎ দোষ এই যে, নিজের বিষয়ে কথা একবার পাড়িলে সে আর ছাড়িতে চায় না।—অপরেও যে নিজেদের সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিতে পারে, তরুণ বয়সের অনাবিল আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রত্যয় সে বিষয়ে তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং সে নিজের বিষয়ে একটানা কথা বলিয়া যায় —নিজের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিজের ভালমন্দ লাগা, নিজের পড়াশুনা। নিজের কোন দুঃখদুর্দশার কথা বলে না, কোন ব্যথা-বেদনার কথা তোলে না— জলের উপরকার দাগের মত সে-সব কথা তাহার মনে মোটে স্থান পায় না— আনকোরা তাজা নবীন চোখের দৃষ্টি শুধুই সম্মুখের দিকে, সম্মুখের বহুদূর দিক্‌চক্রবাল রেখারও ওপারে—আনন্দ ও আশায় ভরা এক অপূর্ব রাজ্যের দিকে।

সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিয়া চিম্‌নি-ভাঙা পুরনো হিঙ্কসের লণ্ঠনটা জ্বালিয়া সে পকেট হইতে আনলের চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িতে বসিল। আমায় যে ভাল বলে, সে আমার পরম বন্ধু, আমার মহৎ উপকার করে, আমার আত্মপ্রত্যয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে, আমার মনের গভীর গোপন কোনও লুকানো রত্নকে দিনের আলোয় মুখ দেখাইতে সাহস দেয়।

পড়িতে পড়িতে পাশের বিছানার দিকে চাহিয়া মনে পড়ে—আজ আবার তাহার ঘরের অপর লোকটির এক আত্মীয় কাঁচরাপাড়া হইতে আসিয়াছে এবং এই ঘরেই শুইবে। সে আত্মীয়টির বয়স বছর ত্রিশেক হইবে; কাঁচরাপাড়া লোকো আফিসে চাকরি করে, বেশী লেখাপড়া না জানিলেও অনবরত যা-তা ইংরেজী বলে, হরদম সিগারেট খায়, অত্যন্ত বকে, অকারণে গায়ে পড়িয়া ভাই ভাই বলিয়া কথা বলে, তাহার মধ্যে বারো আনা থিয়েটারের গল্প, অমুক অ্যাকট্রেস তারাবাঈ-এর ভূমিকায় যে-রকম অভিনয় করে, অমুক থিয়েটারের বিধুমুখীর মত গান—বিশেষ ক'রে 'হীরার দুল' প্রহসনে বেদেনীর ভূমিকায়, 'নয়ন জলের ফাঁদ পেতেছি' নামক সেই বিখ্যাত গানখানি সে যেমন গায়, তেমন আর কোথায়, কে গাহিতে পারে?— তিনি এজন্য বাজি ফেলিতে প্রস্তুত আছেন।

এসব কথা অপুর ভাল লাগে না, থিয়েটারের কথা শুনিতে তাহার কোনও কৌতূহল হয় না। এ লোকটির চেয়ে আলুর ব্যবসাদারটি অনেক ভাল। সে পাড়াগাঁয়ের লোক, অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির, আর এত বাজে কথা বলে না; অন্ততঃ তাহার সঙ্গে তো নয়ই। এ ব্যক্তিটির যত গল্প তাহার সঙ্গে।

মনে মনে ভাবে—একটু ইচ্ছে করে—বেশ একা একটি ঘর হয়, একা বসে

পড়াশুনো করি, টেবিল থাকে একটা, বেশ ফুল কিনে এনে গ্লাসের জলে দিয়ে সাজিয়ে রাখি। এ ঘরটায় না আছে জানালা, পড়তে পড়তে একটু খোলা আকাশ দেখবার জো নাই, তামাকের গুল রোজ পরিষ্কার করি, আর রোজ ওরা এই রকম নোংরা করবে—মা ওয়াড় ক'রে দিয়েছিল, ছিঁড়ে গিয়েছে, কি বিশ্রী তেল চিটচিটে বালিশটা হয়েছে—! এবার হাতে পয়সা হ'লে একটা ওয়াড় করবো।

অনিলের সঙ্গে পরদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেল। চাঁদপাল ঘাটে, প্রিন্সেপস্ ঘাটে বড় বড় জাহাজ নোঙর করিয়া আছে, অপু পড়িয়া দেখিল: কোনটার নাম 'বম্বে', কোনটার নাম 'ইদজু মারু'। সেদিন বৈকালে নতুন ধরণের রং-করা একখানা বড় জাহাজ দেখিয়াছিল, নাম লেখা আছে 'শেনানডোয়া', অনিল বলিল, আমেরিকান মাল জাহাজ—জাপানের পথে আমেরিকায় যায়। অপু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া জাহাজখানা দেখিল। নীল পোশাক-পরা একটা লস্কর রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া জলের মধ্যে কি দেখিতেছে। লোকটি কি সুখী! কত দেশবিদেশে বেড়ায়, কত সমুদ্রে পাড়ি দেয়, চীন সমুদ্রে টাইফুনে পড়িয়াছে, পিনাং-এর নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় কত দুপুর কাটাইয়াছে, কত ঝড়বৃষ্টির রাত্রে এই রকম রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাত্যাক্ষুব্ধ, উত্তাল, উন্মত্ত মহাসমুদ্রের রূপ দেখিয়াছে। কিন্তু ও লোকটা বোঝে কি? কিছুই না। ও কি দূর হইতে ফুজিয়ামা দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে? দক্ষিণ আমেরিকার কোনও বন্দরে নামিয়া পথের ধারে কি গাছপালা আছে তাহা, নিবিষ্ট মনে সাগ্রহে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে? হয়ত জাপানের পথের ধারে বাংলা দেশের পরিচিত কোনও ফুল আছে, ও লোকটি জানে না, হয়ত ক্যালিফোর্ণিয়ার শহরবন্দর হইতে দূরে নির্জন Sierra-র ঢালুতে বনঝোপের নানা অচেনা ফুলের সঙ্গে তাহাদের দেশের সন্ধ্যামণি ফুলও ফুটিয়া থাকে, ও লোকটা কি কখনও সেখানে সূর্যাস্তের রাঙা আলোর বড় একখণ্ড পাথরের উপর আপন মনে বসিয়া নীল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে?

অথচ ও লোকটারই অদৃষ্টে ঘটিতেছে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, সমুদ্রে-সমুদ্রে বেড়ানো—যাহার চোখ নাই, দেখিতে জানে না; আর সে যে শৈশব হইতে শত সাধ পুষিয়া রাখিয়া আসিতেছে মনের কোণে, তাহার কি কিছুই হইবে না?··· কবে যে সে যাইবে!···কলিকাতার শীতের রাত্রের এ ধোঁয়া তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। চোখ জ্বালা করে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, কিছু দেখা যায় না, মন তাহার একেবারে পাগল হইয়া উঠে—এ এক অপ্রত্যাশিত উপদ্রব? কে

জানিত শীতকালে কলিকাতার এ চেহারা হয় !

ওই লোকটার মত জাহাজের খালাসী হইতে পারিলেও সুখ ছিল !

Ship ahoy !···কোথাকার জাহাজ ?···

কলিকাতা হইতে পোর্ট মর্সবি, অষ্ট্রেলেশিয়া.

ওটা কি উঁচু-মত দূরে ?

প্রবালের বড় বাঁধ—The Great Barrier Reef—

এই সমুদ্রের ঠিক এই স্থানে, প্রাচীন নাবিক টাসম্যান ঘোর তুফানে পড়িয়া মাস্তুল ভাঙা পালছেঁড়া ডুবু ডুবু অবস্থায় অকূলে ভাসিতে ভাসিতে বারো দিনের দিন কূল দেখিতে পান—সেইটাই—সেকালে ভ্যান ডিমেনস্ল্যান্ড, বর্তমানে টাসমেনিয়া।···কেমন দূরে নীল চক্রবালরেখা !···উড়ন্ত সিন্ধুশকুনদলের মাতামাতি, প্রবালের বাঁধের উপর বড় বড় ঢেউয়ের সবেগে আছড়াইয়া পড়ার গম্ভীর আওয়াজ।

উপকূলরেখার অনেক পিছনে যে পাহাড়টা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওটা হয়ত জলহীন দিক-দিশাহীন ধূ ধূ নির্জন মরুর মধ্যে···শুধুই বালি আর শুকনা বাবুল গাছের বন.···শত শত ক্রোশ দূরে ওর অজানা অধিত্যকায় লুকানো আছে সোনার খনি, কালো ওপ্যালের খনি···এই খর, জ্বলন্ত, মরু-রৌদ্রে খনির সন্ধানে বাহির হইয়া কত লোক ওদিকে গিয়াছিল আর ফেরে নাই, মরুদেশের নানা স্থানে তাহাদের হাড়গুলা রৌদ্রে বৃষ্টিতে ক্রমে সাদা হইয়া আসিল।

অনিল বলিল, চলুন, আজ সন্ধ্যে হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখে আর কি হবে ?···

অপু সমুদ্র-সংক্রান্ত বহু বই কলেজ-লাইব্রেরী হইতে পড়িয়া ফেলিয়াছে ! কেমন একটা নেশা, কখনও কোন ছাত্র যাহা পড়ে না, এমন সব বই। বহু প্রাচীন নাবিক ও তাহাদের জলযাত্রার বৃত্তান্ত, নানা দেশ আবিষ্কারের কথা, সিবাষ্টিয়ান ক্যাবট, এরিকসন, কর্টেজ ও পিজারো কর্তৃক মেক্সিকো ও পেরু বিজয়ের কথা। দুর্ধর্ষ স্পেনীয় বীর পিজারো ব্রেজিলের জঙ্গলে রূপার পাহাড়ের অনুসন্ধানে গিয়া কি করিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া বেঘোরে অনাহারে সসৈন্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল—আরও কত কি।

পরদিন কলেজ পালাইয়া দু'জনে দুপুরবেলা ষ্ট্র্যান্ড রোডের সমস্ত ষ্টীমার কোম্পানীর অফিসগুলি ঘুরিয়া বেড়াইল। প্রথমে 'পি-এন্ড-ও'। টিফিনের সময় কেরানীবাবুরা নীচের জলখাবার ঘরে বসিয়া চা খাইতেছেন, কেহ

বিড়ি টানিতেছেন। অপু পিছনে রহিল. অনিল আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,
—আজ্ঞে, আমরা জাহাজে চাকরি খুঁজ্‌ছি, এখানে খালি আছে জানেন ?

একজন টাক-পড়া রোগা চেহারার বাবু বলিলেন.—চাকরি ? জাহাজে ··কোন জাহাজে ?

—যে কোন জাহাজে—

অপুর বুক উত্তেজনায় ও কৌতূহলে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, কি বুঝি হয়।

বাবুটি বলিলেন. জাহাজের চাকরিতে তোমাদের চলবে না হে ছোকরা,—দ্যাখো, একবার ওপরে মেরিন মাস্টারের ঘরে খোঁজ করো।

কিছুই হইল না। 'বি-আই-এস্-এন' তথৈবচ। 'নিপন্-ইউশেন-কাইশা'ও তাই। টার্ণার মরিসনের অফিসে তাহাদের সহিত কেহ কথাও কহিল না। বড় বড় বাড়ি. সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠা-নামা করিতে করিতে শীতকালেও ঘাম দেখা দিল। অবশেষে মরীয়া হইয়া অপু গ্লাডস্টোন ওয়াইলির অফিসে চারতলায় উঠিয়া মেরিন্ মাস্টারের কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। খুব দীর্ঘদেহ. অত বড় গোঁফ সে কখনও কাহারও দেখে নাই। সাহেব বিরক্ত হইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া কাহাকে ডাক দিল। অপুর কথা কানেও তুলিল না। একজন প্রৌঢ় বয়সের বাঙালীবাবু ঘরে ঢুকিয়া ইহাদের দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—এ ঘরে কি ? এসো. এসো. বাইরে এসো।

বাহিরে গিয়া অনিলের মুখে আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, কেন হে ছোকরা ? বাড়ি থেকে রাগ ক'রে পালাচ্ছ ?

অনিল বলিল,—না, রাগ ক'রে কেন পালাব ?

—রাগ ক'রে পালাচ্ছ না তো এ মতি হ'ল কেন ? জাহাজে চাকরি খুঁজছো—, কোন্ চাকরি হবে জানো ? খালাসীর চাকরি···এক বছরের এগ্রিমেণ্টে জাহাজে উঠতে হবে। বাঙালীর খাওয়া জাহাজে পাবে না···কষ্টের একশেষ হবে, গোরা লস্করগুলো অত্যন্ত বদমায়েস, তোমাদের সঙ্গে বনবে না। আরও নানা কষ্ট—স্টোকারের কাজ পাবে, কয়লা দিতে দিতে জান হয়রান হবে--সে সব কি তোমাদের কাজ ?

—এখন কোন জাহাজ ছাড়ছে নাকি ?

—জাহাজ তো ছাড়ছে 'গোলকুণ্ডা'—আর সাতদিন পরে মঙ্গলবারে ছাড়বে মাল জাহাজ—কলম্বো হয়ে ডারবান যাবে—

দু'জনেই মহা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। তাহাদের কোনও কষ্ট হইবে না,

কষ্ট করা তাহাদের অভ্যাস আছে। দয়া করিয়া তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করেন। অপু প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—তা হোক, দিন আপনি যোগাড় ক'রে—ওসব কিছু কষ্ট না দিন আপনি—গোরা লস্করে কি করবে আমাদের? কয়লা খুব দিতে পারবো—

কেরানীবাবুটি হাসিয়া বলিলেন,—একি ছেলেখেলা হে ছোক্‌রা! কয়লা দেবে তোমরা! বুঝতে তো পারছো না সেখানকার কাণ্ডকারখানা! বয়লারের গরম, হাওয়া নেই, দম বন্ধ হয়ে আসবে আর শভেল্ কয়লা দিতে না দিতে হাতের শিরা দড়ির মত ফুলে উঠবে—আর তাতে ওই ডেলিকেট হাত - হাঁপ জিরুতে দেবে না, দাঁড়াতে দেখলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মারবে চাবুক—দশ হাজার ঘোড়ার জোরের এঞ্জিনের স্টিম বজায় রাখতে হবে সব সময়. নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাবে না—আর গরম কি সোজা! কুম্ভীপাক নরকের গরম ফার্ণেসের মুখে। সে তোমাদের কাজ?···

তবুও দু'জনে ছাড়ে না।

ইহারা যে বাড়ি হইতে পালাইয়া যাইতেছে. সে ধারণা বাবুটির আরও দৃঢ় হইল। বলিলেন,- নাম ঠিকানা দিয়ে যাও তো তোমাদের বাড়ির। দেখি তোমাদের বাড়িতে না হয় নিজে একবার যাব।

কোনো রকমেই তাঁহাকে রাজী করাইতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা চলিয়া আসিল।

অপরাজিত

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একদিন অপু দুপুরবেলা কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া গায়ের জামা খুলিতেছে. এমন সময় পাশের বাড়ির জানালাটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়িতে সে আর চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না। জানালাটার গায়ে খড়ি দিয়া মাঝারি অক্ষরে মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে—'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।' অপু অবাক হইয়া খানিকটা সেদিক চাহিয়া রহিল এবং পরক্ষণেই কৌতুকের আবেগে হাতের নোটখাতাখানা মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আপন মনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পাশের বাড়ি—তাহার ঘরটা হইতে জানালাটা হাত পাঁচ ছয় দূরে—মধ্যে একটা সরু গলি। অনেকদিন সে দেখিয়াছে, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে জানালার গরাদে ধরিয়া এদিকে চাহিয়া আছে, বয়স চৌদ্দ-পনেরো। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল, বেশ মুখখানা, যদিও তাহাকে সুন্দরী বলিয়া কোনদিনও অপুর মনে হয় নাই। তাহার কলেজ হইতে আসিবার সময় হইলে প্রায়ই সে মেয়েটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিত। ক্রমে শুধু দাঁড়ানো নয়, মেয়েটি তাহাকে দেখিলেই হঠাৎ হাসিয়া জানালার আড়ালে মুখ লুকায়, কখনও বা জানালাটার খড়খড়ি বারকতক খুলিয়া বন্ধ করিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে, দিনের মধ্যে দু'বার, তিনবার, চারবার কাপড় বদ্‌লাইয়া ঘরটার মধ্যে অকারণে ঘোরাফেরা করে এবং ছুতানাতায় জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। কতদিন এ-রকম হয়, অপু মনে মনে ভাবে—মেয়েটা আচ্ছা বেহায়া তো! কিন্তু আজকের এ ব্যাপার একেবারে অপ্রত্যাশিত।

আজ ও-বেলা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে খাইতে গিয়া সে দেখিয়াছিল, সুন্দর ঠাকুর মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। দুই-তিন মাসের টাকা বাকী, সামান্য পুঁজির হোটেল, অপূর্ববাবু ইহার কি ব্যবস্থা করিতেছেন?···আর কতদিন এ ভাবে সে বাকী টানিয়া যাইবে?···সুন্দর ঠাকুরের কথায় তাহার মনে যে দুর্ভাবনার মেঘ জমিয়াছিল, সেটা কৌতুকের হাওয়ায় এক মুহূর্তে কাটিয়া গেল!

—আচ্ছা তো মেয়েটা? দ্যাখো কি লিখে রেখেছে—ওদের—হো-হো—আচ্ছা—হি-হি—

সেদিন আর মেয়েটিকে দেখা গেল না, যদিও সন্ধ্যার সময় একবার ঘরে ফিরিয়া সে দেখিল, জানালার সে খড়ির লেখা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। পরদিন সকালে ঘরের মধ্যে মাদুর বিছাইয়া পড়িতে পড়িতে মুখ তুলিতেই অপু দেখিতে পাইল, মেয়েটি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। কলেজে যাইবার কিছু আগে মেয়েটি আর একবার আসিয়া দাঁড়াইল। সবে স্নান সারিয়া আসিয়াছে, লালপাড় শাড়ি পরনে, ভিজে চুল পিঠের উপর ফেলা, সোনার বালা পরা নিটোল ডান হাতটি দিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া আছে। অল্পক্ষণের জন্য—

কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে কলেজে গেল। সেখানে অনেকের কাছে ব্যাপারটা গল্প করিল। প্রণব তো শুনিয়া হাসিয়া খুন, জানকীও তাই। সবাই আসিয়া দেখিতে চায়—এ যে একেবারে সত্যিকার জানালা-কাব্য! সত্যেন বলিল, নভেল ও মাসিকের পাতায় পড়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে এ-রকম যে ঘটে

তাহা তো জানা ছিল না !···নানা হাসি তামাশা চলিল, সকলেই যে ভদ্রতাসঙ্গত কথা বলিয়াই ক্ষান্ত রহিল তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

তারপর দিনচারেক বেশ কাটিল, হঠাৎ একদিন আবার জানালায় লেখা—'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে'। জানালার খড়খড়ির গায়ে এমন ভাবে লেখা যে, জানালা খুলিয়া লম্বা কব্জাটা মুড়িয়া ফেলিলে লেখাটা শুধু তাহার ঘর হইতেই দেখা যায়, অন্য কারুর চোখে পড়িবার কথা নহে। প্রণবটা যদি এ সময় এখানে থাকিত! তারপর আবার দিন-দুই সব ঠান্ডা।

সেদিন একটু মেঘলা ছিল—সকালে কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দুপুরের পরই আবার খুব মেঘ করিয়া আসিল। কারখানার উঠানে মাল-বোঝাই মোটর লরীগুলার শব্দ একটু থামিলেও দুপুরের 'শিফ্‌ট'-এ মিস্ত্রীদের প্যাক্‌বাক্সের গায়ে লোহার বেড় পরাইবার দুম্‌দাম্‌ আওয়াজ বেজায়। এই বিকট আওয়াজের জন্য দুপুরবেলা এখানে তিষ্ঠানো দায়।

অপু ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, মেয়েটি জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্পক্ষণের জন্য দু'জনের চোখাচোখি হইল। মেয়েটি অন্য অন্য দিনের মত আজও হাসিয়া ফেলিল। অপুর মাথায় দুষ্টুমি চাপিয়া গেল। সেও আগাইয়া গিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল—তারপর সে নিজেও হাসিল। মেয়েটি একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল কেহ আসিতেছে কিনা—পরে সেও আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। অপু কৌতুকের সুরে বলিল,—কিগো হেমলতা, আমায় বিয়ে করবে?

মেয়েটি বলিল—করবো। কথা শেষ করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

অপু বলিল,—কি জাত তোমরা—বামুন?—আমি কিন্তু বামুন।

মেয়েটি খোঁপায় হাত দিয়া একটা কাঁটা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল—আমরাও বামুন।—পরে হাসিয়া বলিল—আমার নাম তো জেনেছেন, আপনার নাম কি?

অপু বলিল, ভাল নাম অপূর্ব, আমরা বাঙ্গাল দেশের লোক—শহরের মেয়ে তোমরা—আমাদের তো দু'চোখে দেখতেই পারো না—তাই না? তোমায় একটা কথা বলি শোন।···ওরকম লিখো না জানালার গায়ে—যদি কেউ টের পায়?

মেয়েটি আর একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, কে টের পাবে? কেউ দেখতে পায় না ওদিক থেকে—আমি যাই, কাকীমা আসবে ঠাকুরঘর থেকে। আপনি বিকেলে রোজ থাকেন?

মেয়েটি চলিয়া গেলে অপুর হাসি পাইল। পাগল না তো? ঠিক—এতদিন সে বুঝিতে পারে নাই···মেয়েটি পাগল! মেয়েটির চোখে তাই কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের দৃষ্টি। কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর করুণা ও অনুকম্পায় তাহার সারা মন ভরিয়া গেল। মেয়ের বাপকে সে মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখে—প্রৌঢ়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোন অফিসের কেরানী বোধ হয়। সে কলেজে যাইবার সময় রোজ ভদ্রলোক ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকেন। হয়ত মেয়েটির বাবাই, নয়ত কাকা বা জ্যাঠামশায়, কি মামা—মোটের উপর তিনিই একমাত্র অভিভাবক। খুব বেশী অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয় না। হয়ত তাহাকে দেখিয়া মেয়েটা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে—এ-রকম তো হয়!

তাহার ইচ্ছা হইল, এবার মেয়েটিকে দেখিতে পাইলে তাহাকে দুটা মিষ্ট কথা, দুটা সান্ত্বনার কথা বলিবে। কেহ কিছু মনে করিবে? যদি নিতাইবাবু টের পায়?—পাইবে।

·

খবরের কাগজে সে মাঝে মাঝে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিত, একদিন দেখিল কোন একজন ডাক্তারের বাড়ির জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর দরকার। গেল সে সেখানে। দোতলা বড় বাড়ি, নিচে বৈঠকখানা কিন্তু সেখানে বড় কেহ বসে না, ডাক্তারবাবুর কন্সাল্টিং রুম দোতলার কোণের কামরায়, সেখানেই রোগীর ভিড়। অপু গিয়া দেখিল, নিচের ঘরটাতে অন্যূন জন-পনেরো নানা বয়সের লোক তীর্থের কাকের মত হাঁ করিয়া বসিয়া।—সেও গিয়া একপাশে বসিয়া গেল। তাহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ঐ বিজ্ঞাপনটা শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে—এত সকালে, অত ছোট ছোট অক্ষরে এককোণে লেখা বিজ্ঞাপনটা—সেও ভাবিয়াছিল—উঃ···এ যে ভিড় দেখা যায় ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

কাহাকে পড়াইতে হইবে; কোন্ ক্লাসের ছেলে, কত বড়, কেহই জানে না। পাশের একটি লোক জিজ্ঞাসা করিল—মশাই জানেন কিছু, কোন্ ক্লাসের—

অপু বলিল, সেও কিছুই জানে না। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছোক্‌রার সঙ্গে অপুর আলাপ হইল। ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া হোমিওপ্যাথিক পড়ে, টিউশনির নিতান্ত দরকার, না হইলেই চলিবে না, সে না-কি কালও একবার আসিয়াছিল, নিজের দুরবস্থার কথা সব কর্তাকে জানাইয়া গিয়াছে, তাহার হইলেও হইতে পারে। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অপু দেখিতেছিল, কাঠের সিঁড়িটা বাহিয়া এক-একজন লোক উপরের ঘরে উঠিতেছে এবং নামিবার সময় মুখ অন্ধকার

করিয়া পাশের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। যদি তাহারও না হয়! পড়া বন্ধ করিয়া মনসাপোতা—কিন্তু সেখানেই বা চলিবে কিসে?

চাকর আসিয়া জানাইল, আজ বেলা হইয়া গিয়াছে, ডাক্তারবাবু কাহারও সঙ্গে এখন আর দেখা করিবেন না। এক-একখানা কাগজে সকলে নিজের নিজের নামধাম ও যোগ্যতা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন, প্রয়োজন বুঝিলে জানানো যাইবে।

ছেঁদো কথা। সকলেই একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল—প্রত্যেকেরই মনে মনে বিশ্বাস—একবার গৃহস্বামী তাহাকে চাক্ষুষ দেখিয়া তাহার গুণ শুনিলে আর চাকুরি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না! অপুও ভাবিল সে উপরে যাইতে পারিলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত।—তবে সে নিজের দুরবস্থার কথা কাহারও কাছে বলিতে পারিবে না। তাহার লজ্জা করে, দৈন্যের কাঁদুনি গাহিয়া পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা—অসম্ভব! লোকে কি করিয়া যে করে! প্রথম প্রথম সে কলিকাতায় আসিয়া ভাবিয়াছিল, কত বড়লোকের বাড়ি আছে কলিকাতায়, চাহিলে একজন দরিদ্র ছাত্রের উপায় করিয়া দিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। কত পয়সা তো তাহাদের কত দিকে যায়! কিন্তু তখন সে নিজেকে ভুল বুঝিয়াছিল, চাহিবার প্রবৃত্তি, পরের চোখে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি, এ-সব তাহার মধ্যে নাই। তাহার আছে—সে যাহা নয় তাহা হইতেও নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিবার, বাহাদুরি করিবার, মিথ্যা গর্ব করিয়া বেড়াইবার একটা কু-অভ্যাস। তাহার মায়ের নির্বুদ্ধিতা এই দিক দিয়া ছেলেতে বর্তাইয়াছে, একেবারে হুবহু—অবিকল। এই কলিকাতা শহরে মহা কষ্ট পাইলেও সে নিতান্ত অন্তরঙ্গ এক-আধজন ছাড়া কখনও কাহাকে—তাও নিজের মুখে কখনও—কিছু বলে না। পাছে ভাবে গরীব।

ইতস্ততঃ করিয়া সেও অপরের দেখাদেখি কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে গেল। নিচের উঠান হইতে চাকর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—আরে কাহে আপ্‌লোক উপরমে যাতে হেঁ···বাত্‌ নেহি মান্‌তে হেঁ, এ বড়া মশ্‌কিল—। অপু সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রৌঢ় বয়সের একটি ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া, হোমিওপ্যাথি-পড়া ছোকরাটির সঙ্গে কি তর্ক চলিতেছে বাহির হইতে বুঝা গেল—ছোকরাটি কি বলিতেছে, ভদ্রলোকটি কি বুঝাইতেছেন! সে ছোকরা একেবারে নাছোড়বান্দা টিউশনি তাহার চাই-ই। ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, 'ম্যাট্রি-কুলেশন-ফেল টিউটর দিয়া তিনি কি করিবেন? ক্রমে সকলে একে একে বাহিরে

আসিয়া চলিয়া গেল। অপু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সসঙ্কোচে বলিল— আপনাদের কি একজন পড়াবার লোক দরকার—আজ সকালের কাগজে বেরিয়েছে—

যেন সে এত লোকের ভিড়, উপরে উঠার নিষেধাজ্ঞা, কাগজে নামধাম লিখিয়া রাখিবার উপদেশ কিছুই জানে না! আসলে সে ইচ্ছা করিয়া এরূপ ভালমানুষ সাজে নাই—অপরিচিত স্থানে আসিয়া অপরিচিত লোকের সহিত কথা কহিতে গিয়া আনাড়ীপনার দরুন কথার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা ন্যাকা সুর আসিয়া গেল।

ভদ্রলোক একবার আপাদমস্তক তাহাকে দেখিয়া লইলেন, তারপর একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন. বসুন। আপনি কি পাশ?—ও, আই-এ পড়ছেন,—দেশ কোথায়?···ও!···এখানে থাকেন কোথায়?—হুঁ!

তিনি আরও যেন খানিকক্ষণ তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। মিনিট পনেরো পরে—অপু বসিয়াই আছে—ডাক্তারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—দেখুন, পড়ানো মানে—আমার একটি মেয়ে—তাকেই পড়াতে হবে। যাকে তাকে তো নিতে পারি নে—কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—ওরে শোন্—তোর দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয় তো— বল্‌গে আমি ডাকছি—

একটু পরে মেয়েটি আসিল। বছর পনেরো বয়স, তন্বী সুন্দরী,বড় বড় চোখ, আঙুলের গড়ন ভারি সুন্দর. রেশমী জামা গায়ে, চওড়া পাড় শাড়ি, গলায় সোনার সরু চেন, হাতে প্লেন বালা। মাথায় চুল এত ঘন যে, দু'ধারের কান যেন ঢাকিয়া গিয়াছে— জাপানী মেয়েদের মত ফাঁপানো খোঁপা!

—এইটি আমার মেয়ে, নাম প্রীতিবালা। বেথুন স্কুলে পড়ে, এইবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে। ইনি তোমার মাস্টার খুকি—আজ বাদ দিয়ে কাল থেকে উনি আসবেন—হ্যাঁ. এঁর মুখ দেখেই আমার মনে হয়েছে ইনিই ঠিক হবেন। বয়স আপনার আর কত হবে—এই উনিশ-কুড়ি, মুখ দেখেই তো মনে হয় ছেলেমানুষ, তাছাড়া একটা distinction-এর ছাপ রয়েছে। খুকি বসো মা—

টিউশান জোটার আনন্দে যত হোক-না-হোক, ভদ্রলোক যে বলিয়াছেন তাহার মুখে একটা distinction-এর ছাপ আছে—এই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সে সারাটা দিন কাটাইল ও ক্লাসে, পথে, বাসায়, হোটেলে—সর্বত্র বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাটা লইয়া নির্বোধের মত খুব জাঁক করিয়া বেড়াইল। মাহিনা যত নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বলিল, মেয়েটির সৌন্দর্য-ব্যাখ্যা অনেক বাড়াইয়া করিল।

কিন্তু পরদিন পড়াইতে গিয়া দেখিল—মেয়েটি দেওয়ানপুরের নির্মলা নয়। সেরকম সরলা, স্নেহময়ী, হাস্যমুখী নয়—অল্প কথা কয়, খাটাইয়া লইতে জানে, একটু যেন গর্বিত! কথাবার্তা বলে হুকুমের ভাবে। অমুক অংকটা কাল বুঝিয়ে দেবেন, অমুকটা কাল ক'রে আনবেন, আজ আরও একঘণ্টা বেশী পড়াবেন, পরীক্ষা আছে—ইত্যাদি! একদিন কোন কারণে আসিতে না পারিলে পরদিন কৈফিয়ৎ তলব করিবার সুরে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপু মনে মনে বড় ভয় খাইয়া গেল, যে রকম মেয়ে, কোন্ দিন পড়ানোর কোন্ ত্রুটির কথা বাবাকে লাগাইবে, চাকরির দফা গয়া—পথে বসা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না। ছাত্রীর উপর অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়াই মাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিল। বৌবাজার ডাকঘর হইতে টাকাটা পাঠাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, সঙ্গের বন্ধুটি বলিল, এসো তো ভাই একটু চোরাবাজারে, একটা ভাল অপেরাগ্লাস কাল দর ক'রে রেখে এসেছি—নিয়ে আসি।

চোরাবাজারের নামও কখনও অপু শোনে নাই। ঢুকিয়া দেখিয়াই সে অবাক্ হইয়া গেল। নানা ধরণের জিনিসপত্র, খেলনা, আসবাবপত্র, ছবি, ঘড়ি, জুতা, কলের গান, বই, বিছানা, সাবান, কৌচ, কেদার—সবই পুরানো মাল। অপুর মনে হইল—বেশ সস্তা দরে বিকাইতেছে। একটা ফুলের টব, দর বলিল ছ'আনা। একটা ভাল দোয়াতদান দশ আনা। এগারো টাকায় কলের গান মায় রেকর্ড! এত দিন কলিকাতায় আছে, এত সস্তায় এখানে জিনিসপত্র বেচা-কেনা হয়, তা তো সে জানে না। এত শৌখিন জিনিসের এত কম দাম!

তাহার মাথায় এক খেয়াল আসিয়া গেল। পরদিন সে বাকী টাকা হাতে বৈকালে আসিয়া চোরাবাজারে ঢুকিল। মনে ভাবিল—এইবার একটু ভাল ভাবে থাকবো, ওরকম গোয়ালঘরে থাকতে পারি নে—যেমন নোংরা তেমনি অন্ধকার। প্রথমেই সে ফুলদানিজোড়া কিনিল। দোয়াতদানের উপর অনেকদিন হইতে ঝোঁক, সেটিও কিনিল। একটা জাপানী পর্দা, খানচারেক ছবি, খানকতক প্লেট, একটা আয়না, ঝুটা পাথর-বসানো ছোট একটা আংটি! ছেলেমানুষের মত আনন্দে শুধু জিনিসগুলিকে দখলে আনিবার ঝোঁকে যাহাই চোখে ভাল লাগিল, তাহাই কিনিল। দাঁও বুঝিয়া দু'একজন দোকানদার বেশ ঠকাইয়াও লইল। ডবল-উইকের একটা পিতলের টেবিল-ল্যাম্প পছন্দ হওয়াতে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল,—এটার দাম কত? দোকানী বলিল,—সাড়ে তিন টাকা। অপুর বিশ্বাস…এ-রকম আলোর

দাম পনেরো-ষোল টাকা। এরূপ মনে হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, অনেকদিন আগে লীলাদের বাড়ি থাকিবার সময় সে ঐই ধরণের আলো লীলার পড়িবার ঘরে টেবিলে জ্বলিতে দেখিয়াছিল। সে বেশী দর কষিতে ভরসা করিল না, চার আনা মাত্র কমাইয়া তিন টাকা চার আনা মূল্যে সেই মান্ধাতার আমলের টেবিল ল্যাম্পটা মহা খুশীর সহিত কিনিয়া ফেলিল! মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া সে সোৎসাহে ও সাগ্রহে সব বাসায় আনিয়া হাজির করিল ও সারাদিন খাটিয়া ঘরদোর ঝাড়িয়া ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ছবিগুলি দেওয়ালে টাঙ্গাইল, সস্তা জাপানী পর্দাটা দরজায় ঝুলাইল, আয়নাটাকে গজাল আঁটিয়া বসাইল, ফুলদানির জন্য ফুল কিনিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সেগুলিকে ধুইয়া মুছিয়া আপাততঃ জানালার ধারে রাখিয়া দিল, দোয়াতদানটা তেঁতুল দিয়া মাজিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিল। বাহিরে অনেকদিনের একটা খালি প্যাকবাক্স পড়িয়াছিল, সেটা ঝাড়িয়া মুছিয়া টেবিলে পরিণত করিয়া সন্ধ্যার পর টেবিল ল্যাম্পটা সেটার উপর রাখিয়া পড়িতে বসিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া সে ঘন ঘন ঘরের চারিদিকে খুশীর সহিত চাহিয়া দেখিতেছিল—ঠিক একেবারে যেন বড়লোকদের সাজানো ঘর। ছবি, পর্দা, ফুলদানি, টেবিল-ল্যাম্প সব!—এতদিন পয়সা ছিল না, হয় নাই। কিন্তু এইবার কেন সে মহিষের মত বিলের কাদায় লুটাইয়া পড়িয়া থাকিতে যাইবে?

বাহাদুরি করিবার ঝোঁকে পরদিন সে ক্লাসের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজের ঘরে খাওয়াইল—প্রণব, জানকী, সতীশ, অনিল এমন কি সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের সেই ভূতপূর্ব ছাত্র চালবাজ মন্মথকে পর্যন্ত।

মন্মথ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হুর্‌রে!—আরে আমাদের অপূর্ব এসব করেছে কি! কোত্থেকে বাজে রাবিশ এক পুরনো পর্দা জুটিয়েছে দ্যাখো। এত্ খাবার কে খাবে?

অপু নীচের কারখানায় হেড মিস্ত্রীকে বলিয়া তাহাদের বড় লোহার চায়ের কেটলিটা ও একটা পলিতা-বসানো সেকেলে লোহার স্টোভ ধার করিয়া আনিয়া চা চড়াইয়াছে, একরাশ কমলালেবু; সিঙ্গাড়া, কচুরী, পানতুয়া, কলা ও কাঁচা পাঁপর কিনিয়া আনিয়াছে—সবাই দেখিতে দেখিতে খাবার অর্ধেকের উপর কমাইয়া আনিল। কথায় কথায় অপু তাহাদের দেশের বাড়ির কথা তুলিল—মস্ত দোতলা বাড়ি নদীর ধারে, এখনও পূজার দালানটা দেখিলে তাক্ লাগে, দেশে এখনও খুব নাম—দেনার দায়ে মস্ত জমিদারী হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাই আজ এ অবস্থা—নহিলে ইত্যাদি।

প্রণব চা পরিবেশন করিতে গিয়া খানিকটা জানকীর পায়ের উপর ফেলিয়া দিল। ঘরসুদ্ধ সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সতীশ আসিয়াই সটান্ শুইয়া পড়িয়াছিল অপুর বিছানায়, বলিল,—ওহে তোমরা কেউ আমার গালে একটা পানতুয়া ফেলে দাও তো! হাঁ ক'রে আছি—

সতীশ বলিল,—হাঁ হে ভাল কথা মনে পড়েছে! তোমার সেই জানালা কাব্যের নায়িকা কোন্ দিকে থাকেন? এই জানালাটি নাকি?—

অনিল বাদে আর সকলেই হাসি ও কলরবের সঙ্গে সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে গেল—অপু লজ্জামিশ্রিত সুরে বলিল—না না ভাই, ওদিকে যেও না—সে কিছু না, সব বানানো কথা আমার—ওসব কিছু না—

মেয়েটি পাগল এই ধারণা হওয়া পর্যন্ত তাহার কথা মনে উঠিলেই অপুর মন করুণার্দ্র হইয়া উঠে। তাহাকে লইয়া এই হাসি-ঠাট্টা তাহার মনে বড় বিঁধিল। কথার সুর ফিরাইবার জন্য সে নতুন কেনা পর্দাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরে হঠাৎ মনে পড়াতে সেই ঝুটা পাথরের আংটিটা বাহির করিয়া খুশীর সহিত বলিল,—এটা দ্যাখো তো কেমন হয়েছে? কত দাম হবে! মন্মথ দেখিয়া বলিল—এ কোথাকার একটা বাজে পাথর বসানো আংটি, কেমিকেল সোনার, এর আবার দামটা কি…দূর!

অনিলের এ কথাটা ভাল লাগিল না। মন্মথ ইতিপূর্বে অপুর পর্দাটা দেখিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে, ইহাও তার ভাল লাগে নাই। সে বলিল—তুমি তো জহুরী নও, সব তাতেই চাল দিতে আস কেন? চেনো এ পাথর?

—জহুরী হবার দরকারটা কি শুনি - এটা কি এমারেল্ড, না হীরে, না—

—শুধু এমারেল্ড আর হীরের নাম শুনে রেখেছ বৈ তো নয়? এটা কর্নেলিয়ান্—চেনো কর্নেলিয়ান্? অভ্রের খনিতে পাওয়া যায়, আমাদের ছিল, আমি খুব ভাল জানি।

অনিল খুব ভালই জানে অপুর আংটির পাথরটা কর্নেলিয়ান্ নয়, কিছুই নয়—শুধু মন্মথর কথার প্রতিবাদ করিয়া মন্মথর চালিয়াতি কথাবার্তায় অপুর মনে কোনও ঘা না লাগে সেই চেষ্টায় কর্নেলিয়ান্ ও টোপাজ পাথরের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিতে লাগিল। তার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে মন্মথ সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না।

তাহার পর প্রণব একটা গান ধরাতে উভয়ের তর্ক থামিয়া গেল। আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিখুশী, কথাবার্তা ও আরও বার-দুই চা খাইবার পর অন্য

সকলে বিদায় লইল, কেবল অনিল থাকিয়া গেল, অপুও তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিল।

সকলে চলিয়া যাইবার কিছু পর অনিল ভৎর্সনার সুরে বলিল—আচ্ছা, এসব আপনার কি কাণ্ড? (সে এতদিনের আলাপে এখনও অপুকে 'তুমি' বলে না) কেন এসব কিনলেন মিছে পয়সা খরচ ক'রে?

অপু হাসিয়া বলিল,—কেন তাতে কি? এসব তো—ভাল থাকতে কি ইচ্ছে যায় না?

—খেতে পান না এদিকে, আর মিথ্যে এই সব—সে যাক্, এই দামে পুরানো বইয়ের দোকানের সেই গিবনের সেটটা যে হয়ে যেতো। আপনার মত লোকও যদি এই ভুয়ো মালের পেছনে পয়সা খরচ করেন তবে অন্য ছেলের কথা কি? একটা পুরানো দূরবীন যে এই দামে হয়ে যেতো! আমার সন্ধানে একটা আছে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের এক জায়গায়—একটা সাহেবের ছিল—স্যাটার্নের রিং চমৎকার দেখা যায়—কম টাকায় হ'ত, মেম বিক্রী ক'রে ফেলছে অভাবে—আপনি কিছু দিতেন, আমি কিছু দিতাম, দু'জনে কিনে রাখলে ঢের বেশী বুদ্ধির কাজ হ'ত—

অপু অপ্রতিভের হাসি হাসিল। দূরবীনের উপর তাহার লোভ আছে অনেক দিন হইতে। এতক্ষণে তাহার মনে হইল—এ টাকার ইহা অপেক্ষাও সদ্ব্যয় হইতে পারিত বটে। কিন্তু সে যে ভাল থাকিতে চায়, ভাল ঘরে সুদৃশ্য সুরুচিসম্মত আসবাবপত্র রাখিতে চায়—সেটাও তো তার কাছে বড় সত্য—তাহাকেই বা সে মনে মনে অস্বীকার করে কি করিয়া?

অনিল আর কিছু বলিল না। পুরানো বাজারের এ-সব সস্তা খেলো মালকে তাহার বন্ধু যে এত খুশীর সহিত ঘরে আনিয়া ঘর সাজাইয়াছে, ইহাতেই সে মনে মনে চটিয়াছিল—শুধু অপুর মনে আর বেশী আঘাত দিতে ইচ্ছা না থাকায় সে বিরক্তি চাপিয়া গেল।

অপু বলিল—হুল্লোড়ে প'ড়ে তোমার খাওয়া হ'ল না অনিল, আর খান-কতক কাঁচা পাঁপর ভাজবো?

অনিল আর খাইতে চাহিল না। অপু বলিল—তবে চলো, কোথাও বেরুই—গড়ের মাঠে কি গঙ্গার ধারে।

অনিলও তাই চায়, বলিল, দেখুন অপূর্ববাবু, উনিশ কুড়ি একুশ বছর থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সের লোক পর্যন্ত কি রকম গলির মধ্যে বাড়ির সামনেকার ছোট্ট রোয়াকটুকুতে বসে আড্ডা দিচ্ছে—এমন চমৎকার বিকেল, কোথাও বেরুনো নেই,

শরীরের বা মনের কোনও অ্যাড্‌ভেঞ্চার নেই, আসনপিঁড়ি হয়ে সব ষষ্ঠী বুড়ি সেজে ঘরের কোণের কথা, পাড়ার গুজব, কি দরে কে ওবেলা বাজারে ইলিশ মাছ কিনেছে সেই সব—ওঃ হাউ আই হেট দেম্! আপনি জানেন না, এই সব র‍্যাঙ্ক স্টুপিডিটি দেখলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে—বরদাস্ত করতে পারি নে মোটে—গা যেন কেমন—

—কিন্তু ভাই, তোমার ও গড়ের মাঠে আমার মন ভোলে না—মোটরের শব্দ, মোটর বাইকের ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ, পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি—নামেই ভাই মাঠ, গঙ্গার কথা আর না-ই বা তুললাম !

—কাল আপনাকে নিয়ে যাব এক জায়গায় ! বুঝতে পারবেন একটা জিনিস—একটা ছেলে—আমার এক বন্ধুর বন্ধু—ছেলেটা সাউথ আফ্রিকায় মানুষ হয়েছে, সেইখানেই জন্ম—সেখান থেকে তার বাবা তাদের নিয়ে চলে এসেছে কলকাতায়, ফিয়ার্স লেনে থাকে। তার মুখের কথা শুনে এমন আনন্দ হয় ! এমন মন ! এখানে থেকে মরে যাচ্ছে—শুনবেন তার মুখে সেখানকার জীবনের বর্ণনা—হিংসে হয়, সত্যি !

অপু এখনি যাইতে চায়। অনিল বলিল, আজ থাক্ কাল ঠিক যাব দু'জনে ! দেখুন অপূর্ববাবু, কিছু যেন মনে করবেন না, আপনাকে তখন কি সব বললাম ব'লে। আপনারা কি জন্যে তৈরী হয়েছেন জানেন ? ওসব চিপ ফাইনারীর খদ্দের আপনারা কেন হবেন ? দেখুন, এ পুরুষ তো কেটে গেল, এ সময়ের কবি, বৈজ্ঞানিক, দাতা, লেখক, ডাক্তার, দেশসেবক—এঁরা তো কিছুদিন পরে সব ফৌত হবেন, তাঁদের হাত থেকে কাজ তুলে নিতে হবে কাদের, না, যারা এখন উঠছে। একদল তো চাই এই জেনারেশনের হাত থেকে সেই সব কাজ নেবার ? সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, আর্টে, দেশসেবায়, গানে—সব কিছুতে, নতুন দল যারা উঠছে, বিশেষ ক'রে যাদের মধ্যে গিফ্‌ট্‌ আছে, তাদের কি হুল্লোড় ক'রে কাটাবার সময় ?

অপু মুখে হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভারী খুশী হইল—কথার মধ্যে তাহারও যে দিবার কিছু আছে বা থাকিতে পারে সেদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বুঝিয়া।

পরে দু'জনে বেড়াইতে বাহির হইল।

ছাত্রীকে পড়াইতে যাইবার সময় অপুর গায়ে যেন জ্বর আসে, ছুটি-ছাটার দিনটা না যাইতে হইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। অদ্ভুত মেয়ে! এমন কারণে-অকারণে প্রভুত্ব জাহির করার চেষ্টা, এমন তাচ্ছিল্যের ভাব—এই রকম সে একমাত্র অতসীদি'তে দেখিয়াছে!

একদিন সে ছাত্রীর একটা রুপো-বাঁধানো পেন্সিল হারাইয়া ফেলিল। পকেটে ভুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, কোথায় ফেলিয়াছে, তারপর আর কিছু খেয়াল ছিল না, পরদিন প্রীতি সেটা চাহিতেই তাহার তো চক্ষুস্থির! সঙ্কুচিতভাবে বলিল—কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম—কাল বরং একটা কিনে—

প্রীতি অপ্রসন্ন মুখে বলিল, ওটা আমার দাদুমণির দেওয়া বার্থ-ডে গিফ্‌ট্‌ ছিল—

ইহার পর আর কিনিয়া আনিবার প্রস্তাবটা উত্থাপিত করা যায় না, মনে মনে ভাবিল, কাল থেকে ছেড়ে দেবো।—এখানে আর চলবে না।

কি একটা ছুটির পরদিন সে পড়াইতে গিয়াছে, প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল, কাল যে আসেন নি?

অপু বলিল, কাল ছিল ছুটির দিনটা—তাই আর আসি নি।

প্রীতি ফট করিয়া বলিয়া বসিল—কেন, কাল তো আমাদের সরকার, বাইরের দু'জন চাকর, ড্রাইভার সব এসেছিল? আমার পড়াশুনো কিছু হ'ল না, আজ ডিটেন্‌ ক'রে রাখলে পাঁচটা অবধি।

অপুর হঠাৎ বড় রাগ হইল, দুঃখও হইল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমাদের সরকার কি রাঁধুনীঠাকুর তো নই, প্রীতি! কাল স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল, এজন্য ভাবলাম আজ যাব না। আমার যদি ভুলই হয়ে থাকে—তোমার সেই রকম মাস্টার রেখো যিনি এখানে বাজার-সরকারের মত থাকবেন। আমি কাল থেকে আর আসব না বলে যাচ্ছি।

বাড়ির বাহিরে আসিয়া মনে হইল—দেওয়ানপুরের নির্মলাদের কথা। তাহারাও তো অবস্থাপন্ন, তাহাদের বাড়িতেও সে প্রাইভেট মাস্টার ছিল, কিন্তু সেখানে সে ছিল বাড়ির ছেলের মত—নির্মলার মা দেখিতেন ছেলের চোখে, নির্মলা দেখিত ভাইয়ের চোখে—সে স্নেহ কি পথেঘাটে সুলভ? নির্মলার মত মমতাময়ীকে

তখন সে চিনিয়াও চেনে নাই, আজ নতুন করিয়া তাহাকে আর চিনিয়া লাভ কি ? আর লীলা ? সে কথা ভাবিতেই বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—যাক্ সে সব কথা।

হাতের টাকায় কিছুদিন চলিল। ইতিমধ্যে কলেজে একটা বড় ঘটনা হইয়া গেল, প্রণব লেখাপড়া ছাড়িয়া কি নাকি দেশের কাজ করিতে চলিয়া গেল। সকলে বলিল. সে এনার্কিস্ট দলে যোগ দিয়াছে।

প্রণব চলিয়া যাওয়ার মাসখানেক পর একদিন অপু হোটেলে খাইতে গিয়া দেখিল. সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার মুখ ভার-ভার। দু'তিন মাসের টাকা বাকী, পাওনাদার আর কতদিন শোনে ? আজ সে স্পষ্ট জানাইল, দেনা শোধ না করিলে আর সে খাইতে পাইবে না। বলিল—বাবু. অন্য খদ্দের হলে মাসের পয়লাটি যেতে দিই নে—ওই কৃষ্টোবাবু খায়, ওদের পাটের কলের হপ্তাটি পেলে দিয়ে দেয়—তুমি, বলে আমি কিছু বলছি না—দু'মাসের ওপর আজ নিয়ে সাত দিন। যাক্ আর পারবো না. আপুনি আর আসবেন না—আমার ভাত একজন ভদ্দরনোকের ছেলে খেয়েছে ভাববো. আর কি করব ?

কথাগুলি খুব ন্যায্য এবং আদৌ অসঙ্গত নয়. কিন্তু খাইতে গিয়া এরূপ রূঢ় প্রত্যাখ্যানে অপুর চোখে জল আসিল। তাহার তো একদিনও ইচ্ছা ছিল না যে, ঠাকুরকে সে ফাঁকি দিবে. কিন্তু সেই প্রীতির টিউশনিটা ছাড়িয়া দেওয়ার পর আজ দুই-তিন মাস একেবারে নিরুপায় অবস্থায় ঘুরিতেছে যে !

বিপদের উপর বিপদ। দিন-দুই পরে কলেজে গিয়া দেখিল নোটিশ বোর্ডে লিখিয়া দিয়াছে, যাহাদের মাহিনা বাকী আছে, এক সপ্তাহের মধ্যে শোধ না করিলে কাহাকেও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। অপু চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রায় গোটা এক বৎসরের মাহিনাই যে তাহার বাকী !—মাত্র মাস-দুইয়ের মাহিনা দেওয়া আছে—সেই প্রথম দিকে একবার. আর প্রীতির টিউশনির টাকা হইতে একবার—তাহার পর হইতে খাওয়াই জোটে না তো কলেজের মাহিনা !—দশ মাসের বেতন ছ'টাকা হিসাবে ষাট টাকা বাকী। কোন দিক হইতে একটা কলঙ্কধরা নিকেলের সিকিও আসিবার সুবিধা নাই যাহার, ষাট টাকা সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোথা হইতে যোগাড় করিবে ? হয়ত তাহাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, গ্রীষ্মের ছুটির পর সেকেন্ড ইয়ারে উঠিতে দিবে না, সারা বছরের কষ্ট ও পরিশ্রম সব ব্যর্থ নিরর্থক হইয়া যাইবে।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় সে হাত-খরচের পয়সা হইতে

চাউল ও আলু কিনিয়া আনিয়া থাকিবার ঘরের সামনের বারান্দাতে রান্নার যোগাড় করিল। হোটেলে খাওয়া বন্ধ হইবার পর হইতে আজ কয়দিন নিজে রাঁধিয়া খাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছে ইহাতে খুব সস্তায় হয়, কাঠ কিনিতে হয় না। নিচের কারখানার ছুতার-মিস্ত্রীদের ঘর হইতে কাঠের চোঁচ ও টুক্‌রা কুড়াইয়া আনে, পাঁচ-ছ'য় পয়সায় খাওয়া দাওয়া হয়। আলুভাতে ডিমভাতে আর ভাত। ভাত চড়াইয়া ডাক দিল—ও বহু—বহু—নিয়ে এসো, আমার হয়ে গেল ব'লে—ছোট কাঁসিটাও এনো—

কারখানার দারোয়ান শম্ভুদত্ত তেওয়ারীর বৌ একখানা বড় পিতলের থালা ও কাঁসি লইয়া উপরে আসিল—এক লোটা জল ও গোটাকতক কাঁচা লংকাও আনিল।

থালা বাসন নাই বলিয়া সে-ই দুই বেলা থালা আনিয়া দেয়। হাসিমুখে বলিল, মছ্‌লিকা তরকারী হম্‌ নেহি ছুঁয়ে গা বাবুজি—

—কোথায় তোমার মছ্‌লি?—ও শুধু আলু—একটু হলুদবাটা এনে দ্যাও না বহু? রোজ রোজ আলুভাতে ভাল লাগে না—

বহুকে ভাল বলিতে হইবে, রোজ উচ্ছিষ্ট থালা নামাইয়া লইয়া যায়, নিজে মাজিয়া লয়—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ যাহা কখনও করে না—অপু বাধা দিয়াছিল, বহু বলে, তুম্‌ তো হামারে লেড়কাকে বরাবর হোগে বাবুজী—ইস্‌মে ক্যা হ্যায়?—

দিন কতক পর মায়ের একটা চিঠি আসিল, হঠাৎ পিছলাইয়া পড়িয়া সর্বজয়ার পায়ে বড় লাগিয়াছে, পয়সার কষ্ট যাইতেছে। মায়ের অভাবের খবর পাইলে অপু বড় ব্যস্ত হইয়া উঠে, মায়ের নানা কাল্পনিক দুঃখের চিন্তায় তাহার মনকে অস্থির করিয়া তোলে, হয়ত আজ পয়সার অভাবে মায়ের খাওয়া হইল না, হয়ত কেহ দেখিতেছে না, মা আজ দু'দিন উপবাস করিয়া আছে, এই-সব নানা ভাবনা আসিয়া জোটে, নিজের আলুভাতে ভাতও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না।

এদিকে আর এক গোলমাল—কারখানার ম্যানেজার ইতিপূর্বে তাহাকে বার-দুই ডাকাইয়া বলিয়াছেন, উপরে সে যে ঘরে আছে তার সমস্তটাই ঔষধের গুদাম করা হইবে—সে যেন অন্যত্র বাসা দেখিয়া লয়—বলিয়াছেন আজ মাস তিনেক আগে, তাহার পর আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই—অপুও থাকিবার স্থানের জন্য কোথায় কি ভাবে কাহার কাছে গিয়া চেষ্টা করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ নিশ্চেষ্টই ছিল এবং নিশ্চিন্ত ভাবে দিন যাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, ও-কথা হয়ত আর উঠিবে না—কিন্তু এইবার যেন সময় পাইয়াই ম্যানেজার বেশী

পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অপু এত সাধ করিয়া কেনা শখের আসবাবগুলি বেচিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে গেল প্লেটগুলি—তাও কেহই কিনিতে চায় না—অবশেষে চৌদ্দ আনায় এক পুরানো দোকানদারের কাছে বেচিয়া দিল। সেই দোকানদারই ফুলদানিটা আট আনায় কিনিল, দু'খানা ছবি দশ আনায়। তবু শেষ পর্যন্ত সে স্যাণ্ডোর ডাম্বেলটা ও জাপানী পর্দাটা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রহিল।

সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিল—ছাতু জিনিসটার অসীম গুণ—সস্তার দিক হইতেও বটে, অল্প খরচে পেট ভরাইবার দিক হইতেও বটে। আগে আগে চৈত্র বৈশাখ মাসে তাহার মা নতুন যবের ছাতু কুটিয়া তাহাদের খাইতে দিতেন—তখন ছাতু ছিল বৎসরের মধ্যে একবার পাল-পার্বণে শখ করিয়া খাইবার জিনিস, তাহাই এখন হইয়া পড়িল প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন। আগে একটু আধটু গুড়ে তাহার ছাতু খাওয়া হইত না, গুড় আরও বেশী করিয়া দিবার জন্য মাকে কত বিরক্ত করিয়াছে, এখন খরচ বাঁচাইবার জন্য শুধু নুন ও তেওয়ারী-বহুর নিকট হইতে কাঁচা লঙ্কা আনাইয়া তাই দিয়া খায়। অভ্যাস নাই, খাইতে ভাল লাগে না।

কিন্তু ছাতু খুব সুস্বাদু না হউক, তাহাও বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। অপু বুঝিতেছিল—টানাটানি করিয়া আর বড়-জোর দিন দশেক—তারপর কূলকিনারাহীন অজানা মহাসমুদ্র!···তখন কি উপায়?

সে রোজ সকালে উঠিয়া নিকটবর্তী এক লাইব্রেরীতে গিয়া দৈনিক ইংরেজী-বাংলা কাগজে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া দেখে। গ্যাসপোস্টের গায়েও অনেক সময় এই ধরণের বিজ্ঞাপন মারা থাকে—চলিতে চলিতে গ্যাসপোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়ানো তাহার একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইল। প্রায়ই বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন।—আলো ও হাওয়াযুক্ত ভদ্রপরিবারের থাকিবার উপযোগী দুইখানি কামরা ও রান্নাঘর. ভাড়া নামমাত্র। যদি বা কালেভদ্রে এক-আধটা ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, তার ঠিকানাটি আগে কেহ ছিঁড়িয়া দিয়াছে। কাপড় ময়লা হইয়া আসিল বেজায়, সাবানের অভাবে কাচিতে পারিল না। তেওয়ারীর স্ত্রী একদিন সোডা সাবান দিয়া নিজেদের কাপড় সিদ্ধ করিতে বসিয়াছে, অপু নিজের ময়লা শার্ট ও ধুতিখানা লইয়া গিয়া বলিল. বহু, তোমার সাবানের বোল একটু দেবে, আমি এ দুটোয় মাখিয়ে রেখে দি—তারপর ওবেলা কলেজ থেকে এসে কলে জল এলে কেচে নেবো—দেবে?···

তেওয়ারী-বধূ বলিল, দে দিজিয়ে না বাবুজী, হাম্ হাঁড়ি মে ডাল দেগা।

অপু ভাবে—আহা, বহু কি ভালো লোক!—যদি কখনও পয়সা হয় ওর উপকার করবো—

এক একবার তাহার মনে হয়, যদি কিছু না জোটে, তবে এবার হয়ত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া মনসাপোতা ফিরিতে হইবে—কিন্তু সেখানেও আর চলিবার কোনও উপায় নাই, তেলি ও কুণ্ডুরা পূজার জন্য অন্যস্থান হইতে পূজারী-বামুন আনাইয়া জায়গা-জমি দিয়া বাস করাইয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল মায়ের পত্রে সে-খবর জানিয়াছে, এখন তাহার মাকেও আর তেলিরা সাহায্য করে না, দেখে-শোনে না! মায়ের একাই চলে না—তার মধ্যে সে আবার কোথায় গিয়া জুটিবে?—তাহা ছাড়া পড়াশুনা ছাড়া? অসম্ভব!

সে নিজে বেশ বুঝিতে পারে, এই এক বৎসরে তাহার মনের প্রসারতা এত বাড়িয়া গিয়াছে, এমন একটা নতুন ভাবে সে জগৎটাকে, জীবনটাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—যা কিনা দশ বৎসর মনসাপোতা কি দেওয়ানপুরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলেও সম্ভব হইয়া উঠিত না। সে এটুকু বেশ বোঝে, কলেজে পড়িয়া ইহা হয় নাই, কোনও প্রফেসারের বক্তৃতাতেও না—যাহা কিছু হইয়াছে, এই বড় আলমারীভরা লাইব্রেরীটার জন্য, সে তাহার কাছে কৃতজ্ঞ।

যতক্ষণ সে লাইব্রেরীতে থাকে, ততক্ষণ তাহার খাওয়া-দাওয়ার কথা তত মনে থাকে না। এই সময়টা এক একটা খেয়ালের ঘোরে কাটে। খেয়ালমত এক একটা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে মনে, তাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বিকারের রোগীর মত অদম্য পিপাসায় সে সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায় হাতের কাছে—পড়িতে চেষ্টা করে। কখনও খেয়াল—নক্ষত্র জগৎ···কখনও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত একটা নিবিড় পরিচয়ের ইচ্ছা,—কখনও কীট্‌স্, কখনও হল্যাণ্ড রোজের নেপোলিয়ন। কোন খেয়াল থাকে দুদিন, কোনোটা আবার একমাস! তার কল্পনা সব সময়ই বড় একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে চায়—বড় ছবি, জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী, চাঁদের দেশের পাহাড়শ্রেণী, বর্তমান মহাযুদ্ধ, কোন বড়লোকের জীবনী।

কারখানার ম্যানেজার আর একদিন তাগিদ দিলেন। খুব সুখের বাসা ছিল না বটে, কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? হাতে কিছু না থাকায় সে এবার পর্দাটা একদিন বেচিতে লইয়া গেল। এটা তাহার বড় শখের জিনিস ছিল। পর্দাটাতে একটা জাপানী ছবি আঁকা—ফুলে ভরা চেরী গাছ, একটু জলরেখা, মাঝ-জলে বড়

বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটিয়া আছে, ওপারে ঢেউখেলানো কাঠের ছাদওয়ালা একটা দেবমন্দির, দূরে ফুজিসানের তুষারাবৃত শিখর একটু একটু নজরে পড়ে। এই ছবিখানার জন্যই সে পর্দাটা কিনিয়াছিল, এইজন্যই এত দিন হাতছাড়া করিতে পারে নাই—কিন্তু উপায় কি ? সাড়ে তিন টাকা দিয়া কেনা ছিল, বহু দোকান ঘুরিয়া তাহার দাম হইল এক টাকা তিন আনা।

পর্দা বেচিয়া অনেকদিন পর সে ভাত রাঁধিবার ব্যবস্থা করিল। ছাতু খাইয়া খাইয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, বাজার হইতে এক পয়সার কলমী শাকও কিনিয়া আনিল। মনে পড়িল—সে কলমী শাক ভাজা খাইতে ভালবাসিত বলিয়া ছেলেবেলায় দিদি যখন-তখন গড়ের পুকুর হইতে কত কলমী তুলিয়া আনিত ও দিন সাতেক পর্দা-বেচা পয়সায় চলিল মন্দ নয়, তারপরই যে-কে সেই ! আর প নাই, কিছুই নাই, একেবারে কানাকড়িটা হাতে নাই।

কলেজ যাইতে হইল না-খাইয়া। বৈকালে কলেজ হইতে বাহির হইয়া বে ? কি মাথা ঘুরিতে লাগিল, আর সেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা, পা নড়িতে না চাওয় মুশকিল এই যে, ক্লাসে মিথ্যা গর্ব ও বাহাদুরির ফলে সকলেই জানে সে অবস্থাপ.. ঘরের ছেলে, কাহারও কাছে বলিবার মুখও তো নাই। দু'-একজন যাহারা জানে যেমন জানকী—তাহাদের নিজেদের অবস্থাও তথৈবচ।

সারাদিন না খাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়াই শুইয়া পড়িল। রাত আটটার পরে আর না থাকিতে পারিয়া তেওয়ারী-বধূকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল —ছোলা কি অড়হরের ডাল আছে, বহু ? আজ আর ক্ষিদে নেই তেমন, রাঁধবো না আর, ভিজিয়ে খেতাম।

সকালে উঠিয়াই প্রথমে তাহার মনে আসিল যে, আজ সে একেবারে কপর্দকশূন্য। আজও কালকার মত না খাইয়া কলেজে যাইতে হইবে। কতদিন এভাবে চালাইবে সে ? না খাইয়া থাকার কষ্ট ভয়ানক—কাল লজিকের ঘণ্টার শেষে সেটা সে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল—বিকালের দিকে ক্ষুধাটা পড়িয়া যাওয়াতে তত কষ্ট বোঝা যায় নাই—কিন্তু সেই বেলা দুটোর সময়টা ! পেটে ঠিক যেন বোলতার ঝাঁক হুল ফুটাইতেছে—বার দুই জল খাইবার ঘরে গিয়া গ্লাস-কতক জল খাইয়া কাল যন্ত্রণাটা অনেকখানি নিবারণ হইয়াছিল। আজ আবার সেই কষ্ট সম্মুখে !

হাতমুখ ধুইয়া বাহির হইয়া বেলা দশটা পর্যন্ত সে আবার নানা গ্যাস-পোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইল, তাহার পর বাসায় না ফিরিয়া সোজা কলেজে

গেল। অন্য কেহ কিছু লক্ষ্য না করিলেও অনিল দু'তিনবার জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছে? মুখ শুকনো কেন? অপু অন্য কথা পাড়িয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। বই লইয়া আজ সে কলেজে আসে নাই, খালি হাতে কলেজ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘুরিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মা আজ দিন-বারো আগে টাকা চাহিয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন—টাকাও দেওয়া হয় নাই. পত্রের জবাবও না।

কথাটা ভাবিতেই সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল—না-খাওয়ার কষ্ট সে ভাল বুঝিয়াছে—মায়েরও হয়ত বা এতদিন না-খাওয়া শুরু হইয়াছে, কে জানে? তাহা ছাড়া মায়ের স্বভাবও সে ভাল বোঝে, নিজের কষ্টের বেলা মা কাহাকেও বলিবে — বা জানাইবে না. মুখ বুজিয়া সমুদ্র গিলিবে।

অপু অস্থির হইয়া পড়িল। এখন কি করে সে! জ্যাঠাইমাদের বাড়ি গিয়া বাগি খুলিয়া বলিবে?—গোটাকতক টাকা যদি এখন ধার পাওয়া যায় সেখানে, তাকে তো আপাততঃ পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে এখন।—কিন্তু খানিকটা ভাবিয়া দেখিল, সেখানে গিয়া সে টাকার কথা তুলিতেই পারিবে না—জ্যাঠাইমাকে সে মনে মনে ভয় করে। অখিলবাবু? সামান্য মাহিনা পায়, সেখানে গিয়া টাকা চাহিতে বাধে। তাহার এক সহপাঠীর কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, খুব বেশী আলাপ নাই, কিন্তু শুনিয়াছে বড়লোকের ছেলে—একবার যাইয়া দেখিবে কি? ছেলেটির বাড়ি বৌবাজারের একটা গলিতে, কলকাতার বনেদি ঘর, বড় তেতলা বাড়ি, পূজার দালান, সামনে বড় বড় সেকেলে ধরণের থাম, কার্নিসে একঝাঁক পায়রার বাসা; বাহিরের ফ্লোরের খোপটা একজন হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা ভাড়া লইয়া ছাতুর দোকান খুলিয়াছে। একটু পরেই অপুর সহপাঠী ছেলেটি বাহিরে আসিয়া বলিল—কৈ, কে ডাকছে—ও—তুমি?—রোল টুএল্‌ভ্‌; এক্সকিউজ মি—তোমার নামটা জানি নে ভাই—sorry—এস, এস, ভেতরে এস।

খানিকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব হইল। খানিকক্ষণ গল্প করিতে করিতে অপু বুঝিল, এখানে টাকার কথা তোলাটা তাহার পক্ষে কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার।—অসম্ভব—তাহা কি কখনও হয়? কি বলিয়া টাকা ধার চাহিবে সে এখানে? এই আমাকে এই—গোটাকতক টাকা ধার দিতে পার ক'দিনের জন্যে? কথাটা কি বিশ্রী শোনাইবে! ভাবিতেও যেন লজ্জা ও সঙ্কোচে তাহার মুখ ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটি বলিল—বা রে এখুনি উঠবে কি?—না না, বোসো, চা খাও—দাঁড়াও, আমি আসছি—

ঘিয়ে-ভাজা চিঁড়ে নিমকি, পেঁপে-কাটা, সন্দেশ ও চা। অপু ক্ষুধার মুখে লোভীর মত সেগুলি ব্যগ্রভাবে গোগ্রাসে গিলিল। গরম চা কয়েক চুমুক খাইতে শরীরের ঝিম্ ঝিম্ ভাবটা কাটিয়া মনের স্বাভাবিক অবস্থা যেন ফিরিয়া আসিল এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে টাকা ধার চাওয়াটা যে কতদূর অসম্ভব সেটাও বুঝিল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিল—ভাগ্যিস্—হাউ য়্যাব্‌সার্ড। তা' কি কখনও আমি—দূর!

রাত্রিতে শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িল, আগামীকাল নববর্ষের প্রথম দিন! কাল কলেজের ছুটি আছে। কাল একবার শ্যামবাজারে জ্যাঠাইমাদের বাড়িতে যাইবে, নববর্ষের দিনটা জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিয়া আসাও হইবে—সেটাও একটা কর্তব্য, তাহা ছাড়া—

মনে মনে ভাবিল—কাল গেলে জেঠিমা কি আর না খাইয়ে ছেড়ে দেবে? বছরকারের দিনটা—সেদিন সুরেশদা তো আর বাড়ির মধ্যে বলে নি—বললে কি আর খেতে বলত না? সুরেশদা ওই রকম ভুলো মানুষ!—

ভুল কাহার, পরদিন অপুর বুঝিতে দেরি হইল না। সকালে ন'টার সময় সুরেশদের বাড়ি গিয়া প্রথমে বাহিরে কাহাকেও পাইল না। বলা না, কওয়া না, হুপ্ করিয়া কি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া যাইবে? কি সমাচার, না নববর্ষের দিন প্রণাম করিতে আসিয়াছি—ছুতাটা যে বড় দুর্বল! সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া একেবারে জ্যাঠাইমাকে পাইল দরজার সামনের রোয়াকে। প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল, জ্যাঠাইমার মুখে যে বিশেষ প্রীতি বিকশিত হইল না, তাহা অপু ছাড়া যে-কেহ বুঝিতে পারিত। তাহার সংবাদ লইবার জন্য তিনি বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, সে-ই নিজের সঙ্কোচ ঢাকিবার জন্য অতসীদি কবে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, সুনীল বুঝি কোথায় বাহির হইয়াছে প্রভৃতি ধরণের মামুলী প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর জ্যাঠাইমা কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ বাড়ি নাই, সে দালানের একটি বেঞ্চিতে বসিয়া একখানা এল্. রায়ের ক্যাটালগ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার ভান করিল। বইখানার মধ্যে একখানা বিবাহের প্রীতি-উপহার, হাতে লইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল—সেখানা সুরেশের বিবাহের! সে দুঃখিতও হইল, আশ্চর্যও হইল, মাত্র মাসখানেক আগে বিবাহ হইয়াছে, সুরেশদা তাহার ঠিকানা জানে, সবই জানে, অথচ কি জ্যাঠাইমা, কি সুরেশদা, কেহই তাহাকে জানায় নাই।

'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সে জ্যাঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল ; জ্যাঠাইমা নির্লিপ্ত, অন্যমনস্ক সুরে বলিল—আচ্ছা তা' এসো—থাক্ থাক্—আচ্ছা।

ফুটপাতে নামিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবিল—সুরেশদার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ফাল্গুন মাসে, একবার বললেও না !—অথচ আমাদের আপনার লোক—আজ দ্যাখো না নববর্ষের দিনটা খেতেও বললে না—

খানিকদূরে আসিতে আসিতে তাহার কেমন হাসিও পাইল। আচ্ছা যদি বলতাম, জেঠিমা আমি এখানে এবেলা খাবো তাহলে—হি-হি—তাহলে কি হতো !

বাসার কাছে পথে সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার সঙ্গে দেখা। দুদুবার নাকি সে অপুর বাসায় গিয়াছে, পায় নাই, আজ পয়লা বৈশাখ, হোটেলের নতুন খাতা—টাকা দেওয়া চাই-ই। সুন্দর-ঠাকুর চীৎকারের সুরে বলিল—ভাতের তো এক পয়সা দিলে না—আবার লুচি খেলে বাবু ন'দিন—সাত আনা হিসাবে সাত নং তেষট্টি আনা—তিন টাকা পনেরো আনা—আজ তিন মাস ঘোরাচ্ছো, আজ খাতা মহরৎ—না দিলে হবেই না বলে দিচ্ছি।

অপুর দোষ—লোভে পড়িয়া সে কোথা হইতে শোধ দিবে না ভাবিয়াই ধারে আট-নয় দিন লুচি খাইয়াছিল। সুন্দর-ঠাকুরের চড়া চড়া কথায় পথে লোক জুটিয়া গেল—পথে দাঁড়াইয়া অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সে কোথা হইতে দিবে বিন্দু-বিসর্গ না ভাবিয়াই বলিল, বৈকালে নিশ্চয়ই সব শোধ করিয়া দিবে।

বৈকালে একটা বিজ্ঞাপনে দেখিল কোন্ স্কুলে একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা শিক্ষক দরকার, টাট্‌কা মারিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও কেহ ছেঁড়ে নাই। খুঁজিয়া তখনি বাহির করিল, মেছুয়াবাজারের একটা গলির মধ্যে কাহাদের ভাড়া বাড়ির বাহিরের ঘরে স্কুল—আপার প্রাইমারী পাঠশালা। জনকতক বৃদ্ধ বসিয়া দাবা খেলিতেছেন, একজন তাহার মধ্যে নাকি স্কুলের হেডমাস্টার। অঙ্কের শিক্ষক—দশ টাকা মাহিনা—ইত্যাদি। বাজার যা তাতে ইহাই যথেষ্ট।

অপুর মন বেজায় দমিয়া গেল। এই অন্ধকার স্কুলঘরটা, দারিদ্র্য, এই ত্রিকালোত্তীর্ণ বৃদ্ধগণের মুখের একটা বুদ্ধিহীন সন্তোষের ভাব ও মনের স্থবিরত্ব, ইহাদের সাহচর্য হইতে তাহাকে দূরে হটাইয়া লইতে চাহিল। যাহা জীবনের বিরোধী, আনন্দের বিরোধী, সর্বোপরি—তাহার অস্থিমজ্জাগত যে রোমান্সের তৃষ্ণা—তাহার বিরোধী, অপু সেখানে একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। ইহারা বৃদ্ধ বলিয়া যে এমন ভাব হইল অপুর, তাহা নয়, ইহাদের অপেক্ষাও বৃদ্ধ ছিলেন,

শৈশবের সঙ্গী নরোত্তম দাস বাবাজী। কিন্তু সেখানে সদাসর্বদা একটা মুক্তির হাওয়া বহিত, কাশীর কথককঠাকুরকেও এইজন্যই ভাল লাগিয়াছিল। অসহায়, দরিদ্র বৃদ্ধ একটা আশাভরা আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মনে—যেদিন জিনিসপত্র বাঁধিয়া হাসিমুখে নতুন সংসার বাঁধিবার উৎসাহে রাজঘাটের স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া দেশে রওনা হইয়াছিলেন।

স্কুল হইতে যখন সে বাহির হইল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহার কেমন একটা ভয় হইল—এ ভয়টা এতদিন হয় নাই। না খাইয়া থাকিবার বাস্তবতা ইতিপূর্বে এভাবে কখনও নিজের জীবনে সে অনুভব করে নাই—বিশেষ করিয়া যখন এখানে খাইতে পাওয়া নির্ভর করিতেছে নিজের কিছু একটা খুঁজিয়া বাহির করিবার সাফল্যের উপর। কিন্তু তাহার সকলের চেয়ে দুর্ভাবনা মায়ের জন্য। একটা পয়সা সে মাকে পাঠাইতে পারিল না, আজ এতদিন মা পত্র দিয়াছেন—কি করিয়া চলিতেছে মায়ের!—

কিন্তু এখানে তো কোনও কিছুই আশা দেখা যায় না—এত বড় কলিকাতা শহরে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহায় নাই, চেনাশোনা নাই, সে কোথায় যাইবে—কি করিবে?

পথে একটা মারোয়াড়ীর বাড়িতে বোধ হয় বিবাহ। সন্ধ্যার তখনও সামান্য বিলম্ব আছে, কিন্তু এরই মধ্যে সামনের লাল-নীল ইলেকট্রিক আলোর মালা জ্বালাইয়া দিয়াছে, দু'চারখানা মোটর ও জুড়ি গাড়ি আসিতে শুরু করিয়াছে। লুচি-ভাজার মন-মাতানো সুগন্ধে বাড়ির সামনেটা ভরপুর। হঠাৎ অপু দাঁড়াইয়া গেল। ভাবিল—যদি গিয়ে বলি আমি একজন পুওর স্টুডেন্ট—সারাদিন খাই নি— তবে খেতে দেবে না?—ঠিক দেবে—এত বড়লোকের বাড়ি, কত লোক তো খাবে—বলতে দোষ কি? কে-ই বা চিনবে আমায় এখানে?...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না। সে বেশ বুঝিল, মনে ষোল আনা ইচ্ছা থাকিলেও মুখ দিয়া এ কথা সে বলিতে পারিবে না কাহারও কাছে—লজ্জা করিবে। লজ্জা না করিলে সে যাইত। মুখচোরা হওয়ার অসুবিধা সে জীবনে পদে পদে দেখিয়া আসিতেছে।

কলিকাতা ছাড়িয়া মনসাপোতা ফিরিবে? কথাটা সে ভাবিতে পারে না—প্রত্যেক রক্তবিন্দু বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহার জীবন-সন্ধানী মন তাহাকে বলিয়া দেয় এখানে জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা—সেখানে অন্ধকার, দৈন্য, নিভিয়া যাওয়া। কিন্তু উপায় কই তাহার হাতে? সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে

নাই। সব দিকেই গোলমাল। কলেজের মাহিনা না দিলে, আপাততঃ পরীক্ষা দিতে দিলেও, বেতন শোধ না করিলে প্রমোশন বন্ধ। থাকিবার স্থানের এই দশা. দু'বেলা ওষুধের কারখানার ম্যানেজার উঠিয়া যাইবার তাগিদ দেয়, আহার তথৈবচ, সুন্দর-ঠাকুরের দেনা, মায়ের কষ্ট—একেই তো সে সংসারানভিজ্ঞ, স্বপ্নদর্শী প্রকৃতির—কিসে কি সুবিধা হয় এমনিই বোঝে না—তাহাতে এই কয় দিনের ব্যাপার তাহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

বাসায় আসিয়া ছাদের উপর বসিল। একখানা খাপ্‌রা কুড়াইয়া আনিয়া ভাবিল—আচ্ছা, দেখি দিক কোন্‌ পিঠটা পড়ে? পরে নিশ্চিন্দিপুরে বালো দিদির কাছে যেমন শিখিয়াছিল, সেই ভাবে চোখ বুজিয়া খাপ্‌রাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেখিল—একবার—দু'বার—কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার দিকটাই পড়ে। তৃতীয়বার ফেলিয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না।

বাল্যকাল হইতে নিশ্চিন্দিপুরের বিশালাক্ষী দেবীর উপর তাহার অসীম শ্রদ্ধা। করুণাময়ী দেবীর কথা কত সে শুনিয়াছে, সে তো তাঁর গ্রামের ছেলে—কলিকাতায় কি তাঁর শক্তি খাটে না?

পরীক্ষা হইবার দিনকয়েক পরে একদিন অনিল তাহাকে জানাইল সায়েন্স সেক্‌শনের মধ্যে সে গণিত ও বস্তু-বিজ্ঞানে প্রথম হইয়াছে, প্রফেসরের বাড়ি গিয়া নম্বর জানিয়া আসিয়াছে। অপু শুনিয়া আন্তরিক সুখী হইল, অনিলকে সে ভারী ভালবাসে, সত্যিকার চরিত্রবান্‌ বুদ্ধিমান ও উদারমতি ছাত্র। অনিলের যে জিনিসটা তাহার ভাল লাগে না, সেটা তাহার অপরকে তীব্রভাবে আক্রমণ ও সমালোচনা করিবার একটা দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন তুচ্ছ কাজে বা জিনিসে অপু তাহার আসক্তি দেখে নাই—কোনও ছোট কথা, কি সুবিধার কথা, কি বাজে খোসগল্প তাহার মুখে শোনে নাই।

অপু দেখিয়াছে সব সময় অনিলের মনে একটা চাঞ্চল্য, একটা অতৃপ্তি—তাহার অধীর মন মহাভারতের বকরূপী ধর্মরাজের মত সব সময়ই ফাঁদিয়া বসিয়া আছে—কা চ বার্তা?

অপুর সহিত এইজন্যেই অনিলের মিলিয়াছিল ভাল। দুজনের আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি এক ধরণের। অপুর বাংলা ও ইংরেজী লেখা খুব ভাল, কবিতা-প্রবন্ধ, মায় একখানা উপন্যাস পর্যন্ত লিখিয়াছে। দু'তিনখানা বাঁধানো খাতা ভর্তি—লেখা এমন কিছু নয়, গল্পগুলি ছেলেমানুষি ধরণের উচ্ছ্বাসে ভরা-

কবিতা রবি ঠাকুরের নকল, উপন্যাসখানাতে—জলদস্যুর দল, প্রেম, আত্মদান কিছুই বাদ যায় নাই—কিন্তু এইগুলি পড়িয়াই অনিল সম্প্রতি অপুর আরও ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তাহের শেষে দুজনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গেল। একটা ঝিলের ধারের ঘন সবুজ লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বসিয়া অনিল বন্ধুকে একটা সুসংবাদ দিল। বাগানে আসিয়া গাছের ছায়ায় এইভাবে বসিয়া বলিবে বলিয়াই এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল। তাহার বাবার এক বন্ধু তাহাকে খুব ভালবাসেন, বড়বনীর অভ্রের খনির তিনি ছিলেন একজন অংশীদার, তিনি গত পরীক্ষার ফলে অনিলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজের খরচে বিদেশে পাঠাইতে চাহিতেছেন, আই. এস. সি.-টা পাস দিলেই সোজা বিলাত বা ফ্রান্স।

—কেম্‌ব্রিজে কি ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজিতে পড়বো, রাদারফোর্ড আছেন, টম্‌সন্‌ আছেন—এঁদের সব দুবেলা দেখতে পাওয়া একটা পুণ্য—যুদ্ধ থামলে জার্মানীতে যাব, মস্ত জাত—বিরাট ভাইটালিটি—গয়টে, অস্টওয়াল্‌ডের দেশ—ওখানে কি আর না যাব?

অনিল অপুর বিদেশে যাইবার টান জানে—বলিল, আপনাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। না-হয় দুজনে আমেরিকায় চলে যাব—আমি সব ঠিক করব দেখবেন।

অনিলের প্রভাব যেমন অপুর জীবনে বিস্তার লাভ করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপুর চরিত্রের পবিত্রতা, মনের ছেলেমানুষি ও ভাবগ্রাহিতা অনিলের কঠোর সমালোচনা ও অযথা আক্রমণ-প্রবৃত্তিকে অনেকটা সংযত করিয়া তুলিতেছিল। দূরের পিপাসা অপুর আরও অনেক বেশী, অনেক উদ্দাম—কলিকাতার ধোঁয়া-ভরা, সংকীর্ণ, ভ্যাপ্‌সা-গন্ধ সিওয়ার্ড ডিচের ভিতর হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ যেন একটা উদার প্রান্তর, জ্যোৎস্না-মাখা মুক্ত আকাশ, পাখিদের আনন্দভরা পক্ষ-সঙ্গীতের, একটা বন-প্রান্তের রহস্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অপুর কথার সুরে, জীবন-পিপাসু নবীন চোখের দৃষ্টিতে, অন্ততঃ অনিলের তো মনে হয়।

কোন্‌ পথে যাওয়া হইবে সে কথা উঠিল। অপু উৎসাহে অনিলের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল—এসো একটা প্যাক্ট করি—দেখি হাত? এসো আমরা কখ্‌খনো কেরানীগিরি করব না, পয়সা পয়সা করব না কখ্‌খনো—সামান্য জিনিসে ভুলব না কখনও—ব্যাস্‌?···পরে মাটিতে একটা ঘুসি মারিয়া বলিল—খুব বড় কাজ কিছু একটা করব জীবনে।

অনিল সাধারণতঃ অপুর মত নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠে না, তবুও আজ উৎসাহের মুখে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল, বিলাতে পড়া শেষ করিয়া সে আমেরিকায় যাইবে, জাপান হইয়া দেশে ফিরিবে। বিদেশ হইতে ফিরিয়া সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়াই থাকিবে।

অপু বলিল—যখন দেশে ছিলাম, তখন আমার একখানা 'প্রাকৃতিক ভূগোল' ব'লে ছেঁড়া, পুরনো বই ছিল—তাতে লেখা ছিল, এমন সব নক্ষত্র আছে, যাদের আলো আজও এসে পৃথিবীতে পেঁছয় নি, সে-সব এত দূরে—মনে আছে, সন্ধ্যের সময় একটা নদীতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে নৌকার ওপর বসে সে কথা ভাবতাম, ওপারে একটা কদম গাছ ছিল, তার মাথাতে একটা তারা উঠত সকলের আগে, তারাটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—কি যে একটা ভাব হ'ত মনে! একটা mystery, একটা uplift-এর ভাব—ছেলেমানুষ তখন, সে-সব বুঝতাম না, কিন্তু সেই থেকে যখনই মনে দুঃখ হয়েছে, কি কোনও ছোট কাজে মন গিয়েছে, তখনই আকাশের নক্ষত্রদের দিকে চাইলেই আবার ছেলেবেলার সেই uplift-এর ভাবটা, একটা joy বুঝলে? একটা অদ্ভুত transcendental joy—সে ভাই মুখে তোমাকে—

বেলা পড়িলে দু'জনে স্টীমারে কলিকাতায় ফিরিল।

পরদিন কলেজের কমন-রুমে অনেকক্ষণ আবার সেই কথা।

কলেজ হইতে উৎফুল্ল মনে বাহির হইয়া অনিল প্রথমে দোকানে এক কাপ চা খাইল, পরে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া একটুখানি ভাবিল, কালীঘাটে মাসীর বাড়ি যাওয়ার কথা আছে, এখন যাইবে কিনা। একখানা বই কিনিবার জন্য একবার কলেজ স্ট্রীটেও যাওয়া দরকার। কোথায় আগে যায়? অপূর্ব একমাত্র ছেলে, যার কথা তার সব সময় মনে হয়। যে কোনরূপে হউক অপূর্বকে সে নিশ্চয়ই বিদেশ দেখাইবে।

তলপেটে অনেকক্ষণ হইতে একটা কী বেদনা বোধ হইতেছিল, এইবার যেন একটু বাড়িয়াছে, হাঁটিয়া চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, সেটা আর না যাওয়াই ভাল। সম্মুখেই ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রাম, সে ভাবিল—পরেরটাতে যাব, বেজায় ভিড়, ততক্ষণ বরং চিঠিখানা ডাকে ফেলে আসি।

নিকটেই লাল রংয়ের গোল ডাকবাক্স ফুটপাথের ধারে, ডাকবাক্সটার গা ঘেঁষিয়া একজন মুসলমান ফেরিওয়ালা পাকা কাঁচকলা বিক্রী করিতেছে, তাহার

বাজরায় পা না লাগে এইজন্য এক পায়ে ভর করিয়া অন্য পা-খানা একটু অস্বাভাবিক রকমে পিছনে বাঁকাভাবে পাতিয়া সে সবে চিঠিখানা ডাকবাক্সের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে—এখন সময় হঠাৎ পিছন হইতে যেন কে তীক্ষ্ম বর্শা দিয়া তাহার দেহটা এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিল, এক নিমেষে. অনিল সেটাতে হাত দিয়া সামলাইতেও যেন অবকাশ পাইল না। হঠাৎ যেন পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া গেল···চোখে অন্ধকার—কাঁচকলার বাজরার কানাটা মাথায় লাগিতেই মাথাটায় একটা বেদনা—মুসলমানটি কি বলিয়া উঠিল—হৈ হৈ, বহু লোক—কি হয়েছে মশায় ?···কি হ'ল মশায় ?···সরো সরো—বাতাস করো···বরফ নিয়ে এসো ···এই যে আমার রুমাল নিন না···

অনিলের দু'টি মাত্র কথা শুধু মনে ছিল—একবার সে অতিকষ্টে গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল—রি—রিপন কলেজ—অপূর্ব রায়—রিপন—

আর মনে ছিল সামনের একটা সাইন বোর্ড—গনেশচন্দ্র দাঁ এণ্ড কোং—কারবাইডের মশলা, তারপরেই সেই তীক্ষ্ম বর্শাটা পুনরায় কে যেন সজোরে তলপেটে ঢুকাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার—

কতক্ষণ পরে সে জানে না, তাহার জ্ঞান হইল। একটা বাক্স বা ঘরের মধ্যে সে শুইয়া আছে, ঘরটা বেজায় দুলিতেছে—পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা—কাহারা কি বলিতেছে, অনেক মোটরগাড়ির ভেঁপুর শব্দ—আবার ধোঁয়া ধোঁয়া···

পুনরায় যখন অনিলের জ্ঞান হইল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল একটা বড় সাদা দেওয়ালের পাশে একখানা খাটে সে শুইয়া আছে। পাশে তাহার বাবা ও ছোট কাকা বসিয়া, আরও তিনজন অপরিচিত লোক। নার্সের পোশাক-পরা দু'জন মেম। এটা হাসপাতাল ? কোন্ হাসপাতাল ? কি হইয়াছে তাহার ?··· তলপেটের যন্ত্রণা তখনও সমান. শরীর ঝিম্ ঝিম করিতেছে. সারা দেহ যেন অবশ।

পরদিন বেলা দশটার সময় অপু গেল। সে-ই কাল খবর পাইয়া তখনি ছুটিয়া শিয়ালদহের মোড়ে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল সত্যেন ও চার-পাঁচজন ছেলে। টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আনাইয়া তখনি সকলে মিলিয়া তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় ও বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার বলেন হার্নিয়া···স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া, তখনি অস্ত্র করা হইয়াছে।···

বৈকালেও সে গেল। কেবিন ভাড়া করা হইয়াছে, অনিলের মা বসিয়াছিলেন, অপু গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। অনিল এখন অনেকটা ভাল আছে, অস্ত্র করার পরে বেজায় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সারারাত ও সারাদিন—দুপুরের পর

সেটা একটু কম। তাহার মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। সে হাসিয়া অপুর হাত ধরিয়া কাছে বসাইল, বলিল—স্বাস্থ্যের মতন জিনিস আর নেই, যতই বলুন—এই তিনটে দিন যেন একেবারে মুছে গিয়েছে জীবন থেকে।

অপু বলিল—বেশী কথা বলো না, যন্ত্রণা কেমন এখন ?

অনিলের মা বলিলেন,—তোমার কথা সব শুনেছি, ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে বাবা সেদিন !

অনিল বলিল—দেখবেন মজা, ঘণ্টা নাড়লেই নার্স এখুনি ছুটে আসবে—বাজাব দেখবেন ?—সে হাসিয়া একটা হাত-ঘণ্টা বাজাইতেই লম্বা একজন নার্স আসিয়া হাজির। সে চলিয়া গেলে অনিলের মা বলিলেন—কি যে করিস্ মিছিমিছি ? ছিঃ—

দুজনেই খুব হাসিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া অপু সবে আলোটি জ্বালিয়াছে, এমন সময় সত্যেন ও অনিলের পিসতুতো ভাই ফণী—অপু তাহাকে হাসপাতালে প্রথম দেখিয়াছে, সেখানেই প্রথম আলাপ—ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকিল। সত্যেন বলিল—ওঃ, তোমাকে দু'বার এর আগে খুঁজে গেছি—এখুনি হাসপাতালে এস—জান না ?···

অপু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উহাদের মুখের দিকে চাহিতেই ফণী বলিল—অনিল মারা গিয়েছে এই সাড়ে ছটার সময়—হঠাৎ।

সকলে ছুটিতে ছুটিতে হাসপাতালে গেল। অনিলের মৃতদেহ খাট হইতে নামাইয়া সাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া মেঝেতে রাখিয়াছে। বহু আত্মীয়স্বজনে কেবিন ভরিয়া গিয়াছে, ক্লাসের অনেক ছেলে উপস্থিত, একদল ছেলে এইমাত্র এসেন্স ও ফুলের তোড়া লইয়া কেবিনে ঢুকিল। অল্প পরেই মৃতদেহ নিমতলায় লইয়া যাওয়া হইল।

সব কাজ শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল।

অন্য সকলে গঙ্গাস্নান করিতে লাগিল। অপু বলিল, তোমরা নাও, আমি গঙ্গায় নাইবো না, কলের জলে সকালবেলা নাইবো। কলকাতার গঙ্গায় নাইতে আমার মন যায় না।

অনিলের বাবার মত লোক সে কখনও দেখে নাই। এত বিপদেও তিনি সারারাত বাঁধানো চাতালে বসিয়া ধীরভাবে কাঠের নল বসানো সট্কাতে তামাক টানিতেছেন ! অপুকে বার-দুই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বাবা তোমার ঘুম লাগে নি

তো ?···কোনও কষ্ট হয় তো বলো বাবা।

অপু শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারে নাই।

সুনীল সিগারেট কেস্‌টা তাহার জিম্মায় রাখিয়া জলে নামিলে সে ঘাটের ধাপের উপর বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য জ্বলজ্বলে নক্ষত্র, রাত্রিশেষের আকাশে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল ওপারে জেসপ কোম্পানীর কারখানার মাথায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, পূর্ব-আকাশে চিত্রা প্রত্যাসন্ন দিবালোকের মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। অপু মনের মধ্যে কোনও শোক কি দুঃখের ভাব খুঁজিয়া পাইল না—কিন্তু মাত্র তিনদিন আগে কোম্পানীর বাগানে বসিয়া যেমন অনিলের সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সারা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির দিকে চাহিয়া বাল্যে নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখিবার দিনগুলির মত এক অপূর্ব, অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল—কেমন মনে হইতে লাগিল, কি একটা অসীম রহস্য ও বিপুলতার আবেগে নির্বাক নক্ষত্রজগৎটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হইতেছে।

অনিলের মৃত্যুর পর অপু বড় মুষড়াইয়া পড়িল। কেমন এক ধরণের অবসাদ শরীরে ও মনে আশ্রয় করিয়াছে, কোন কাজে উৎসাহ আসে না, হাত-পা উঠে না।

বৈকালে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলেজ-স্কোয়ারের একখানা বেঞ্চির উপর বসিল। এতদিন তো এখানে রহিল, কিছুই স্থির হইল না, এভাবে আর কতদিন চলে? ভাবিল, না হয় অ্যাম্বুলেন্সে যেতাম, কলেজের অনেকে তো যাচ্ছে, কিন্তু মা কি তা যেতে দেবে?

পরে ভাবিল—বাড়ি চলে যাই, মাসখানেক অর্ডারলি রিট্রিট্ করা যাক।

পাশে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়াছিলেন। মধ্যবয়সী লোক, চোখে চশমা, হাতের শিরগুলি দড়ির মত মোটা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাঁতারের ম্যাচ কবে হবে জানেন?

অপু জানে না, বলিতে পারিল না। ক্রমে দু-চার কথায় আলাপ জমিল। সাঁতারেরই গল্প। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল—তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থান ঘুরিয়াছেন। অপু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল।

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক—

অনেকদিনের একটা কথা অপুর মনে পড়িয়া গেল, সে সোজা হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি আপনাকে চিনি, আপনি অনেকদিন আগে বঙ্গবাসীতে 'বিলাত যাত্রীর চিঠি' লিখতেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক, সে দশ এগারো বছর আগেকার কথা—তুমি কি ক'রে জানলে? পড়তে না কি?

—ওঃ, শুধু পড়তাম না, হাঁ ক'রে বসে থাকতাম কাগজখানার জন্যে—তখন আমার বয়েস বছর দশ। পাড়াগাঁয়ে থাকতাম—কি inspiration যে পেতাম আপনার লেখা থেকে!···

ভদ্রলোকটি ভারী খুশী হইলেন। সে কি করে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন,—দ্যাখো কোথায় ব'সে কে লেখে আর কোথায় গিয়ে তার বীজ উড়ে পরে—বিলেতে হ্যাম্পস্টেডের একটা বোর্ডিং-এ ব'সে লিখতাম, আর বাংলায় এক obscure পাড়াগাঁয়ের এক ছোট ছেলে আমার লেখা পড়ে—বাঃ বাঃ—

ভদ্রলোকটির ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল। মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে জমি লইয়াছেন, নারিকেল ও ভ্যানিলার চাষ করিবেন। নিঃসম্বল তেরো বৎসরের নিগ্রো বালককে ইউরোপে আসিয়া নিজের উপার্জন নিজে করিতে দেখিয়াছেন, দেশের যুবকদের চাষবাস করিতে উপদেশ দেন।

ভদ্রলোকটিকে আর অপুর অপরিচিত মনে হইল না। তাহার বাল্যজীবনের কতকগুলি অবর্ণনীয়, আনন্দ-মুহূর্তের জন্য এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দায়ী, ইহারই লেখার ভিতর দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে সেই আনন্দ-ভরা প্রথম পরিচয়—

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উৎসাহ লইয়া সে ফিরিল। কে জানিত বঙ্গবাসীর সে লেখকের সঙ্গে এভাবে দেখা হইয়া যাইবে!···শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ, তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র পূর্ণ করিয়া তোমার অন্যমনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে···সে যে করিয়া হউক বাঁচিবে।

সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই, উঠানে তেলি-বাড়ির বড়-বৌ দাঁড়াইয়া কি গল্প করিতেছিল, দূর হইতে অপুকে আসিতে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—কে আসছে বলুন তো মা-ঠাকরুন?—সর্বজয়ার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অপু নয় তো—অসম্ভব—সে এখন কেন—

পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অপুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। সর্বজয়ার চোখের জলে তাহার জামার হাতটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন এবার নিজের অপেক্ষা মাথায় ছোট, দুর্বল ও অসহায় বলিয়া অপুর মনে হইতে লাগিল। তপঃকৃশ শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী, আলুথালু. অর্ধরুক্ষ চুলের গোছা একদিকে পড়িয়াছে, মুখের চেহারা এখনও সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখাবলী এখনও অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবার মায়ের চুল পাকিয়াছে. কানের পাশের চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সবল দৃঢ় বাহুবেষ্টনে. সরলা. চিরদুঃখিনী মাকে সংসারে সহস্র দুঃখ-বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপুর ইচ্ছা যায়। এ ভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল. ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই।

বড়-বৌ একপাশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল. সে অপুকে ছোট দেখিয়াছে, এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না। সর্বজয়া বলিল.—এবার ও এসেছে বৌমা. এবার কালই কিন্তু—।

অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি খুড়ীমা, কাল কি?

বড়-বৌ হাসিয়া বলিল,—দেখো কাল,—আজ বলবো না তো!

খিচুড়ি খাইতে ভালবাসে বলিয়া সর্বজয়া অপুকে রাত্রে খিচুড়ি রাঁধিয়া দিল; পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল. এই সাত-আটদিন পর আজ মায়ের কাছে। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ রে, সেখানে খিচুড়ি খেতে পাস?

অপুর শৈশবে তাহার মা শত প্রতারনার আবরণে নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাহাদের শিশুচক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিতেন. এখন আবার অপুর পালা। সে বলিল.—হুঁ, বাদলা হলেই খিচুড়ি হয়।

—কি ডালের করে?

—মুগের বেশী, মসুরীরও করে, খাঁড়ি মসুরী।

—সকালে জলখাবার খেতে দেয় কি কি?

অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের এক কাল্পনিক বিবরণ খুব উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ. চা, এক-একদিন লুচিও দেয়। খাওয়ার বেশ সুবিধা!

প্রীতির টুইশানি কোন্‌কালে চলিয়া গিয়াছে. কিন্তু অপু সে কথা মাকে জানায় নাই; সর্বজয়া বলিল—হ্যাঁ রে. তুই যে সে মেয়েটিকে পড়াস—তাকে কি ব'লে ডাকিস? খুব বড়লোকের মেয়ে. না?

—তার নাম ধরেই ডাকি—

—দেখতে-শুনতে বেশ ভাল ?

—বেশ দেখতে—

—হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে বিয়ে দেয় না ? বেশ হয় তা হলে—

অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল,—হ্যাঁ—তারা হ'ল বড়লোক—আমার সঙ্গে—তা কি কখনও—তোমার যেমন কথা !

সর্বজয়ার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস অপুর মত ছেলে পাইলে লোকে এখনি লুফিয়া লইবে। অপু ভাবে, তবুও তো মা আসল কথা কিছুই জানে না। প্রীতির টুইশানি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায় ?

অপু দেখিল—সে যে টাকা পাঠায় নাই, মা একটিবারও সে-কথা উত্থাপন করিল না, শুধুই তাহার কলিকাতার অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত নানা আগ্রহ-ভরা প্রশ্ন। নিজেকে এমন ভাবে সর্বপ্রকারে মুছিয়া বিলোপ করিতে তাহার মায়ের মত সে আর কাহাকেও এ পর্যন্ত দেখে নাই। সে জানিত বাড়ি গেলে এ লইয়া মা কোন কথা তুলিবে না।

সর্বজয়া একটা এনামেলের বাটি ও গ্লাস ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া হাসিমুখে বলিল,—এই দ্যাখ, এই দু'খানা ছেঁড়া কাপড় বদলে তোর জন্যে নিইচি—বেশ ভালো, না ?···কত বড় বাটিটা দ্যাখ।

অপু ভাবিল, মা যা দ্যাখে তাই বলে ভালো, এ আর কি ভালো, যদি আমার সেই পুরানো-দোকানে কেনা প্লেটগুলো মা দেখত !

কলিকাতায় সে দুরূহ জীবন-সংগ্রামের পর এখানে বেশ আনন্দে ও নির্ভাবনায় দিন কাটে। রাত্রে মায়ের কাছে শুইয়া সে আবার নিজেকে ছেলেমানুষের মত মনে করে—বলে, সেই গানটা কি মা, ছেলেবেলায় তুমি আর আমি শুয়ে শুয়ে রাত্রে গাইতাম—এক-একদিন দিদিও—সেই চিরদিন কখনও সমান না যায়—কভু বনে বনে রাখালের সনে, কভু বা রাজত্ব পায়—

পরে আবদারের সুরে বলে—গাও না মা, গানটা ?

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—হ্যাঁ, এখন কি আর গলা আছে—দূর—

—এসো দুজনে গাই—এসো না মা—খুব হবে, এসো—

সর্বজয়ার মনে আছে—অপু যখন ছোট ছিল তখন কোনও কোনও মেয়ে-মজলিসে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান হয়ত হইত, অপুর গলা ছিল খুব মিষ্ট কিন্তু তাহাকে প্রথমে কিছুতেই গান-গাওয়ানো যাইত না—অথচ যেদিন তাহার গাহিবার ইচ্ছা হইত, সেদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি বার বার বলিত, আমি কিন্তু

আজ গান গাইবো না, গাইতে বলো না। অর্থাৎ সেদিন তাকে এক-আধবার বলিলেই সে গাহিবে। সর্বজয়া ছেলের মন বুঝিয়া অমনি বলিত—তা অপু এবার কেন একটা গান কর্ না?···দু'একবার লাজুক মুখে অস্বীকার করার পর অমনি অপু গান শুরু করিয়া দিত।

সেই অপু এখন একজন মানুষের মত মানুষ। এত রূপ এ অঞ্চলের মধ্যে কে কবে দেখিয়াছে? একহারা চেহারা বটে, কিন্তু সবল, দীর্ঘ, শক্ত হাত-পা। কি মাথার চুল, কি ডাগর চোখের নিষ্পাপ পবিত্র দৃষ্টি; রাঙা ঠোঁটের দু'পাশে বাল্যের সে সুকুমার ভঙ্গী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু সর্বজয়াই তাহা ধরিতে পারে।

অপু কিন্তু সে ছেলেবেলার অপু আর নাই। প্রায় সবই বদলাইয়া গিয়াছে, সে অপূর্ব হাসি, সে ছেলেমানুষী, সে কথায় কথায় মান অভিমান, আবদার, গলার সে রিন্‌রিনে মিষ্টি সুর—এখনও অপুর স্বর খুবই মিষ্টি—তবুও সে অপরূপ বাল্যস্বর, সে চাঞ্চল্য—পাগলামি—সে সবের কিছুই নাই। সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলেমানুষ থাকে না কিন্তু অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব। সরলতায়, দুষ্টামিতে, রূপে, ভাবুকতায়—দেবশিশুর মত! এক ছেলে ছিল তাই কি, শত ছেলেতে কি হয়? সর্বজয়া মনে মনে বলে—বেশী চাই নে, দশটা পাঁচটা চাই নে ঠাকুর, ওকেই আর জন্মে আবার কোলজোড়া ক'রে দিও।

সর্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে, তারই স্মৃতি তার দুঃখ-ভরা জীবন-পথের পাথেয়। আর কিছুই সে চায় না।

কোনও কোনও দিন রাত্রে অপু মায়ের কাছে গল্প শুনিতে চায়। সর্বজয়া বলে—তুই তো কত ইংরেজী বই পড়িস, কত কি—তুই একটা গল্প বল না বরং শুনি। অপু গল্প করে। দু'জনে নানা পরামর্শ করে; সর্বজয়া পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাঁটাদহের সাণ্ডাল বাড়ি নাকি ভালো মেয়ে আছে সে শুনিয়াছে, অপু পাশটা দিলেই এইবার···

তারপর অপু বলিল,—ভালো কথা মা—আজকাল জ্যাঠিমারা কলকাতায় বাড়ি পেয়েছে যে! সেদিন তাদের বাড়ি গেছলাম—

সর্বজয়া বলে,—তাই নাকি?···তোকে খুব যত্নটত্ন করলে?—কি খেতে দিলে—

অপু নানা কথা সাজাইয়া বানাইয়া বলে। সর্বজয়া বলে,—আমায় একবার

নিয়ে যাবি—কলকাতা কখনও দেখি নি, বট্‌ঠাকুরদের বাড়ি দু'দিন থেকে মা-কালীর চরণ দর্শন ক'রে আসি তা হ'লে ?…

অপু বলে,—বেশ তো মা, নিয়ে যাব, যেও সেই পুজোর সময় ।

সর্বজয়া বলে,—একটা সাধ আছে অপু, বট্‌ঠাকুরদের দরুন নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা তুই মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস ভুবন মুখুযোদের কাছ থেকে, তবে—

সামান্য সাধ, সামান্য আশা। কিন্তু যার সাধ, যার আশা, তার কাছে তা ছোটও নয়, সামান্যও নয় । মায়ের ব্যথা কোন্‌খানে অপুর তাহা বুঝিতে দেরি হয় না । মায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া বাস করা, সে অপু জানে। সর্বজয়া বলে,—তুই মানুষ হ'লে, তোর একটা ভাল চাকরি হ'লে, তোর বৌ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করবো । বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস—বড় ইচ্ছে হয় ।

অপুর কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মা আর বেশীদিন বাঁচিবে না । মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে এবার, কেবলই অসুখে ভুগিতেছে । মুখে যত সান্ত্বনা দেওয়া, যত আশার কথা বলা—সব বলে । জানালার ধারে তক্তপোশে দুপুরের পর মা একটু ঘুমাইয়া পড়ে, অনেক বেলা পড়িয়া যায় । অপু কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে,—গা যে তোমার বেশ গরম, দেখি ?

সর্বজয়া সে-সব কথা উড়াইয়া দেয় । এ-গল্প ও-গল্প করে । বলে,—হ্যাঁরে, অতসীর মা আমার কথা-টথা কিছু বলে ?

অপু মনে মনে ভাবে—মা আর বাঁচবে না বেশী দিন । কেমন যেন—কেমন —কি ক'রে থাকব মা মারা গেলে ?

অনেক বেলা পড়িয়া যায়—

জানালার পাশেই একটা আতা গাছ । আতা-ফুলের মিষ্টি ভুরভুরে গন্ধ বৈকালের বাতাসে ! একটু পোড়ো জমি । এক ঢিবি সুরকি । একটা চারা জামরুল গাছ । পুরনো বাড়ির দেওয়ালের ধারে ধারে বনমূলার গাছ । কাঁটকারীর ঝাড় । একটা জায়গায় কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া সর্বজয়া শাকের ক্ষেত করিয়াছে ।

একটা অদ্ভুত ধরণের মনের ভাব হয় অপুর । কেমন এক ধরণের গভীর বিষাদ…মায়ের এই সব ছোটখাটো আশা, তুচ্ছ সাধ—কত নিষ্ফল ।…মা কি ওই শাকের ক্ষেতের শাক খাইতে পারিবে ?—কালীঘাটের কালীদর্শন করিবে

জ্যাঠাইমার বাসায় থাকিয়া !···নিশ্চিন্দিপুরের আমবাগান···

এক ধরণের নির্জনতা—সঙ্গীহীনতার ভাব···মায়ের উপর গভীর করুণা··· রাঙা রোদ মিলাইতেছে চারা জামরুল গাছটাতে···সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। ছাতারে ও শালিক পাখির দল কিচ্-মিচ ও ঝটাপটি করিতেছে।···

অপুর চোখে জল আসিল···কি অদ্ভুত নির্জনতা-মাখানো সন্ধ্যাটা! মুখে হাসিয়া সস্নেহে মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—আচ্ছা, মা, বড় বোয়ের সঙ্গে বাজি রেখেছিলে কি নিয়ে—বলো না—বললে না তো সেদিন ?···

ছুটি ফুরাইলে অপু বাড়ি হইতে রওনা হইল।

স্টেশনে আসিয়া কিন্তু ট্রেন পাইল না, গহনার নৌকা আসিতে অত্যন্ত দেরি হইয়াছে, ট্রেন আধ ঘণ্টা পূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সর্বজয়া ছেলের বাড়ি হইতে যাইবার দিনটাতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য কাপড়, বালিশের ওয়াড় সাজিমাটি দিয়া সিদ্ধ করিয়া বাঁশবনের ডোবার জলে কাচিতে নামিয়াছে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু বাড়ির দাওয়ায় জিনিসপত্র নামাইয়া ছুটিয়া ডোবার ধারে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল,—মা!···

সর্বজয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য দুপুর হইতে কাপড় সিদ্ধ লইয়া ব্যস্ত আছে, চমকিয়া পিছন দিকে চাহিয়া আনন্দ-মিশ্রিত সুরে বলে,—তুই!—যাওয়া হ'ল না ?

অপু হাসিমুখে বলে,—গাড়ি পাওয়া গেল না—এসো বাড়ি—

বাঁশবনের ছায়ায় মায়ের মুখে সেদিন যে অপূর্ব আনন্দের ও তৃপ্তির ছাপ পড়িয়াছিল, অপু পূর্বে কোনও দিন তাহা দেখে নাই—বহুকাল পর্যন্ত মায়ের এ মুখখানা তাহার মনে ছিল। সেদিন রাত্রে দুজনে নানা কথা। অপু আবার ছেলেবেলাকার গল্প শুনিতে চায় মা'র মুখে—সর্বজয়া লজ্জিত সুরে বলে,—হ্যাঁ, আমার আবার গল্প!···সে সব ছেলেবয়েসের গল্প—তা বুঝি এখন শুনে তোর ভাল লাগবে ? অপুকে আর সর্বজয়া বুঝিতে পারে না—এ সে ছোট্ট অপু নয়, যে ঠোঁট ফুলাইলেই সর্বজয়া বুঝিত ছেলে কি চাহিতেছে···এ কলেজের ছেলে, তরুণ অপু, এর মন, মতিগতি, আশা আকাঙ্ক্ষা—সর্বজয়ার অভিজ্ঞতার বাহিরে—অপু বলে,—না মা, তুমি সেই ছেলেবেলার শ্যামলঙ্কার গল্পটা করো। সর্বজয়া বলে, —তা আবার কি শুনবি—তুই বরং তোর বইয়ের একটা গল্প বল্—কত ভালো গল্প তো পড়িস ?···

পরদিন সে কলিকাতায় ফিরিল।

কলেজ সেই দিনই প্রথম খুলিয়াছে, প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা বাহির হইয়াছে, নোটিশ বোর্ডের কাছে রথযাত্রার ভিড়—সে অধীর আগ্রহে ভিড় ঠেলিয়া নিজের নামটা আছে কিনা দেখিতে গেল।

আছে! দু'তিনবার বেশ ভাল করিয়া দেখিল। আরও আশ্চর্য এই যে, পাশেই যে সব ছেলে পাশ করিয়াছে অথচ বেতন বাকী থাকার দরুন প্রমোশন পায় নাই, তাহাদের একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অপুর নাম নাই, অথচ অপু জানে তাহারই সর্বাপেক্ষা বেশী বেতন বাকী।

সে ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ভিড়ের বাহিরে আসিল। কেমন করিয়া এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল, নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও তখন কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

দু-তিনদিন পরে তাহার এক সহপাঠী নিজের প্রমোশন বন্ধ হওয়ার কারণ জানিতে অফিস-ঘরে কেরানীর কাছে গেল, সে-ও গেল সঙ্গে। হেড ক্লার্ক বলিল—একি ছেলের হাতের মোয়া হে ছোকরা! কত রোল?···পরে একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই দ্যাখো রোল টেন—লাল কালির মার্কা মারা রয়েছে—দু' মাসের মাইনে বাকী—মাইনে শোধ না দিলে প্রমোশন দেওয়া হবে না, প্রিন্সিপালের কাছে যাও, আমি আর কি করবো?

অপু তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল—তাহার রোল নম্বর কুড়ি—একই পাতায়। দেখিল অনেক ছেলের নামের সঙ্গে সঙ্গে কালিতে 'ডি' লেখা আছে অর্থাৎ ডিফল্টার—মাহিনা দেয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে নামের উল্টাদিকে মন্তব্যের ঘরে কোন্ কোন্ মাসের মাহিনা বাকী তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহার নামটাতে কোন কিছু দাগ বা আঁচড় নাই—একেবারে পরিষ্কার মুক্তার মত হাতের লেখা জ্বলজ্বল করিতেছে—রায় অপূর্বকুমার—লাল কালির একটা বিন্দু পর্যন্ত নাই;···

ঘটনা হয়ত খুব সামান্য, কিছুই না—হয়ত একটা সম্পূর্ণ কলমের ভুল, না হয় কেরানীর হিসাবের ভুল, কিন্তু অপুর মনে ঘটনাটা গভীর রেখাপাত করিল।

মনে আছে—অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় তাহার দিদি যেবার মারা গিয়াছিল, সেবার শীতের দিনে বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভাবিত, দিদি কি নরকে গিয়াছে? সেখানকার বর্ণনা সে মহাভারতে পড়িয়াছিল, ঘোর অন্ধকার নরকে শত শত

বিকটাকার পাখী ও তাহাদের চেয়েও বিকটাকার যমদূতের হাতে পড়িয়া তাহার দিদির কি অবস্থা হইতেছে! কথাটা মনে আসিতেই বুকের কাছটায় কি একটা আটকাইয়া যেন গলা বন্ধ হইয়া আসিত—চোখের জলে কাশবন শিমুলগাছ ঝাপসা হইয়া আসিত, কি জানি কেন, সে তাহার হাস্যমুখী দিদির সঙ্গে মহাভারতোক্ত নরকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেন কোন মতেই খাপ খাওয়াইতে পারিত না। তাহার মন বলিত, না—না—দিদি সেখানে নাই—সে জায়গা দিদির জন্য নয়।

তারপর ওপারে কাশবনে ম্লান সন্ধ্যার রাঙা আলো যেন অপূর্ব রহস্য মাখানো মনে হইত—আপনা-আপনি তাহার শিশুমন কোন্ অদৃশ্য শক্তির নিকট হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিত—আমার দিদিকে তোমরা কোন কষ্ট দিও না—সে অনেক কষ্ট পেয়ে গেছে—তোমাদের পায়ে পড়ি, তাকে কিছু বলো না—

ছেলেবেলার সে সহজ নির্ভরতার ভাব সে এখনও হারায় নাই। এই সেদিনও কলিকাতায় পড়িতে আসিবার সময়ও তাহার মনে হইয়াছিল—যাই না, আমি তো একটা ভাল কাজে যাচ্ছি—কত লোক তো কত চায়, আমি বিদ্যে চাইছি—আমায় এর উপায় ভগবান ঠিক ক'রে দেবেন—। তাহার এ নির্ভরতা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছিলেন দেওয়ানপুরের হেডমাস্টার মিঃ দত্ত। তিনি ছিলেন—ভক্ত ও বিশ্বাসী খৃষ্টান। তিনি তাহাকে যে-সব কথা বলিতেন অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে সে ভাবের কথা বলিতেন না। শুধু গ্রামার এ্যালজেব্রা নয়—কত উপদেশের কথা, গভীর বিশ্বাসের কথা, ঈশ্বর, পরলোক, অন্তরতম অন্তরের নানা গোপন বাণী। হয়ত বা তাঁহার মনে হইয়াছিল, এ বালকের মনের ক্ষেত্রে এসকল উপদেশ সময়ে অঙ্কুরিত হইবে।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি, রাস্তার ফেরিওয়ালা হাঁকিতেছে, 'পেয়ারাফুলি আম', 'ল্যাংড়া আম'—দিনরাত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, পথঘাটে জল কাদা। এই সময়টার সঙ্গে অপুর কেমন একটা নিরাশ্রয়তা ও নিঃসম্বলতার ভাব জড়িত হইয়া আছে, আর-বছর ঠিক এই সময়টিতে কলিকাতায় নূতন আসিয়া অবলম্বন-শূন্য অবস্থায় পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছিল, কি না জানি হয়, কোথায় না জানি কি সুবিধা জুটিবে—এবারও তাই।

ঔষধের কারখানায় এবার আর স্থান হয় নাই। এক বন্ধুর মেসে দিনকতক উঠিয়াছিল, এখন আবার অন্য একটি বন্ধুর মেসে আছে। নানাস্থানে ছেলে

পড়ানোর চেষ্টা করিয়া কিছুই জুটিল না, পরের মেসেই বা চলে কি করিয়া ? তাহা ছাড়া এই বন্ধুর ব্যবহার তত ভাল নয়, কেমন যেন বিরক্তির ভাব সর্বদাই— তাহার অবস্থা সবই জানে অথচ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, সে মেস খুঁজিয়া লইতে এত দেরি কেন করিতেছে—এ মাসটার পরে আর কোথাও সিট খালি পাওয়া যাইবে ? অপু মনে বড় আহত হইল। একদিন তাহার হঠাৎ মনে হইল খবরের কাগজ বিক্রয় করিলে কেমন হয় ? কলিকাতার খরচ চলে না ? মাকেও তো···

অপু সব সন্ধান লইল। তিন পয়সা দিয়া নগদ কিনিয়া আনিতে হয় খবরের কাগজের অফিস হইতে, চার পয়সায় বিক্রী, এক পয়সা লাভ কাগজ পিছু; কিন্তু মূলধন তো চাই; কাহারও কাছে হাত পাতিতে লজ্জা করে, দিবেই বা কে ? এই কলিকাতা শহরে এমন একজনও নাই যে তাহাকে টাকা দেয় ? সে সুদ দিতে রাজী আছে। সমীরের কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সে ভাল করিয়া কথা কয় না! ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে কারখানার তেওয়ারী-বৌয়ের কাছে গিয়া সব বলিল। তেওয়ারী-বৌ সুদ লইবে না। লুকাইয়া দু'টা মাত্র টাকা বাহির করিয়া দিল, তবে আশ্বিন মাসে তাহারা দেশে যাইবে, তাহার পূর্বে টাকাটা দেওয়া চাই।

ফিরিবার পথে অপু ভাবিল···বহুর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে, মায়ের মত দ্যাখে, আহা কি ভালো লোক !

পরদিন সকালে সে ছুটিল অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে। সেখানে কাগজ-বিক্রেতাদের মারামারি, সবাই আগে কাগজ চায়। অপু ভিড়ের মধ্যে ঢুকিতে পারিল না—কাগজ পাইতে বেলা হইয়া গেল। তাহার পর আর এক নূতন বিপদ —অন্য কাগজওয়ালাদের মত কাগজ হাঁকিতে পারা তো দূরের কথা, লোকে তাহার দিকে চাহিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, গলা দিয়া কোনও কথা বাহির হয় না। সকলেই তাহার দিকে চায়, সুশ্রী সুন্দর ভদ্রলোকের ছেলে কাগজ বিক্রয় করিতেছে, এ দৃশ্য তখনকার সময়ে কেহ দেখে নাই—অপু ভাবে—বা রে, আমি কি চড়কের নতুন সঙ্ নাকি ? খানিক দূরে আর একটা জায়গায় চলিয়া যায়। কাহাকেও বিনীত ভাবে মুখের দিকে না চাহিয়া বলে—একখানা খবরের কাগজ নেবেন ? অমৃতবাজার ?

কলেজে যাইবার পূর্বে মাত্র আঠারোখানি বিক্রয় হইল। বাকীগুলি এক খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা তিন পয়সা দরে কিনিয়া লইল। পরদিন লজ্জাটা অনেকটা কমিল, ট্রামে অনেকগুলি কাগজ কাটিল, বোধ হয় বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলে

বলিয়াই তাহার নিকট হইতে অনেকে কাগজ লইল।

মাসের শেষে একদিন কলেজে হৈ-চৈ উঠিল। গিয়া দেখে কোথাকার এক ছেলে লাইব্রেরীর একখানা বই চুরি করিয়া পালাইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে—তাহারই গোলমাল। অপু তাহাকে চিনিল—একদিন আর বছর সে ঠাকুরবাড়িতে খাইতে যাইতেছিল, ওই ছেলেটিও বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের দত্তবাড়ি দরিদ্র ছাত্র হিসাবে খাইতে যাইতেছিল। শীতের রাত্রি, খুব বৃষ্টি আসাতে দু'জনে এক গাড়ি-বারান্দার নীচে ঝাড়া দু'ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। ছেলেটি তখন অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া অতদূর খাইতে যায় শুনিয়া অপুর মনে বড় দয়া হয়। সে নামও জানিত, মেট্রোপলিটন কলেজে থার্ড ইয়ারের ছেলে তাহাও জানিত, কিন্তু কোনও কথা প্রকাশ করিল না! কলেজ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিসের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, দর্শনের অধ্যাপক বৃদ্ধ প্রসাদদাস মিত্র মধ্যস্থতা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

অপুর মনে বড় আঘাত লাগিল—সে পিছু পিছু গিয়া অখিল মিস্ত্রি লেনের মোড়ে ছেলেটিকে ধরিল। ছেলেটির নাম হরেন। সে দিশাহারার মত হাঁটিতেছিল, অপুকে চিনিতে পারিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অত্যন্ত অচল হইয়াছে, ছেঁড়া কাপড়, চারিদিকে দেনা, দত্তবাড়ি আজকাল আর খাইতে দেয় না—বর্ধমান জেলায় দেশ, এখানে কোনও আত্মীয়স্বজন নাই। অপু মির্জাপুর পার্কে একখানা বেঞ্চিতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইল, ছেলেটার মুখে বসন্তের দাগ, রং কালো, চুল রুক্ষ, গায়ের শার্ট কব্জির অনেকটা উপর পর্যন্ত ছেঁড়া। অপুর চোখে জল আসিতেছিল, বলিল—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো—খবরের কাগজ বিক্রি করবে? বাদামভাজা খাওয়া যাক্ এসো—এই বাদামভাজা—

পূজা পর্যন্ত দুজনের বেশ চলিল। পূজার পরই পুনর্মূষিক—তেওয়ারী-বৌয়ের দেনা শোধ করিয়া যাহা থাকিল, তাহাতে মাসিক খরচের কিছু অংশ কুলান হয় বটে, বেশীটাই হয় না। সেকেণ্ড ইয়ারের টেস্ট পরীক্ষাও হইয়া গেল, এইবারই গোলমাল—সারা বছরের মাহিনা ও পরীক্ষার ফী দিতে হইবে অল্পদিন পরেই।

উপায় কিছুই নাই। সে কাহারও কাছে কিছু চাহিতে পারিবে না। হয়ত পরীক্ষা দেওয়াই হইবে না। সত্যই তো, এত টাকা—এ তো আর ছেলেখেলা নয়? মন্মথকে একদিন হাসিয়া সব কথা খুলিয়া বলে। মন্মথ শুনিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল—এসব কথা আগে জানাতে হয় আমাকে। মন্মথ সত্যই খুব খাটিল। নিজের দেশের বার লাইব্রেরিতে চাঁদা তুলিয়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা আনিয়া

দিল, কলেজে প্রফেসারদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া ফেলিল, অল্পদিনের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকগুলি টাকা আসিতে দেখিয়া অপু নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু বাকী বেতন একরূপ শোধ হইলেও তখনও পরীক্ষার ফি-এর এক পয়সাও যোগাড় হয় নাই, মন্মথ ও বৌবাজারের সেই ছেলেটি বিশ্বনাথ—দু'জনে মিলিয়া ভাইস-প্রিন্সিপ্যালকে গিয়া ধরিল, অপূর্বকে কলেজের বাকী বেতন কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এদিকে ঔষধের কারখানায় থাকিবার সুবিধার জন্য অপু পুনরায় কারখানার ম্যানেজারের নিকটে গেল। এই মাস তিনেক যদি সেখানে থাকিবার সুবিধা পায়, তবে পরীক্ষার পড়াটা করিতে পারে। এর-ওর-তার মেসে সারা বছর অস্থিতপঞ্চক-ভাবে থাকিয়া তেমন পড়াশুনা হয় নাই। কারখানার আর সকলে অপুকে চিনিত, পছন্দও করিত, তাহারা বলিল—ওহে, তুমি একবার মিঃ লাহিড়ীর কাছে যেতে পার? ওর কাছে বলাই ভুল—মিঃ লাহিড়ী কারখানার একজন ডিরেক্টর, তাঁর চিঠি যদি আনতে পার, ও সুড়-সুড় ক'রে রাজী হবে এখন। ঠিকানা লইয়া অপু উপরি উপরি তিন-চার দিন ভবানীপুরে মিঃ লাহিড়ীর বাড়িতে গেল, দেখা পাইল না,—বড়লোকের গাড়িবারান্দার ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া চলিয়া আসে। দিনকতক কাটিল।

সেদিন রবিবার। ভাবিল, আজ আর দেখা না করিয়া আসিবে না। মিঃ লাহিড়ী বাড়ি নাই বটে, তবে বেলা এগারোটার মধ্যে আসিবেন। খানিকক্ষণ বসিয়া আছে, এমন সময় একজন ঝি আসিয়া বলিল—আপনাকে দিদিমণি ডাকছেন—

অপু আশ্চর্য হইয়া গেল। কোন্ দিদিমণি তাহাকে ডাকিবেন এখানে? সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমাকে? না—আমি তো—

ঝি ভুল করে নাই, তাহাকেই। ডানধারে একটা বড় কামরা, অনেকগুলা বড় বড় আলমারী, প্রকাণ্ড বনাত-মোড়া টেবিল, চামড়ার গদি-আঁটা আরাম চেয়ার ও বসিবার চেয়ার। সরু বারান্দা পার হইয়া একটা চকমিলানো ছোট পাথর-বাঁধানো উঠান; পাশের ছোট ঘরটায় হাতল-হীন চেয়ারে একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের তরুণী বসিয়া টেবিলে বই কাগজ ছড়াইয়া কি লিখিতেছে, পরনে সাদাসিদে আটপৌরে লালপাড় শাড়ি, ব্লাউজ, ঢিলে-খোঁপা, গলায় সরু চেন, হাতে প্লেন বালা—অপরূপ সুন্দরী! সে ঘরে ঢুকিতেই মেয়েটি হাসিমুখে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপু স্বপ্ন দেখিতেছে না তো? সকালে সে আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে!...নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিয়াও করা যায় না—আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—লীলা।

লীলা মৃদু মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। বলিল—চিনতে পেরেছেন তো দেখছি? আপনাকে কিন্তু চেনা যায় না—ওঃ কতকাল পর—আট বছর খুব হবে—না?

অপু এতক্ষণ পর কথা ফিরিয়া পাইল। সম্মুখের এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী লীলাও বটে, না-ও বটে। কেবল হাসির ভঙ্গি ও এক ধরণের হাত রাখিবার ভঙ্গিটা পরিচিত পুরনো।

সে বলিল, আট বছর—হঁ্যা তা—তো—তোমাকেও দেখলে চেনা যায় না! অপু 'আপনি' বলিতে পারিল না, মুখে বাধিল, লীলার সম্বোধনে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল।

লীলা বলিল—আপনাকে দু'দিন দেখেছি, পরশু কলেজে যাবার সময় গাড়িতে উঠছি, দেখি কে একজন গাড়িবারান্দার ধারে বেঞ্চিতে ব'সে—দেখে মনে হ'ল কোথায় দেখেছি যেন—আবার কালও দেখি ব'সে—আজ সকালে বাইরের ঘরে খবরের কাগজখানা এসেছে কিনা দেখতে জানলা দিয়ে দেখি আজও ব'সে—তখন হঠাৎ মনে হ'ল আপনি...তখন মাকে বলেছি, মা আসছেন—কি করছেন কলকাতায়? রিপনে?—বাঃ, তা এতদিন আছেন, একদিন এখানে আসতে নেই?

বাল্যের সেই লীলা!—একজন অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত আপনার লোক যেন দূরে চলিয়া গিয়া পর হইয়া পড়িয়াছে। 'আপনি' বলিবে না 'তুমি' বলিবে, দিশাহারা অপু তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। বলিল,—কি ক'রে আসব? আমি কি ঠিকানা জানি?

লীলা বলিল—ভাল কথা, আজ এখানে হঠাৎ কি ক'রে এসে পড়লেন?

অপু লজ্জায় বলিতে পারিল না যে, সে এখানে থাকিবার স্থানের সুপারিশ ধরিতে আসিয়াছে। লীলা জিজ্ঞাসা করিল—মা ভাল আছেন? বেশ—আপনার বুঝি সেকেণ্ড ইয়ার? আমার ফার্স্ট ইয়ার আর্টস্।

একটি মহিলা ঘরে ঢুকিলেন। অপু চিনিল, বিস্মিতও হইল। লীলার মা মেজ-বৌরানী, কিন্তু বিধবার বেশ। আট দশ বৎসর পূর্বের সে অতুলনীয় রূপরাশি এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলেও দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না। অপু পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। মেজ-বৌরানী বলিলেন—এসো বাবা

এসো, লীলা কালও বলেছে, কে একজন বসে আছে মা, ঠিক বর্ধমানের সেই অপূর্বর মত—আজ আমাকে গিয়ে বললে, ও আর কেউ নয় ঠিক অপূর্ব—তখনি আমি ঝিকে দিয়ে ডাকতে পাঠালাম—বসো, দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ভাল আছ বেশ? তোমার মা কোথায়?

অপু সঙ্কুচিতভাবে কথার উত্তর দিয়া গেল। মেজ-বৌরানীর কথায় কি আন্তরিকতার সুর! যেন কত কালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়তার আবহাওয়া। অপু কি করিতেছে, কোথায় থাকে, মা কোথায় থাকেন, কি করিয়া চলে, এবার পরীক্ষা দিয়া পুনরায় পড়িবে কি না, নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন। তারপর তিনি চা ও খাবারের বন্দোবস্ত করিতে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলে অপু বলিল—ইয়ে. তোমার বাবা কি—

লীলা ধরা গলায় বলিল—বাবা তো. এই তিন বছর হ'ল—এটা মামার বাড়ি—

অপু বলিল—ও! তাই ঝি বললে দিদিমণি ডাকছেন।—মানে উনি—না?·· মিঃ লাহিড়ী কে হন তোমার?

—দাদামশায়—উনি ব্যারিস্টার, তবে আজকাল আর প্র্যাক্‌টিশ করেন না—বড় মামা হাইকোর্টে বেরুচ্ছেন। ও-বছর বিলেত থেকে এসেছেন।

চা ও খাবার খাইয়া অপু বিদায় লইল। লীলা বলিল—বড় মামার মেয়ের নেম্‌-ডে পার্টি, সামনের বুধবারে। এখানে বিকালে আসবেন অবিশ্যি অপূর্ব বাবু—ভুলবেন না যেন—ঠিক কিন্তু ভুলবেন না।

পথে আসিয়া অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। 'অপূর্ববাবু'!—

লীলাই বটে, কিন্তু ঠিক কি সেই এগারো বছরের কৌতুকময়ী সরলা স্নেহময়ী লীলা?···সে লীলা কি তাহাকে 'অপূর্ববাবু' বলিয়া ডাকিত? তবুও কি আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা।···আর নিজের আপনার লোক জ্যাঠাইমাও তো কলিকাতায় আছেন—মেজ-বৌরানী সম্পূর্ণ পর হইয়া আজ তাহার বিষয়েতে যত খুঁটিনাটি আন্তরিক আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, জ্যাঠাইমা কোনও দিন তাহা করিয়াছেন?···

বাসায় ফিরিয়া কেবলই লীলার কথা ভাবিল। তাহার মনের যে স্থান লীলা দখল করিয়া আছে ঠিক সে স্থানটিতে আর কেহই তো নাই? কিন্তু সে এ লীলা নয়। সে লীলা স্বপ্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহার দেখা মিলিবে কোনও কালে? সে ঠিক বুঝিতে পারিল না—আজকার সাক্ষাতে সে

আনন্দিত হইয়াছে কি ব্যথিত হইয়াছে।

বুধবারের পার্টির জন্য সে টুইল শার্টটা সাবান দিয়া কাচিয়া লইল। ভাবিল, নিজের যাহা আছে তাহাই পরিয়া যাইবে, চাহিবার চিন্তিবার আবশ্যক নাই। তবুও যেন বড় হীনবেশ হইল। মনে মনে ভাবিল, হাতে যখন পয়সা ছিল, তখন লীলার সঙ্গে দেখা হ'ল না—আর এখন একেবারে এই দশা, এখন বিনা—!

লীলার দাদামশায় মিঃ লাহিড়ী খুব মিশুক লোক। অপুকে বৈঠকখানায় বসাইয়া খানিকটা গল্পগুজব করিলেন। লীলা আসিল, সে ভারি ব্যস্ত, একবার দু-চার কথা বলিয়াই চলিয়া গেল। কোনও পার্টিতে কেহ কখনও তাহাকে নিমন্ত্রণ করে নাই। যখন এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অপু খুব খুশী হইল। কলিকাতা শহরে এ রকম ধনী উচ্চশিক্ষিত পরিবারে মিশিবার সুযোগ—এ বুঝি সকলের হয়? মাকে গিয়া গল্প করিবার মত একটা জিনিস পাইয়াছে এতদিন পরে! মা শুনিয়া কি খুশীই যে হইবেন!

বৈঠকখানায় অনেক সুবেশ যুবকের ভিড়, প্রায় সবলেই বড়লোকের ছেলে, কেহ বা নতুন ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া আসিয়াছে কেহ বা ডাক্তার, বেশীর ভাগ বিলাত-ফেরত। কি লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক হইতেছিল। কর্পোরেশন ইলেক্‌শন লইয়া কথা কাটাকাটি। অপু এ বিষয়ে কিছু জানে না, সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাড়াগাঁয়ের কোন একটা মিউনিসিপ্যালিটির কথায় সেখানকার নানা অসুবিধার কথাও উঠিল।

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে সোনা-বাঁধানো চশমা, একটু টানিয়া টানিয়া কথা বলিবার অভ্যাস, মাঝে মাঝে মোটা চুরুটে টান দিয়া কথা বলিতেছিলেন—দেখুন মিঃ সেন, এগ্রিকালচারের কথা যে বলছেন, ও শখের ব্যাপার নয়— ও কাজ আপনার আমার নয়, ইট মাস্ট বি ব্রেড্ ইন্ দি বোন্—জন্মগত একটা ধাত গড়ে না উঠলে শুধু কলের লাঙল কিনলে ও হয় না—

প্রতিপক্ষ একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক, সাহেবী পোশাক-পরা, বেশ সবল ও সুস্থকায়। তিনি অধীরভাবে সামনে ঝুঁকিয়া বলিলেন—মাপ করবেন রমেশবাবু, কিন্তু এ-কথার কোনও ভিত্তি আছে ব'লে আমার মনে হয় না। আপনি কি বলতে চান তা হ'লে এডুকেশন, অর্গ্যানিজেশন, ক্যাপিটাল—এসবের মূল্য নেই এগ্রিকালচারে? এই যে—

—আছে, সেকেণ্ডারী—

—তবে চাষার ছেলে ভিন্ন কোনও শিক্ষিত লোক কখনও ওসবে যাবে না ?… কারণ ইট্ ইজ্ নট ব্রেড্ ইন্ হিজ বোন্ ? অদ্ভুত কথা আপনার—আমার সঙ্গে কেম্বিজে একজন আইরিশ ছাত্র পড়ত—লম্বা লম্বা চুল মাথায়, সুন্দর চেহারা, ধরণধারণে ট্রু পোয়েট। হয়ত সারারাত জেগে হল্লা করছে, একটা বেহালা নিয়ে বাজাচ্ছে—আবার হয়ত দেখুন সারাদিন পড়ছে, ব'সে কি লিখছে—নয় তো ভাবছে—ডিগ্রী নিয়ে চলে গেল বেরিয়ে ক্যানাডায়—গবর্ণমেণ্ট হোমস্টেড্ ল্যাণ্ডে জংলী জমি নিলে—ছোট্ট একটা কাঠের কুঁড়েঘরে সেই দুর্ধর্ষ শীতের মধ্যে তিন-চার বৎসর কাটালে—হোমস্টেড্ ল্যাণ্ডের নিয়ম হচ্ছে টাইট্‌ল হবার আগে পাঁচ বৎসর জমির ওপর বাস করা চাই—থেকে জমি পরিষ্কার করলে, নিজের হাতে রোজ জমি সাফ করে—লোকজন নেই, দুশো একর জমি, ভাবুন কতদিনে—

ওদিকে একদলের মধ্যে আলোচনা বেশ ঘনাইয়া আসিল। একজন কে বলিয়া উঠিল—ওসব মর্যালিটী, আপনি যা বলছেন, সেকেলে হয়ে পড়েছে—এটা তো মানেন যে, ওসব তৈরি হয়েছে বিশেষ কোনও সামাজিক অবস্থায়, সমাজকে বা ইন্‌ডিভিজুয়ালকে প্রোটেক্‌শান্ দেবার জন্যে, সুতরাং—

—বটে, তাহ'লে সবাই সুবিধাবাদী আপনারা। নর্ম্যাটিভ ভ্যালু ব'লে কোনও কিছুর স্থান নেই দুনিয়ায় ?…ধরুন যদি—

অপু খুব খুশী হইল। কলিকাতার বড়লোকের বাড়ির পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা ছাড়া শিক্ষিত বিলাত-ফেরত দলের মধ্যে এভাবে। নাটক-নভেলে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। সে অতীব খুশীর সহিত চারিধারে চাহিয়া একবার দেখিল—মার্বেলের বড় ইলেকট্রিক ল্যাম্প কড়ি হইতে ঝুলিতেছে, সুন্দর ফুলকাটা ছিটের কাপড়ে ঢাকা কৌচ, সোফা, দামী আয়না—বড় বড় গোলাপ, মোরাদাবাদের পিতলের গোলাপদানী। নিজের বসিবার কৌচখানা সে দু-একবার অপরের অলক্ষিতে টিপিয়া দেখিল। তাহা ছাড়া এ-ধরণের কথাবার্তা—এই তো সে চায় ! কোথায় সে ছিল পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছেলে—তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মামজোয়ানের স্কুলে পড়িতে যাইত, সে এখন কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে ! এ-ধরণের একটা উৎসবের মধ্যে তাহার উপস্থিতি ও পাঁচজনের একজন হইয়া বসিবার আত্মপ্রসাদে ঘরের তাবৎ উপকরণ ও অনুষ্ঠানকে যেন সে সারা দেহ-মন দ্বারা উপভোগ করিতেছিল।

কৃষিকার্যে উৎসাহী ভদ্রলোকটি অন্য কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু অপুর দক্ষিণ

ধারের দলটি পূর্ব আলোচনাই চালাইতেছেন এখনও। অপুর মনে হইল সে-ও এ-আলোচনায় যোগদান করিবে, আর হয়ত এ-ধরণের সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার সুযোগ জীবনে কখনও ঘটিবে না। এই সময় দু-এক কথা এখানে বলিলে সে-ও একটা আত্মপ্রসাদ। ভবিষ্যতে ভাবিয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে। পাঁস-নে চশমা-পরা যুবকটির নাম হীরক সেন। নতুন পাশ-করা ব্যারিস্টার! মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ—কি কথায় সে বলিল—ওসব মানি নে বিমলবাবু, দেহ একটা এঞ্জিন—এঞ্জিনের যতক্ষণ স্টীম থাকে, চলে—যেই কলকব্জা বিগড়ে যায়, সব বন্ধ—

অপু অবসর খুঁজিতেছিল, এই সময় তাহার মনে হইল এ-বিষয়ে সে কিছু কথা বলিতে পারে। সে দু-একবার চেষ্টা করিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কতকটা আনাড়ী, কতকটা মরীয়ার মত আরক্ত মুখে বলিল—দেখুন মাপ করবেন, আমি আপনার মতে ঠিক মত দিতে পারি নে—দেহটাকে এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি বলেন দেহ ছাড়া আর কিছু নেই—

ঘরের সকলেই তাহার দিকে যে কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতুকের সহিত চাহিতেছে, সেটুকু সে বুঝিতে পারিল—তাহাতে সে আরও অভিভূত হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু চাপিবার চেষ্টায় আরও মরীয়া হইয়া উঠিল।

একজন বাধা দিয়া বলিল—মশায় কি করেন, জানতে পারি কি?

—আমি এবার আই-এ দেবো।

পাঁস-নে চশমা-পরা যে যুবকটি এঞ্জিনের কথা তুলিয়াছিল, সে বলিল,—ইউনিভার্সিটির আরও দু-এক ক্লাস পড়ে এ তর্কগুলো করলে ভাল হয় না?

সে এমন অতিরিক্ত শান্তভাবে কথাগুলি বলিল যে, ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপুর মুখ দাড়িমের মত লাল হইয়া উঠিল।

যদি সে পূর্ব হইতেই ধারণা করিয়া না লইত যে, সে এ-সভায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং উহারা দয়া করিয়া তাহার এখানে উপস্থিতি সহ্য করিতেছে—তাহা হইলে এমন উগ্র ও অভদ্র ভাবের প্রত্যুত্তরে হয়ত তাহার রাগ হইত—কিন্তু সে তো কোনও কিছুতেই এদের সমকক্ষ নয়!—রাগ করিবার মত ভরসা সে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। তার অত্যন্ত লজ্জা হইল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঢাকিবার জন্য সে আরও মরীয়ার সুরে বলিল—ইউনিভার্সিটির ক্লাসে না পড়লে যে কিছু জানা যায় না একথা আমি বিশ্বাস করি নে—আমি একথা বলতে পারি কোনও ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র যে-কোনও কলেজের হিস্ট্রিতে কি ইংলিশ পোইট্রিতে—কিংবা জেনারেল নলেজে পারবে না আমার সঙ্গে।

নিতান্ত অপটু ধরণের কথা—সকলে আরও একদফা হাসিয়া উঠিল।

তারপর তাহারা নিজেদের মধ্যে অন্য কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হইল। অপু আধঘণ্টা থাকিলেও তাহার অস্তিত্বই যেন সবলে ভুলিয়া গেল। উঠিবার সময় তাহারা নিজেদের মধ্যে করমর্দন ও পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না।

যেভাবে সকলে তাহাকে উড়াইয়া দিল বা মানুষের মধ্যে গণ্য করিল না, তাহাতে সত্যই অপু অপমান ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পাশ কাটাইয়া সকলে চলিয়া গেল—কেহ একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন কৌতূহলও দেখাইল না। অপু মনে মনে ভাবিল—বেশ. না বলুক কথা—আমি কি জানি না-জানি, তার খবর ওরা কি জানে? সে জানত অনিল···

সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় লীলা আসিয়া তাহাকে নিজে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। বলিল,—মা, অপূর্ববাবু না খেয়েই চুপি চুপি পালাচ্ছিলেন!

লীলা বৈঠকখানার ব্যাপারটা না জানিতে পারে···

একটি ছোট আট-নয় বৎসরের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—একে চেনেন অপূর্ববাবু? এ সেই খোকামণি, আমার ছোট ভাই, এর অন্নপ্রাশনেই আপনাকে একবার আসতে বলেছিলুম, মনে নেই?

লীলার কয়েকটি সহপাঠিনী সেখানে উপস্থিত, সে সকলকে বলিল—তোমরা জান না, অপূর্ববাবুর গলা খুব ভাল, তবে গান গাইবেন কিনা জানি নে, মানে বেজায় লাজুক, আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, একটা অনুরোধ রাখবেন অপূর্ববাবু?

অপু অনেকের অনুরোধ-উপরোধে অবশেষে বলিল—আমি বাজাতে জানি নে —কেউ যদি বরং বাজান।—

খাওয়াটা ভালই হইল! তবুও রাত্রে বাসায় ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইতেছিল—আর কখনও এখানে সে আসিবে না। বড়লোকের সঙ্গে তাহার কিসের খাতির—দরকার কি আসিবার? দারুণ অতৃপ্তি।

যেদিন অপুর পরীক্ষা আরম্ভ হইবে তাহার দিন-পাঁচেক আগে অপু পত্রে জানিল মায়ের অসুখ, হস্তাক্ষর তেলি-বাড়ির বড়-বৌয়ের।

সন্ধ্যার সময় অপু বাড়ি পেঁছিল।

সর্বজয়া কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মনে হয়। অপুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অনেক দিন হইতেই অসুখে ভুগিতেছে, পরীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত হওয়ার ভয়ে খবর দেয় নাই, সেদিন তেলি-বৌ জোর করিয়া নিজে পত্র দিয়াছে। এমন যে কিছু শয্যাগত অবস্থা তাহা নয়, খায়-দায়, কাজকর্ম করে। আবার অসুখও হয়। সন্ধ্যা হইলেই শয্যা আশ্রয় করে, আবার সকালে উঠিয়া গৃহকর্ম শুরু করে। চিরদিনের গৃহিণীপনা এ অসুস্থ শরীরেও তাহাকে ত্যাগ করে নাই।

অপু বলিল—উঠো না বিছানা থেকে মা—শুয়ে থাকো—দেখি গা!

—তুই আয় বোস্—ও কিছু না—একটু জ্বর হয়, খাই-দাই—ও এমন সময়ে হয়েই থাকে। বোশেখ মাসের দিকে সেরে যাবে—তুই যে মেয়েকে পড়াস্, সে ভাল আছে তো?

সর্বজয়ার রোগশীর্ণ মুখের হাসিতে অপুর চোখে জল আসিল। সে পুঁটুলি খুলিয়া গোটাকতক কমলালেবু, বেদানা, আপেল বাহির করিয়া দেখাইল। জিনিসপত্র সস্তায় কিনিতে পারিলে সর্বজয়া ভারি খুশী হয়। অপু জানে মাকে আমোদ দিবার এটা একটা প্রকৃষ্ট পন্থা। কমলালেবু দেখাইয়া বলে কত সস্তায় কলকাতায় জিনিসপত্র পাওয়া যায় দ্যাখো—লেবুগুলো দশপয়সা—

প্রকৃতপক্ষে লেবু-ক'টির দাম ছ'আনা।

সর্বজয়া আগ্রহের সহিত বলিল—দেখি? ওমা, এখানে যে ওগুলোর দাম বারো আনার কম নয়—এখানে সব ডাকাত।

চার পয়সার এক তাড়া পান দেখাইয়া বলিল—বৈঠকখানা বাজার থেকে দু' পয়সায়—দ্যাখো মা—

সর্বজয়া ভাবে—এবার ছেলের সংসারী হইবার দিকে মন গিয়াছে, হিসাব করিয়া সে চলিতে শিখিয়াছে।

অপু ইচ্ছা করিয়াই লীলার সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটা উঠায় না। ভাবে, মা মনে মনে দুরাশা পোষণ করে, হয়ত এখনি বলিয়া বসিবে—লীলার সঙ্গে তোর বিয়ে হয় না?···দরকার কি, অসুস্থ মায়ের মনে সে-সব দুরাশার ঢেউ তুলিয়া?

এমন সব কথা কখনও অপু মায়ের সামনে বলে না, যাহা কিনা, মা বুঝিবে না। জগৎ সংসারটাকে মায়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপযোগী করিয়াই সে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করে। দিন-তিনেক সে বাড়ি রহিল। রোজ দুপুরে জানলার ধারের বিছানাটিতে সর্বজয়া শুইয়া থাকে, পাশে সে বসিয়া নানা গল্প করে।

ক্রমে বেলা যায়, রোদ প্রথমে ওঠে রান্নাঘরের চালায়, পরে বেড়ার ধারের পালতেমাদার গাছটার মাথায়, ক্রমে বাঁশঝাড়ের ডগায়। ছায়া পড়িয়া যায়—বৈকালের ঘন ছায়ায় অপুর মনে আবার একটা বিপুল নির্জনতা ও সঙ্গহীনতার ভাব আনে—গত গ্রীষ্মের ছুটির দিনের মত।

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—পাশটা হ'লে এবার তোর বিয়ের ঠিক করেছি এক জায়গায়। মেয়ের দিদিমা এসেছিল এখানে, বেশ লোক—

ঘরের কোণে একটা তাকে সংসারের জিনিসপত্র সর্বজয়া রাখিয়া দেয়—একটা হাঁড়িতে আমসত্ত্ব, একটা পাত্রে আচার। অপু চিরকালের অভ্যাস অনুসারে মাঝে মাঝে ভাঁড় হাঁড়ি খুঁজিয়া-পাতিয়া মাকে লুকাইয়া এটা-ওটা চুরি করিয়া খায়। এ কয়দিনও খাইয়াছে। সর্বজয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকে, টের পায় না—সেদিন দুপুরে অপু জানালাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে—গায়ে মায়ের গামছাখানা। হঠাৎ সর্বজয়া চোখ চাহিয়া বলিল—আমার গামছাখানা আবার পিষচো কেন?—ওখানা তিলে বড়ি দেবো ব'লে রেখে দিইচি—কুণ্ডুদের বাড়ির গামছা ওখানা, ভারি টনকো—আর সরে সরে তাকটার ঘাড়ে যাচ্ছ কেন?—ছুঁসনে তাক—তুমি এমন দুষ্টু হয়েচো, বাসি কাপড়ে ছুঁয়েছিলে তাকটা?

কথাটা অপুর বুকে কেমন বিঁধিল—মা সেরে উঠে তিলে বড়ি দেবে? তা দিয়েছে! মা আর উঠছে না—হঠাৎ তাহার মনে হইল, এই সেদিনও তো সে তাক হইতে আমসত্ত্ব চুরি করিয়াছে···মা, অসহায় মা বিছানায় জ্বরের ঘোরে পড়িয়া ছিল···একুশ বৎসর ধরিয়া মায়ের যে শাসন চলিয়াছিল আজ তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, নিজের অধিকার আর বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না কখনও···

অপু চতুর্থদিন সকালে চলিয়া গেল, কালই পরীক্ষা। চুকিয়া গেলেই আবার আসিবে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শোনে, সর্বজয়া রান্নাঘরে ইতিমধ্যে কখন ঘুম হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, ছেলের সঙ্গে গরম পরোটা দেওয়া যাইবে।

সর্বজয়ার এরকম কোনও দিন হয় নাই। অপু চলিয়া যাওয়ার দিনটা হইতে বৈকালে তাহার এত মন হু হু করিতে লাগিল, যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস অবস্থা। কত কথা, সারা জীবনের কত ঘটনা, কত আনন্দ ও অশ্রুর ইতিহাস একে একে মনে আসিয়া উদয় হয়। গত একমাস ধরিয়া এসব কথা মনে হইতেছে। নির্জনে বসিলেই বিশেষ করিয়া···। ছেলেবেলায়

বুধী বলিয়া গাই ছিল বাড়িতে···বাল্যসঙ্গিনী হিমিদি···দুজনে একসঙ্গে দো-পেটে· গাঁদাগাছ পুঁতিয়া জল দিত। একদিন হিমিদিও সে বন্যার জলে মাঠে ঘড়া বুকে সাঁতার কাটিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল আর একটু হইলেই···

বিবাহ···মনে আছে সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ছোট ভাই তখন বাঁচিয়া, লুকাইয়া তাহাকে নাড়ু দিয়া গিয়াছিল হাতের মুঠায়। ছোট্ট ছেলেবেলার অপু···কাচের পুতুলের মত রূপ···প্রথম স্পষ্ট কথা শিখিল, কি জানি কি করিয়া শিখিল 'ভিজে'। একদিন অপুকে কদ্‌মা হাতে বসাইয়া রাখিয়াছিল। —কেমন খেলি ও খোকা?

অপু দন্তহীন মুখে কদ্‌মা চিবাইতে চিবাইতে ফুলের মত মুখটি তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—'ভিজে'। হি-হি—ভাবিলে এখনও সর্বজয়ার হাসি পায়।

সেদিন দুপুর হইতেই বুকে মাঝে মাঝে ফিক্‌-ধরা বেদনা হইতে লাগিল। তেলি-বৌ আসিয়া তেল গরম করিয়া দিয়া গেল। দু'তিনবার দেখিয়াও গেল। সন্ধ্যার পর কেহ কোথাও নাই। একা নির্জন বাড়ি। জ্বও আসিল।

রাত্রে খুব পরিষ্কার আকাশে ত্রয়োদশীর প্রকাণ্ড বড় চাঁদ উঠিয়াছে। জীবনে এই প্রথম সর্বজয়ার একা থাকিতে ভয় ভয় করিতে লাগিল। খানিক রাত্রে একবার যেন মনে হইল, সে জলের তলায় পড়িয়া আছে. নাকে মুখে জল ঢুকিয়া নিশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে···একেবারে বন্ধ। সে ভয়ে এক-গা ঘামিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে কি মরিয়া যাইতেছে? এই কি মৃত্যু? —সে এখন কাহাকে ডাকে? জীবনে সর্বপ্রথম এই তাহার জীবনের ভয় হইল— ইহার আগে কখনও তো এমন হয় নাই! পরে নিজের ভয় দেখিয়া তাহার আর একদফা ভয় হইল। ভয় কিসের? না—না—মৃত্যু, সে এরকম নয়। ও কিছু না।

কত চুরি, কত পাপ···চুরিই যে কত করিয়াছে তাহার কি ঠিক আছে? ছেলেমেয়েকে খাওয়াইতে অমুকের গাছের কলার কাঁদিটা, অমুকের গাছের শসাটা লুকাইয়া রাখিত তক্তপোশের তলায়—ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ি হইতে একবার দশ পলা তেল ধার করিয়া আনিয়া ভালমানুষ রাণুর মার কাছে পাঁচ পলা শোধ দিয়া আসিয়াছিল, মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল—পাঁচ পলাই তো নিয়ে গিছলাম ন'দি— বোলো সেজ ঠাকুরঝিকে। সারাজীবন ধরিয়া শুধু দুঃখ ও অপমান। কেন আজ এসব কথা মনে উঠিতেছে?

ঘর অন্ধকার।···খাটের তলায় নেংটি ইঁদুর ঘুট্‌ ঘুট্‌ করিতেছে। সর্বজয়া

ভাবিল, ওদের বাড়ির কলটা না আনলে আর চলে না—নতুন মুগগুলো সব খেয়ে ফেললে। কিন্তু নেংটি ইঁদুরের শব্দ তো?—সর্বজয়ার আবার সেই ভয়টা আসিল. দুর্দমনীয় ভয়…সারা শরীর যেন ধীরে ধীরে অসাড় হইয়া আসিতেছে ভয়ে…পায়ের দিক হইতে ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে, যতটা উঠিতেছে, ততটা অসাড় করিয়া দিতেছে…না—পায়ের দিক হইতে না—হাতে আঙুলের দিক হইতে…কিন্তু তাহার সন্দেহ হইতেছে কেন? ইঁদুরের শব্দ নয় কেন? কিসের শব্দ? কখনও তো এমন সন্দেহ হয় না?…হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল না—পায়ের ও হাতের দিক হইতে সুড়সুড়ি কাটিয়া যাহা উপরের দিকে উঠিতেছে তাহা ভয় নয়—তাহা মৃত্যু। মৃত্যু? ভীষণ ভয়ে সর্বজয়া ধড়মড় করিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিতে গেল…চীৎকার করিতে গেল…খুব…খুব চীৎকার. আকাশফাটা চীৎকার—অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়াছে, আর সে চেঁচাইতে পারে না…গলা ভাঙিয়া আসিয়াছে…কেউ আসিল না তো?…কিন্তু সে তো বিছানা হইতে…বিছানা হইতে উঠিল কখন?…সে তো উঠে নাই—ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া সারা দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে. যেন খুব বড় একটা কালো মাকড়সা… শুঁড়ের বিষে দেহ অবশ…অসাড় হাতও নাড়ানো যায় না…পা-ও না…সে চীৎকার করে নাই…ভুল।…

সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে…একজনের কথাই মনে হয়…অপু…অপু…অপুকে ফেলিয়া সে থাকিতে পারিতেছে না…অসম্ভব।…বিস্ময়ের সহিত দেখিল—সে নিজে অনেকক্ষণ কাঁদিতেছে!…এতক্ষণ তো টের পায় নাই!…আশ্চর্য।…চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে যে!…

জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় হয় না…কেমন একটা আনন্দ…আকাশটা, পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে…টুপ…টুপ…টুপ…টাপ…। আবার কান্না পায়… জ্যোৎস্নার আলোয় জানালার গরাদে ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে?… সর্বজয়ার দৃষ্টি পাশের জানলার দিকে নিবদ্ধ হইল…বিস্ময়ে আনন্দে রোগশীর্ণ মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল…অপু…দাঁড়াইয়া আছে।…এ অপু নয়…সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট অপু…এতটুকু অপু…নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িত যাহার দন্তহীন ফুলের কুঁড়ির মত কচি মুখে…সেই অপু… ওর ছেলেমানুষ খঞ্জন পাখির মত ডাগর ডাগর চোখের নীল চাহনি…চুল কোঁকড়া

কোঁক্‌ড়া···মুখচোরা, ভালমানুষ লাজুক বোকা জগতের ঘোরপ্যাঁচ কিছুই একেবারে বোঝে না···কোথায় যেন সে যায়···নীল আকাশ বাহিয়া বহু দূরে··· বহু দূরের দিকে. সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে···যায়···যায়···যায়···যায়··· মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে মিলাইয়া যায়···

বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে।···কিন্তু তার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে···এতই সুন্দর···

কি হাসি! কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের!···

পরদিন সকালে তেলি-বাড়ির বড়-বৌ আসিল। দরজায় রাত্রে খিল দেওয়া হয় নয় নাই, খোলাই আছে, বড়-বৌ আপন মনে বলিল—রাত্রে দেখছি মা-ঠাকরুনের অসুখ খুব বেড়েছে, খিলটাও দিতে পারেন নি।

বিছানার উপর সর্বজয়া যেন ঘুমাইতেছেন। তেলি-বৌ একবার ভাবিল—ডাকিবে না—কিন্তু পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া উঠাইতে গেল। সর্বজয়া কোনও সাড়া দিলেন না, নড়িলেনও না। বড়-বৌ আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া নিকটে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিল।

পরক্ষণেই সে সব বুঝিল।

সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত—এমন কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলি-বাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিশ্বাস···একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস··· অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবনপথের বাধা?—কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন—। তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যু-সংবাদটা প্রথমে যে একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। তাহার পর সে বাড়ি রওনা হইল। উলা স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। এই প্রথম এ পথে সে

যাইতেছে—যেদিন মা নাই! গ্রামে ঢুকিবার কিছু আগে আধমজা কোদলা নদী, এ সময়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়—এরই তীরে কাল মাকে সবাই দাহ করিয়া গিয়াছে! বাড়ি পেঁৗছিল বৈকালে। এই সেদিন বাড়ি হইতে গিয়াছে, মা তখনও ছিলেন···ঘরে তালা দেওয়া, চাবি কাহাদের কাছে? বোধ হয় তেলি-বাড়ির ওরা লইয়া গিয়াছে। ঘরের পৈঠায় অপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উঠানের বাহিরে আগড়ের কাছে এক জায়গায় পোড়া খড় জড়ো করা। সেদিকে চোখ পড়িতেই অপু শিহরিয়া উঠিল—সে বুঝিয়াছে—মাকে যাহারা সৎকার করিতে গিয়াছিল, দাহ অন্তে তাহারা কাল এখানে আগুন ছুঁইয়া নিমপাতা খাইয়া শুদ্ধ হইয়াছে—প্রথাটা অপু জানে···মা মারা গিয়াছেন এখনও অপুর বিশ্বাস হয় নাই···একুশ বৎসরের বন্ধন, মন এক মুহূর্তে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে নাই···কিন্তু পোড়া খড়গুলাতে নগ্ন, রূঢ়, নিষ্ঠুর সত্যটা···মা নাই! মা নাই!···বৈকালের কি রূপটা! নির্জন, নিরালা, কোনও দিকে কেহ নাই। উদাস পৃথিবী, নিস্তব্ধ বিবাগী রাঙা রোদভরা আকাশটা।···অপু অর্থহীন দৃষ্টিতে পোড়া খড়গুলার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু মায়ের গায়ের কাঁথাখানা উঠানের আলনায় মেলিয়া দেওয়া কেন? কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল···সঙ্গেই তো যাওয়ার কথা। অনেক দিনের নিশ্চিন্দিপুরের আমলের, মায়ের হাতে সেলাই করা কল্কা-কাটা রাঙা সুতার কাজ।···কতক্ষণ সে বসিয়া ছিল জানে না, রোদ প্রায় পড়িয়া আসিল। তেলি-বাড়ির বড় ছেলে নাদুর ডাকে চমক ভাঙিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্লান হাসিয়া বলিল—এই যে আমার ঘরের চাবিটা তোমাদের বাড়ি?···

নাদু বলিল—কখন এলে, এখানে ব'সে একলাটি—বেশ তো দাদাঠাকুর—এসো আমাদের বাড়ি। অপু বলিল, না ভাই, তুমি চাবিটা নিয়ে এসো—ঘরের মধ্যে দেখি জিনিসগুলোর কি ব্যবস্থা। চাবি দিয়া নাদু চলিয়া গেল। —ঘর খুলে দ্যাখো, আমি আসছি এখুনি। অপু ঘরে ঢুকিল। তক্তপোশের উপর বিছানা নাই, বালিশ, মাদুর কিছু নাই——তক্তপোশটা পড়িয়া আছে-তক্তপোশের তলায় একটা পাথরের খোরায় কি ভিজানো—খোরাটা হাতে তুলিয়া দেখিল। চিরতা না নিমছাল কি ভিজানো—মায়ের ওষুধ।

বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে বলিল—ঘরের মধ্যে কে?—অপু খোরাটা তক্তপোশের কোণে নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে দাওয়ায় আসিল। নিরুপমা দিদি—নিরুপমাও অবাক—গালে আঙুল দিয়া বলিল—তুমি! কখন এলে ভাই?

—কৈ কেউ তো বলে নি !···

অপু বলিল—না, এই তো এলাম,— এই এখনও আধঘণ্টা হয় নি।

নিরুপমা বলিল—আমি বলি রোদ পড়ে গিয়েছে, কাঁথাটা কেচে মেলে দিয়ে এসেছি বাইরে, যাই কাঁথাখানা তুলে রেখে আসি কুণ্ডুদের বাড়ি। তাই আসছি—

অপু বলিল—কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল, না নিরুদি ?

—কোথায় ?···পরশু রাতে তো তাঁর—পরশু বিকেলে বড়-বৌকে বলেছেন কাঁথাখানা সরিয়ে রাখো মা—ও আমার অপুর জন্যে, বর্ষাকালে কলকাতা পাঠাতে হবে—সেই পুরানো তুলোজমানো কালো কম্বলটা ছিল···সেইখানা গায়ে দিয়েছিলেন—তিনি আবার প্রাণ ধ'রে তোমার কাঁথা নষ্ট করবেন ?···তাই কাল যখন ওরা তাঁকে নিয়ে-থুয়ে গেল তখন ভাবলাম রুগীর বিছানায় তো ছিল কাঁথাখানা, জলকাচা ক'রে রোদে দিই—কাল আর পারি নি—আজ সকালে ধুয়ে আলনায় দিয়ে গেলাম—তা এসো—আমাদের বাড়ি - ওসব শুনবো না—মুখ শুকনো—হবিষ্যি হয় নি ? এসো—

নিরুপমার আগে আগে সে কলের পুতুলের মত তাদের বাড়ি গেল। সরকার মহাশয় কাছে ডাকিয়া বসাইয়া অনেক সান্ত্বনার কথা বলিলেন।

নিরুদি কি করিয়া মুখ দেখিয়া বুঝিল খাওয়া হয় নাই ! নাদুও তো ছিল —কৈ কোনও কথা তো বলে নাই ?

সন্ধ্যার পর নিরুপমা একখানা রেকাবীতে আখ ও ফলমুল কাটিয়া আনিল। একটা কাঁসার বাটিতে কাঁচামুগের ডাল-ভিজা, কলা ও আখের গুড় নিয়া নিজে একসঙ্গে মাখিয়া আনিয়াছে। অপু কারুর হাতে চটকানো জিনিস খায় না, ঘেন্না ঘেন্না করে···প্রথমটা মুখে তুলিতে একটুখানি গা-কেমন করিতেছিল। তারপর দুই-এক গ্রাস খাইয়া মনে হইল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আস্বাদই তো !···নিজের হাতে বা মায়ের হাতে মাখিলে যা হইত—তাই। পরদিন হবিষ্যের সময় নিরুপমা গোয়ালে সব যোগাড়যন্ত্র করিয়া অপুকে ডাক দিল। উনুনে ফুঁ পাড়িয়া কাঠ ধরাইয়া দিল। ফুটিয়া উঠিলে বলিল—এইবার নামিয়ে ফ্যালো, ভাই।

অপু বলিল—আর একটু না—নিরুদি ?

নিরুপমা বলিল—নামাও দেখি,ও হয়ে গিয়েছে। ডালবাটাটা জুড়োতে দাও—

সব মিটিয়া গেলে সে কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিল। সর্বজয়ার জাঁতিখানা, সর্বজয়ার হাতে সই-করা খানদুই মনিঅর্ডারের রসিদ চালের বাতায় গোঁজা ছিল—সেগুলি, সর্বজয়ার নথ কাটিবার নরুণটা, পুঁটলির মধ্যে বাঁধিয়া লইল। দোরের পাশে ঘরের কোণে সেই তাকটা—আসিবার সময় সেদিকে নজর পড়িল। আচারভরা ভাঁড়, আমসত্ত্বের হাঁড়িটা, কুলচুর, মায়ের গঙ্গাজলের পিতলের ঘটি, সবই পড়িয়া আছে···যে যত ইচ্ছা খুশী খাইতে পারে যাহা খুশী ছুঁইতে পারে, কেহ বকিবার নাই, বাধা দিবার নাই। তাহার প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যে মুক্তি চায় না···অবাধ অধিকার চায় না—তুমি এসে শাসন করো, এসব ছুঁতে দিও না, হাত দিতে দিও না—ফিরে এসো মা···ফিরে এসো···

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, একটা তীব্র ঔদাসীন্য সব বিষয়ে, সকল কাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ানক নির্জনতার ভাবটা। পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কলিকাতায় থাকিতে একদণ্ডও ইচ্ছা হয় না···মন পাগল হইয়া উঠে, কেমন যেন পালাই-পালাই ভাব হয় সর্বদা, অথচ পালাইবার স্থান নাই, জগতে সে একেবারে একাকী—সত্যসত্যই একাকী।

এই ভয়ানক নির্জনতার ভাব এক এক সময় অপুর বুকে পাথরের মত চাপিয়া বসে, কিছুতেই সেটা সে কাটাইয়া উঠিতে পারে না, ঘরে থাকা তাহার পক্ষে তখন আর সম্ভব হয় না। গলিটার বাহিরে বড় রাস্তা, সামনে গোলদীঘি, বৈকালে গাড়ি, মোটর, লোকজন ছেলেমেয়ে। বড় মোটরগাড়িতে কোনও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মেয়েরা বাড়ির ছেলেমেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, অপুর মনে হয় কেমন সুখী পরিবার!—ভাই, বোন, মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, রাঙ্গাদি, বড়দা, ছোট কাকা। যাহাদের থাকে তাহাদের কি সব দিক দিয়াই এমন করিয়া ভগবান দিয়া দেন! অন্যমনস্ক হইবার জন্য এক-একদিন সে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীতে গিয়া বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাইয়া থাকে। কিন্তু কোথাও বেশীক্ষণ বসিবার ইচ্ছা হয় না, শুধুই কেবল এখানে-ওখানে, ফুটপাথ হইতে বাসায় বাসা হইতে ফুটপাথে। এক জায়গায় বসিলেই শুধু মায়ের কথা মনে আসে, উঠিয়া ভাবে গোলদীঘিতে আজ সাঁতারের ম্যাচের কি হ'ল দেখে আসি বরং—কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় বাহিরে কোথাও চলিয়া গেলে শান্তি পাওয়া যাইত—যে কোনও জায়গায়, যে কোন জায়গায়—পাহাড়ে, জঙ্গলে, হরিদ্বারে কেদার-বদরীর পথে—মাঝে মাঝে ঝরণা, নির্জন অধিত্যকায় কত ধরণের বিচিত্র বন্যপুষ্প, দেওদার ও পাইন বনের ঘন ছায়া, সাধু-সন্ন্যাসী দেবমন্দির, রামচটি,

শ্যামচাঁট কত বর্ণনা তো সে বইয়ে পড়ে, একা বাহির হইয়া পড়া মন্দ কি ?—কি হইবে এখানে শহরের ঘিঞ্জি ও ধোঁয়ার বেড়াজালের মধ্যে ?

কিন্তু পয়সা কৈ ? তাও তো পয়সার দরকার। তেলিরা কুড়ি টাকা দিয়াছিল মাতৃশ্রাদ্ধের দরুন, নিরুপমা নিজে হইতে পনেরো, বড়-বৌ আলাদা দশ। অপু সে টাকার এক পয়সাও রাখে নাই, অনেক লোকজন খাওয়াইয়াছে। তবু তো সামান্যভাবে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ !

দশপিণ্ড দানের দিন সে কি তীব্র বেদনা ! পুরোহিত বলিতেছেন—প্রেতা শ্রীসর্বজয়া দেবী—অপু ভাবে কাহাকে প্রেত বলিতেছে ? সর্বজয়া দেবী প্রেত ? তাহার মা, প্রীতি আনন্দ ও দুঃখ-মুহূর্তের সঙ্গিনী, এত আশাময়ী, হাস্যময়ী, এত জীবন্ত যে ছিল কিছুদিন আগেও, সে প্রেত ? সে আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূত-নিরাশ্রয়ঃ ?

তারপরই মধুর আশার বাণী—আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক, পথের ধূলি মধুময় হউক, ওষধি সকল মধুময় হউক, বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য, চন্দ্র, অন্তরীক্ষস্থিত আমাদের পিতা মধুময় হউন।

সারাদিনব্যাপী উপবাস অবসাদ, শোকের পর এ মন্ত্র অপুর মনে সত্য সত্যই মধুবর্ষণ করিয়াছিল, চোখের জল সে রাখিতে পারে নাই। হে আকাশের দেবতা, বাতাসের দেবতা, তাই কর, মা আমার অনেক কষ্ট ক'রে গিয়েছেন, তাঁর প্রাণে তোমাদের উদার আশীর্বাদের অমৃতধারা বর্ষণ কর।

এই অবস্থায় শুধুই ইচ্ছা করে যারা আপনার লোক, যারা তাহাকে জানে ও মাকে জানিত, তাহাদের কাছে যাইতে। এক জ্যাঠাইমারা আছেন—কিন্তু তাঁহাদের সহানুভূতি নাই, তবু সেখানেই যাইতে ইচ্ছা করে। তবুও মনে হয়, হয়ত জ্যাঠাইমা মায়ের দু'-পাঁচটা কথা বলিবেন এখন, দুটা সহানুভূতির কথা হয়ত বলিবেন—।

মাস-তিনেক এভাবে কাটিল। এ তিন মাসের কাহিনী তাহার জীবনের ইতিহাসে একটা একটানা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী। ভবিষ্যৎ জীবনে অপু এ গলিটার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারে একবার বড় রাস্তা হইতে গলির মোড়ে চাহিয়া দেখিত, আর কখনও সে ইহার মধ্যে ঢোকে নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একদিন খবরের কাগজে দেখিল—যুদ্ধের জন্য লোক লওয়া হইতেছে, পার্ক স্ট্রীটে তাহার অফিস। দুপুরে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গেল

পার্ক স্ট্রীটে।

টেবিলে একরাশ ছাপানো ফর্ম পড়িয়া ছিল, অপু একখানা তুলিয়া পড়িয়া রিক্রুটিং অফিসারকে বলিল—কোথাকার জন্য লোক নেওয়া হবে?

—মেসোপটেমিয়া, রেলওয়ে ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগের জন্য। তুমি কি টেলিগ্রাফ জানো—না মোটর মিস্ত্রী?

অপু বলিল—সে কিছুই নহে। ও-সব কাজ জানে না, তবে অন্য যে-কোন কাজ—কি কেরানীগিরি—

সাহেব বলিল—না, দুঃখিত। আমরা শুধু কাজ-জানা লোক নিচ্ছি—বেশীর ভাগ মোটর ড্রাইভার, সিগন্যালার, স্টেশন মাস্টার সব!

এই অবস্থায় একদিন লীলার সঙ্গে দেখা। ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ডালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে সে রাস্তা পার হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সামনে একখানা হল্‌দে রঙের বড় মিনার্ভা গাড়ি ট্রাফিক পুলিসে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল—হঠাৎ গাড়িখানার দিক হইতে তাহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল।

সে গাড়ির কাছে গিয়া দেখিল, লীলা ও আর দুই-তিনটি অপরিচিত মেয়ে। লীলার ছোটভাই ড্রাইভারের পাশে বসিয়া। লীলা আগ্রহের সুরে বলিল—আপনি আচ্ছা তো অপূর্ববাবু? তিন-চার মাসের মধ্যে দেখা করলেন না, কেন বলুন তো? মা সেদিনও আপনার কথা—

অপুর আকৃতিতে একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনার কি হয়েছে? অসুখ থেকে উঠেছেন নাকি, শরীর—মাথার চুল অমন ছোট-ছোট, কি হয়েছে বলুন তো?

অপু হাসিয়া বলিল—কই না, কি হবে—কিছু তো হয় নি?

—মা কেমন আছেন?

—মা? তা মা—মা তো নেই। ফাল্গুন মাসে মারা গিয়েছেন।

কথা শেষ করিয়া অপু আর এক দফা পাগলের মত হাসিল।

হয়ত বাল্যের সে প্রীতি নানা ঘটনায়, বহু বৎসরের চাপে লীলার মনে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, হয়ত ঐশ্বর্যের আঁচ লাগিয়া সে মধুর বাল্যমন অন্যভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল ধীরে-ধীরে, অপুর মুখের এই অর্থহীন হাসিটা যেন একখানা তীক্ষ্ম ছুরির মত গিয়া তাহার মনের কোন্ গোপন মণিমঞ্জুষার রুদ্ধ ঢাকনির ফাঁকটাতে হঠাৎ একটা সজোরে চাড়া দিল, এক মুহূর্তে অপুর সমস্ত ছবিটা

তাহার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিল—সহায়হীন, মাতৃহীন, আশ্রয়হীন, পথে-পথে বেড়াইতেছে—কে মুখের দিকে চাহিবার আছে ?

লীলার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আপনি আমাদের ওখানে কবে আসবেন বলুন—না, ও-রকম বললে হবে না। এ-কথা আমাদের জানানো আপনার উচিত ছিল না ? অন্ততঃ মাকেও বলা তো—কাল সকালে আসুন—ঠিক বলুন আসবেন ? কেমন ঠিক তো—সেবারকার মত করবেন না কিন্তু—ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা বলুন তো কি—ভুলবেন না কিন্তু—।

গাড়ি চলিয়া গেল ।

বাসায় ফিরিয়া অপু মনের মধ্যে অনেক তোলাপাড়া করিল। লীলার মুখে সে একটা কিসের ছাপ দেখিয়াছে, বর্তমান অবস্থায় মন তাহার এই আন্তরিকতার স্নেহস্পর্শটুকুরই কাঙ্গাল বটে—কিন্তু এই বেশে কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না, এই জামায়. এই কাপড়ে, এই ভাবে। থাক বরং।

তিনদিন পর নিজের নামে একখানা পত্র আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল—মা ছাড়া আর তো কাহারও পত্র সে পায় নাই। কে পত্র দিল ? পত্র খুলিয়া পড়িল :—

অপূর্ববাবু,

আপনার এখানে আসবার কথা ছিল সোমবারে, কিন্তু আজ শুক্রবার হয়ে গেল আপনি এলেন না। আপনাকে মা একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আসতে বলেছেন, না এলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আপনার আসা চাই-ই। নমস্কার নেবেন।

লীলা

কথাটা লইয়া মনের মধ্যে সে অনেক বোঝাপড়া করিল। কি লাভ গিয়া ? ওরা বড়মানুষ, কোন্ বিষয়ে সে ওদের সঙ্গে সমান যে, ওদের বাড়ি যখন-তখন যাইবে ? মেজ-বৌরানী যে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই কথাটা তাহার মনে অনেকবার যাওয়া-আসা করিল—সেইটা, আর লীলার আন্তরিকতা। কিন্তু মেজ-বৌরানী কি আর তার মায়ের অভাব দূর করিতে পারিবেন ? তিনি বড়লোকের মেয়ে. বড়লোকের বধূ। তাহার মায়ের আসন হৃদয়ের যে স্থানটিতে, সে শুধু তাহার দুঃখিনী মা অর্জন করিয়াছে তাহার বেদনা, ব্যর্থতা, দৈন্য-দুঃখ শত

অপমান দ্বারা—ছয় সিলিণ্ডারের মিনার্ভা গাড়িতে চড়িয়া কোনও ধনীবধূ—হউন তিনি স্নেহময়ী, হউন তিনি মহিমময়ী—তাঁহার সেখানে প্রবেশাধিকার কোথায় ?

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রথম বিভাগের প্রথম সতের জনের মধ্যে তাহার নাম, বাংলাতে সকলের মধ্যে প্রথম হইয়াছে, এজন্য একটা সোনার মেডেল পাইবে। এমন কেহ নাই যাহার কাছে খবরটা বলিয়া বাহাদুরি করা যাইতে পারে। কোনও পরিচিত বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত এখানে নাই—ছুটিতে সব দেশে গিয়াছে। জ্যাঠাইমার কাছে যাইবে ?···গিয়া জানাইবে জ্যাঠাইমাকে ? ···কি লাভ, হয়ত তিনি বিরক্ত হইবেন, দরকার নাই যাওয়ার।

অপরাজিত — দশম পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সব কলেজ খুলিয়া গেল, অপু কোনও কলেজে ভর্তি হইল না। অধ্যাপক মিঃ বসু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইতিহাসে অনার্স কোর্স লওয়াইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন ! অপু ভাবিল—কি হবে আর কলেজে পড়ে ? সে সময়টা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কাটাব, বি. এ-র ইতিহাসে এমন কোন নতুন কথা নেই যা আমি জানি নে। ও দু'বছর মিছিমিছি নষ্ট, লাইব্রেরীতে তার চেয়ে অনেক পড়ে ফেলতে পারব এখন। তা ছাড়া ভর্তির টাকা, মাইনে, এ সব পাই বা কোথায় ?

একটা কিছু চাকুরি না খুঁজিলে চলে না। খবরের কাগজ বিক্রয়ের পুঁজি অনেকদিন ফুরাইয়া গিয়াছে, মায়ের মৃত্যুর পর সে কাজে আর উৎসাহ নাই। একটা ছোট ছেলে পড়ানো আছে, তাতে শুধু দুটো ভাত খাওয়া চলে দু'বেলা—কোনমতে ইক্‌মিক্‌ কুকারে আলুসিদ্ধ, ডালসিদ্ধ ও ভাত। মাছ মাংস, দুধ, ডাল, তরকারী তো অনেকদিন-আগে-দেখা স্বপ্নের মত মনে হয়—যাক্‌ সে সব, কিন্তু ঘর-ভাড়া, কাপড়জামা, জলখাবার, এসব চলে কিসে ? তাহা ছাড়া অপুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, কলিকাতায় ছেলে-পড়ানো বাবার মুখে শৈশবে শেখা উদ্ভট শ্লোকের পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত চপল, আজ যদি যায় কাল দাঁড়াইবার স্থান নাই !

কয়েকদিন ধরিয়া খবরের কাগজ দেখিয়া দেখিয়া পাইওনিয়ার ড্রাগ স্টোর্সে একটা কাজ খালি দেখা গেল দিন কতক পরে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে বড়

দোকান, পিছনে কারখানা, তখনও ভিড় জমিতে শুরু হয় নাই, অপু ঢুকিয়াই এক স্থূলকায় আধাবয়সী ভদ্রলোকের একেবারে সামনে পড়িল। ভদ্রলোক বলিলেন, কাকে চান ?

অপু লাজুক মুখে বলিল—আজ্ঞে, চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে—তাই—

—ও ! আপনি ম্যাট্রিক পাশ ?

—আমি এবার আই-এ—

ভদ্রলোক পুনরায় তাকিয়ায় ভর দিয়া হাল ছাড়িয়া দিবার সুরে বলিলেন—ও আই-এ পাশ নিয়ে আমরা কি করব, আমাদের লেবেলিং ও মাল বট্‌লিং করার জন্য লোক চাই। খাটুনিও খুব, সকাল সাতটা থেকে সাড়ে দশটা, মধ্যে দেড় ঘণ্টা খাবার ছুটি, আবার বারোটা থেকে পাঁচটা. কাজের চাপ পড়লে রাত আটটাও বাজবে—

—মাইনে কত ?

—আপাতত পনেরো, ওভারটাইম খাটলে দু'আনা জলখাবার—সে-সব আপনাদের কলেজের ছোকরার কাজ নয় মশায়—আমরা এমনি মোটামুটি লোক চাই !

ইহার দিনকতক পর আর একটা চাকুরি খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া গেল ক্লাইভ স্ট্রীটে। দেখিল, সেটা একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান, বাঙালী ফার্ম। একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অত্যন্ত চুল-ফাঁপানো. টেরি-কাটা লোক ইস্ত্রিকরা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছে, মুখের নিচের দিকের গড়নে একটা কর্কশ ও স্থূল ভাব, এমন ধরণের চোখের ভাবকে সে মাতাল ও কুচরিত্র লোকের সঙ্গে মনে মনে জড়িত করিয়া থাকে। লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বলিল—কি, কি এখানে ?

অপুর নিজেকেই অত্যন্ত ছোট বোধ হইল নিজের কাছে। সে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—এখানে একটা চাকরি খালি দেখে আসছি।

লোকটার চেহারা বড়লোকের বাড়ির উচ্ছৃঙ্খল. অসচ্চরিত্র, বড় ছেলের মত। পূর্বে এ ধরণের চরিত্রের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, লীলাদের বাড়ি বর্ধমানে থাকিতে। এই টাইপটা সে চেনে।

লোকটা কর্কশ সুরে বলিল—কি কর তুমি ?

—আমি আই-এ পাশ—করি নে কিছু—আপনাদের এখানে—

—টাইপ রাইটিং জান ? না ?—যাও যাও, এখানে না—ও কলেজ-টলেজ এখানে চলবে না—যাও—

সেদিনকার ব্যাপারটা বাসায় আসিয়া গল্প করাতে ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্রটির এক কাকা বলিলেন—ওদের আজকাল ভারি দেমাক, যুদ্ধের বাজারে লোহার দোকানদার সব লাল হয়ে যাচ্ছে, দালালেরা পর্যন্ত দু-পয়সা ক'রে নিলে।

অপু বলিল—দালাল আমি হ'তে পারি নে?

—কেন পারবেন না, শক্তটা কি? আমার শ্বশুর একজন বড় দালাল, আপনাকে নিয়ে যাব একদিন—সব শিখিয়ে দেবেন, আপনাদের মত শিক্ষিত ছেলে তো আরও ভাল কাজ করবে—

মহা-উৎসাহে ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলের লোহার বাজারে দালালি করিতে বাহির হইয়া প্রথম দিন-চার-পাঁচ ঘোরাঘুরিই সার হইল; কেহ ভাল করিয়া কথাও বলে না, একদিন একজন বড় দোকানী জিজ্ঞাসা করিল,—বোল্টু আছে? পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ? অপু বোল্টু কাহাকে বলে জানে না, কোন্ দিকের মাপ পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ তাহাও বুঝিতে পারিল না। নোটবুকে টুকিয়া লইল, মনে মনে ভাবিল, একটা অর্ডার তো পাইয়াছে, খুঁজিবার মতও একটা কিছু জুটিয়াছে এতদিন পরে।

পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ বোল্টু এ-দোকান ও-দোকান দিন-চারেক বৃথা খোঁজা-খুঁজির পর তাহার ধারণা পেঁাছিল যে, জিনিসটা বাজারে সুলভপ্রাপ্য নয় বলিয়াই দোকানী এত সহজে তাহাকে অর্ডার দিয়াছিল। একদিন একজন দালাল বলিল—মশাই সওয়া ইঞ্চি ঘেরের সীসের পাইপ দিতে পারেন যোগাড় ক'রে আড়াই শো ফুট? যান না অর্ডারটা নিয়ে আসুন এই পাশেই ইউনাইটেড মেশিনারি কোম্পানীর অফিস থেকে।

পাশেই খুব বড় বাড়ি। আফিসের লোকে প্রথমে তাহাকে অর্ডার দিতে চায় না, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল···মাল আমাদের এখানে ডেলিভারি দিতে পারবেন তো?···

এ কথার মানে ঠিক না বুঝিয়াই সে বলিল—হাঁ তা দিতে পারব।

বহু খুঁজিয়া কলেজ স্ট্রীটের যে দোকান হইতে মাল বাহির হইল, তাহারা মাল নিজের খরচে কোথাও ডেলিভারি দিতে রাজী নয়, অপু নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি লইয়া গরুর গাড়িতে সীসার পাইপ বোঝাই দেওয়াইল—রাজা উডমাণ্ড্ স্ট্রীটে দুপুর রৌদ্রে মাল আনিয়া হাজিরও করিল। ইউনাইটেড মেশিনারি কিন্তু গাড়ির ভাড়া দিতে একদম অস্বীকার করিল, মাল তো এখানে ডেলিভারি দিবার কথা ছিল, তবে গাড়ি-ভাড়া কিসের? অপু ভাবিল, না হয় নিজের দালালির টাকা হইতে

গাড়ি ভাড়াটা মিটাইয়া দিবে এখন। এখন কাজে নামিয়া অভিজ্ঞতাটাই আসল, না-ই বা হইল বেশী লাভ।

সে বলিল—আমার ব্রোকারেজটা ?

—সে কি মশাই. আপনি সাড়ে পাঁচ আনা ফুটে দর দিয়েছেন, আপনার দালালি নেন নি ? তা কখনও হয় !—

অপু জানে না যে, প্রথম দর দিবার সময় তাহার মধ্যে দালালি ধরিয়া দিবার নিয়ম, সবাই তাহা দিয়া থাকে, সেও যে তাহা দেয় নাই, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। বার-বার সেই কথা তাহাদের বুঝাইতে গিয়া নিজের আনাড়ীপনাই বিশেষ করিয়া ধরা পড়িল। সীসার পাইপওয়ালা গোমস্তা তাহাদের বিল বুঝিয়া পাইয়া চলিয়া গেল—তিনদিন ধরিয়া রৌদ্রে ছুটাছুটি ও পরিশ্রম সার হইল, একটি পয়সাও তাহাকে দিল না কোন পক্ষই। খোট্টা গাড়োয়ান পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হামারা ভাড়া কৌন দেগা ?

একজন বৃদ্ধ মুসলমান দালানের এক পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল, অপু আফিস হইতে বাহিরে আসিলেই সে বলিল, বাবু আপনি কত দিন এ কাজে নেমেছেন—কাজ তো কিছুই জানেন না দেখছি—

অপুকে সে-কথা স্বীকার করিতে হইল। লোকটি বলিল—আপনি লেখাপড়া জানেন, ও-সব খুচরো কাজ ক'রে আপনার পোষাবে না। আপনি আমার সঙ্গে কাজে নামবেন ?—বড় মেশিনারির দালালি, ইঞ্জিন, বয়লার এই সব। এক-একবারে পাঁচ-শো সাত-শো টাকা রোজগার হবে—বাবু ইংরেজি জানি নে তাই, তা যদি জানতাম, এ বাজারে এতদিন গুছিয়ে···নামবেন আমার সঙ্গে ?

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। গাড়োয়ানকে ভাড়াটা যে দণ্ড দিতে হইল, আনন্দের আতিশয্যে সেটাও গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না। মুসলমানটির সঙ্গে তাহার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল—অপু নিজের বাসার ঠিকানা দিয়া দিল। স্থির হইল, কাল সকাল দশটার সময় এইখানে লোকটি তাহার অপেক্ষা করিবে।

অপু রাত্রে শুইয়া মনে মনে ভাবিল—এতদিন পরে একটা সুবিধে জুটেছে, —এইবার হয়ত পয়সার মুখ দেখবো।

কিন্তু মাসখানেক কিছুই হইল না—একদিন দালালটি তাহাকে বলিল— দুটোর পর আর বাজারে থাকেন না, এতে কি হয় কখনও বাবু ? যান কোথায় ?

অপু বলিল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়তে যাই—দুটো থেকে সাতটা পর্যন্ত থাকি। একদিন যেও, দেখাবো কত বড় লাইব্রেরী।

লাইব্রেরীতে ইতিহাস খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে, কোন এক দরিদ্র ঘরের ছোট ছেলের কাহিনী পড়িতে বড় ইচ্ছা যায়, সংসারে দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ—তাহাদের জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ ধরণের সংবাদ জানিতে মন যায়।

মানুষের সত্যকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় ঐতিহাসিকদের অনেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝাঁঝে, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমকে, দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পথের ধারের আমগাছে তাহাদের পুটুলিবাঁধা ছাতু কবে ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট হইতে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলে তাহার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল—ছ'হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নাই—থাকিলেও বড় কম—রাজা যযাতি কি সম্রাট অশোকের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প সবাই শৈশব হইতে মুখস্থ করে—কিন্তু ভারতবর্ষের, গ্রীসের, রোমের যব, গম ক্ষেতের ধারে, ওলিভ, বন্যদ্রাক্ষা, মার্টলা ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে প্রতিদিনের জীবন, হাজার হাজার বছর ধরিয়া প্রতি সকালে সন্ধ্যায় যাপিত হইয়াছে—তাহাদের সুখ-দুঃখ আশানিরাশার গল্প, তাহাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস সে জানিতে চায়।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের লেখা পাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের এই আড়ালটা সরিয়া যায়, সার বাঁধা বর্শার অরণ্যের ফাঁকে দূর অতীতের এক ক্ষুদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ি নজরে আসে। অজ্ঞাতনামা কোন লেখকের জীবন-কথা, কি কালের স্রোতে কূলে-লাগা এক টুকরা পত্র, প্রাচীন মিশরের কোন্ কৃষক পুত্রকে শস্য কাটিবার কি আয়োজন করিতে লিখিয়াছিল,—বহু হাজার বছর পর তাহাদের টুকরা ভূগর্ভে প্রোথিত মৃণ্ময়-পাত্রের মত দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ ধরণের, আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চায় সে। মানুষ মানুষের বুকের কথা জানিতে চায়। আজ যা তুচ্ছ, হাজার বছর পরে তা মহাসম্পদ। ভবিষ্যতের সত্যকার ইতিহাস হইবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস।

আর একটা দিক তাহার চোখে পড়ে। একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার কাছে—মহাকালের এই মিছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, কি অন্য কেহ ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে তাহার তত কৌতূহল নাই, সে শুধু কৌতূহলাক্রান্ত মহাকালের এই বিরাট মিছিলে। হাজার

যুগ আগেকার কত রাজা, রাণী, সম্রাট, মন্ত্রী, খোজা, সেনাপতি, বালক, যুবা, কত অশ্রুনয়না তরুণী, কত অর্থলিপ্সু রাজপুরুষ—যাহারা অর্থের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে নিক্ষেপ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই—অনন্ত কালসমুদ্রে ইহাদের ভাসিয়া যাওয়ার, বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাওয়ার দিকটা। কোথায় তাহাদের বৃথা শ্রমের পুরস্কার, তাহাদের অর্থলিপ্সার সার্থকতা?

এদিকে ছুটাছুটিই সার হইতেছে—কাজে কিছুই হয় না। সে তো চায় না বড়মানুষ হইতে—খাওয়া-পরা চলিয়া গেলেই সে খুশী—পড়াশুনা করার সে সময় পায় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু তাও তো হয় না, টুইশানি না থাকিলে একবেলা আহারও জুটিত না যে। তা ছাড়া এ সব জায়গার আবহাওয়াই তাহার ভাল লাগে না আদৌ। চারিধারে অত্যন্ত হুশিয়ারী, দর-কষাকষি,··· —শুধু টাকা···টাকা···টাকা সংক্রান্ত কথাবার্তা—লোকজনের মুখে ও চোখের ভাবে ইতর ও অশোভন লোভ যেন উগ্রভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে—এদের পাকা বৈষয়িক কথাবার্তায় ও চালচলনে অপু ভয় খাইয়া গেল। লাইব্রেরীর পরিচিত জগতে আসিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে প্রতিদিন।

একদিন মুসলমান দালালটি বাজারে তাহার কাছে দইটি টাকা ধার চাহিল। বড় কষ্ট যাইতেছে, পরের সপ্তাহেই দিয়া দিবে এখন। অপু ভাবিল—হয়ত বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, রোজগার নাই এক পয়সা। অর্থাভাবের কষ্ট যে কি সে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে এই দুই বৎসরে—নিজের বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য না থাকিলেও একটি টাকা বাসা হইতে আনিয়া পরদিন বাজারে লোকটাকে দিল।

ইহার দিন সাতেক পর অপু সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া ঘরের দোরে কাহার ধাক্কার শব্দ পাইল,দোর খুলিয়া দেখিল—মুসলমান দালালটি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া।

—এসো, এসো আবদুল, তারপর খবর কি?

—আদাব বাবু, চলুন, ঘরের মধ্যে বলি। এ-ঘরে আপনি একলা থাকেন, না আর কেউ—ওঃ—বেশ ঘর তো বাবু।

—এসো বসো। চা খাবে?

চা-পানের পর আবদুল আসিবার উদ্দেশ্য বলিল। বারাকপুরে একটা বড় বয়লারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই ধরণের বয়লারেরই আবার এদিকে একটা খরিদ্দার জুটিয়া গিয়াছে, কাজটা লাগাইতে পারিলে তিনশো টাকার কম

নয়—একটা বড় দাঁও। কিন্তু মুশকিল দাঁড়াইয়াছে এই যে, এখনই বারাকপুরে গিয়া বয়লারটি দেখিয়া আসা দরকার এবং কিছু বায়না দিবারও প্রয়োজন আছে—অথচ তাহার হাতে একটা পয়সাও নাই। এখন কি করা ?

অপু বলিল—খদ্দের মাল ইন্‌স্পেক্‌শনে যাবে না ?

—আগে আমরা দেখি, তবে তো খদ্দেরকে নিয়ে যাব ?—দেড় পার্সেণ্ট ক'রে ধরলেও সাড়ে চারশো টাকা থাকবে আমাদের—খদ্দের হাতের মুঠোয় রয়েছে—আপনি নির্ভাবনায় থাকুন—এখন টাকার কি করি ?

অপু পূর্বদিন টুইশানির টাকা পাইয়াছিল, বলিল—কত টাকার দরকার ? আমি তো ছেলে-পড়ানোর মাইনে পেয়েছি—কত তোমার লাগবে বলো।

হিসাবপত্র করিয়া আট টাকা পড়িবে দেখা গেল। ঠিক হইল—আবদুল এবেলা বয়লার দেখিয়া আসিয়া ওবেলা বাজারে অপুকে সব খবর দিবে। অপু বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া আবদুলের হাতে দিল।

বৈকালে সে পাটের এক্সচেঞ্জের বারান্দাতে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত আগ্রহের সহিত আবদুলের আগমন প্রতীক্ষা করিল। আবদুল সেদিন আসিল না, পরদিনও তাহার দেখা নাই। ক্রমে একে একে সাত-আটদিন কাটিয়া গেল—কোথায় আবদুল ? সারা বাজার ও রাজা উডমাণ্ড স্ট্রীটের লোহার দোকান আগাগোড়া খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান মিলিল না। ক্লাইভ স্ট্রীটের একজন দোকানদার শুনিয়া বলিল—কত টাকা নিয়েছে আপনার মশাই ! আবদুল তো ? মশাই জোচ্চোরের ধাড়ী—আর টাকা পেয়েছেন,—টাকা নিয়ে সে দেশে পালিয়েছে—আপনিও যেমন !···

প্রথমে সে বিশ্বাস করিল না। আবদুল সে রকম মানুষ নয়, তাহা ছাড়া এত লোক থাকিতে তাহাকে কেন ঠকাইতে যাইবে ?

কিন্তু এ ধারণা বেশীদিন টিকিল না ! ক্রমে জানা গেল আবদুল দেশে যাইবে বলিয়া যাহার কাছে সামান্য যাহা কিছু পাওনা ছিল, সব আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে দিন সাতেক আগে ! কাঁটাপেরেকের দোকানের বৃদ্ধ বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—আশ্চয্যি কথা মশাই, সবাই জানে আবদুলের কাণ্ডকারখানা আর আপনি তাকে চেনেন নি দু-তিন মাসেও ? রাধে-কৃষ্ট ! বেটা জুয়াচোরের ধাড়ী, হার্ডওয়ারের বাজারে সবাই চিনে ফেলেছে, এখানে আর সুবিধে হয় না, তাই গিয়ে আজকাল জুটেছে মেশিনারির বাজারে। কোনও দোকানে তো আপনার একবার জিজ্ঞেস করাও উচিত ছিল। হার্ডওয়ারের দালালি করা কি আপনার মত

ভালমানুষের কাজ মশাই ? আপনার অল্প বয়স, অন্য কাজ কিছু দেখে নিন গে। এখানে কথা বেচে খেতে হবে, সে আপনার কর্ম নয়, তবুও ভাল যে আটটা টাকার ওপর দিয়ে গিয়েছে—

আট টাকা বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে যতই তুচ্ছ হউক অপুর কাছে তাহা নয়। ব্যাপার বুঝিয়া চোখে অন্ধকার দেখিল—গোটা মাসের ছেলে পড়ানোর দরুন সব টাকাটাই যে সে তুলিয়া দিয়াছে আবদুলের হাতে ! এখন সারা মাস চলিবে কিসে ! বাড়ি ভাড়ার দেনা, গত মাসের শেষে বন্ধুর কাছে ধার—এ সবের উপায় ?

দিশাহারা ভাবে পথ চলিতে চলিতে সে ক্লাইভ স্ট্রীটে শেয়ার মার্কেটের সামনে আসিয়া পড়িল। দালাল ও ক্রেতাদের চীৎকার, মাড়োয়ারীদের ভিড় ও ঠেলাঠেলি, থার্ডক্রফট ছ' আনা, নাগরমল সাড়ে পাঁচ আনা—বেজায় ভিড়, বেজায় হৈ-চৈ, লালদীঘির পাশ কাটাইয়া লাটসাহেবের বাড়ির সম্মুখ দিয়া সে একেবারে গড়ের মাঠের মধ্যে কেল্লার দক্ষিণে একটা নির্জন স্থানে একটা বড় বাদাম গাছের ছায়ায় আসিয়া বসিল।

আজই সকালে বাড়িওয়ালা একবার তাগাদা দিয়াছে, কাপড় একেবারে নাই, না কুলাইলেও ছেলে পড়ানোর টাকা হইতে কাপড় কিনবে ঠিক করিয়াছিল, রুম-মেট তো নিত্য ধারের জন্য তাগাদা করিতেছে। আবদুল শেষকালে এভাবে ঠকাইল তাহাকে ? চোখে তাহার জল আসিয়া পড়িল—দুঃখদিনের সাথী বলিয়া কত বিশ্বাস যে করিত সে আবদুলকে !

অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে দুপুর, বেলা দেড়টা আন্দাজ। কেহ কোন দিকে নাই, আকাশ মেঘমুক্ত, দূরপ্রসারী নীল আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মত চিল উড়িয়া চলিয়াছে—দূর হইতে দূরে, সেই ছেলেবেলার মত—ছোট হইতে ক্রমে মিলাইয়া চলিয়াছে। একজন ঘেসেড়া বর্ষার লম্বা লম্বা ঘাস কাটিতেছে। ছোট একটি খোট্টাদের মেয়ে ঝুড়িতে ঘুঁটে কুড়াইতেছে।···দূরে খিদিরপুরের ট্রাম যাইতেছে···গঙ্গার দিকে বড় একটা জাহাজের চোঙ—ফোর্টের বেতারের মাস্তুল—এক···দুই···তিন···চার···আকাশ কি ঘন নীল !—এই তো চারিধারের মুক্ত সৌন্দর্য এই কম্পমান শ্রাবণ দুপুরের খররৌদ্র···বিদ্যুৎ···সূর্য··· রাত্রির তারা···প্রেম···মা···দিদি···অনিল···মাথার উপরে নিঃসীম নীল আকাশ ···মৃত্যুপারের দেশ···চিররাত্রির অন্ধকারে যেখানে সাঁই সাঁই রবে ধূমকেতুর দল আগুনের পুচ্ছ দুলাইয়া উড়িয়া চলে—গ্রহ ছোটে, চন্দ্রসূর্য লাটিমের মত

আপনার বেগে আপনি ঘুরিয়া বেড়ায়···তুহিন শীতল ব্যোমকেশ দূরে দূরে দেব-লোকের মেরু-পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে তাহারা মিট মিট করে—এই পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে জন্ম লইয়া আটটা টাকা···তুচ্ছ আট টাকা···এ কোন্ বিচিত্র !···কিসের থর্নিক্রফ্ট্ আর নাগরমল ?

কখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, কখন একটু দূরে একটা ফুটবল টিমের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল—একটা বল দুম্ করিয়া তাহার একেবারে সামনে আসিয়া পড়াতে তাহার চমক ভাঙিল। উঠিয়া সে বলটা দু'হাতে ধরিয়া সজোরে একটা লাথি মারিয়া সেটাকে ধাবমান লাইন্‌সম্যানের দিকে ছুড়িয়া দিল।

একদিন পথে হঠাৎ প্রণবের সঙ্গে দেখা। দুজনেই ভারি খুশী হইল। সে কলিকাতায় আসিয়া পর্যন্ত অপুকে কত জায়গায় খুঁজিয়াছে, প্রথমটা সন্ধান পায় নাই, পরে জানিতে পারে অপূর্ব পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চাকুরিতে ঢুকিয়াছে। প্রণব রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বৎসরখানেক হাজতভোগের পর সম্প্রতি খালাস হইয়াছে, হাসিয়া বলিল···কিছুদিন গবর্ণমেণ্টের অতিথি হয়ে এলুম রে, এসেই তোর কত খোঁজ করেছি—তারপর, কোথায় চাকরি করিস, মাইনে কত ?

অপু হাসিমুখে বলিল—খবরের কাগজের আফিসে, মাইনে সত্তর টাকা !

সর্বৈব মিথ্যা। টাকা চল্লিশেক মাইনে পায়, কি একটা ফণ্ড বাবদ কিছু কাটিয়া লওয়ার পর হাতে পেঁছায় তেত্রিশ টাকা ক' আনা। একটু গর্বের সুরে বলিল, চাকরি সোজা নয়, রয়টারের বাংলা করার ভার আমার ওপর—বুধবারের কাগজে 'আর্ট ও ধর্ম' বলে লেখাটা আমার, দেখিস পড়ে।

প্রণব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুই ধর্মের সম্বন্ধে লিখতে গেলি কি নিয়ে রে ! কি জানিস তুই—

—ওখানেই তোমার গোলমাল। ধর্ম মানে তুই যা বলতে চাইছিস, সেটা হচ্ছে collective ধর্ম, আমি বলি ওটার প্রয়োজনীয়তা ছিল আদিম মানুষের সমাজে, আর একটা ধর্ম আছে, যা কিনা নিজের নিজের, আমার ধর্ম আমার, তোমার ধর্ম তোমার, এইটের কথাই আমি—যে ধর্ম আমার নিজের তা যে আর কারো নয়, তা আমার চেয়ে কে ভাল বোঝে ?

—বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা হবে না, আয় গোলদীঘিতে লেকচার দিবি।

—শুনবি তুই ? চল্ তবে—

গোলদীঘিতে আসিয়া দুজনে একটা নির্জন কোণ বাছিয়া লইল। প্রণব বলিল —বেঞ্চের উপর দাঁড়া উঠে।

অপু বলিল—দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু লোক জমবে না তো ? তা হ'লে কিন্তু আর একটি কথাও বলব না।

তারপর আধঘণ্টাটাক অপু বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়া গেল। সে নিষ্কপট ও উদার—যা মুখে বলে মনে মনে তাহা বিশ্বাস করে। প্রণব শেষ পর্যন্ত শুনিবার পর ভাবিল—এসব কথা নিয়ে খুব তো নাড়াচাড়া করেছে মনের মধ্যে ? একটু পাগলামির ছিট্ আছে, কিন্তু ওকে ঐজন্যেই এত ভালবাসি।

অপু বেঞ্চ হইতে নামিয়া বলিল—কেমন লাগ্‌ল ?—

—তুই খুব sincere, যদিও একটু ছিট্‌গ্রস্ত—

অপু লজ্জামিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিল—যাঃ—

প্রণব বলিল—কিন্তু কলেজটা ছেড়ে ভাল কাজ করিস নি, যদিও আমি জানি, তাই সেদিন বিনয়কে বল্‌ছিলাম যে অপূর্ব কলেজে না গিয়েও যা পড়াশুনা করবে, তোমরা দ'বেলা কলেজের সিমেণ্ট ঘষে ঘষে উঠিয়ে ফেললেও তা হবে না! ওর মধ্যে একটা সত্যিকার পিপাসা রয়েছে যে—

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অপু খুব বেশী—বালকের মত খুশী। উজ্জ্বল মুখে বলিল—অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, চল তোকে কিছু খাওয়াইগে—কলেজ মেট্‌দের আর কারুর দেখা পাই নে—আমোদ করা হয় নি কতদিন যে—মা মারা যাওয়ার পর থেকে তো···

প্রণব বিস্ময়ের সুরে বলিল—মাও মারা গিয়েছেন !

—ওঃ, সে কথা বুঝি বলি নি ? সে তো প্রায় এক বছর হ'তে চল্‌ল—

সামনেই একটা চায়ের দোকান। অপু প্রণবের হাত ধরিয়া সেখানে ঢুকিল। প্রণবের ভারি ভাল লাগিল অপুর এই অত্যন্ত খাঁটি ও অকৃত্রিম, আগ্রহভরা হাত ধরিয়া টানা। সে মনে মনে ভাবিল—এরকম warmth আর sincerity ক'জনের মধ্যে পাওয়া যায় ? বন্ধু তো মুখে অনেকেই আছে—অপু একটা জুয়েল।

অপু বলিল—কি খাবি বল ?—এই বেয়ারা, কি আছে ভাল ?

খাইতে খাইতে প্রণব বলিল—তারপর চাকরির কথা বল—যে বাজার—কি ক'রে জোটালি ?

অপু প্রথমে লোহার বাজারের দালালির গল্প করিল। হাসিয়া বলিল—তারপর আবদুলের মহাভিনিষ্ক্রমণের পরে হার্ডওয়ার আর জমলো না—ঘুরে ঘুরে বেড়াই চাকরি খুঁজে, বুঝলি—একদিন একজন বললে, বি-এন-আর অফিসে অনেক নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—গেলুম সেখানে। খুব লোকের ভিড়, চাকরি অনেক খালি আছে, ইংরিজি লিখতে-পড়তে পারলেই চাকরি হচ্ছে। ব্যাপার কি শুনলাম মাস-দুই হ'ল স্ট্রাইক চলছে—তাদের জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে -

প্রণব চায়ে চুমুক দিয়া বলিল—চাকরি পেলি ?

—শোন্ না, চাকরি তখুনি হয়ে গেল, প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেটটাই কাজের হ'ল, তখুনি ছাপানো ফর্মে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়ে দিলে, বাইরে এসে ভারি আনন্দ হল মনটাতে। চল্লিশ টাকা মাইনে, যেতে হবে গঞ্জাম জেলায়, অনেক দূর, যা ঠিক চাই তাই—বেণ্টিক স্ট্রীটের মোড়ে একটা চায়ের দোকানে বসে মনের খুশীতে উপরি উপরি চার কাপ চা খেয়ে ফেললাম—ভাবলাম এতদিন পর পয়সার কষ্টটা তো ঘুচল ?—আর কি খাবি ? এই বেয়ারা আর দুটো ডিম ভাজা—না-না থা—

—দু'দিন চাকরি হয়েছে বলে বুঝি—তোর সেই পুরানো রোগ আজও—হ্যাঁ তারপর ?

—তারপর বাড়ি এসে রাতে শুয়ে শুয়ে মনটাতে ভাল বললে না—ভাবলাম, ওরা একটা সুবিধে আদায় করবার জন্য স্ট্রাইক করেছে, দু'মাস তাদেরও ছেলেমেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের মুখের ভাতের থালা কেড়ে খাব শেষকালে ?—আবার ভাবি, যাই চলে, অতদূর কখনো দেখি নি, তা ছাড়া মা মারা যাওয়ার পর কলকাতা আর ভাল লাগে না, যাইগে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত—ফের ওদের আফিসে গেলাম-ছাপানো ফর্মখানা ফেরত দিয়ে এলাম, বলে এলাম আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না—

প্রণব বলিল—তোর মুখ আর চোখ look full of music and poetry—প্রথম থেকে আমি জানি এ একজন আইডিয়ালিস্ট ছোকরা—তোদের দিয়েই তো এসব হবে—তোর এ খবরের কাগজের কাজ কখন ?

—রাত ন'টার পর যেতে হয়, রাত তিনটের পর ছুটি। ভারি ঘুম পায়, এখনও রাত-জাগা অভ্যেস হয় নি, তবে সুবিধে আছে, সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নি, সারাদিন লাইব্রেরীতে কাটাতে পারি—

খাওয়া-দাওয়া ভালই হইল। অপু বলিল—জল খাস্ নে—চল্ কলেজ

স্কোয়ারে শরবৎ খাব—বেশ মিষ্টি লাগে খেতে।—লেমন স্কোয়াশ খেয়েছিস—আয়,—

কলেজের অত ছেলের মধ্যে এক অনিল ও প্রণব ছাড়া সে আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, অনেকদিন পরে মন খুলিয়া আলাপের লোক পাইয়া তাহার গল্প আর ফুরাইতেছিল না। বলিল, গাছপালা যে কতদিন দেখি নি, ইট আর সিমেণ্ট অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের অফিসে একজন কাজ করে, তার বাড়ি হাওড়া জেলা, সেদিন বলছে, বাড়ির বাগানে আগাছা বেড়ে উঠেছে, তাই সাফ করছে রবিবারে-রবিবারে। আমি তাকে বলি, কি গাছ মিত্তির মশাই? সে বলে—কিছু না, ঝুপি গাছ। আমি বলি—বলুন না, কি কি গাছ? রোজ সোমবারে সে বাড়ি থেকে এলে তাকে এই কথা জিগ্যেস করি—সে হয়ত ভাবে, আচ্ছা পাগল!—রাত্রে, ভাই, সারারাত প্রেসের ঘড়ঘড়ানি, গরম, প্রিণ্টারের তাগাদার মধ্যে আমার কেবল মিত্তির মশায়ের বাড়ির সেই ঝুপি বনের কথা মনে হয়—ভাবি কি না কি জানি গাছ। এদিকে চোখ ঘুম ঢুলে আসে, রাত একটার পর শরীর এলিয়ে পড়তে চায়, শরীরের বাঁধন যেন ক্রমে আলগা হয়ে আসে, কুঁজোর জল চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে ফুলো-ফুলো রাঙা-রাঙা, জ্বালা-করা চোখে আবার কাজ করতে বসি—ইলেকট্রিক বাতিতে যেন চোখে ছুঁচ বেঁধে—আর এত গরমও ঘরটাতে!

পরে সে আগ্রহের সুরে বলিল—একদিন রবিবারে চল তুই আর আমি কোনও পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাঠে, বনের ধারে ধারে সারা দিন বেড়িয়ে কাটাব—বেশ সেখানেই কাঠ-কাঠি কুড়িয়ে আমরা রাঁধব—বিকেল হবে—পাখীর ডাক যে কতকাল শুনি নি! দোয়েল কি বৌ-কথা-কও, এদের ডাক তো ভুলেই গিয়েছি, রবিবার দিনটা ছুটি, চল্ যাবি?—এখন কত ফুল ফোটারও সময়—আমি অনেক বনের ফুলের নাম জানি, দেখিস্ চিনিয়ে দেব। যাবি প্রণব, চল আজ থিয়েটার দেখি? স্টারে 'সধবার একাদশী' আছে—যাবি?

নিজেই দু'খানা গ্যালারির টিকিট কিনিল—থিয়েটার ভাঙিলে অনেক রাত্রিতে ফিরিবার পথে অপু বলিল—কি হবে বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে; আজ বসে গল্প ক'রে রাত কাটাই। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের কাছে আসিয়া অপু বন্ধুর হাত ধরিয়া রেলিং টপকাইয়া স্কোয়ারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল—আয় আয়, এই বেঞ্চটাতে বসি, আমি নিমচাঁদের পার্ট প্লে করব, দেখবি—

প্রণব হাসিয়া বলিল—তোর মাথা খারাপ আছে—এত রাত্রে বেশী চেঁচাস্

নি—পুলিস এসে তাড়িয়ে দেবে—কিন্তু খানিকটা পর প্রণবও মাতিয়া উঠিল। দু'জনে হাসিয়া আবোল-তাবোল বকিয়া আরও ঘণ্টাখানেক কাটাইল। অপু একটা বেঞ্চির উপরে গড়াগড়ি দিতেছিল ও মুখে নিমচাঁদের অনুকরণে ইংরাজি কি কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—প্রণবের ভয়সূচক স্বরে উঠিয়া বসিয়া চাহিয়া দেখিল ফুটপাথের উপর একজন পাহারাওয়ালা। অমনি সে বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—Hail, Holy Light! Heaven's First born!—পরে দু'জনেই ডাফ্ স্ট্রীটের দিকের রেলিং টপকাইয়া সোজা দৌড় দিল।

রাত্রি আর বেশী নাই। আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা বড় লাল বাড়ীর পৈঠায় অপু গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—কোথায় আর যাবো—আয় বোস্ এখানে—

প্রণব বলিল—একটা গান ধর তবে—

অপু বলিল—বাড়ির লোকে দোর খুলে বেরিয়ে আসবে—কোন রকমে পুলিসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি—

—কেমন পাহারাওয়ালাটাকে চেঁচিয়ে বললুম—Hail, Holy Light?—হি-হি—টেরও পায় নি? কোথা দিয়ে পালালুম—নিমচাঁদের মত হয় নি?—হি-হি—

প্রণব বলিল—তোর মাথায় ছিট আছে—যাঃ সারা রাতটা ঘুম হ'ল না তোর পাল্লায় পড়ে—গা একটা গানই গা—আস্তে আস্তে ধর—আবার হাসে, যাঃ—

ইহার দিন-পনেরো পরে একদিন প্রণব আসিয়া বলিল—তোকে নিয়ে যাব বলে এলাম—আমার মামাতো বোনের বিয়ে হবে সোমবারে, শুক্রবার রাত্রে আমরা যাব, খুলনা থেকে স্টীমারে যেতে হয়, অনেকদিন কোথাও যাস নি, চল আমার সঙ্গে, দিন চার-পাঁচের ছুটি পাবি নে?

ছুটি মিলিল। ট্রেনে উঠিবার সময় তাহার ভারি আনন্দ। অনেকদিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, অনেকদিন রেলেও চড়ে নাই। সকালবেলা স্টীমারে উঠিবার সময় ভৈরবের ওপার হইতে তরুণ সূর্য ওঠার দৃশ্যটা তাহাকে মুগ্ধ করিল। নদী খুব বড় ও চওড়া, স্টীমার প্রণবের মামার বাড়ির ঘাটে ধরে না পাশের গ্রামে নামিয়া নৌকায় যাইতে হয়। অপু এ অঞ্চলে কখনও আসে নাই সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, নদীর ধারে সুপারির সারি, বাঁশ, বেত-বন, অসংখ্য নারিকেল গাছ। টিনের চালাওয়ালা গোলা গঞ্জ। অদ্ভুত ধরণের নাম, স্বরূপ-কাটি, বশাইকাটি।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ও খাড়া পশ্চিম, দু'দিক হইতে প্রকাণ্ড দু'টা নদী আসিয়া

পরস্পরকে ছুঁইয়া অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানটাতে জলের রং ঈষৎ সবুজ এবং এই সঙ্গমস্থানেরই ও-পারে আধ মাইলের মধ্যে প্রণবের মামার বাড়ির গ্রাম গঙ্গানন্দকাটি।

নদীর ঘাট হইতে বাড়িটা অতি অল্প দূরে। এ গ্রামের মধ্যে ইহারাই অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ।

অনেকবার অপু এ ধরণের বাড়ির ছবি কল্পনা করিয়াছে, এই ধরণের বড় নদীর ধারে, শহর-বাজারের ছোঁয়াচ ও আবহাওয়া হইতে বহু দূরে, কোন এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের সম্ভ্রান্ত গৃহ, আগে অবস্থা ভাল ছিল, অথচ এখন নাই, নাটমন্দির, পূজার দালান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ সবই থাকিবে, অথচ সে-সব হইবে ভাঙা, শ্রীহীন—আর থাকিবে প্রাচীন ধনীবংশের শ্রান্ত মর্যাদাবোধ, মানসম্মান, উদারতা। প্রণবের মামার বাড়ির সঙ্গে সব যেন হুবহু মিলিয়া গেল।

ঘাট হইতে দুই সারি নারিকেল গাছ সোজা একেবারে বাড়ির দেউড়িতে গিয়া শেষ হইয়াছে, বাঁয়ে প্রকান্ড পূজার দালান, ডাইনে হলুদ রঙের কলসী বসানো ফটক ও ফুলবাগান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, নাটমন্দির। খুব জলুস নাই কোনটারই, কার্নিস খসিয়া পড়িতেছে, একরাশ গোলাপায়রা নাটমন্দিরের মেজেতে চরিয়া বেড়াইতেছে, এক-আধটা ঝটাপট করিয়া ছাদে উড়িয়া পালাইতেছে, একখানা ষোল-বেহারার সেকেলে হাঙরমুখো পালকি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে! দেখিয়া মনে হয়—এক সময় ইহাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল, বর্তমানে পসারহীন ডাক্তারের দ্বার সংযুক্ত অনাদৃত পিতলের পাতের মত শ্রীহীন ও মলিন।

'পুলু এসেছে, পুলু এসেছে'—'এই যে পুলু'—'এটি কে সঙ্গে?' 'ও! বেশ বেশ, স্টীমার কি আজ লেট? ওরে নিবারণকে ডাক, ব্যাগটা বাড়ির মধ্যে নিয়ে যা, আহা থাক এসো এসো দীর্ঘজীবী হও।'

প্রণব তাহাকে একেবারে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। অপু অপরিচিত বাড়ির মধ্যে অন্দরমহলে যথারীতি অত্যন্ত লাজুক মুখে ও সঙ্কোচের সহিত ঢুকিল। প্রণবের বড় মামীমা আসিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন—এ ছেলেটিকে কোত্থেকে আনলি পুলু? এ মুখ যেন—

প্রণব হাসিয়া বলিল—কি ক'রে চিনবে মামীমা? ও কি আর বাঙ্গাল দেশের মানুষ?

প্রণবের মামীমা বলিলেন—তা নয় রে, কতবার পটে আঁকা ছবি দেখেছি, ঠাকুর দেবতার মুখের মত মুখ—এসো এসো দীর্ঘজীবী হও—

প্রণবের দেখাদেখি অপুও পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

—এসো এসো, বাবা আমার এসো—কি সুন্দর মুখ—দেশ কোথায় বাবা ?

সন্ধ্যার পর সারাদিনের গরমটা একটু কমিল। দেউড়ির বাহিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, চারিদিকে শাঁখ বাজিল। উপরের খোলাছাদে শীতল পাটি পাতিয়া অপু একা বসিয়া ছিল, প্রণব ঘুম হইতে সন্ধ্যার কিছু আগে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। কেমন একটা নতুন ধরণের অনুভূতি—সম্পূর্ণ নতুন ধরণের—কি সেটা ? কে জানে, হয়ত শাঁখের রব বা আরতির বাজনার দরুণ—কিংবা হয়ত···

মোটের উপর এ এক অপরিচিত জগৎ। কলিকাতার কর্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর ধুমধুলিপূর্ণ আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভিন্ন জীবনধারার জগৎ।

নারিকেলশ্রেণীর পত্রশীর্ষে নবমীর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, এইমাত্র ফুটিল. অপু লক্ষ্য করে নাই। কি কথা যেন সব মনে আসে। অনেকদিনের কথা।

পিছন হইতে প্রণব বলিল—কেমন, গাছপালা গাছপালা ক'রে পাগল, দেখলি তো গাছপালা নদীতে আসতে ? কি রকম লাগল বল শুনি—

অপু বলিল—সে যা লাগল তা লাগল—এখন কি মনে হচ্ছে জানিস এই আরতি শুনে ? ছেলেবেলায়, আমার দাদু ছিল ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁর মুখে শুনতাম, 'বংশী বটতট কদম্ব নিকট, কালিন্দী ধীর সমীর'—যেন—

সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রণব ডাকিয়া বলিল—কে রে ? মেনী ? শোন্—

একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের বালিকা হাসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—কে, কে রে ? মেয়েটি পিছন ফিরিয়া কাহাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—সবাই আছে, ননীদি, দাসীদি, মেজদি, সরলা তাস খেলছে চিলেকোঠার ঘরে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এ বাড়ির মেয়ে-ছেলে সবাই দেখতে ভারি সুন্দর তো ?

প্রণব বলিল—এটি মামার ছোট মেয়ে, এরই মেজ বোনের বিয়ে। ক'বোনের মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে সুশ্রী—মেনী ডাক তো একবার অপর্ণাকে ?

মেনি সিঁড়িতে গিয়া কি বলিতেই একটা সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্যধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, অল্পক্ষণ পরেই একটি ষোল-সতেরো বছরের নতমুখী সুন্দরী মেয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—ও আমার

কথ্‌, তোরও স্‌বাদে দাদা—লজ্জা কাকে এখানে রে? এটি মামার মেজ মেয়ে অপর্ণা—এরই—

মেয়েটি চপলা নয়, মৃদ্‌ হাসিয়া তখনই সরিয়া গেল, কি স্‌ন্দর একঢাল চুল! কিছ্‌ দিন আগে পড়া একটা ইংরাজী উপন্যাসের একটা লাইন বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল—Do they breed goddesses at Slocum Magna? Do···they···breed···goddes·es···at···Slocum Magna?

এ রাতটার কথা অপ্‌র চিরকাল মনে ছিল।

পরদিন প্রণবের সঙ্গে অপ্‌ তাহার মামার বাড়ির সবটা ঘ্‌রিয়া দেখিল। প্রাচীন ধনীবংশ বটে। বাড়ির উত্তর দিকে প্‌রাতন আমলের আবাস-বাটি ও প্রকাণ্ড সাতদ্‌য়ারী প্‌জার দালান ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ওপারে অন্যতম সরিক রামদ্‌র্লভ বাঁড়্‌য্যের বাড়ি। প্‌রাতন আমলের বসতবাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত, রামদ্‌র্লভের ছোট ভাই সেখানে বাস করিতেন। কি কারণে তাঁহার একমাত্র প্‌ত্র নির্‌দ্দেশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা বেচিয়া-কিনিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন।

এ সব কথা প্রণবের ম্‌খেই ক্রমে ক্রমে শোনা গেল।

স্নানের সময়ে সে নদীতে স্নান করিতে চাহিলে সকলেই বারণ করিল—এখানকার নদীতে এ সময়ে কুমীরের উৎপাত খ্‌ব বেশী, প্‌কুরে স্নান করাই নিরাপদ।

বৈকালে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাছারী-বাড়ির বারান্দাতে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, দিন-পনেরো প্‌র্বে নিকটস্থ কোন গ্রামের জনৈক তাঁতির ছেলে হঠাৎ নির্‌দ্দেশ হইয়া যায়, সম্প্রতি তাহাকে রায়মঙ্গলের এক নির্জন চরে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছেলেটি বলে, তাহাকে নাকি পরীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রমাণস্বর্‌প সে আঁচলের খ্‌ট খ্‌লিয়া কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ ও জায়ফল বাহির করিয়া দেখাইয়াছে, এ-অঞ্চলের ত্রিসীমানায় এ সকলের গাছ নাই—পরী কোথা হইতে আনিয়া উপহার দিয়াছে।

প্রণবের মামীমা দ্‌প্‌রে কাছে বসিয়া দ্‌জনকে খাওয়াইলেন, অনেকদিন অপ্‌র অদৃষ্টে এত যত্ন আদর বা এত ভাল খাওয়া-দাওয়া জোটে নাই। চিনি, ক্ষীর, মশলা, কপ্‌র, ঘৃত, জীবনে কখনও তাহাদের দরিদ্র গৃহস্থালিতে এ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। মায়ের সংসারে চালের গ্‌ড়া, গ্‌ড় ও সরিষার তৈলের কারবার ছিল বেশী।

পরদিন বিবাহ। সকাল হইতে নানা কাজে সে বাড়ির ছেলের মত খাটিতে লাগিল। নাটমন্দিরে বরাসন সাজানোর ভার পড়িল তাহার উপর। প্রাচীন আমলের বড় জাজিম ও সতরঞ্চির উপর সাদা চাদর পাতিয়া ফরাস বিছানো, কাচের সেজ ও বাতির ঝুম টাঙ্গানো, দেবদারু পাতার ফটক বাঁধা, কাগজ কাটিয়া দম্পতির উদ্দেশ্যে আশিষবাণী রচনা, সকাল আটটা হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এসব কাজে কাটিল।

সন্ধ্যার সময় বর আসিবে। বরের গ্রাম এই নদীরই ধারে, তবে দশ বারো ক্রোশ দূরে, নদীপথেই আসিতে হইবে। বরের পিতা ও-অঞ্চলের নাকি বড় গাঁতিদার, তাহা ছাড়া বিস্তৃত মহাজনী কারবারও আছে।

বরের নৌকা আসিতে একটু বিলম্ব হইতে পারে, প্রথম লগ্নে বিবাহ যদি না হয় রাত্রি দশটার লগ্ন বাদ যাইবে না।

ব্যাপার বুঝিয়া অপু বলিল—রাত তো আজ জাগতেই হবে দেখছি, আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নি ভাই, বর এলে আমাকে ডেকে তুলো এখন।

প্রণব তাহাকে তেতলার চিলে-কোঠার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—এখানে হৈ-চৈ কম, এখানে ঘুম হবে এখন, আমি ঘণ্টা দুই পরে ডাকবো।

ঘরটা ছোট, কিন্তু খুব হাওয়া, দিনের শ্রান্তিতে সে শুইতে না শুইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে সে ঠিক জানে না, কাহাদের ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বর এসেছে বুঝি? উঃ, রাত অনেক হয়েছে তো! কিন্তু প্রণবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল—একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি—কি-প্রণব—কিছু হয়েছে নাকি?

উত্তরের পরিবর্তে প্রণব তাহার বিছানার পাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর মুখে তাহার দিকে চাহিল, পরে ছল্-ছল্ চোখে তাহার হাত দু'টি ধরিয়া বলিল—ভাই আমাদের মান রক্ষার ভার তোমার হাতে আজ রাত্রে, অপর্ণাকে এখুনি তোমায়

বিয়ে করতে হবে, আর সময় বেশী নেই, রাত খুব অল্প আছে, আমাদের মান রাখো ভাই।

আকাশ হইতে পড়িলেও অপু এত অবাক্ হইত না।

প্রণব বলে কি ?···প্রণবের মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি ? না—কি সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে !

এই সময়ে দুজন গ্রামের লোকও ঘরে ঢুকিলেন, একজন বলিলেন—আপনার সঙ্গে যদিও আমার পরিচয় হয় নি, তবুও আপনার কথা সব পুলুর মুখে শুনেছি—এদের আজ বড় বিপদ, সব বলছি আপনাকে, আপনি না বাঁচালে আর উপায় নেই—

ততক্ষণ অপু ঘুমের ঘোরটা অনেকখানি কাটাইয়া উঠিয়াছে, সে না-বুঝিতে পারার দৃষ্টিতে একবার প্রণবের, একবার লোক দুইটির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ব্যাপারখানা কি !

ব্যাপার অনেক।

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পর বরপক্ষের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগে। লোকজনের ভিড় খুব, দু-তিনখানা গ্রামের প্রজাপত্র উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। বরকে হাঙ্গরমুখো সেকেলে বড় পাল্কিতে উঠাইয়া বাজনা-বাদ্য ও ধুমধামের সহিত মহা সমাদরে ঘাট হইতে নাটমন্দিরে বরাসনে আনা হইতেছিল—এমন সময় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। বাড়ির উঠানে পাল্কিখানা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, হঠাৎ বর নাকি পাল্কি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া বলিতে থাকে—হুক্কা বোলাও, হুক্কা বোলাও !!

সে কি বেজায় চীৎকার !

এক মুহূর্তে সব গোলমাল হইয়া গেল। চীৎকার হঠাৎ থামে না, বরকর্তা স্বয়ং দৌড়িয়া গেলেন, বরপক্ষের প্রবীণ লোকেরা ছুটিয়া গেলেন,—চারিদিকে সকলে অবাক্, প্রজারা অবাক্, গ্রামসুদ্ধ লোক অবাক্ ! সে এক কাণ্ড ! চোখে না দেখিলে বুঝানো কঠিন—আর কি যে লজ্জা, সারা উঠান জুড়িয়া প্রজা, প্রতিবেশী, আত্মীয়কুটুম্ব, পাড়ার ও গ্রামের ছোট বড় সকলে উপস্থিত, সকলের সামনে—বাঁড়ুয্যে বাড়ির মেয়ের বিবাহে এ ভাবের ঘটনা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নাতীত, এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বর যে প্রকৃতিস্থ নয়, একথা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না।

বরপক্ষ যদিও নানাভাবে কথাটা ঢাকিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কেহ

বলিলেন, গরমে ও সারাদিনের উপবাসের কষ্টে—ও কিছু নয়, ও-রকম হইয়া থাকে,…কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে চাপা দেওয়া গেল না, ক্রমে ক্রমে নাকি প্রকাশ হইতে লাগিল যে, বরের একটু সামান্য ছিট আছে বটে,—কিংবা ছিল বটে, তবে সেটা সব সময় যে থাকে তা নয়, আজকার গরমে, বিশেষ উৎসবের উত্তেজনায়—ইত্যাদি। ব্যাপারটা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিতেছিল, নানা পক্ষের বোঝানোতে আবার সোজা হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল, মেয়ের বাপ শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যেও মন হইতে সমস্তটা ঝাড়িয়া ফেলিতে প্রস্তুত ছিলেন—তাহা ছাড়া উপায়ও অবশ্য ছিল না—কিন্তু এদিকে মেয়ের মা অর্থাৎ প্রণবের বড় মামীমা মেয়ের হাত ধরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছেন,—তিনি বলেন, জানিয়া-শুনিয়া তাঁহার সোনার প্রতিমা মেয়েকে তিনি ও পাগলের হাতে কখনই তুলিয়া দিতে পারিবেন না, যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে। সকলের বহু অনুনয়-বিনয়েও এই তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে তিনি আর ঘরের দরজা খোলেন নাই, নাকি তেমন তেমন বুঝিলে মেয়েকে রাম-দা দিয়া কাটিয়া নিজের গলায় দা বসাইয়া দিবেন এমনও শাসাইয়াছেন, সুতরাং কেহ দরজা ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই। অপর্ণাও এমনি মেয়ে, সবাই জানে, মা তাহার গলায় যদি সত্যিই রাম-দা বসাইয়া দেয়ও, সে প্রতিবাদে মুখে কখনও টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করিবে না, মায়ের ব্যবস্থা শান্তভাবেই মানিয়া লইবে।

পিছনের ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি না রক্ষা করলে আর কেউ নেই, হয় এদিকে একটা খুনোখুনি হবে, না হয় সকাল হলেই ও-মেয়ে দো-পড়া হয়ে যাবে—এ সব দিবের গতিক তো জানেন না, দো-পড়া হ'লে কি আর ও মেয়ের বিয়ে হবে মশাই?…আহা, অমন সোনার পুতুল মেয়ে, এত বড় ঘর, ওরই অদৃষ্টে শেষে কিনা এই কেলেঙ্কারী! এ রাত্রের মধ্যে আপনি ছাড়া আর এ অঞ্চলে ও-মেয়ের উপযুক্ত পাত্র কেউ নেই—বাঁচান আপনি—

অপুর মাথায় যেন কিসের দাপাদাপি, মাতামাতি…মাথার মধ্যে যেন চৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্তন শুরু হইয়াছে!…এ কি সংকটে তাহাকে ভগবান ফেলিলেন! সকল প্রকার বন্ধনকে সে ভয় করে, তাহার উপর বিবাহের মত বন্ধন! এই তো সেদিন মা তাহাকে মুক্তি দিয়া গেলেন…আবার এক বৎসর ঘুরিতেই—এ কি!

মেয়েটির মুখ মনে হইল…আজই সকালে নিচের ঘরে তাহাকে দেখিয়াছে …কি শান্ত, সুন্দর গতিভঙ্গি। সোনার প্রতিমাই বটে, তাহার অদৃষ্টে

উৎসবের দিনে এই ব্যাপার!···তাহা ছাড়া রাম-দা-এর কাণ্ডটা···কি করে সে এখন?···

কিন্তু ভাবিবার অবসর কোথায়? পিছনে প্রণব দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে, সেই ভদ্রলোক দুটি তার হাত ধরিয়াছেন—তাহাও সে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিত—কিন্তু মেয়েটিও যেন শান্ত ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, সেই যে কাল সন্ধ্যায় প্রণবের আহ্বানে ছাদের উপরে যেমন তাহার পানে চাহিয়াছিল—তেমনি অপরূপ স্নিগ্ধ চাহনিতে···নির্বাক মিনতির দৃষ্টিতে সেও যেন তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে।···

সে বলিল, চল ভাই, যা করতে বলবে, আমি তাই করব, এসো।

নিচে কোথাও কোন শব্দ নাই, উৎসব-কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, বরপক্ষ এ বাড়ি হইতে সদলবলে উঠিয়া গিয়া ইঁহাদের শরিক রামদুর্লভ বাঁড়ুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছেন, এ-বাড়ির ঘরে-ঘরে খিল বন্ধ। কেবল নাটমন্দিরে উত্তর বারান্দার স্থানে স্থানে দু-চারজন জটলা করিয়া কি বলাবলি করিতেছে, আশ্চর্য এই যে, সম্প্রদান-সভায় পুরোহিত মহাশয় এত গোলমালের মধ্যেও ঠিক নিজের কুশাসনখানির উপর বসিয়া আছেন, তিনি নাকি সেই সন্ধ্যার সময় আসনে বসিয়াছেন আর উঠেন নাই।

সকলে মিলিয়া লইয়া গিয়া অপুকে বরাসনে বসাইয়া দিল।

এসব ঘটনা পরবর্তী জীবনে অপুর তত মনে ছিল না, বাংলা খবরের কাগজের ছবির মত অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকিত। তাহার মন তখন এত দিশাহারা ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল, চারিধারে কি হইতেছে, তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

আবার দু-একটা যাহা লক্ষ্য করিতেছিল, যতই তুচ্ছ হোক্ গম্ভীরভাবে মনে আঁকিয়া গিয়াছিল, যেমন—সামিয়ানার কোণের দিকে কে একজন ডাব কাটিতেছিল, ডাবটা গোল ও রাঙা, কাটারির বাঁটটা বাঁশের—অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিল।

রেশমী-চেলী-পরা সালঙ্কারা কন্যাকে সভায় আনা হইল, বাড়ির মধ্যে হঠাৎ শাঁখ বাজিয়া উঠিল, উলুধ্বনি শোনা গেল, লোকে ভিড় করিয়া সম্প্রদান-সভার চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইল। পুরোহিতের কথায় অপু চেলী পরিল, নূতন উপবীত ধারণ করিল, কলের পুতুলের মত মন্ত্রপাঠ করিয়া গেল। স্ত্রী-আচারের সময় আসিল, তখনও সে অন্যমনস্ক, নববধূর মত সেও ঘাড় গুঁজিয়া আছে, যে ব্যাপারটা ঘটিতেছে চারিধারে তখনও যেন সে সম্যক্

ধারণা করিতে পারে নাই—কানের পাশ দিয়া কি একটা যেন শির্-শির্ করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে—না ঠিক উপরের দিকে নয়, যেন নিচের দিকে নামিতেছে।

প্রণবের বড় মামীমা কাঁদিতেছিলেন তাহা মনে আছে, তিনিই আবার গরদের শাড়ির আঁচল দিয়া তাহার মুখের ঘাম মুছাইয়া দিলেন, তাহাও মনে ছিল। কে একজন মহিলা বলিলেন—মেয়ের শিবপুজোর জোর ছিল বড়বৌ, তাই এমন বর মিললো। ভাঙা দালান যে রূপে আলো করেছে!

শুভদৃষ্টির সময় সে এক অপূর্ব ব্যাপার! মেয়েটি লজ্জায় ডাগর চোখ দুটি নত করিয়া আছে, অপু কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিল, ভাল করিয়াই দেখিল, যতক্ষণ কাপড়ের ঢাকাটা ছিল, ততক্ষণ সে মেয়েটির মুখ ছাড়া অন্যদিকে চাহে নাই—চিবুকের গঠন-ভঙ্গিটি এক চমক দেখিয়াই সুঠাম ও সুন্দর মনে হইল। প্রতিমার মত রূপই বটে, চূর্ণ অলকের দু'এক গাছা কানের আশে-পাশে পড়িয়াছে, হিঙ্গুল রঙের ললাটে ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কানে সোনার দুলে আলো পড়িয়া জ্বলিতেছে।

বাসর হইল খুব অল্পক্ষণ, রাত্রি অল্পই ছিল। মেয়েদের ভিড়ে বাসর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ইঁহাদের অনেকেই বিবাহ ভাঙিয়া যাইতে নিজের নিজের বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন, কোথা হইতে একজনকে ধরিয়া আনিয়া অপর্ণার বিবাহ দেওয়া হইতেছে শুনিয়া তাঁহারা পুনরায় ব্যাপারটা দেখিতে আসিলেন। একরাত্রে এত মজা এ অঞ্চলের অধিবাসীর ভাগ্যে কখনও জোটে নাই —কিন্তু পথ-হইতে-ধরিয়া-আনা বরকে দেখিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন —এইবার অপর্ণার উপযুক্ত বর হইয়াছে বটে।

প্রণবের বড় মামীমা তেজস্বিনী মহিলা, তিনি বাঁকিয়া না বসিলে ওই বায়ু-রোগগ্রস্ত পাত্রটির সহিতই আজ তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইত নিশ্চয়ই। এমন কি তাঁহার অমন রাশভারী স্বামী শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে যখন নিজে বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—বড়বৌ, কি কর পাগলের মত, দোর খোলো, আমার মুখ রাখো—ছিঃ—তখনও তিনি অচল ছিলেন। তিনি বলিলেন—মা, যখনই একে পুলুর সঙ্গে দেখেছি, তখনই আমার মন যেন বলেছে এ আমার আপনার লোক— ছেলে তো আরও অনেক পুলুর সঙ্গে এসেছে গিয়েছে কিন্তু এত মায়া কারোর উপর হয়নি কখনও—ভেবে দ্যাখো মা, এ মুখ আর লোকালয়ে দেখাবো না ভেবে-ছিলাম—ও ছেলে যদি আজ পুলুর সঙ্গে এ বাড়ি না আসতো—

পূর্বের সেই প্রৌঢ়া বাধা দিয়া বলিলেন—তা কি ক'রে হবে মা,ওই যে তোমার অপর্ণার স্বামী, তুমি আমি কেনারাম মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ঠিক করতে গেলে কি হবে, ভগবান যে ওদের দুজনের জন্যে দুজনকে গড়েছেন, ও ছেলেকে যে আজ এখানে আসতেই হবে মা—

প্রণবের মামীমা বলিলেন—আবার যে এমন ক'রে কথা বলব তা আজ দুঘণ্টা আগেও ভাবিনি—এখন আপনারা পাঁচজনে আশীর্বাদ করুন, যাতে—যাতে—

চোখের জলে তাঁহার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল। উপস্থিত কাহারো চোখ শুষ্ক ছিল না, অপুও অতি কষ্টে উদ্গত অশ্রু চাপিয়া বসিয়া রহিল। প্রণবের মামীমার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাহার মন—মায়ের পরই বোধ হয় এমন আর কাহারও উপর—কেবল আর একজন আছেন—মেজ বৌরাণী—তিনি লীলার মা।

তা ছাড়া মায়ের উপর তাহার মনোভাব, শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব নয়, তাহা আরও অনেক ঘনিষ্ঠ, অনেক গভীর, অনেক আপন—বত্রিশ নাড়ীর বাঁধনের সঙ্গে সেখানে যেন যোগ—সে-সব কথা বুঝাইয়া বলা যায় না—যাক্ সে কথা।

বিশ্বাসঘাতক প্রণব কোথা হইতে আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে, নূতন জামাই খুব ভাল গাহিতে পারে। অপর্ণার মা তখনই বাসর হইতে চলিয়া গেলেন; বালিকা ও তরুণীর দল একে চায় তো আরে পায়, এদিকে অপু ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। না সে পারে ভালো করিয়া কাহারো দিকে চাহিতে, না মুখ দিয়া বাহির হয় কোন কথা। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে একটা রবিবাবুর গান গাহিল, তারপর আর কেহ ছাড়িতে চায় না—সুতরাং আর একটা! মেয়েরাও গাহিলেন, একটি বধূর কণ্ঠস্বর ভারী সুমিষ্ট। প্রৌঢ়া ঠান্দি নববধূর গা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—ওরে ও নাত্নি, তোর বর ভেবেছে ও বাঙাল দেশে এসে নিজেই গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেবে—শুনিয়ে দে না তোর গলা—জারিজুরি একবার দে না ভেঙে—

অপু মনে মনে ভাবে—কার বর?···সে আবার কার বর?···এই সুসজ্জিতা সুন্দরী নতমুখী মেয়েটি তাহার পাশে বসিয়া, এ তার কে। হয়?··স্ত্রী··· তাহারই স্ত্রী?

পরদিন সকালে পূর্বতন বরপক্ষের সহিত তুমুল কাণ্ড বাধিল। উভয় পক্ষে বিস্তর তর্ক, ঝগড়া, শাপাশাপি, মামলার ভয় প্রদর্শনের পর কেনারাম মুখুয্যে দলবলসহ নৌকা করিয়া স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। প্রণব বড়মামাকে বলিল—ওসব বড়লোকের মুখ্যু জড়ভরত ছেলের চেয়ে আমি যে অপূর্বকে কত বড় মনে

করি!···একা কলকাতা শহরে সহায়হীন অবস্থায় ওকে যা দুঃখের সঙ্গে লড়াই করতে দেখেছি আজ তিন বছর ধ'রে, ওকে একটা সত্যিকার মানুষ ব'লে ভাবি।

অপুর ঘর-বাড়ি নাই, ফুলশয্যা এখানেই হইল। রাত্রে অপু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ঘরের চারিধার ফুল ও ফুলের মালায় সাজানো, পালঙ্কের উপর বিছানায় মেয়েরা একরাশ বৈশাখী চাঁপাফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে, ঘরের বাতাসে পুষ্পসারের মৃদু সৌরভ। অপু সাগ্রহে নববধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাসরের রাত্রের পর আর মেয়েটির সহিত দেখা হয় নাই বা এ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কথাবার্তা হয় নাই আদৌ—আচ্ছা ব্যাপারটা কি রকম ঘটিবে? অপুর বুক কৌতূহলে ও আগ্রহে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল।

খানিক রাত্রে নববধূ ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনে আর একদফা একটা অবাস্তবতার ভাব জাগিয়া উঠিল। এ মেয়েটি তাহারই স্ত্রী?···স্ত্রী বলিতে যাহা বোঝায়, অপুর ধারণা ছিল, তা যেন এ নয়···কিংবা হয়ত স্ত্রী বলিতে ইহাই বোঝায়, তাহার ধারণা ভুল ছিল। মেয়েটি দোরের কাছে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল—অপু অতিকষ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আপনি—তু—তুমি দাঁড়িয়ে কেন? এখানে এসে ব'স

বাহিরে বহু বালিকাকণ্ঠের একটা সম্মিলিত কলহাস্যধ্বনি উঠিল। মেয়েটিও মৃদু হাসিয়া পালঙ্কের একধারে বসিল—লজ্জায় অপুর নিকট হইতে দূরে বসিল। এই সময় প্রণবের ছোট মামীমা আসিয়া বালিকার দলকে বকিয়া-ঝকিয়া নিচে নামাইয়া লইয়া যাইতে অপু খানিকটা স্বস্তি বোধ করিল। মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার নাম কি?

মেয়েটি মৃদুস্বরে নতমুখে বলিল—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী—সঙ্গে সঙ্গে সে অল্প একটু হাসিল। যেমন সুন্দর মুখ তেমনি সুন্দর মুখের হাসিটা—কি রং!···কি গ্রীবার ভঙ্গি! চিবুকের গঠনটি কি অপরূপ—মুখের দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল বাতির আলোয় অপুর যেন কিসের নেশা লাগিয়া গেল।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ। অপুর গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল। কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া এক গ্লাস জলই সে খাইয়া ফেলিল। কি কথা বলিবে সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিল—আচ্ছা, আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তোমার মনে খুব কষ্ট হয়েছে—না?

বধূ মৃদু হাসিল।

—বুঝতে পেরেছি ভারী কষ্ট হয়েছে—তা আমার—

—যান্—

এই প্রথম কথা, তাহাকে এই প্রথম সম্বোধন! অপুর সারাদেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, অনেক মেয়ে তো ইতিপূর্বে তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, এ রকম তো কখনও হয় নাই?…

দক্ষিণের জানালা দিয়া মিঠা হাওয়া বহিতেছিল, চাঁপাফুলের সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভরপুর।

অপু বলিল—রাত দুটো বাজে, শোবে না? ইয়ে—এখানেই তো শোবে?

মা ও দিদির সঙ্গে ভিন্ন কখনও অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় সে শোয় নাই, একা একঘরে এতবড় অনাত্মীয়, নিঃসম্পর্কীয় মেয়ের পাশে এক বিছানায় শোওয়া—সেটা ভাল দেখাইবে? কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। একবার তাহার হাতখানা মেয়েটির গায়ে অসাবধানতাবশত ঠেকিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে সারা গা শিহরিয়া উঠিল। কৌতূহলে ও ব্যাপারের অভিনবতায় তাহার শরীরের রক্ত টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল—ঘরের উজ্জ্বল আলোয় অপুর সুন্দর মুখ রাঙা ও একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিসম্পন্ন দেখাইতেছিল।

হঠাৎ সে কিসের টানে পাশ ফিরিয়া মেয়েটির গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত তুলিয়া দিল। বলিল—সেদিন যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল, তুমি কি ভেবেছিলে?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া তাহার হাতখানা আস্তে আস্তে সরাইয়া দিয়া বলিল—আপনি কি ভেবেছিলেন আগে বলুন?…সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের সুঠাম, পুষ্পপেলব হাতখানি বাতির আলোয় তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে—এই দেখুন কাঁটা দিয়েছে—কেন বলুন না?…কথা শেষ করিয়া সে আবার মৃদু হাসিল।

এতগুলি কথা একসঙ্গে এই প্রথম! কি অপূর্ব রোমান্স এ! ইহার অপেক্ষা কোন্ রোমান্স আছে আর এ জগতে, না চিনিয়া, না বুঝিয়া সে এতদিন কি হিজিবিজি ভাবিয়া বেড়াইয়াছে?…জীবনের জগতের সঙ্গে এ কি অপূর্ব ঘনিষ্ঠ পরিচয়…তাহার মাথার মধ্যে কেমন যেন করিতেছে, মদ খাইলে বোধ হয় এরকম নেশা হয়…ঘরের হাওয়া যেন…ঘরের মধ্যে যেন আর থাকা যায় না…বেজায় গরম। সে বলিল—একটু বাইরের ছাদে বেড়িয়ে আসি, খুব গরম না? আসছি এখুনি—

বৈশাখের জ্যোৎস্না রাত্রি—রাত্রি বেশী হইলেও বাড়ির লোক এখনও ঘুমায় নাই, কাল এখানে বৌভাত হইবে, নিচে তাহারই উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। দালানের পাশে বড় রোয়াকে ঝিয়েরা কচুর শাক কুটিতেছে, রান্না-কোঠার পিছনে নতুন খড়ের চালা বাঁধা হইয়াছে, সেখানে এত রাত্রে পানতুয়া ভিয়ান হইতেছে—সে ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিল।

ছাদে কেহ নাই, দূরের নদীর দিক হইতে একটা ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বহিতেছে। দু'দিন যে কি ঘটিয়াছে তাহা যেন সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই—আজ বুঝিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বেও সে ছিল সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য, জগতে সম্পূর্ণ একাকী, মুখের দিকে চাহিবার ছিল না কেহই। কিন্তু আজ তো তাহা নয়, আজ ওই মেয়েটি যে কোথা হইতে আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে, মনে হইতেছে যেন ও জীবনের পরম বন্ধু।

মা এ-সময় কোথায়?···মায়ের যে বড় সাধ ছিল···মনসাপোতার বাড়িতে শুইয়া শুইয়া কত রাত্রে সে-সব কত সাধ, কত আশার গল্প···মায়ের সোনার দেহ কোদ্‌লাতীরের শ্মশানে চিতাগ্নিতে পুড়িবার রাত্রি হইতে সে আশা-আকাঙ্ক্ষার তো সমাধি হইয়াছিল···মাকে বাদ দিয়া জীবনের কোন্‌ উৎসব···

তপ্ত আকুল চোখের জলে চারিদিক ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী রাত্রির জ্যোৎস্না যেন তাহার পরলোকগত দুঃখিনী মায়ের আশীর্বাদের মত তাহার বিভ্রান্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া সরল শুভ্র মহিমায় স্বর্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

অপরাজিত — দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার কর্মকঠোর, কোলাহল-মুখর, বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গত কয়েকদিনের জীবনকে নিতান্ত স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল অপুর। একথা কি সত্য —গত শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমার শেষরাত্রে সে অনেক দূরের নদীতীরবর্তী এক অজানা গ্রামের অজানা গৃহস্থবাটীর রূপসী মেয়েকে বলিয়াছিল—আমি এ বছর যদি আর না আসি অপর্ণা?···

প্রথমবার মেয়েটি একটু হাসিয়া মুখ নিচু করিয়াছিল, কথা বলে নাই।

অপু আবার বলিয়াছিল—চুপ ক'রে থাকলে হবে না, তুমি যদি বলো আসব,

নৈলে আসব না, সত্যি অপর্ণা। বলো কি বলবে?

মেয়েটি লজ্জারক্তমুখে বলিয়াছিল—বা রে, আমি কে? মা রয়েছেন, বাবা রয়েছেন, ও'দের—আপনি ভারী—

—বেশ আসব না তবে। তোমার নিজের ইচ্ছে না থাকে—

—আমি কি সে কথা বলেছি?

—তা হলে?

—আপনার ইচ্ছে যদি হয় আসতে, আসবেন—না হয় আসবেন না, আমার কথায় কি হবে?

ও কথা ইহার বেশী আর অগ্রসর হয় নাই. অন্য সময় এ ক্ষেত্রে হয়ত অপুর অত্যন্ত অভিমান হইত. কিন্তু এ ক্ষেত্রে কৌতূহলটাই তাহার মনের অন্য সব প্রবৃত্তিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—ভালবাসার চোখে মেয়েটিকে সে এখনও দেখিতে পারে নাই. যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে অভিমানও নাই।

সেদিন বৈকালে গোলদীঘির মোড়ে একজন ফেরিওয়ালা চাঁপাফুল বেচিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত গিয়া ফুল কিনিল। ফুলটা আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনের মধ্যে একটা বেদনা সে সুস্পষ্ট অনুভব করিল, একটা কিছু পাইয়া হারাইবার বেদনা, একটা শূন্যতা, একটা খালি-খালি ভাব···মেয়েটির মাথার চুলের সে গন্ধটাও যেন আবার পাওয়া যায়···

অন্যমনস্কভাবে গোলদীঘির এক কোণে ঘাসের উপর অনেকক্ষণ একা বসিয়া বসিয়া সেদিনের সেই রাতটি আবার সে মনে আনিবার চেষ্টা করিল। মেয়েটির মুখখানি কি রকম যেন?···ভারী সুন্দর মুখ···কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সব যেন মুছিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—মেয়েটির মুখ মনে আনিবার ও ধরিয়া রাখিবার যত বেশী চেষ্টা করিতেছে সে, ততই সে-মুখ দ্রুত অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। শুধু নতপল্লব কৃষ্ণতারা-চোখ-দুটির ভঙ্গি অল্প অল্প মনে আসে, আর মনে আসে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সে স্নিগ্ধ হাসিটুকু। প্রথমে ললাটে লজ্জা ঘনাইয়া আসে, ললাট হইতে নামে ডাগর দুটি চোখে, পরে কপোলে···তারপরই যেন সারা মুখখানি অল্পক্ষণের জন্য অন্ধকার হইয়া আসে···ভারী সুন্দর দেখায় সে সময়! তারপরই আসে সেই অপূর্ব হাসিটি, ওরকম হাসি আর কারও মুখে অপু কখনও দেখে নাই। কিন্তু মুখের সব আদলটা তো মনে আসে না—সেটা মনে আনিবার জন্য সে ঘাসের উপর শুইয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, অনেকক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিল—না কিছুতেই মনে আসে না—কিংবা হয়ত আসে অতি অল্পক্ষণের জন্য,

আবার তখনই অস্পষ্ট হইয়া যায় অপর্ণা—কেমন নামটি ?···

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি প্রণব কলিকাতায় আসিল। বিবাহের পর এই তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা। সে আসিয়া গল্প করিল, অপর্ণার মা বলিয়াছেন—তাঁহার কোন্ পুণ্যে এ রকম তরুণ দেবতার মত রূপবান জামাই পাইয়াছেন জানেন না—তাহার কেহ কোথাও নাই শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারেন নাই।

অপু খুশী হইল. হাসিয়া বলিল—শুধু তো একটা ভাল জামা গায়ে দিতে পারলাম না, সাদা পাঞ্জাবী গায়ে বিয়ে হ'ল—দূর!···না খেয়ে-দেয়ে একটা সিল্কের জামা করালুম. সেটা গেল ছিঁড়ে-খুঁড়ে, তখন তুমি এলে তোমার মামার বাড়িতে নিয়ে যেতে. তার আগে আসতে পারলে না—আচ্ছা সিল্কের জামাটাতে আমায় কেমন দেখাতো ?

—ওঃ—সাক্ষাৎ য়্যাপোলো বেলভেডিয়ার!···ঢের ঢের হ্যান্সাম দেখেছি, কিন্তু তোর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার—বুঝলি ?

না—কিন্তু একটা কথা। অপর্ণার মা কি বলেন তাহা জানিতে অপুর তত কৌতূহল নাই—অপর্ণা কি বলিয়াছে—অপর্ণা ?···অপর্ণা কিছু বলে নাই ?··· হয়ত কেনারাম মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে বিবাহ না হওয়াতে মনে মনে দুঃখিত হইয়াছে—না ?

প্রণবের মামা এ বিবাহে তত সন্তুষ্ট হন নাই, স্ত্রীর উপরে মনে মনে চটিয়াছেন এবং তাঁহার মনে ধারণা—প্রণবই তাহার মামীমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নিজের বন্ধুর সঙ্গে বোনের বিবাহ দেওয়াইয়াছে। নাম নাই. বংশ নাই. চালচুলা নাই—চেহারা লইয়া কি মানুষ ধুইয়া খাইবে···কিন্তু এসব কথা প্রণব অপুকে কিছু বলিল না।

একটা কথা শুনিয়া সে দুঃখিত হইল।—কেনারাম মুখুজ্যের ছেলেটি নিজে দেখিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়াছিল। অপর্ণাকে বিবাহ করিবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল তাহার—কিন্তু হঠাৎ বিবাহ-সভায় আসিয়া কি যেন গোলমাল হইয়া গেল, সারারাত্রি কোথা দিয়া কাটিল. সকালবেলা যখন একটু হুঁশ হইল. তখন সে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দাদা. আমার বিয়ে হ'ল না ?

এখনও তাহার অবশ্য ঘোর কাটে নাই···বাড়ি ফিরিবার পথেও তাহার মুখে ওই কথা—এখন নাকি সে বদ্ধ উন্মাদ! ঘরে তালা দিয়া রাখা হইয়াছে।

অপু বলিল—হাসিস কেন. হাসবার কি আছে?···পাগল তো নিজের ইচ্ছেয় হয় নি, সে বেচারির আর দোষ কি? ও নিয়ে হাসি ভাল লাগে না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হয় না—কেবলই অপর্ণার কথা মনে আসে। প্রণব এ কি করিয়া দিল তাহাকে? সে যে বেশ ছিল, এ কোন্ সোনার শিকল তাহার মুক্ত, বন্ধনহীন হাতে-পায়ে অদৃশ্য নাগপাশের মত দিন দিন জড়াইয়া পড়িতেছে? লাইব্রেরীতে বসিয়া কেবল আজকাল বাংলা উপন্যাস পড়ে—দেখিল, তাহার মত বিবাহ নভেলে অনেকে ঘটিয়াছে, অভাব নাই।

পূজার সময় শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঘটিল না। একে তো অর্থাভাবে সে নিজের ভাল জামা-কাপড় কিনিতে পারিল না, শ্বশুরবাড়ি হইতে পূজার তত্ত্বে যাহা পাওয়া গেল, তাহা পরিয়া সেখানে যাইতে তাহার ভারী বাধবাধ ঠেকিল। তাহা ছাড়া অপর্ণার মা চিঠির উপর চিঠি দিলে কি হইবে, তাহার বাবার দিক হইতে জামাইকে পূজায় সময় লইয়া যাইবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না বরং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশপূর্ণ পত্র পাওয়া গেল যে, একটা ভাল চাকুরি যেন সে শীঘ্র দেখিয়া লয়, এখন অল্প বয়স, এই তো অর্থ উপার্জনের সময়, এখন আলস্য ও ব্যসনে কাটাইলে…এমনি ধরনের নানা কথা। এখানে বলা আবশ্যক, এ বিবাহে তিনি অপুকে একেবারে ফাঁকি দিয়াছিলেন, কেনারাম মুখুযোর ছেলেকে যাহা দিবার কথা ছিল তাহার সিকিও এ জামাইকে দেন নাই।

ছুটি পাওয়া গেল পুনরায় বৈশাখ মাসে। পূর্বদিন রাত্রে তাহার কিছুতেই ঘুম আসে না, কি রকম চুল ছাঁটা হইয়াছে, আয়নায় দশবার দেখিল। ওই সাদা পাঞ্জাবীতে তাহাকে ভাল মানায়—না, এই তসরের কোটটাতে?

অপর্ণার মা তাহাকে পাইয়া হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলেন। সেদিনটা খুব বৃষ্টি, অপু নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ির বাহিরের উঠানে পা দিতেই কে পূজার দালানে বসিয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া বাড়ির মধ্যে খবর দিল। এক মুহূর্তে বাড়ির উপরের নিচের সব জানালা খুলিয়া গেল, বাড়িতে ঝি-বৌয়ের সংখ্যা নাই, সকলে জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—মুষলধারায় বৃষ্টিপাত অগ্রাহ্য করিয়া অপর্ণার মা উঠানে তাহাকে লইতে ছুটিয়া আসিলেন, সারা বাড়িতে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

ফুলশয্যার সেই ঘরে, সেই পালঙ্কেই রাত্রে শুইয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় রহিল।

এক বৎসরে অপর্ণার এ কি পরিবর্তন! তখন ছিল বালিকা—এখন ইহাকে দেখিলে যেন আর চেনা যায় না! লীলার মত চোখ-ঝলসানো সৌন্দর্য ইহার নাই বটে, কিন্তু অপর্ণার যাহা আছে, তাহা উহাদের কাহারও নাই। অপুর মনে

হইল দু-একখানা প্রাচীন পটে-আঁকা-তরুণী দেবীমূর্তির, কি দশমহাবিদ্যার ষোড়শী মূর্তির মুখে এ-ধরণের অনুপম, মহিমময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য সে দেখিয়াছে। একটু সেকেলে, একটু প্রাচীন ধরণের সৌন্দর্য···সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। যেন মনে হয় এ খাঁটি বাংলার জিনিস, এই দূর পল্লীপ্রান্তরের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথপ্রান্তে বনফুলের সকল সরলতা ছানিয়া ও মুখ গড়া. শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার পল্লীর চূত-বকুল-বীথির ছায়ায় ছায়ায় কত অপরাহ্নে নদীঘাটের যাওয়া-আসার পথে এই উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা, রূপসী তরুণী বধূদের লক্ষ্মীর মত আলতা-রাঙা পদচিহ্ন কতবার পড়িয়াছে, মুছিয়াছে, আবার পড়িয়াছে—ইহাদেরই স্নেহ-প্রেমের, দুঃখসুখের কাহিনী, বেহুলা-লখিন্দরের গানে, ফুল্লরার বারোমাস্যায়, সুবচনীর ব্রতকথায়, বাংলার বৈষ্ণব-কবিদের রাধিকার রূপবর্ণনায়, পাড়াগাঁয়ের ছড়ায়, উপকথায়, সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্পে :···

অপু বলিল—তোমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি, সারা বছরে একখানা চিঠি দিলে না কেন ?—

অপর্ণা সলজ্জ মৃদু একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর একবার ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। খুব মৃদুস্বরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল—আর আমার বুঝি রাগ হতে নেই ?···

অপু দেখিল—এতদিন কলিকাতায় সে জারুল কাঠের তক্তপোশে শুইয়া অপর্ণার যে মুখ ভাবিত—আসল মুখ একেবারেই তাহা নহে—ঠিক এই অনুপম মুখই সে দেখিয়াছিল বটে ফুলশয্যার রাত্রে, এমন ভুলও হয় !

—পুজোর সময় আসি নি তাই ?—তুমি ভাবতে কি না ?—ও-সব মুখের কথা, ছাই ভাবতে !—

— না গো না, মা বললেন, তুমি আসবে ষষ্ঠীর দিন, ষষ্ঠী গেল, পুজো গেল, তখনও মা বললেন তুকি একাদশীর পর আসবে—আমি—

অপর্ণা হঠাৎ থামিয়া গেল, অল্প একটু চাহিয়া চোখ নিচু করিল।

অপু আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি কি, বললে না ?

অপর্ণা বলিল—আমি জানি নে, বলব না—

অপু বলিল—আমি জানি আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তুমি মনে মনে—

অপর্ণা স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের সুরে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—আবার ওই কথা ?···ও-সব কথা বলতে আছে ?—ছিঃ—বলো না—

—তা কৈ, তুমি খুশী হয়েছ, একথা তো তোমার মুখে শুনি নি অপর্ণা—

অপর্ণা হাসিমুখে বলিল—তারপর কতদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে গো শুনি ?—সেই আর-বছর বোশেখ আর এ বোশেখ—

—আচ্ছা বেশ, এখন তো দেখা হ'ল, এখন আমার কথার উত্তর দাও ?

অপর্ণা কি-একটা হঠাৎ মনে পড়িবার ভঙ্গিতে তাহার দিকে চাহিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি নাকি যুদ্ধে যাচ্ছিলে, পুলুদা বলছিল, সত্যি ?—

—যাই নি, এবার ভাবছি যাবো—এখান থেকে গিয়েই যাবো—

অপর্ণা ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক্ গো, আর রাগ করতে হবে না, আচ্ছা তোমার কথার কি উত্তর দেব বলো তো ?—ওসব আমি মুখে বলতে পারব না—

—আচ্ছা, যুদ্ধ কাদের মধ্যে বেধেছে, জানো ?···

ইংরেজের সঙ্গে আর জার্মানির সঙ্গে—আমাদের বাড়িতে বাংলা কাগজ আসে ! আমি পড়ি যে।

অপর্ণা রূপার ডিবাতে পান আনিয়াছিল, খুলিয়া বলিল—পান খাবে না ?···

বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। একটুকু গরম নাই, ঠাণ্ডা রাতটির ভিজা মাটির সুগন্ধে ঝির্‌ঝিরে দক্ষিণ হাওয়া ভরপুর, একটু পরে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল।

অপু বলিল—আচ্ছা অপর্ণা, চাঁপাফুল পাওয়া যায় তো কাউকে কাল বলো না, বিছানায় রেখে দেবে ? আছে চাঁপাগাছ কোথাও ?···

—আমাদের বাগানেই আছে। আমি কাউকে বলতে পারব না কিন্তু—তুমি বলো কাল সকালে ওই নৃপেনকে, কি অনাদিকে···কি আমার ছোট বোনকে বলো—

—আচ্ছা কেন বল তো চাঁপাফুলের কথা তুললাম ?···

অপর্ণা সলজ্জ হাসিল। অপুর বুঝিতে দেরি হইল না যে, অপর্ণা তাহার মনের কথা ঠিক ধরিয়াছে। তাহার হাসিবার ভঙ্গিতে অপু একথা বুঝিল। বেশ বুদ্ধিমতী তো অপর্ণা !···

সে বলিল—হ্যাঁ একটা কথা অপর্ণা, তোমাকে একবার কিন্তু নিয়ে যাব দেশে, যাবে তো ?

অপর্ণা বলিল—মাকে বলো, আমার কথায় তো হবে না···

—তুমি রাজী কি না বলো আগে—সেখানে কিন্তু কষ্ট হবে। অপু একবার

ভাবিল সত্যি কথাটা খুলিয়াই বলে। কিন্তু সেই পুরাতন গর্ব ও বাহাদুরির ঝোঁক!—বলিল—অবিশ্যি একদিন আমাদেরও সবই ছিল। যেখানে থাকতুম—আমাদের পৈতৃক দেশ—এখন তো দোতলা মস্ত বাড়ি—মানে সবই—তবে শরিকানী মামলা আর মানে ম্যালেরিয়া—বুঝলে না? এখন যেখানে থাকি, সেখানে দু'খানা মেটে চালাঘর, তাও মা মারা যাওয়ার পর আর সেখানে যাই নি, তোমাদের মত ঝি-চাকর নেই, নিজের হাতে সব করতে হবে—তা আগে থেকেই ব'লে রাখি। তুমি হলে জমিদারের মেয়ে—

অপর্ণা কৌতুকের সুরে বলিল—আছিই তো জমিদারের মেয়ে। হিংসে হচ্ছে বুঝি? একটু থামিয়া শান্ত সুরে বলিল—কেন একশ'বার ওকথা বলো?···তুমি কাল মাকে বাবাকে ব'লে রাজী করাও, আমি তোমার সঙ্গে যেখানে নিয়ে যাবে যাবো, গাছতলাতেও যাবো, আমি তোমার সব কথা জানি, পুলুদা মায়ের কাছে বলছিল, আমি সব শুনেছি। যেখানে নিয়ে যাবে, নিয়ে চল, তোমার ইচ্ছে, আমার তাতে মতামত কি?

রাত্রে দুজনে কেহ ঘুমাইল না।

বধূকে লইয়া সে রওনা হইল। শ্বশুর প্রথমটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন—নিয়ে তো যেতে চাইছ বাবাজী, কিন্তু এখন নিয়ে গিয়ে তুলবে কোথায়? চাকরি-বাকরি ভাল কর, ঘর-দোর ওঠাও, নিয়ে যাবার এত তাড়াতাড়িটা কি?

সিঁড়ির ঘরে অপর্ণার মা স্বামীকে বলিলেন—হ্যাঁগা, তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছে দিন দিন—না কি? জামাইকে ও-সব কথা বলেছ? আজকালকার ছেলেমেয়েদের ধরণ আলাদা, তুমি জান না। ছেলেমানুষ জামাই, টাকাকড়ি, চাকরি-বাকরি ভগবান যখন দেবেন তখন হবে। আজকালের মেয়েরা ও-সব বোঝে না, বিশেষ ক'রে তোমার মেয়ে সে ধরণেরই নয়, ওর মন আমি খুব ভাল বুঝি। দাও গিয়ে পাঠিয়ে ওকে জামাইয়ের সঙ্গে—ওদের সুখ নিয়েই সুখ।

উৎসাহে অপুর রাত্রে ঘুম হয় না এমন অবস্থা, কাল সারাদিন অপর্ণাকে লইয়া রেল-স্টীমারে কাটানো—উঃ!···শুধু সে, আর কেউ না। রাত্রে অস্পষ্ট আলোকে অপর্ণাকে ভাল করিয়া দেখিবারই সুযোগ হয় না, দিনে দেখা হওয়া এ বাড়িতে অসম্ভব—কিন্তু কাল সকালটি হইতে তাহারা দুজনে—মাঝে আর কোন বাধা ব্যবধান থাকিবে না!

কিন্তু স্টীমারে অপর্ণা রহিল মেয়েদের জায়গায়। তিন ঘণ্টা কাল সেভাবে

কাটিল। তার পরেই রেল।

এইখানেই অপু সর্বপ্রথম গৃহস্থালি পাতিল স্ত্রীর সঙ্গে। ট্রেনের তখনও অনেক দেরি। যাত্রীদের রান্না-খাওয়ার জন্য স্টেশন হইতে একটু দূরে ভৈরবের ধারে ছোট ছোট খড়ের ঘর অনেকগুলি—তারই একটা চার আনায় ভাড়া পাওয়া গেল। অপু দোকানে খাবার কিনিতে যাইতেছে দেখিয়া বধূ বলিল—তা কেন? এই তো এখানে উনুন আছে, যাত্রীরা সব রেঁধে খায়, এখনও তো তিন-চার ঘণ্টা দেরি গাড়ির, আমি রাঁধব।

অপু ভারী খুশী। সে ভারী মজা হইবে! এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মনে আসে নাই। মহা উৎসাহে বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে ইতিমধ্যেই কখন বধূ স্নান সারিয়া ভিজা চুলটি পিঠের উপর ফেলিয়া, কপালে সিন্দুরের টিপ্ দিয়া লাল-জরিপাড় মটকার শাড়ি পরিয়া ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় এটা-ওটা ঠিক করিতেছে। হাসিমুখে বলিল—বাড়িওয়ালী জিগ্যেস করছে উনি তোমার ভাই বুঝি? আমি হেসে ফেলতেই বুঝতে পেরেছে, বলেছে—জামাই! তাই তো বলি!—আরও কি বলিতে গিয়া অপর্ণা লজ্জায় কথা শেষ করিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অপু মুগ্ধনেত্রে বধূর দিকে চাহিয়া ছিল। কিশোরীর তনুদেহটি বেড়িয়া স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কি অপূর্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সুন্দর নিটোল গৌর বাহু দুটি, চুলের খোঁপার ভঙ্গিটি কি অপরূপ! গভীর রাত্রে শোবার ঘরে এ পর্যন্ত দেখাশোনা, দিনের আলোয় স্নানের পরে এ অবস্থায় তাহার স্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করিবার সুযোগ কখনও ঘটে নাই—আজ দেখিয়া মনে হইল অপর্ণা সত্যই সুন্দরী বটে।

কাঁচা কাঠ কিছুতেই ধরে না, প্রথমে বধূ, পরে সে নিজে, ফুঁ দিয়া চোখ লাল করিয়া ফেলিল। প্রৌঢ়া বাড়িওয়ালী ইহাদের জন্য নিজের ঘরে বাটনা বাটিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দুজনের দুর্দশা দেখিয়া বলিল—ওগো মেয়ে, সরো বাছা, জামাইকে যেতে বলো। তোমাদের কি ও কাজ মা? সরো আমি দি ধরিয়ে!

বধূ তাগিদ দিয়া অপুকে স্নানে পাঠাইল। নদী হইতে ফিরিয়া সে দেখিল—ইহার মধ্যে কখন বধূ বাড়িওয়ালীকে দিয়া বাজার হইতে রসগোল্লা ও ছানা আনাইয়াছে, রেকাবিতে পেঁপে কাটা, খাবার ও গ্লাসে নেবুর রস মিশানো চিনির শরবৎ। অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, ভারী গিন্নীপনা যে!···আচ্ছা

তরকারীতে নুন দেওয়ার সময় গিন্নীপনার দৌড়টা একবার দেখা যাবে।

অপর্ণা বলিল—আচ্ছা গো দেখো—পরে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলাইয়া বলিল—ঠিক হ'লে কিন্তু আমায় কি দেবে ?

অপু কৌতুকের সুরে বলিল—ঠিক হলে যা দেব, তা এখুনি পেতে চাও ?

—যাও, আচ্ছা তো দুষ্টু !

একবার সে রন্ধনরত বধূর পিছনে আসিয়া চুপি-চুপি দাঁড়াইল। দৃশ্যটা এত নতুন, এত অভিনব ঠেকিতেছিল তাহার কাছে ! এই সুঠাম, সুন্দরী পরের মেয়েটি তাহার নিতান্ত আপনার জন—একমাত্র পৃথিবীতে আপনার জন ! পরে সে সন্তর্পণে নিচু হইয়া পিঠের উপরে এলানো চুলের গিঁঠটা ধরিয়া অতর্কিতে এক টান দিতেই বধূ পিছনে চাহিয়া কৃত্রিম কোপের সুরে বলিল—উঃ ! আমার লাগে না বুঝি ?···ভারী দুষ্টু তো···রান্না থাকবে পড়ে ব'লে দিচ্ছি যদি আবার চুল ধরে টানবে—

অপু ভাবে, মা ঠিক এই ধরণের কথা বলিত—এই ধরণের স্নেহ-প্রীতি-ঝরা চোখ। সে দেখিয়াছে, কি দিদি, কি রানু-দি, কি লীলা, কি অপর্ণা—সকলেরই মধ্যে মা যেন অল্পবিস্তর মিশাইয়া আছেন—ঠিক সময়ে ঠিক অবস্থায় ইহারা একই ধরণের কথা বলে, চোখে-মুখে একই ধরণের স্নেহ ফুটিয়া ওঠে।

একটি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে প্লাটফর্মে পায়চারী করিতেছিলেন। ট্রেনে উঠিবার কিছু পূর্বে অপু তাঁহাকে চিনিতে পারিল, দেওয়ানপুরের মাস্টার সেই সত্যেনবাবু। অপু থার্ড ক্লাসে পড়িবার সময়েই ইনি আইন পাস করিয়া স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আর কখনও দেখা হয় নাই। পুরাতন ছাত্রকে দেখিয়া খুশী হইলেন, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে কে কি করিতেছে শুনিবার আগ্রহ দেখাইলেন।

তিনি আজকাল পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, চালচলন দেখিয়া অপুর মনে হইল—বেশ দু'পয়সা উপার্জন করেন। তবুও বলিলেন, পুরানো দিনই ছিল ভাল, দেওয়ানপুরের কথা মনে হইলে কষ্ট হয়। ট্রেন আসিলে তিনি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলেন।

অপর্ণাকে সব ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়া অপু একখানা ফিটন গাড়ি ভাড়া করিয়া খানিকটা ঘুরিল।

অপু একটা জিনিস লক্ষ্য করিল ; অপর্ণা কখনও কিছু দেখে নাই বটে, কিন্তু কোনও বিষয়ে কোনও অশোভন ব্যগ্রতা দেখায় না। ধীর, স্থির, সংযত,

বুদ্ধিমতী—এই বয়সেই চরিত্রগত একটা কেমন সহজ গাম্ভীর্য—যাহার পরিণতি সে দেখিয়াছে ইহারই মায়ের মধ্যে ; উছলিয়া-পড়া মাতৃত্বের সঙ্গে চরিত্রের সে কি দৃঢ় অটলতা।

মনসাপোতা পেঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অপু বাড়িঘরের বিশেষ কিছু ঠিক করে নাই, কাহাকেও সংবাদ দেয় নাই, কিছু না—অথচ হঠাৎ স্ত্রীকে আনিয়া হাজির করিয়াছে। বিবাহের পর মাত্র একবার এখানে দুদিনের জন্য আসিয়াছিল, বাড়িঘর অপরিষ্কার, রাত্রিবাসের অনুপযুক্ত, উঠানে ঢুকিয়া পেয়ারা গাছটার তলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বধূ দাঁড়াইয়া রহিল, অপু গরুর গাড়ি হইতে তোরঙ্গ ও কাঠের হাতবাক্সটা নামাইতে গেল। উঠানের পাশের জঙ্গলে নানা পতঙ্গ কুম্বর করিয়া ডাকিতেছে, ঝোপে-ঝোপে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিতেছে।

কেহ কোথাও নাই, কেহ তরুণ দম্পতিকে সাদরে বরণ ও অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে তুলিয়া লইতে ছুটিয়া আসিল না, তাহারাই দুজনে টানাটানি করিয়া নিজেদের পেটরা-তোরঙ্গ মাত্র দেশলাইয়ের কাঠির আলোর সাহায্যে ঘরের দাওয়ায় তুলিতে লাগিল। সে আজ কাহাকেও ইচ্ছা করিয়াই খবর দেয় নাই, ভাবিয়াছিল—মা যখন বরণ করে নিতে পারলেন না আমার বৌকে, অত সাধ ছিল মার—তখন আর কাউকে বরণ করতে হবে না, ও অধিকার আর কাউকে বুঝি দেব ?

অপর্ণা জানিত তাহার স্বামী দরিদ্র কিন্তু এ রকম দরিদ্র তাহা সে ভাবে নাই। তাহাদের পাড়ার নাপিত-বাড়ির মত নিচু, ছোট চালাঘর। দাওয়ার একধারে গরু বাছুর উঠিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে···ছাঁচতলায় কাঁই-বীচি ফুটিয়া বর্ষার জলে চারা বাহির হইয়াছে···একস্থানে খড় উড়িয়া চালের বাখারি ঝুলিয়া পড়িয়াছে···বাড়ির চারিধারে কি পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছে···এরকম ঘরে তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে ?···অপর্ণার মন দমিয়া গেল। কি করিয়া থাকিবে সে এখানে ? মায়ের কথা মনে হইল···খুড়ীমাদের কথা মনে হইল···ছোট ভাই বিনুর কথা মনে হইল··· কান্না ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল···সে মরিয়া যাইবে এখানে থাকিলে···

অপু খুঁজিয়া-পাতিয়া একটা লণ্ঠন জ্বালিল। ঘরের মাটির মেঝেতে পোকায় খুঁড়িয়া মাটি জড় করিয়াছে। তক্তপোশের একটা পাশ ঝাড়িয়া তাহার উপর অপর্ণাকে বসাইল···সবে অপর্ণাকে অন্ধকার ঘরে বসাইয়া লণ্ঠনটা হাতে বাহিরে হাতবাক্সটা আনিতে গেল···অপর্ণার গা ছম ছম করিয়া উঠিল অন্ধকারে··· পরক্ষণেই অপু নিজের ভুল বুঝিয়া আলো হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—দ্যাখো কাণ্ড, তোমাকে একা অন্ধকারে বসিয়ে রেখে—থাক্ লণ্ঠনটা এখানে—

অপর্ণার কান্না আসিতেছিল।···

আধঘণ্টা পরে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঘরটা একরকম রাত্রি কাটানোর মত দাঁড়াইল। কি খাওয়া যায় রাত্রে ?—রান্নাঘর ব্যবহারের উপযোগী নাই তো বটেই, তা ছাড়া চাল, ডাল, কাঠ কিছুই নাই। অপর্ণা তোরঙ্গ খুলিয়া একটা পুঁটুলি বার করিয়া বলিল—ভুলে গিয়েছিলাম তখন, মা নাড়ু দিয়েছিলেন এতে বেঁধে—অনেক আছে—এই খাও।

অপু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। সংসার কখনও করে নাই—এই নতুন—নিতান্ত আনাড়ী—অপর্ণাকে এ অবস্থায় এখানে আনা ভাল হয় নাই, সে এতক্ষণে বুঝিয়াছে। অপ্রতিভের সুরে বলিল—রাণাঘাট থেকে কিছু খাবার নিলেই হ'ত—তোমাকে একলা বসিয়ে রেখে যাই কি ক'রে—নৈলে ক্ষেত্র কাপালীর বাড়ি থেকে চিঁড়ে আর দুধ—যাব ?···

অপর্ণা ঘাড় নাড়িয়া বারণ করিল।

তেলিদের বাড়িতে কেউ ছিল না, তিন-চারি মাস হইতে তাহারা কলিকাতায় আছে, বাড়ি তালাবন্ধ, নতুবা কাল রাত্রে ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া সে-বাড়ির লোক আসিত। সকালে সংবাদ পাইয়া ও-পাড়া হইতে নিরুপমা ছুটিয়া আসিল। অপু কৌতুকের সুরে বলিল—এসো, এসো নিরুদিদি, এখন মা নেই, তোমরা কোথায় বরণ ক'রে ঘরে তুলবে, দুধে-আলতার পাথরে দাঁড় করাবে, তা না তুমি সকালে পান চিবুতে চিবুতে এলে। বেশ যা হোক্!

নিরুপমা অনুযোগ করিয়া বলিল—তুমি ভাই সেই চৌদ্দ বছরে যেমন পাগলটি ছিলে, এখনও ঠিক সেই আছে। বৌ নিয়ে আসছো তা' একটা খবর না, কিছু না। কি ক'রে জানব তুমি এ অবস্থায় একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে এই ভাঙা-ঘরে হুপ্ ক'রে এনে তুলবে ? ছি ছি, দ্যাখ তো কাণ্ডখানা ? রাত্রে যে রইলে কি ক'রে এখানে, সে কেবল তুমিই পার।

নিরুপমা গিনি দিয়া বৌ-এর মুখ দেখিল।

অপু বলিল—তোমাদের ভরসাতেই কিন্তু ওকে এখানে রেখে যাব নিরুদি। আমাকে সোমবার চাকুরিতে যেতেই হবে। নিরুপমা বৌ দেখিয়া খুব খুশী, বলিল—আমি আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেব বৌকে, এখানে থাকতে দেব না! অপু বলিল—তা হবে না, আমার মায়ের ভিটেতে সন্ধ্যে দেবে কে তাহলে ? রাত্রে তোমাদের ওখানে শোবার জন্যে নিয়ে যেও। নিরুপমা তাতেই রাজী

চৌদ্দ বছরের ছেলে যখন প্রথম চেলী পরিয়া তাহাদের বাড়ি পূজা করিতে গিয়াছিল, তখন হইতে সে অপুকে সত্য সত্য স্নেহ করে তাহার দিকে টানে। অপু ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় সে মনে মনে খুব দুঃখিত হইয়াছিল। মেয়েরা গতিকে বোঝে না, বাহিরকে বিশ্বাস করে না, মানুষের উদ্দাম ছুটিবার বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত সংযত করিয়া তাহাকে গৃহস্থালি পাতাইয়া, বাসা বাঁধাইবার প্রবৃত্তি নারীমনের সহজাত ধর্ম, তাহাদের সকল মাধুর্য, স্নেহ, প্রেমের প্রয়োগ-নৈপুণ্য এখানে। সে শক্তিও এত বিশাল যে খুব কম পুরুষই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জয়ী হইবার আশা করিতে পারে। অপু বাড়ি ফিরিয়া নীড় বাঁধাতে নিরুপমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া অপুর আর কিছু ভাল লাগে না, কেবল শনিবারের অপেক্ষায় দিন গুনিতে থাকে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাহারা নব-বিবাহিত তাহাদের সঙ্গে কেবল বিবাহিত জীবনের গল্প করিতে ও শুনিতে ভাল লাগে। কোনও রকমে এক সপ্তাহ কাটাইয়া শনিবার দিন সে বাড়ি গেল। অপর্ণার গৃহিণীপনায় সে মনে মনে আশ্চর্য না হইয়া পারিল না। এই সাত-আট দিনের মধ্যেই অপর্ণা বাড়ির চেহারা একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছে। তেলি-বাড়ির বুড়ী ঝিকে দিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে ঘরের দেওয়াল লেপিয়া ঠিক করাইয়াছে। দাওয়ায় মাটি ধরাইয়া দিয়াছে, রাঙা এলামাটি আনিয়া চারিধারে রঙ করাইয়াছে, নিজের হাতে এখানে তাক, ওখানে কুলুঙ্গি গাঁথিয়াছে, তক্তপোশের তলাকার রাশীকৃত ইঁদুরের মাটি নিজেই উঠাইয়া বাহিরে ফেলিয়া গোবর-মাটি লেপিয়া দিয়াছে। সারা বাড়ি যেন ঝক্‌-ঝক্‌ তক্‌-তক্‌ করিতেছে। অথচ অপর্ণা জীবনে এই প্রথম মাটির ঘরে পা দিল। পূর্ব গৌরব যতই ক্ষুণ্ণ হউক, তবুও সে ধনীবংশের মেয়ে, বাপ-মায়ের আদরে লালিত, বাড়ি থাকিতে নিজের হাতে তাহাকে কখনও বিশেষ কিছু করিতে হইত না।

মাসখানেক ধরিয়া প্রতি শনিবারে বাড়ি যাতায়াত করিবার পর অপু দেখিল তাহার যাহা আয় ফি শনিবার বাড়ি যাওয়ার খরচ তাহাতে কুলায় না। সংসারে দশ-বারো টাকার বেশী মাসে এ পর্যন্ত সে দিতে পারে নাই। সে বোঝে—ইহাতে সংসার চালাইতে অপর্ণাকে দস্তুরমতো বেগ পাইতে হয়। অতএব ঘন ঘন বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিল।

ডাকপিয়নের খাকির পোশাক যে বুকের মধ্যে হঠাৎ এরূপ ঢেউ তুলিতে পারে, ব্যগ্র আশার আশ্বাস দিয়াই পরমুহূর্তে নিরাশা ও দুঃখের অতলতলে নিমজ্জিত

করিয়া দিতে পারে, পনেরো টাকা বেতনের আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাফিসের পিওন যে একদিন তাহার দুঃখ-সুখের বিধাতা হইবে, এ কথা কবে ভাবিয়াছিল? পূর্বে কালে-ভদ্রে মায়ের চিঠি আসিত, তাহার জন্য এরূপ ব্যগ্র প্রতীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। পরে মায়ের মৃত্যুর পর বৎসরখানেক তাহাকে একখানি পত্রও কেহ দেয় নাই। উঃ, কি দিনই গিয়াছে সেই এক বৎসর! মনে আছে, তখন রোজ সকালে চিঠির বাক্স বৃথা আশায় একবার করিয়া খোঁজ করিয়া হাসিমুখে পাশের ঘরের বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত—আরে, বীরেন বোসের জন্যে তো এ বাসায় আর থাকা চলে না দেখছি!—রোজ রোজ যত চিঠি আসে তার অর্ধেক বীরেন বোসের নামে!

বন্ধু হাসিয়া বলিত—ওহে পাঁচজন থাকলেই চিঠিপত্তর আসে পাঁচদিক থেকে তোমার নেই কোনও চুলোয় কেউ, দেবে কে চিঠি?

বোধ হয় কথাটা রূঢ় সত্য বলিয়াই অপুর মনে আঘাত লাগিত কথাটায়। বীরেন বোসের নানা ছাঁদের চিঠিগুলি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—সাদা খাম, সবুজ খাম, হলদে খাম, মেয়েলি হাতের লেখা পোস্টকার্ড, এক-একবার হাতে তুলিয়া লোভ দমন করিতে না পারিয়া দেখিয়াছেও—ইতি তোমার দিদি, ইতি তোমার মা, আপনার স্নেহের ছোট বোন সুশী, ইত্যাদি। বীরেন বোস মিথ্যা বলে নাই, চারিদিকে আত্মীয় বন্ধু থাকিলেই রোজ পত্র আসে—তাহার চিঠি তো আর আকাশ হইতে পড়িবে না? আজকাল আর সে দিন নাই। পত্র লিখিবার লোক হইয়াছে এতদিনে।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা, কিন্তু দিনগুলা মাসের মত দীর্ঘ।

অবশেষে জন্মাষ্টমীর ছুটি আসিয়া গেল। এডিটারকে বলিয়া বেলা তিনটার সময় আফিস হইতে বাহির হইয়া সে স্টেশনে আসিল। পথে নব-বিবাহিত বন্ধু অনাথবাবু বৈঠকখানা বাজার হইতে আম কিনিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রাম ধরিতে ছুটিতেছেন। অপুর কথার উত্তরে বলিলেন—সময় নেই, তিনটে পনেরো ফেল করলে আবার সেই চারটে পঁচিশ, দু'ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে বাড়ি পৌঁছতে—আচ্ছা আসি, নমস্কার!

দাড়িটা ঠিক কামানো হইয়াছে তো?

মুখ রৌদ্রে, ধূলায় ও ঘামে যে বিবর্ণ হইয়া যাইবে তাহার কি? কী গাধাবোট গাড়িখানা, এতক্ষণে মোটে নৈহাটী? বাড়ি পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইতে পারে।

খুশির সহিত ভাবিল, চিঠি লিখে তো যাচ্ছি নে, হঠাৎ দেখে অপর্ণা একেবারে অবাক হয়ে যাবে এখন—

বাড়ি যখন পৌঁছিল, তখনও সন্ধ্যার কিছু দেরি। বধূ বাড়ি নাই, বোধ হয় নিরুপমাদের বাড়ি কি পুকুরের ঘাটে গিয়াছে। কেহ কোথাও নাই। অপু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পুঁটলি নামাইয়া রাখিয়া সাবানখানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া আগে হাত মুখ ও মাথা ধুইয়া ফেলিয়া তাকের আয়না ও চিরুনির সাহায্যে টেরী কাটিল। পরে নিজের আগমনের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

আধঘণ্টা পরেই সে ফিরিল। বধূ ঘরের মধ্যে প্রদীপের সামনে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কি বই পড়িতেছে। অপু পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। এটা অপুর পুরানো রোগ, মায়ের সঙ্গে কতবার এরকম করিয়াছে। হঠাৎ কি একটা শব্দে বধূ পিছন ফিরিয়া চাহিয়া ভয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে অপু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বধূ অপ্রতিভের সুরে বলিল—ওমা তুমি! কখন—কৈ—তোমার তো—

অপু হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন জব্দ! আচ্ছা তো ভীতু!

বধূ ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়া হাসি মুখে বলিল—বা রে, ওই রকম ক'রে বুঝি আচমকা ভয় দেখাতে আছে? ক'টার গাড়িতে এলে এখন—তাই বুঝি আজ ছ-সাত দিন চিঠি দেওয়া হয় নি—আমি ভাবছি—

অপু বলিল—তারপর, তুমি কি রকম আছ, বল? মায়ের চিঠিপত্র পেয়েছ?

—তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গিয়েছ, অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বুঝি?

—আমার এবারকার চিঠির কাগজটা কেমন? ভালো না? তোমার জন্যে এনেছি পঁচিশখানা। তারপর রাত্রে কি খাওয়াবে বল?

—কি খাবে বলো? ঘি এনে রেখেছি. আলুপটলের ডালনা করি—আর দুধ আছে—

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু দেখিয়া অবাক হইল, বাড়ির পিছনের উঠানে অপর্ণা ছোট ছোট বেড়া দিয়া শাকের ক্ষেত, বেগুনের ক্ষেত করিয়াছে। দাওয়ার ধারে ধারে গাঁদার চারা বসাইয়াছে। রান্নাঘরের চালায় পুঁইলতা, লাউলতা উঠাইয়া দিয়াছে। দেখাইয়া বলিল,—আজ পুঁই-শাক খাওয়াব আমার গাছের! ওই দোপাটীগুলো দ্যাখ? কত বড়, না? নিরুপমা দিদি বীজ দিয়েছেন। আর একটা জিনিস দ্যাখো নি? এসো দেখাব—

অপুর সারা শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ বহিল। অপর্ণা যেন তাহার মনের গোপন কথাটি জানিয়া বুঝিয়াই কোথা হইতে একটা ছোট চাঁপা গাছের ডাল আনিয়া মাটিতে পুঁতিয়াছে, দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো কেমন—হবে না এখানে?

—হবে না আর কেন? আচ্ছা, এত ফুল থাকতে চাঁপা ফুলের ডাল যে পুঁততে গেলে?

অপর্ণা সলজ্জমুখে বলিল—জানি নে—যাও!

অপু তো লেখে নাই, পত্রে তো এ কথা অপর্ণাকে জানায় নাই যে, মিত্তির বাড়ির কম্পাউণ্ডের চাঁপাফুল গাছটা তাহাকে কি কষ্টই না দিয়াছে এই দু'মাস! চাঁপা ফুল যে হঠাৎ তাহার এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, এ কথাটি মনে মনে অনুমান করিবার জন্য এই কর্মব্যস্ত, সদা-হাসিমুখ মেয়েটির উপর তাহার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

অপর্ণা বলিল—এখানে একটু বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে? মাগো, কি ছাগলের উৎপাতই তোমাদের দেশে! চারাগাছ থাকতে দেয় না, রোজ খেয়েদেয়ে সারা দুপুর কঞ্চি হাতে দাওয়ায় ব'সে ছাগল তাড়াই আর বই পড়ি—দুপুরে রোজ নিরুদি আসেন, ও-বাড়ির মেয়েরা আসে, ভারী ভাল মেয়ে কিন্তু নিরুদিদি!

আজ সারাদিন ছিল বর্ষা। সন্ধ্যার পর একটানা বৃষ্টি নামিয়াছে, হয়ত বা সারা রাত্রি ধরিয়া বর্ষা চলিবে। বাহিরে কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকারে মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। বধূ বলিল—রান্নাঘরে এসে বসবে? গরম গরম সেঁকে দি—। অপু বলিল—তা হবে না, আজ এসো আমরা দুজনে এক পাতে খাবো! অপর্ণা প্রথমটা রাজী হইল না, অবশেষে স্বামীর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া একটা থালায় রুটি সাজাইয়া খাবার ঠাঁই করিল।

অপু দেখিয়া বলিল,—ও হবে না, তুমি আমার পাশে বসো, ও-রকম বসলে চলবে না। আরও একটু—আরও—পরে সে বাঁ-হাতে অপর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—এবার এসো দু'জনে খাই—

বধূ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তোমার বদ্‌খেয়ালও মাথায় আসে, মাগো মা! দেখতে তো খুব ভালমানুষটি!

লাভের মধ্যে বধূর একরূপ খাওয়াই হইল না সেরাত্রে। অন্যমনস্ক অপু গল্প করিতে করিতে থালার রুটি উঠাইতে উঠাইতে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল—

পাছে স্বামীর কম পড়িয়া যায় এই ভয়ে সে বেচারী খান-তিনের বেশী নিজের জন্য লইতে পারিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর অপর্ণা বলিল- কই, কি বই এনেছ বললে. দেখি ?

দু'জনেই কৌতুকপ্রিয় সমবয়সী সুস্থমন. বালকবালিকার মত আমোদ করিতে, গল্প করিতে, সারারাত জাগিতে, অকারণে অর্থহীন বকিতে দুজনেরই সমান আগ্রহ, সমান উৎসাহ। অপু একখানা নতুন-আনা বই খুলিয়া বলিল— পড়ো তো এই পদ্যটা ?

অপর্ণা প্রদীপের সল্‌তেটা চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়া উস্কাইয়া দিয়া পিলসুজটা আরও নিকটে টানিয়া আনিল। পরে সে লজ্জা করিতেছে দেখিয়া অপু উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—পড়ো না, কই দেখি ?

অপর্ণা যে কবিতা এত সুন্দর পড়িতে পারে অপুর তাহা জানা ছিল না। সে ঈষৎ লজ্জাজড়িত স্বরে পড়িতেছিল—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা—

অপু পড়ার প্রশংসা করিতেই অপর্ণা বই মুড়িয়া বন্ধ করিল। স্বামীর দিকে উজ্জ্বলমুখে চাইয়া কৌতুকের ভঙ্গিতে বলিল—থাকগে পড়া, একটা গান করো না !

অপু বলিল, একটা টিপ পরো না খুকী ! ভারী সুন্দর মানাবে তোমার কপালে—

অপর্ণা সলজ্জ হাসিয়া বলিল—যাও—

—'সত্যি বলছি অপর্ণা, আছে টিপ ?—

—আমার বয়সে বুঝি টিপ পরে ? আমার ছোট বোন শান্তির এখন টিপ পরবার বয়স তো—

কিন্তু শেষে তাহাকে টিপ পরিতেই হইল। সত্যই ভারী সুন্দর দেখাইতে-ছিল, প্রতিমার চোখের মত টানা, আয়ত সুন্দর চোখ দুটির উপর দীর্ঘ, ঘনকালো, জোড়াভুরুর মাঝখানটিতে টিপ মানাইয়াছে কি সুন্দর ! অপুর মনে হইল—এই মুখের জন্যই জগতের টিপ সৃষ্টি হইয়াছে—প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় এই টিপ-পরা মুখখানি বার-বার সতৃষ্ণ চোখে চাহিয়া দেখিবার জন্যই।

অপর্ণা বলে—ছাই দেখাচ্ছে, এ বয়েসে কি টিপ মানায় ? কি করি পরের

ছেলে, বললে তো আর কথা শুনবে না তুমি !

—না গো পরের মেয়ে, শোনো একটু সরে এসো তো—

—ভারী দুষ্টু—এত জ্বালাতনও তুমি করতে পার !···

অপু বলিল—আচ্ছা, আমায় দেখতে কেমন দেখায় বলো না সত্যি—কেমন মুখ আমার ? ভাল, না পেঁচার মত ?

অপর্ণার মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল দেখাইল—নাক সিঁটকাইয়া বলিল—বিশ্রী, পেঁচার মত ।

অপু কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলিল—আর তোমার মুখ তো ভাল, তা হলেই হয়ে গেল । যাই, শুইগে যাই—রাত কম হয় নি—কাল ভোরে আবার—

বধূ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল ।

এই রাত্রিটা গভীর দাগ দিয়া গিয়াছিল অপুর মনে । মাটির ঘরের আনাচে-কানাচে, গাছপালায় বাঁশবনে, ঝিম্ ঝিম্ নিশীথের একটানা বর্ষার ধারা । চারিধারই নিস্তব্ধ । পূর্বদিকের জানালা দিয়া বর্ষাসজল বাদল রাতের দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে আসে—মাটির প্রদীপের আলোতে, খড়ের ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া সে ও অপর্ণা !

অপু বলিল—দ্যাখো আজ রাত্রে মায়ের কথা মনে হয়—মা যদি আজ থাকতেন ?

অপর্ণা শান্ত সুরে বলিল—মা সবই জানেন, যেখানে গিয়েছেন, সেখান থেকে সবই দেখছেন । পরে সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দ্যাখো, আমি মাকে দেখেছি ।

অপু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিল । অপর্ণার মুখে শান্ত, স্থির বিশ্বাস ও সরল পবিত্রতা ছাড়া আর কিছু নাই ।

অপর্ণা বলিল—শোন, একদিন কি মাসটায়, তোমার সেদিন চিঠি এল দুপুর বেলা । বিকেলে আঁচল পেতে পান্‌চালার পিঁড়েতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—সেদিন সকালে উঠোনের ঐ লাউগাছটাকে পুঁতেছি, কঞ্চি কেটে তাকে উঠিয়েছি, খেতে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, বুঝলে ? স্বপ্নে দেখছি—একজন কে দেখতে বেশ সুন্দর, লালপেড়ে শাড়ি-পরা, কপালে সিঁদুর, তোমার মুখের মত আদল, আমায় আদর ক'রে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলছেন—ও আবাগীর মেয়ে, অবেলায় শুয়ো না, ওঠো, অসুখ-বিসুখ হবে আবার ? তারপর তিনি তাঁর হাতের সিঁদুরের কৌটো থেকে আমার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিতেই আমি চমকে জেগে উঠলাম—এমন স্পষ্ট আর সত্যি বলে মনে হ'ল যে, তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেখতে

গেলাম সিঁদুর লেগে আছে কিনা—দেখি কিছুই না—বুক ধড়াস্ ক'রে উঠল—চারদিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে—বাড়িতে কেউ নেই—খানিকক্ষণ না পারি কিছু করতে—হাত পা যেন অবশ—তারপরে মনে হ'ল, এ মা—আর কেউ না, ঠিক মা। মা এসেছিলেন এয়োতির সিঁদুর পরিয়ে দিতে। কাউকে বলি নি, আজ বললাম তোমায়।

বাহিরের বর্ষাধারার অবিশ্রান্ত রিম্‌ঝিম্ শব্দ, একটা কি পতঙ্গ বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তান রাখিয়া একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে পূবে-হাওয়ার দমকা, অপর্ণার মাথায় চুলের গন্ধ। জীবনের এই সব মুহূর্ত বড় অদ্ভুত। অনভিজ্ঞ হইলেও অপু তাহা বুঝিল। হঠাৎ ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকে যেন অন্ধকার পথের অনেকখানি নজরে পড়ে। এমন সব চিন্তা মনে আসে, সাধারণ অবস্থায়, সুস্থ মনে সারা জীবনেও সে-সব চিন্তা মনে আসিত না।···কেমন একটা রহস্য···আত্মার অদৃষ্ট লিপি···একটা বিরাট অসীমতা···

কিন্তু পরক্ষণেই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে কোনও কথা বলিল না। কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না, কেহই কোন কথা বলিল না।

খানিকটা পরে সে বলিল, আর একটা কবিতা পড়ো—শুনি বরং—

অপর্ণা বলিল – তুমি একটা গান করো—

অপু রবিঠাকুরের গান গাহিল একটা, দুইটা, তিনটা। তারপর আবার কথা, আবার গল্প। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আর রাত নেই কিন্তু—ফর্সা হয়ে এল—

—ঘুম পাচ্ছে ?

—না। তুমি একটা কাজ করো না ? কাল আর যেও না—

—অফিস কামাই করব ? তা কি কখনো চলে ?

ভোর হইয়া গেল। অপর্ণা উঠিতে যাইতেছিল, অপু কোন্ সময় ইতিমধ্যে তাহার আঁচলের সঙ্গে নিজের কাপড়ের সঙ্গে গিঁট বাঁধিয়া রাখিয়াছে, উঠিতে গিয়া টান পড়িল। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ওমা তুমি কি! আচ্ছা দুষ্টু তো···এখুনি হারাণের মা কাজ করতে আসবে—বুড়ী কি ভাববে বল দিকি ? ভাববে, এত বেলা অবধি ঘরের মধ্যে—মাগো মা, ছাড়ো, লজ্জা করে—ছিঃ।

অপু ততক্ষণে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

—ছাড়ো, ছাড়ো, লক্ষ্মী—ছিঃ—এখুনি এল বলে বুড়ী, পায়ে পড়ি তোমার ছাড়ো—

অপু নির্বিকার।

এমন সময় বাহিরে হারাণের মায়ের গলা শোনা গেল। অপর্ণা ব্যস্তভাবে মিনতির সুরে বলিল—ওই এসেছে বুড়ী—ছাড়ো ছিঃ—লক্ষ্মীটি—ওরকম দুষ্টুমি করে না—লক্ষ্মী—

হারাণের মা কপাটের গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল—ও বৌমা, ভোর হয়ে গিয়েছে ওঠো, ওঠো, ঘড়া ঘটিগুলো বার ক'রে দেবে না?

অপু হাসিয়া উঠিয়া আঁচলের গিট খুলিয়া দিল।

আফিস কামাই করিয়া সে-দিনটা অপু বাড়িতেই রহিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী উপলক্ষে খুব ভিড়। অপু অনেক দিন হইতে ইন্‌স্টিটিউটের সভ্য, তাহাদের জনকয়েকের উপর শিশুমঙ্গল ও খাদ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার আছে। দুপুর হইতে সে এই কাজে লাগিয়া আছে। মন্মথ বি-এ পাস করিয়া এটর্নির আর্টিক্‌ল্‌ড্‌ ক্লার্ক হইয়াছে। তাহার সহিত একদিন ইনস্টিটিউটের বসিবার ঘরে ঘোর তর্ক। অপুর দৃঢ় বিশ্বাস—যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে। বিলাতে লয়েড জর্জ বলিয়াছেন, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে আমরা আর পদানত করিয়া রাখিব না। ভারতকে দিয়া আর ক্রীতদাসের কার্য করাইয়া লইলে চলিবে না। Indians must not remain as hewers of wood and drawers of water.

এই সময়েই একদিন ইন্‌স্টিটিউটের লাইব্রেরিতে কাগজ খুলিয়া একটা সংবাদ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। জোয়ান অব্‌ আর্ককে রোমান্‌ ক্যাথলিক যাজক-শক্তি তাঁহাদের ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুর তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

তার শৈশবের আনন্দ-মুহূর্তের সঙ্গিনী সেই পল্লীবালিকা জোয়ান—ইছামতীর ধারে শান্ত বাব্‌লা-বনের ছায়ায় বসিয়া শৈশবের সে স্বপ্নভরা দিনগুলিতে যাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়! ইহার পর সে একদিন সিনেমাতে জোয়ান অব্‌ আর্কের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব দেখিল। ডম্‌রেমির নিভৃত পল্লীপ্রান্তে ফ্রান্সের সকল প্রদেশ হইতে লোকজন জড়ো হইয়াছে—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে কত নরনারী আসিয়াছে ···সামরিক পোশাকে সজ্জিত ফরাসী সৈনিক কর্মচারীর দল···সবসুদ্ধ মিলিয়া এক মাইল দীর্ঘ বিরাট শোভাযাত্রা···জোয়ানের সঙ্গে তার নাড়ীর কি যেন যোগ

…জোয়ানের সম্মানে তার নিজের বুক যেন গর্বে ফুলিয়া উঠিতেছিল…শৈশবের স্বপ্নের সে-মোহ অপু এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বড় হইয়া অবধি সে এই মেয়েটিকে কি শ্রদ্ধার চোখে ভক্তির চোখে দেখিয়া আসিয়াছে এতদিন, সে-কথা জানিত এক অনিল—নতুবা কল্পনা যাহাদের পঙ্গু, মন মিনমিনে, পানসে—তাহাদের কাছে সে-কথা তুলিয়া লাভ কি? কলেজে পড়িবার সময় সে বড় ইতিহাসে জোয়ানের বিস্তৃত বিবরণ পড়িয়াছে—অতীত শতাব্দীর সেই অবুঝ নিষ্ঠুরতা, ধর্মমতের গোঁড়ামি, খুঁটিতে বাঁধিয়া হৃদয়হীন দাহন—সূর্যদেবের রথচক্রের দ্রুত আবর্তনে অসীম আকাশে যেমন দুপুর হয় বৈকাল, বৈকাল হয় রাত্রি, রাত্রি হয় প্রভাত—মহাকালের রথচক্রের আবর্তনে এক শতাব্দীর অন্ধকারপুঞ্জ তেমনি পরের শতাব্দীতে দূরীভূত হইয়া যাইতেছে। সত্যের শুক-তারা একদিন যে প্রকাশ হইবেই, জীবনের দুঃখদৈন্যের অন্ধকার শুধু যে প্রভাতেরই অগ্রদূত—কল-কাকলিময়, ফুল-ফোটা অমৃত-ঝরা প্রভাত।

অন্যমনস্ক মনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে খাদ্য-বিভাগের ঘরে ঢুকিতে যাইতেছে, কে তাহাকে ডাকিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া প্রথমটা চিনিতে পারিল না—পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—প্রীতি, না? এগ্‌জিবিশন্‌ দেখতে এসেছিলে বুঝি? ভাল আছ?

প্রীতি অনেক বড় হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিল, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে সঙ্গিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে ডাকিয়া বলিল—মা, আমার মাস্টার মশায় অপূর্ববাবু—সেই অপূর্ববাবু।

অপু প্রণাম করিল। প্রীতি বলিল—আচ্ছা আপর্ণার রাগ তো? এক কথায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, দেখুন! কত ছোট ছিলুম, বুঝতুম কি কিছু? তারপর আপনাকে কত খোঁজ করেছিলুম, আর কোনও সন্ধানই কেউ বলতে পারলে না। আপনি আজকাল কি করছেন মাস্টার মশায়?

—ছেলেও পড়াই, রাত্রে খবরের কাগজের অফিসে চাকরিও করি—

—আচ্ছা মাস্টার মশাই, আপনাকে যদি বলি, আমাদের বাড়ি কি আপনি আর যাবেন না?

অপুর মনে পূর্বতন ছাত্রীর উপর কেমন একটা স্নেহ আসিল। কথা গুছাইয়া বলিতে জানিত না, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছিল সে সময়—তাহারও অত সহজে রাগ করা ঠিক হয় নাই। সে বলিল,—তুমি অত অপ্রতিভ ভাবে কথা বলছ কেন প্রীতি! দোষ আমারই, তুমি না হয় ছেলেমানুষ ছিলে, আমার

রাগ করা উচিত হয় নি—

ঠিকানা বিনিময়ের পর প্রীতি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

আবার অপুর এ-কথা মনে না হইয়া পারিল না—কাল, মহাকাল, সবারই মধ্যে পরিবর্তন আনিয়া দিবে···তোমার বিচারের অধিকার কি?

আরও মাস দুই কোন রকমে কাটাইয়া অপু পূজার সময় দেশে গেল। সেদিন ষষ্ঠী, বাড়ির উঠানে পা দিয়া দেখিল পাড়ার একদল মেয়ে ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া হাসিকলরব করিতেছে—অপু উপস্থিত হইতে অপর্ণা ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পাড়ার মেয়েদের সে আজ ষষ্ঠী উপলক্ষে বৈকালিক জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের হাতে সকলকে আলতা সিঁদুর পরাইয়াছে। হাসিয়া বলিল,—ভাগ্যিস্ এলে! ভাবছিলাম এমন কলার বড়াটা আজ ভাজলাম—

—সত্যি, কৈ দেখি?

—বা রে, হাত মুখ ধোও—ঠান্ডা হও—অমন পেটুক কেন তুমি?···পেটুক গোপাল কোথাকার!

পরে সে রেকাবিতে খাবার আনিয়া বলিল, এগুলো খেয়ে ফেলো, তারপর আরও দেব—দ্যাখো তো খেয়ে, মিষ্টি কম হয় নি তো?—তোমার তো আবার একটুখানি গুড়ে হবে না!

খাইতে খাইতে অপু ভাবিল—বেশ তো শিখেছে করতে! বেশ—

পরে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়াতে বলিল,—বাঃ, ও-রকম আলপনা দিয়েছে কে? ভারী সুন্দর তো! অপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল,—ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজোতে তো এলে না! আমি বাড়িতে পুজো করলাম,—মা করতেন, সিঁদুরমাখা কাঠা দেখি তোলা রয়েছে, তাতে নতুন ধান পেতে—বামুন খাওয়ালাম। তুমি এলেও দু'টি খেতে পেতে গো—তারই ঐ আল্‌পনা—

—তাই তো! তুমি ভারী গিন্নী হয়ে উঠেছ দেখছি! লক্ষ্মীপুজো, লোক খাওয়ানো—আমার কিন্তু এসব ভারী ভাল লাগে অপর্ণা—সত্যি, মাও খুব ভালবাসতেন—একবার তখন আমরা এখানে নতুন এসেছি—একজন বুড়োমত লোক আমাদের উঠোনের ধারে এসে দাঁড়িয়ে বললে,—খোকা ক্ষিদে পেয়েছে, দুটো মুড়ি খাওয়াতে পারো?—আমি মাকে গিয়ে বললাম, মা, একজন মুড়ি খেতে চাচ্ছে, ওকে খানকতক রুটি করে খাওয়ালে ভারী খুশী হবে—খাওয়াবে মা? মা কি করলেন বলো তো?

—রুটি তৈরী ক'রে বুঝি—

—তা নয়। মা একটু ক'রে সরের ঘি ক'রে রাখতেন, আমি বোর্ডিং থেকে বাড়িটাড়ি এলে পাতে দিতেন। আমায় খুশী করবার জন্য মা সেই ঘি দিয়ে আট-দশখানা পরোটা ভেজে লোকটাকে ডেকে, দাওয়ার কোলে পিঁড়ি পেতে খেতে দিলেন। লোকটা তো অবাক, তার মুখের এমন ভাব হ'ল!

রাত্রে অপর্ণা বলিল—দ্যাখো, মা চিঠি লিখেছেন,—পুজোর পর মুরারি-দা আসবেন নিতে, পাঁচ-ছ'মাস যাই নি, তুমি যাবে আমাদের ওখানে?

অপুর বড় অভিমান হইল। সে এত আশা করিয়া পুজার সময় বাড়ি আসিল, আর এদিকে কিনা অপর্ণা বাপের বাড়ি যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া আছে! সে-ই তাহা হইলে ভাবিয়া মরে, অপর্ণার কাছে বাপের বাড়ি যাওয়াটাই অধিকতর লোভনীয়!

অপু উদার সুরে বলিল—বেশ, যাও। আমার যাওয়া ঘট্‌বে না, ছুটি নেই এখন। কথাটা শেষ করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বই পড়িতে লাগিল।

অপর্ণা খানিকক্ষণ পরে বলিল—এবারে যে বইগুলো এনেছ আমার জন্যে, ওর মধ্যে একখানা 'চয়নিকা' তো আনলে না? সেই যে সে-বার বলে গেলে জন্মাষ্টমীর সময়? এক-আধ কথার জবাব পাইয়া ভাবিল সারা দিনের কষ্টে স্বামীর হয়ত ঘুম আসিতেছে। তখন সেও ঘুমাইয়া পড়িল।

দশমীর পরদিনই মুরারি আসিয়া হাজির। জামাইকেও যাইতে হইবে, অপর্ণার মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি নানা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। অপু বলি—পাগল! ছুটি কোথায় যে যাব আমি? বোনকে নিতে এসেছ, বোনকেই নিয়ে যাও ভাই—আমরা গরীব চাক্‌রে লোক, তোমাদের মত জমিদার নই—আমাদের কি গেলে চলে?

অপর্ণা বুঝিয়াছিল স্বামী চটিয়াছে, এ অবস্থায় তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না আদৌ, কিন্তু বড় ভাই লইতে আসিয়াছে সে কি করিয়াই বা 'না' বলে? দো-টানার মধ্যে সে বড় মুশকিলে পড়িল। স্বামীকে বলিল—দ্যাখো আমি যেতাম না। কিন্তু মুরারি-দা এসেছেন, আমি কি কিছু বলতে পারি?······ রাগ করো না লক্ষ্মীটি, তুমি এখন না যাও, কালীপুজোর ছুটিতে অবিশ্যি ক'রে যেও—ভুলো না যেন।

অপর্ণা চলিয়া যাইবার পর মনসাপোতা আর একদিনও ভাল লাগিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়া সে রাত্রিটা সেখানে কাটাইতে হইল, কারণ অপর্ণারা গেল বৈকালের ট্রেনে। কোনদিন লুচি হয় না কিন্তু দাদার কাছে স্বামীকে ছোট

হইতে না হয়, এই ভাবিয়া অপর্ণা দুইদিনই রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করিয়াছিল—আজও স্বামীর খাবার আলাদা করিয়া ঘরের কোণে ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। লুচি ক'খানা খাইয়াই অপু উদাস মনে জানালার কাছে আসিয়া বসিল। খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, বাড়ির উঠানের গাছে গাছে এখনও কি পাখি ডাকিতেছে, শূন্য ঘর, শূন্য শয্যাপ্রান্ত—অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। অপর্ণা সব বুঝিয়া তাহাকে এই কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া গেল। বড়লোকের মেয়ে কিনা?···আচ্ছা বেশ।···অভিমানের মুখে সে এ কথা ভুলিয়া গেল যে, অপর্ণা আজ ছ'-মাস এইশূন্য বাড়িতে শূন্য শয্যায় তাহারই মুখ চাহিয়া কাটাইয়াছে!

পরদিন প্রত্যুষে অপু কলিকাতা রওনা হইল। সেখানে দিনচারেক পরেই অপর্ণার এক পত্র আসিল—অপু সে পত্রের কোনও জবাব দিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে অপর্ণার আর একখানা চিঠি। উত্তর না পাইয়া ব্যস্ত আছে, শরীর ভাল আছে তো? অসুখ-বিসুখের সময়, কেমন আছে পত্রপাঠ যেন জানায়, নতুবা বড় দুর্ভাবনার মধ্যে থাকিতে হইতেছে। তাহারও কোন জবাব গেল না।

মাসখানেক কাটিল।

কার্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন একখানা দীর্ঘ পত্র আসিল। অপর্ণা লিখিয়াছে—ওগো, আমার বুকে এমন পাষাণ চাপিয়ে আর কতদিন রাখবে, আমি এত কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে?···আজ একমাসের ওপর হ'ল তোমার একছত্র লেখা পাই নি, কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি, তা কাকে জানাব? দ্যাখো, যদি কোন দোষই ক'রে থাকি, তুমি যদি আমার উপর রাগ করবে তবে ত্রিভুবনে আর কার কাছে দাঁড়াই বল তো?

অপু ভাবিল,—বেশ জব্দ, কেন, যাও বাপের বাড়ি!—আমাকে চাইবার দরকার কি, কে আমি? সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব পুলকের ভাব মনের কোণে দেখা দিল—পথে, ট্রামে, আফিসে, বাসায়, সব সময়, সকল অবস্থাতেই মনে না হইয়া পারিল না যে, পৃথিবীতে একজন কেহ আছে, যে সর্বদা তাহার জন্য ভাবিতেছে, তাহারই চিঠি না পাইলে সে-জনের দিন কাটিতে চাহে না, জীবন বিস্বাদ লাগে। সে যে হঠাৎ এক সুন্দরী তরুণীর নিকট এতটা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে—এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অভিনব ও অদ্ভুত তাহার কাছে। অতএব তাহাকে আরও ভাবাও, আরও কষ্ট দাও, তাহার রজনী আরও বিনিদ্র করিয়া তোল।

সুতরাং অপর্ণার মিনতি বৃথা হইল। অপু চিঠির জবাব দিল না।

এদিকে অপুদের আফিসের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া আসিল। কাগজ উঠিয়া যাইবার যোগাড়, একদিন স্বত্বাধিকারী তাহাদের কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কি করা উচিত সে-সম্বন্ধে পরামর্শ। কথাবার্তার গতিকে বুঝিল কাগজের পরমায়ু আর বেশী দিন নয়। তাহার একজন সহকর্মী বাহিরে আসিয়া বলিল—এ বাজারে চাকরিটুকু গেলে মশাই দাঁড়াবার যো নেই একেবারে—বোনের বিয়েতে টাকা ধার, সুদে-আসলে অনেক দাঁড়িয়েছে, সুদটা দিয়ে শামিয়ে রাখার উপায় যদি না থাকে, মহাজন বাড়ি ক্রোক দেবে মশাই, কি যে করি!

ইতিমধ্যে সে একদিন লীলাদের বাড়ি গেল। যাওয়া সেখানে ঘটে নাই প্রায় বছর দুই, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে দেখিয়া লীলা আনন্দ ও বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—এ কি আপনি! আজ নিতান্তই পথ ভুলে বুঝি এদিকে এসে পড়লেন? অপু যে শুধু অপ্রতিভ হইল তাহা নয়, কোথায় যেন সে নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিল। একটুখানি আনাড়ীর মত হাসি ছাড়া লীলার কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। লীলা বলিল—এবার না হয় আপনার পরীক্ষার বছর, তার আগে তো অনায়াসেই আস্‌তে পারতেন? অপু মৃদু হাসিয়া বলিল—কিসের পরীক্ষা? সে সব তো আজ বছর দুই ছেড়ে দিয়েছি। এখন খবরের কাগজের আফিসে চাকরি করি।

লীলা প্রথমটা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথাটা যেন বিশ্বাস করিল না, পরে দুঃখিতভাবে বলিল,—কেন, কি জন্য ছাড়লেন পড়া, শুনি? আ-প-নি পড়া ছেড়েছেন!

লীলার চোখের এই দৃষ্টিটা অপুর প্রাণে কেমন একটা বেদনার সৃষ্টি করিল, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার দৃষ্টি, তবুও সে হাসিমুখে কৌতুকের সুরে বলিল—এমনি দিলুম ছেড়ে, ভাল লাগে না আর, কি হবে পড়ে? তাহার এই হাল্‌কা কৌতুকের সুরে লীলা মনে আঘাত পাইল, অপূর্ব কি ঠিক সেই পুরানো দিনের অপূর্বই আছে? না যেন?

অপু বলিল—তুমি তো পড়ছ, না?

লীলা নিজের সম্বন্ধে কোন কথা হঠাৎ বলিতে চায় না, অপুর প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবে বলিল—এবার আই-এ পাশ করেছি, থার্ড ইয়ারে পড়ছি।

আপনি আজকাল পুরোনো বাসায় থাকেন, না, আর কোথাও উঠে গিয়েছেন ?

লীলার মা ও মাসীমা আসিলেন। লীলা নিজের আঁকা ছবি দেখাইল। বলিল—এবার আপনার মুখে 'স্বর্গ হইতে বিদায়'টা শুনব, মা আর মাসীমা সেই জন্য এসেছেন।

আরও খানিক পরে অপু বিদায় লইয়া বাহিরে আসিল, লীলা বৈঠকখানার দোর পর্যন্ত সঙ্গে আসিল, অপু হাসিয়া বলিল,—লীলা, আচ্ছা ছেলেবেলায় তোমাদের বাড়িতে কোন বিয়েতে তুমি একটা হাসির কবিতা বলেছিলে মনে আছে ? মনে আছে সে কবিতাটা ?

—উঃ! সে আপনি মনে ক'রে রেখেছেন এতদিন! সে সব কি আজকের কথা ?

অপু অনেকটা আপন-মনেই অন্যমনস্কভাবে বলিল—আর একবার তুমি তোমার জন্যে আনা দুধ অর্ধেকটা খাওয়ালে আমায় জোর ক'রে, শুনলে না কিছুতেই—ওঃ, দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল!

বলিয়া সে হাসিল, কিন্তু লীলা কোনও কথা বলিল না। অপু একবার পিছন দিকে চাহিল, লীলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন দেখিতেছে।

ফিরিবার পথে একটা কথা তাহার বার বার মনে আসিতেছিল। অপর্ণা সুন্দরী বটে, কিন্তু লীলার সঙ্গে এ পর্যন্ত দেখা কোন মেয়ের তুলনা হয় না, হওয়া অসম্ভব। লীলার রূপ মানুষের মত নয় যেন, দেবীর মত রূপ, মুখের অনুপম শ্রীতে, চোখের ও ভ্রূর ভঙ্গিতে, গায়ের রং-এ, গলার সুরে, গতির ছন্দে।

অপু বুঝিল সে লীলাকে ভালবাসে, গভীর ভাবে ভালবাসে, কিন্তু তা আবেগহীন, শান্ত, ধীর ভালবাসা। মনে তৃপ্তি আনে, স্নিগ্ধ আনন্দ আনে, কিন্তু শিরায় উপশিরায় রক্তের তাণ্ডব নর্তন তোলে না। লীলা তাহার বাল্যের সাথী, তাহার উপর মায়ের পেটের বোনের মত একটা মমতা, স্নেহ ও অনুকম্পা, একটা মাধুর্যভরা ভালবাসা।

দিন দুই পরে, একদিন লীলার দাদামশায়ের এক দারোয়ান আসিয়া তাহাকে একখানা পত্র দিল, উপরে লীলার হাতের ঠিকানা লেখা। পত্রখানা সে খুলিয়া পড়িল। দু-লাইনের পত্র, একবার বিশেষ প্রয়োজনে আজ বা কাল ভবানীপুরের বাড়িতে যাইতে লিখিয়াছে।

লীলা সাদাসিধা লালপাড় শাড়ি পরিয়া মাঝের ছোট ঘরে তাহার সঙ্গে দেখা করিল। যাহাই সে পরে, তাহাতেই তাহাকে কি সুন্দর না মানায়! সকাল আটটা, লীলা বোধ হয় বেশীক্ষণ ঘুম হইতে উঠে নাই, রাত্রির নিদ্রালুতা এখনও যেন ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, মাথার চুল অবিন্যস্ত, ঘাড়ের দিকে ঈষৎ এলাইয়া পড়িয়াছে, প্রভাতের পদ্মের মত মুখের পাশে চূর্ণকুন্তলের দু-এক গাছা। অপু হাসিমুখে বলিল—থার্ড ইয়ার ব'লে বুঝি লেখাপড়া ঘুচেছে! আটটার সময় ঘুম ভাঙল? না, এখনও ঠিক ভাঙে নি?

লীলা যে কত পছন্দ করে অপুকে তাহার এই সহজ আনন্দ, খুশী ও হাল্‌কা হাসির আবহাওয়ার জন্য! ছেলেবেলাতেও সে দেখিয়াছে, শত দুঃখের মধ্যেও অপুর আনন্দ, উজ্জ্বলতা ও কৌতুকপ্রবণ মনের খুশী কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিত না, এখনও তাই, একরাশ বাহিরের আলো ও তারুণ্যের সজীব জীবনানন্দ সে সঙ্গে করিয়া আনে যেন, যখনই আসে—আপনা-আপনিই এসব কথা লীলার মনে হইল। তাহার মনে পড়িল, মায়ের মৃত্যুর খবরটা সে এই রকম হাসিমুখেই দিয়াছিল লালদীঘির মোড়ে।

—আসুন, বসুন, বসুন। কুড়েমি ক'রে ঘুমুই নি, কাল রাত্রে বড় মামীমার সঙ্গে বায়োস্কোপে গিয়েছিলাম সাড়ে-ন'টার শো'তে। ফিরতে হয়ে গেল পৌনে বারো, ঘুম আসতে দেড়টা। বসুন চা আনি।

জাপানী গালার সুদৃশ্য চায়ের বাসনে সে চা আনিল। সঙ্গে পাঁউরুটি-টোস্ট, খোলাসুদ্ধ ডিম, কি এক প্রকার শাক, আধখানা ভাঙা আলু—সব সিদ্ধ, ধোঁয়া উড়িতেছে। অপু বলিল—এসব সাহেবী বন্দোবস্ত বোধ হয় তোমার দাদামশায়ের, লীলা? ডিম, তা আবার খোলাসুদ্ধ, এ শাকটা কি?

লীলা হাসিমুখে বলিল,—ওটা লেটুস্। দাঁড়ান ডিম ছাড়িয়ে দি। আপনার দাড়ির কাছে ও কাটা দাগটা কিসের? কামাবার সময় কেটে ফেলেছিলে বুঝি?

অপু বলিল,—ও কিছু না, এমনি কিসের। ব'সো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন তুমি চা খাবে না?

লীলার ছোট ভাই ঘরে ঢুকিয়া অপুর দিকে চাহিয়া হাসিল, নাম বিমলেন্দু, দশ-এগারো বছরের সুশ্রী বালক। লীলা তাহাকে চা ঢালিয়া দিল, পরে তিনজনে নানা গল্প করিল। লীলা নিজের আঁকা কতকগুলি ছবি দেখাইল,

নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিল। সে এম. এ. পাশ করিবে, নয় তো বি. এ. পাশ করিয়া বিদেশে যাইতে চায়, দাদামশায়কে রাজী করাইয়া লইবে, ইউরোপের বড় আর্ট গ্যালারিগুলির ছবি দেখিবে, ফিরিয়া আসিয়া অজন্তা দেখিতে যাইবে, তার আগে নয়। একটা আলমারী দেখাইয়া বলিল—দেখুন না এই বইগুলো ?···ভ্যাসারির লাইভস্···এডিশন্‌টা কেমন ?···ছবিগুলো দেখুন—সেণ্ট্ এ্যাণ্টনির ছবিটা আমার বড় ভাল লাগে, কেমন একটা তপস্যাস্তব্ধ ভাব, না ?—ইন্‌স্টল্‌মেণ্ট সিস্টেমে এগুলো কিনেছি—আপনি কিনবেন কিছু ? ওদের ক্যান্‌ভাসার আমাদের বাড়ি আসে, তা হলে ব'লে দি—

অপু বলিল—কত ক'রে মাসে ?···ভ্যাসারির এডিশনটা তা'হলে না হয়—

—এটা কেন কিনবেন ? এটা তো আমার কাছেই রয়েছে—আপনার যখন দরকার হবে, নেবেন—আমার কাছে যা যা আছে, তা আপনাকে কিনতে হবে কেন ? —দাঁড়ান, আর একটা বইয়ের একখানা ছবি দেখাই—

অপু ছবিটার দিক হইতে আর একবার লীলার দিকে চাহিয়া দেখিল—বতিচেলির প্রিন্সেস্ দেস্ত্ খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু বতিচেলির বা দ্য-ভিঞ্চির প্রতিভা লইয়া যদি লীলার এই অপূর্ব সুন্দর মুখ, এই যৌবন-পুষ্পিত দেহলতা ফুটাইয়া তুলিতে পারিত কেউ !···

কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল—আমি কি ভাবছি বলব লীলা ? আমি যদি ছবি আঁকতে পারতাম, তোমাকে মডেল ক'রে ছবি আঁকতাম—

লীলা সে কথার কোন জবাব না দিয়া হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, আচ্ছা অপূর্ববাবু, একটা চাকরি কোথাও যদি পাওয়া যায়, তো করেন ?

অপু বলিল—কেন করব না ; কিসের চাকরি ?

লীলা বিবরণটা বলিয়া গেল। তাহার দাদামশায় একটা বড় স্টেটের এটর্নি, তাঁদের অফিসে একজন সেক্রেটারী দরকার—মাইনে দেড়শো টাকা, চাকরিটা দাদামশায়ের হাতে, লীলা বলিলে এখনই হইয়া যায়, সেই জন্যই আজ তাহাকে এখানে ডাকিয়া আনা !

অপুর মনে পড়িল, সেদিনকথায় কথায় সে লীলার কাছে নিজের বর্তমান চাকুরির দুরবস্থা ও খবরের কাগজখানা উঠিয়া যাওয়ার কথাটা অন্য কি সম্পর্কে একবারটি তুলিয়াছিল।

লীলা বলিল—সেদিন রাত্রে আমি তাঁর মুখে কথাটা শুনলাম, আজ সকালেই আপনাকে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনি রাজী আছেন তো ? আসুন,

দাদামশায়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যাই, ও'র একখানা চিঠিতে হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতায় অপুর মন ভরিয়া গেল। এত কথার মধ্যে লীলা চাকুরি যাওয়ার কথাটাই কি ভাবে মনে ধরিয়া বসিয়াছিল।

লীলা বলিল—আপনি আজ দুপুরে এখানে না খেয়ে যাবেন না! আসুন,—পাখাটা দয়া ক'রে টিপে দিন না।

কিন্তু চাকুরি হইল না। এসব ব্যাপারের অভিজ্ঞতা না থাকায় লীলা একটু ভুল করিয়াছিল, দাদামশায়কে বলিয়া রাখে নাই অপুর কথা। দিন দুই আগে লোক লওয়া হইয়া গিয়াছে। সে খুব দুঃখিত হইল, একটু অপ্রতিভও হইল। অপু দুঃখিত হইল লীলার জন্য। বেচারী লীলা! সংসারের কোন অভিজ্ঞতা তাহার কি আছে? একটা চাকুরি খালি থাকিলে যে কতখানা উমেদারীর দরখাস্ত পড়ে, বড়লোকের মেয়ে, তাহার খবর কি করিয়া জানিবে?

লীলা বলিল—আপনি এক কাজ করুন না, আমার কথা রাখতে হবে কিন্তু, ছেলেবেলার মত একগুঁয়ে হলে কিন্তু চলবে না—প্রাইভেটে বি. এ-টা দিয়ে দিন। আপনার পক্ষে সেটা কঠিন না কিছু।

অপু বলিল—বেশ দেব।

লীলা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—ঠিক? অনার ব্রাইট?

—অনার ব্রাইট।

শীতের অনেক দেরী, কিন্তু এরই মধ্যে লীলাদের গাড়িবারান্দার পাশে জাফরিতে ওঠানো মার্শালনীলের লতায় ফুল দেখা দিয়াছে, বারান্দার সিঁড়ির দু'পাশের টবে বড় বড় পল নিরোন ও ব্ল্যাক প্রিন্স ফুটিয়াছে। বর্ষাশেষে চাইনিজ ফ্যান্ পামের পাতাগুলো ঘন সবুজ।

পদ্মপুকুর রোডে পা দিয়া অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। লীলা, ছেলেমানুষ লীলা—সে কি জানে সংসারের রূঢ়তা ও নিষ্ঠুর সংঘর্ষের কাহিনী? আজ তাহার মনে হইল, লীলার পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে সেটা তুলিয়া দিবার জন্য সে নিজের সুখ শান্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিতে পারে।

বিবাহের পর লীলার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, কিন্তু দু-একবার বলি বলি করিয়াও অপু বিবাহের কথা বলিতে পারিল না, অথচ সে নিজে ভালই বোঝে যে, না বলিতে পারিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পুনরায় পূজার বিলম্ব অতি সামান্যই।

শনিবার। অনেক আফিস আজ বন্ধ হইবে, অনেকগুলি সম্মুখের মঙ্গলবারে বন্ধ। দোকানে দোকানে খুব ভিড়—ঘণ্টাখানেক পথ হাঁটিলে হ্যাণ্ডবিল হাত পাতিয়া লইতে লইতে ঝুড়িখানেক হইয়া উঠে। একটা নতুন স্বদেশী দেশলাইয়ের কারখানা পথে পথে জাঁকাল বিজ্ঞাপন মারিয়াছে।

আমড়াতলা গলির বিখ্যাত ধনী ব্যবসাদার নকুলেশ্বর শীলের প্রাসাদোপম সুবৃহৎ অট্টালিকার নিম্নতলেই ইঁহাদের আফিস। অনেকগুলি ঘর ও দুটা বড় হল কর্মচারীতে ভর্তি। দিনমানেও ঘরগুলির মধ্যে ভালো আলো যায় না বলিয়া বেলা চারটা না বাজিতেই ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে।

ছোকরা টাইপিস্ট নৃপেন সন্তর্পণে পর্দা ঠেলিয়া ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিল। ম্যানেজার নকুলেশ্বর শীলের বড় জামাই দেবেন্দ্রবাবু। ভারী কড়া মেজাজের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়াছে, দোহারা ধরণের চেহারা। বেশ ফর্সা, মাথায় টাক। এক কলমের খোঁচায় লোকের চাকরি খাইতে এমন পারদর্শী লোক খুব অল্পই দেখা যায়। দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন—কি হে নৃপেন?

নৃপেন ভূমিকাস্বরূপ দুইখানা টাইপ-ছাপা কি কাগজ মঞ্জুর করাইবার ছলে তাঁহার টেবিলের উপর রাখিল।

সহি শেষ হইলে নৃপেন একটু উশখুশ করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া আরক্ত-মুখে বলিল—আমি—এই—আজ বাড়ি যাব—একটু সকালে, চারটেতে গাড়ি কি না? সাড়ে তিনটেতে না গেলে—

—তুমি এই সেদিন তো বাড়ি গেলে মঙ্গলবারে। রোজ রোজ সকালে ছেড়ে দিতে গেলে আফিস চলবে কেমন ক'রে? এখনও তো একখানা চিঠি টাইপ কর নি দেখছি—

এ আফিসে শনিবারে সকালে ছুটির নিয়ম নাই। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার পূর্বে কোনদিন আফিসের ছুটি নাই। কি শনিবার কি অন্যদিন। কোনও পালপার্বণে ছুটি নাই, কেবল পূজার সময় এক সপ্তাহ, শ্যামাপূজায় একদিন ও সরস্বতী পূজায় একদিন। অবশ্য রবিবারগুলি বাদ। ইহাদের বন্দোবস্ত এইরূপ—চাকরি করতে হয় কর, নতুবা যাও চলিয়া। এ ভয়ানক বেকার সমস্যার দিনে কর্মচারিগণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে চাণক্য-শ্লোকের উপদেশ মত চাকুরিকে পুরো-

ভাগে বজায় ও ছুটিছাটা, অপমান অসুবিধাকে পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ করতঃ কায়-ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন।

নৃপেন কি বলিতে যাইতেছিল—দেবেনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—মল্লিক য়্যান্ড চৌধুরীদের মর্টগেজখানা টাইপ করেছিলে ?

নৃপেন কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—আজ্ঞে, কই ওদের আফিস থেকে তা পাঠিয়ে দেয় নি এখনও ?

—পাঠিয়ে দেয় নি তো ফোন কর নি কেন ? আজ সাতদিন থেকে বলছি—কচি খোকা তো নও ?···যা আমি না দেখব তাই হবে না ?

নৃপেনের ছুটির কথা চাপা পড়িয়া গেল এবং সে বেচারী পুনরায় সাহস করিয়া সে-কথা উঠাইতেও পারিল না।

সন্ধ্যার অল্প পূর্বে ক্যাশ ও ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টের কেরানীরা বাহির হইল —অন্য অন্য কেরানীগণ আরও ঘন্টাখানেক থাকিবে। অত্যন্ত কম বেতনের কেরানী বলিয়া কেহই তাহাদের মুখের দিকে চায় না, বা তাহারা নিজেরাও আপত্তি উঠাইতে ভয় পায়।

দেউড়ীতে দারোয়ানেরা বসিয়া খৈনী খাইতেছে, ম্যানেজার ও সুপারিণ্টেন্ডেণ্টের যাতায়াতের সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফৌজের কায়দায় সেলাম করে, ইহাদিগকে পোঁছেও না।

ফুটপাথে পা দিয়া নৃপেন বলিল—দেখলেন অপূর্ববাবু, ম্যানেজার বাবুর ব্যাপার ? একদিন সাড়ে তিনটের সময় ছুটি চাইলাম, তা দিলে না—অন্য সব আফিস দেখুন গিয়ে দুটোতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা সব এতক্ষণে ট্রেনে যে যার বাড়ি পোঁছে চা খাচ্ছে আর আমরা এই বেরুলাম—কি অত্যাচারটা বলুন দিকি ?

প্রবোধ মুহুরী বলিল—অত্যাচার ব'লে মনে কর ভায়া, কাল থেকে এস না, মিটে গেল। কেউ তো অত্যাচার পোয়াতে বলে নি। ওঃ, ক্ষিদে যা পেয়েছে ভায়া, একটা মানুষ পেলে ধরে খাই এমন অবস্থা। রোজ রোজ এমনি—হার্টের রোগ জন্মে গেল ভায়া, শুধু না খেয়ে খেয়ে—

অপু হাসিয়া বলিল—দেখবেন প্রবোধ-দা, আমি পাশে আছি, এ যাত্রা আমাকে না হয় রেহাই দিন। ধরে খেতে হয় রাস্তার লোকের ওপর দিয়ে আজকের ক্ষিদেটা শান্ত করুন। আমি আজ তৈরী হয়ে আসি নি। দোহাই দাদা !

তাহার দুঃখের কথা লইয়া এরূপ ঠাট্টা করাতে প্রবোধ মুহুরী খুব খুশী হইল না। বিরক্তমুখে বলিল, তোমাদের তো সব তাতেই হাসি আর ঠাট্টা, ছেলেছোকরার কাছে কি কোন কথা বলতে আছে—আমি যাই, তাই বলি! হাসি সোজা ভাই, কই দাও দিকি ম্যানেজারকে ব'লে পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে? হুঁ, তার বেলা—

অপুকে হাঁটিতে হয় রোজ অনেকটা। তার বাসা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে, গোলদীঘির কাছে। তের টাকা ভাড়াতে নীচু একতলা ঘর, ছোট রান্নাঘর। সামান্য বেতনে দু'জায়গায় সংসার চালানো অসম্ভব বলিয়া আজ বছরখানেক হইল সে অপর্ণাকে কলিকাতায় আনিয়া বাসা করিয়াছে। তবু এখানে চাকরিটি জুটিয়াছিল তাই রক্ষা!

শৈশবের স্বপ্ন এ ভাবেই প্রায় পর্যবসিত হয়। অনভিজ্ঞ তরুণ মনের উচ্ছ্বাস, উৎসাহ—মাধুর্যভরা রঙীন ভবিষ্যতের স্বপ্ন—স্বপ্ন থাকিয়া যায়। যে ভাবে বড় সওদাগর হইবে, দেশে দেশে বাণিজ্যের কুঠি খুলিবে, তাহাকে হইতে হয় পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার, যে ভাবে ওকালতি পাস করিয়া রাসবিহারী ঘোষ হইবে, তাহাকে হইতে হয় কয়লার দোকানী, যাহার আশা থাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইবে, কি দ্বিতীয় কলম্বস্ হইবে, তাহাকে হইতে হয় চল্লিশ টাকা বেতনের স্কুলমাস্টার।

শতকরা নিরানব্বই জনের বেলা যা হয়, অপুর বেলাও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যথানিয়মে সংসার-যাত্রা, গৃহস্থালী, কেরানীগিরি, ভাড়া বাড়ি, মেলিন্‌স্ ফুড ও অয়েলক্লথ। তবে তাহার শেষোক্ত দুটির এখনও আবশ্যক হয় নাই—এই যা।

অপর্ণা ঘরের দোরের কাছে বঁটি পাতিয়া কুটনা কুটিতেছে, স্বামীকে দেখিয়া বলিল—আজ এত সকাল সকাল যে! তারপর সে বঁটিখানা ও তরকারীর চুপড়ি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপু বলিল, খুব সকাল আর কৈ, সাতটা বেজেছে, তবে অন্যাদিনের তুলনায় সকাল বটে। হ্যাঁ, তেলওয়ালা আর আসে নি তো?

—এসেছিল একবার দুপুরে, ব'লে দিয়েছি বুধবারে মাইনে হ'লে আসতে, তোমার আসবার দেরি হবে ভেবে এখনও আমি চায়ের জল চড়াই নি।

কলের কাছে অন্য ভাড়াটেদের ঝি-বৌয়েরা এ সময় থাকে বলিয়া অপর্ণা স্বামীর হাত-মুখ ধুইবার জল বারান্দার কোণে তুলিয়া রাখে। অপু মুখ

ধুইতে গিয়া বলিল, রজনীগন্ধা গাছটা হেলে পড়েছে কেন বল তো? একটু বেঁধে দিও।

চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময়ে কলের কাছে কোন প্রৌঢ়া-কণ্ঠের কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল—তা হলে বাপু একশো টাকা বাড়িভাড়া দিয়ে সায়েবপাড়ায় থাকো গে। আজ আমার মাথা ধরেছে, কাল আমার ছেলের সর্দি লেগেছে—পালার দিন হলেই যত ছুতো। নাও না, সারা ওপরটাই তোমরা ভাড়া নাও না; দাও না পঁয়ষট্টী টাকা—আমরা না হয় আর কোথাও উঠে যাই, রোজ রোজ হাঙ্গামা কে সহ্যি করে বাপু!

অপু বলিল—আবার বুঝি আজ বেধেছে গাঙ্গুলী-গিন্নীর সঙ্গে?

অপর্ণা বলিল—নতুন ক'রে বাধবে কি, বেধেই তো আছে। গাঙ্গুলী-গিন্নীরও মুখ বড় খারাপ, হালদারদের বৌটা ছেলেমানুষ, কোলের মেয়ে নিয়ে পেরে ওঠে না, সংসারে তো আর মানুষ নেই, তবুও আমি এক একদিন গিয়ে বাট্‌না বেটে দিয়ে আসি।

সিঁড়ি ও রোয়াক ধুইবার পালা লইয়া উপরের ভাড়াটেদের মধ্যে এ রেষারেষি, দ্বন্দ্ব—অপু আসিয়া অবধি এই এক বৎসরের মধ্যে মিটিল না। সকলের অপেক্ষা তাহার খারাপ লাগে ইহাদের এই সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা। কট্‌ কট্‌ করিয়া শক্ত কথা শুনাইয়া দেয়—বাঁচিয়া, বাঁচাইয়া কথা বলে না, কোন্‌ কথায় লোকের মনে আঘাত লাগে, সে কথা ভাবিয়াও দেখে না।

বাড়িটাতে হাওয়া খেলে না, বারান্দাটাতে বসিলে হয়ত একটু পাওয়া যায়, কিন্তু একটু দূরেই ঝাঁঝরি-ড্রেন, সেখানে সারা বাসার তরকারীর খোসা, মাছের আঁশ, আবর্জনা, বাসি ভাত-তরকারী পচিতেছে, বর্ষার দিনে বাড়িময় ময়লা ও আধময়লা কাপড় শুকাইতেছে, এখানে তোবড়ানো টিনের বাক্স, ওখানে কয়লার ঝুড়ি। ছেলেমেয়েগুলা অপরিষ্কার, ময়লা পেনী বা ফ্রক পরা। অপুদের নিজেদের দিকটা ওরই মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে কি হয়, এই ছোট্ট বারান্দার টবে দু-চারটে রজনীগন্ধা, বিদ্যাপাতার গাছ রাখিলে কি হয়, এই এক বৎসর সেখানে আসিয়া অপু বুঝিয়াছে, জীবনের সকল সৌন্দর্য, পবিত্রতা, মাধুর্য এখানে পলে পলে নষ্ট করিয়া দেয়, এই আবহাওয়ার বিষাক্ত বাষ্পে মনের আনন্দকে গলা টিপিয়া মারে। চোখে পীড়া দেয় যে অসুন্দর, তা ইহাদের অঙ্গের আভরণ। থাকিতে জানে না, বাস করিতে জানে না, শূকরপালের মত খায় আর কাদায় গড়াগড়ি দিয়া মহা আনন্দে দিন কাটায়। এত কুশ্রী বেষ্টনীর মধ্যে দিন দিন

যেন তার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু উপায় নাই, মনসাপোতায় থাকিলেও আর কুলায় না, অথচ তের টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল ঘর শহরে কোথাও মেলে না। তবুও অপর্ণা এই আলো-হাওয়াবিহীন স্থানেও শ্রীছাঁদ আনিয়াছে, ঘরটা নিজের হাতে সাজাইয়াছে, বাক্স-পেঁটরাতে নিজের হাতে বোনা ঘেরাটোপ, জানলায় ছিটের পর্দা, বালিশ মশারি সব ধপ ধপ করিতেছে, দিনে দু-তিনবার ঘর ঝাঁট দেয়।

এই বাড়ির উপরের তলার ভাড়াটে গাঙ্গুলীদের একজন দেশস্থ আত্মীয় পীড়িত অবস্থায় এখানে আসিয়া দু-তিন মাস আছেন। আত্মীয়টি প্রৌঢ়, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয় অতি দরিদ্র, বড়লোক আত্মীয়ের আশ্রয়ে এখানে রোগ সারাইতে আসিয়াছেন ও চোরের মত একপাশে পড়িয়া আছেন। বৌটি যেমন শান্ত তেমনি নিরীহ,—ইতিপূর্বে কখনও কলিকাতায় আসে নাই—দিনরাত জুজুর মত হইয়া আছে। সারাদিন সংসারের খাটুনি খাটে, সময় পাইলেই রুগ্ণ স্বামীর মুখের দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার উপর গাঙ্গুলী-বৌয়ের ঝঙ্কার, বিরক্তি প্রদর্শন, মধুবর্ষণ তো আছেই। অত্যন্ত গরীব, অপু রোগী দেখিতে যাইবার ছলে মাঝে মাঝে বেদনা, আঙ্গুর, লেবু দিয়া আসিয়াছে। সেদিনও বড় ছেলেটিকে জামা কিনিয়া দিয়াছে।

এদিকে তাহারও চলে না। এ সামান্য আয়ে সংসার চালানো একরূপ অসম্ভব। অপর্ণা অন্যদিকে ভাল গৃহিণী হইলেও পয়সা-কড়ির ব্যাপারটা ভাল বোঝে না—দুজনে মিলিয়া মহা আমোদে মাসের প্রথম দিকটা খুব খরচ করিয়া ফেলে—শেষের দিকে কষ্ট পায়।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা কষ্টকর হইয়াছে আফিসের এই ভূতগত খাটুনি। ছুটি বলিয়া কোনও জিনিস নাই এখানে। ছোট ঘরটিতে টেবিলের সামনে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকা সকাল এগারোটা হইতে বৈকাল সাতটা পর্যন্ত। আজ দেড় বৎসর ধরিয়া এই চলিতেছে। এই দেড় বৎসরের মধ্যে সে শহরের বাহিরে কোথাও যায় নাই। আফিস আর বাসা, বাসা আর আফিস। শীলবাবুদের দমদমার বাগান-বাড়িতে সে একবার গিয়াছিল, সেই হইতে তাহার মনের সাধ নিজের মনের মত গাছ-পালায় সাজানো বাগান-বাড়িতে বাস করা। আফিসে যখন কাজ থাকে না, তখন একখানা কাগজে কাল্পনিক বাগান-বাড়ির নক্সা আঁকে। বাড়িটা যেমন তেমন হউক, গাছপালার বৈচিত্র্যই থাকিবে বেশী। গেটের দু'ধারে দুটো চীনা বাঁশের ঝাড় থাকুক। রাঙা সুরকীর পথের ধারে ধারে রজনীগন্ধা ল্যাভেণ্ডার

ঘাসের পাড় বসানো বকুল ও কৃষ্ণচূড়ার ছায়া।

বাড়িতে ফিরিয়া চা ও খাবার খাইয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে—হ্যাঁ, তারপর কাঁটালি চাঁপার পারগোলাটা কোন্ দিকে হবে বলো তো?

অপর্ণা স্বামীকে এই দেড় বছরে খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। স্বামীর এই-সব ছেলেমানুষিতে সেও সোৎসাহে যোগ দেয়। বলে,—শুধু কাঁটালি চাঁপা? আর কি কি থাকবে, জানলার জাফরিতে কি উঠিয়ে দেব বল তো?

যে আমড়াতলার গলির ভিতর দিয়া সে আফিস যায় তাহার মত নোংরা স্থান আর আছে কি-না সন্দেহ। ঢুকিতেই শুঁটকী চিংড়ি মাছের আড়ত সারি সারি দশ-পনেরোটা। চড়া রৌদ্রের দিনে যেমন তেমন, বৃষ্টির দিনে কার সাধ্য সেখান দিয়ে যায়? স্থানে স্থানে মাড়োয়ারীদের গরু ও ষাঁড় পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া—পিচ-পিচে কাদা, গোবর, পচা আপেলের খোলা।

নিত্য দু'বেলা আজ দেড় বৎসর এই পথে যাতায়াত।

তা ছাড়া রোজ বেলা এগারটা হইতে সাতটা পর্যন্ত এই দারুণ বদ্ধতা! আফিসে অন্য যাহারা আছে, তাহাদের ইহাতে তত কষ্ট হয় না। তাহারা প্রবীণ, বহুকাল ধরিয়া তাহাদের খাকের কলম শীলবাবুদের সেরেস্তায় অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাদের গর্বও এইখানে। রোকড়-নবীশ রামধনবাবু বলেন—হেঁ হেঁ, কেউ পারবে না মশাই, আজ এক কলমে বাইশ বছর হ'ল বাবুদের এখানে—কোন ব্যাটার ফুঁ খাটবে না বলে দিও—চার সালের ভূমিকম্প মনে আছে? তখন কর্তা বেঁচে, গদী থেকে বেরুচ্ছি, ওপর থেকে কর্তা হেঁকে বললেন, ওহে রামধন, পোস্তা থেকে ল্যাংড়া আমের দরটা জেনে এসো দিকি চট ক'রে। বেরুতে যাবো মশাই—আর যেন মা বাসুকি একেবারে চৌদ্দ হাজার ফণা নাড়া দিয়ে উঠলেন—সে কি কাণ্ড মশাই? হেঁ হেঁ আজকের লোক নই—

কষ্ট হয় অপুর ও ছোকরা টাইপিস্ট নৃপেনের। সে বেচারী উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসে ম্যানেজার ঘরে বসিয়া আছে কিনা। অপুর কাছে টুলের উপর বসিয়া বলে, এখনও ম্যানেজার হাইকোর্ট থেকে ফেরেন নি বুঝি, অপূর্ববাবু—ছটা বাজে, ছুটি সেই সাতটায়—

অপু বলে, ও-কথা আর মনে করিয়ে দেবেন না, নৃপেনবাবু। বিকেল এত ভালবাসি, সেই বিকেল দেখি নি যে আজ কত দিন। দেখুন তো বাইরে চেয়ে, এমন চমৎকার বিকেলটি, আর এই অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক আলো জেলে ঠায় বসে আছি সেই সকাল দশটা থেকে।

মাটির সঙ্গে যোগ অনেকদিনই তো হারাইয়াছে, সে সব বৈকাল তো এখন দূরের স্মৃতি মাত্র। কিন্তু কলিকাতা শহরের যে সাধারণ বৈকালগুলি তাও তো সে হারাইতেছে প্রতিদিন। বেলা পাঁচটা বাজিলে এক-একদিন লুকাইয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের বাড়ির উঁচু কার্নিশের উপর যে এবটুখানি বৈকালের আকাশ চোখে পড়ে তারই দিকে বুভুক্ষুর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে!

সামনেই উপরের ঘরে মেজবাবু বন্ধুবান্ধব লইয়া বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন. মার্কারটা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াইয়া সিগারেট খাইয়া পুনরায় ঘরে ঢুকিল। মেজবাবুর বন্ধু নীলরতনবাবু একবার বারান্দায় আসিয়া কাহাকে হাঁক দিলেন অপুর মনে হয় তাহার জীবনের সব বৈকালগুলি এরা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইয়াছে, সবগুলি এখন ওদের জিম্মায়, তাহার নিজের আর কোন অধিকার নাই উহাতে।

প্রথম জীবনের সে-সব মাধুরীভরা মুহূর্তগুলি যৌবনের কলকোলাহলে কোথায় মিলাইয়া গেল? কোথায় সে নীল আকাশ, মাঠ, আমের বউলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নারাত্রি? পাখি আর ডাকে না, ফুল আর ফোটে না, আকাশ আর সবুজ মাঠের সঙ্গে মেলে না—ঘেঁটুফুলের ঝোপে সদ্যফোটা ফুলের তেতো গন্ধ আর বাতাসকে তেতো করে না। জীবনে সে যে রোমান্সের স্বপ্ন দেখিয়াছিল—যে স্বপ্ন তাহাকে একদিন শত দুঃখের মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়াছে, তার সন্ধান তো কই এখনও মিলিল না? এ তো একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন, কর্মব্যস্ত, এক-ঘেয়ে জীবন সারাদিন এখানে আফিসের বদ্ধজীবন, রোকড়, খতিয়ান, মর্টগেজ, ইনকামট্যাক্সের কাগজের বোঝার মধ্যে পক্ককেশ প্রবীণ ঝুনো সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে সপিনা ধরানোর প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করা, এটর্নিদের নামে বড় বড় চিঠি মুশাবিদা করা—সন্ধ্যায় পায়রার খোপের মত অপরিষ্কার নোংরা বাসাবাড়িতে ফিরিয়াই তখনি আবার ছেলে পড়াইতে ছোটা।

কেবল এক অপর্ণাই এই বদ্ধ জীবনের মধ্যে আনন্দ আনে। আফিস হইতে ফিরিলে সে যখন হাসিমুখে চা লইয়া কাছে দাঁড়ায়, কোনদিন হালুয়া, কোনদিন দু-চারখানা পরোটা, কোনদিন বা মুড়ি নারিকেল রেকাবিতে সাজাইয়া সামনে ধরে, তখন মনে হয় এ যদি না থাকিত! ভাগ্যে অপর্ণাকে সে পাইয়াছিল! এই ছোট্ট পায়রার খোপকে যে গৃহ বলিয়া মনে হয় সে শুধু অপর্ণা এখানে আছে বলিয়া, নতুবা চৌকী, টুল, বাসন-কোসন, জানালার পর্দা, এসব সংসার নয়; অপর্ণা যখন বিশেষ ধরণের শাড়িটি পরিয়া ঘরের মধ্যে

ঘোরাফেরা করে, অপু ভাবে, এ স্নেহনীড় শুধু ওরই চারিধারে ঘিরিয়া, ওরই মুখের হাসি বুকের স্নেহ যেন পরম আশ্রয়, নীড় রচনা সে ওরই ইন্দ্রজাল।

আফিসে সে নানা স্থানের ভ্রমণকাহিনী পড়ে, ডেস্কের মধ্যে পুরিয়া রাখে। পুরানো বইয়ের দোকান হইতে নানা দেশের ছবিওয়ালা বর্ণনাপূর্ণ বই কেনে—নানা দেশের রেলওয়ে বা স্টীমার কোম্পানী যে সব দেশে যাইতে সাধারণকে প্রলুব্ধ করিতেছে—কেহ বলিতেছে, হাওয়াই দ্বীপে এস একবার—এখানকার নারিকেল কুঞ্জে, ওয়াকিকির বালুময় সমুদ্রবেলায় জ্যোৎস্নারাত্রে যদি তারাভিমুখী ঊর্মিমালার সঙ্গীত না শুনিয়া মর, তবে তোমার জীবন বৃথা।

এলো পাশো দেখ নাই। দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার চুনাপাথরের পাহাড়ের ঢালুতে, শান্ত রাত্রির তারাভরা আকাশের তলে কম্বল বিছাইয়া একবারটি ঘুমাইয়া দেখিও···শীতের শেষে নুড়িভরা উঁচুনীচু প্রান্তরে কর্কশ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে দু-এক ধরণের মাত্র বসন্তের ফুল প্রথম ফুটিতে শুরু করে, তখন সেখানকার সোডা-আল্‌কালির পলিমাটিপড়া রৌদ্রদীপ্ত মুক্ত তরুবলয়ের রহস্যময় রূপ—কিংবা ওয়ালোয়া হ্রদের তীরে উন্নত পাইন ও ডগ্‌লাস ফারের ঘন অরণ্য, হ্রদেও স্বচ্ছ বরফগলা জলের তুষারকিরীটী মাজামা আগ্নেয়গিরির প্রতিচ্ছায়ার কম্পন—উত্তর আমেরিকার ঘন, স্তব্ধ, নির্জন আরণ্যভূমির নিরত পরিবর্তনশীল দৃশ্যরাজি, কর্কশ বন্ধুর পর্বতমালা, গম্ভীরনিনাদী জলপ্রপাত ফেনিল পাহাড়ী নদীতীরে বিচরণশীল বলগা হরিণের দল, ভালুক, পাহাড়ী ছাগল, ভেড়ার দল, উষ্ণ প্রস্রবণ, তুষারপ্রবাহ, পাহাড়ের ঢালুর গায়ে সিডার ও মেপল গাছের বনের মধ্যে বুনো ভ্যালেরিয়ান ও ভায়োলেট্‌ ফুলের বিচিত্র বর্ণসমাবেশ—দেখ নাই এসব? এস এস।

টাহিটি! টাহিটি! কোথায় কত দূরে, কোন্‌ জ্যোৎস্নালোকিত রহস্যময় কূলহীন স্বপ্নসমুদ্রের পারে, শুভরাত্রে গভীর জলের তলায় যেখানে মুক্তার জন্ম হয়, সাগরগুহায় প্রবালের দল ফুটিয়া থাকে, কানে শুধু দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত তাহাদের অপূর্ব আহ্বান ভাসিয়া আসে। আফিসের ডেস্কে বসিয়া এক একদিন সে স্বপ্নে ভোর হইয়া থাকে—এই সবের স্বপ্নে। ঐ রকম নির্জন স্থানে, যেখানে লোকালয় নাই, ঘন নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে ছোট কুটিরে, খোলা জানালা দিয়া দূরের নীল সমুদ্র চোখে পড়িবে—তার ওপারে মরকতশ্যাম ছোট ছোট দ্বীপ, বিচিত্র পক্ষীরাজ অজানা দেশের অজানা আকাশের তলে তারার আলোয় উজ্জ্বল মাঠটা একটা রহস্যের বার্তা বহিয়া আনিবে—কুটিরের ধারে ফুটিয়া থাকিবে ছোট

ছোট বনফুল—শুধু সে আর অপর্ণা।

এই সব বড়লোকের টাকা আছে, কিন্তু জগৎকে দেখিবার, জীবনকে বুঝিবার পিপাসা কই এদের? এ সিমেণ্ট বাঁধানো উঠান, চেয়ার, কোচ, মোটর—এ ভোগ নয়, এই শৌখীন বিলাসিতার মধ্যে জীবনের সবদিকে আলো-বাতাসের বাতায়ন আটকাইয়া এ মরিয়া থাকা—কে বলে ইহাকে জীবন? তাহার যদি টাকা থাকিত? কিছুও যদি থাকিত, সামান্যও কিছু! অথচ ইহারা তো লাভ-ক্ষতি ছাড়া আর কিছু শেখে নাই, বোঝেও না, জানে না, জীবনে আগ্রহও নাই কিছুতেই, ইহাদের সিন্দুক-ভরা নোটের তাড়া।

এই আফিস-জীবনের বদ্ধতাকে অপু শান্তভাবে, নিরুপায়ের মত দুর্বলের মত মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ইহার বিরুদ্ধে, এই মানসিক দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা যুদ্ধ চলিতেছে অনবরত, সে হঠাৎ দমিবার পাত্র নয় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে,—ফেনোচ্ছল সুরার মত জীবনের প্রাচুর্য ও মাদকতা তাহার সারা অঙ্গের শিরায় উপশিরায়—ব্যগ্র, আগ্রহভরা তরুণ জীবন বুকের রক্তে উন্মত্ততালে স্পন্দিত হইতেছে দিনরাত্রি—তাহার স্বপ্নকে আনন্দকে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা খুব সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু এক এক সময় তাহারও সন্দেহ আসে। জীবন যে এই রকম হইবে, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতি দণ্ড পল যে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বৈচিত্র্যহীন ঘটনায় ভরিয়া উঠিবে, তাহার কল্পনা তো তাহাকে এ আভাস দেয় নাই। তবে কেন এমন হয়! তাহাকে কাঁচা, অনভিজ্ঞ পাইয়া নিষ্ঠুর জীবন তাহাকে এতদিন কি প্রতারণাই করিয়া আসিয়াছে? ছেলেবেলায় মা যেমন নগ্ন দারিদ্র্যের রূপকে তাহার শৈশবচক্ষু হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিত তেমনই!···

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া গেল। আজ দু'বৎসর এখানে সে চাকরি করিতেছে, পূজার পূর্বে প্রতিবারই সে ও নৃপেন টাইপিস্ট কোথাও না কোথাও যাইবার পরামর্শ আঁটিয়াছে, নক্সা আঁকিয়াছে, ভাড়া কষিয়াছে, কখনও পুরুলিয়া, কখনও পুরী—যাওয়া অবশ্য কোথাও হয় না। তবুও যাইবার কল্পনা করিয়াও মনটা খুশী হয়। মনকে বোঝায় এবার না হয় আগামী পূজায় নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

শনিবার আফিস বন্ধ হইয়া গেল। অপুর আজকাল এমন হইয়াছে—বাড়ি ফিরিয়া অপর্ণার মুখ দেখিতে পারিলে যেন বাঁচে, কতক্ষণে সাতটা বাজিবে, ঘন

ঘন ঘড়ির দিকে সতৃষ্ণ চোখে চায়। পাঁচটা বাজিয়া গেলে অকূল সময়-সমুদ্রে যেন থৈ পাওয়া যায়—আর মোটে ঘণ্টা-দুই। ছ'টা—আর এক। হোক্ পায়রার খোপের মত বাসা, অপর্ণা যেন সব দুঃখ ভুলাইয়া দেয়। তাহার কাছে গেলে আর কিছু মনে থাকে না।

অপর্ণা চা খাবার আনিল। এ সময়টা আধঘণ্টা সে স্বামীর কাছে থাকিতে পায়, গল্প করিতে পায়, আর সময় হয় না, এখনি আবার অপুকে ছেলে পড়াইতে বাহির হইতে হইবে। অপু এ-সময় তাহাকে সব দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখিয়াছে, ফরসা লাল পাড় শাড়িটি পরা, চুলটি বাঁধা, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ—মূর্তিমতী গৃহলক্ষ্মীর মত হাসিমুখে তাহার জন্য চা আনে, গল্প করে, রাত্রে কি রান্না হইবে রোজ জিজ্ঞাসা করে, সারাদিনের বাসার ঘটনা বলে। বলে, ফিরে এসো, দুজনে আজ মহারানী ঝিন্দন আর দিলীপ সিংহের কথাটা প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলব।

বার-দুই অপু তাহাকে সিনেমায় লইয়া গিয়াছে, ছবি কি করিয়া নড়ে অপর্ণা বুঝিতে পারে না, অবাক হইয়া দেখে, গল্পটাও ভাল বুঝিতে পারে না। বাড়ি আসিয়া অপু বুঝাইয়া বলে।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া অপু বলিল—এবার তো তোমায় নিয়ে যেতে লিখেছেন শ্বশুরমশায়, কিন্তু আফিসের ছুটির যা গতিক—রাম এসে কেন নিয়ে যাক্ না? তারপর আমি কার্তিক মাসের দিকে না হয় দু-চারদিনের জন্য যাব? তাছাড়া যদি যেতেই হয় তবে এ সময় যত সকালে যেতে পারা যায়—এ সময়টা বাপ-মায়ের কাছে থাকা ভাল, ভেবে দেখলাম।

অপর্ণা লজ্জারক্তমুখে বলিল—রাম ছেলেমানুষ, ও কি নিয়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া মা তোমায় কতদিন দেখেন নি, দেখতে চেয়েছেন।

—তা বেশ চলো আমিই যাই। রামের হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না, এ অবস্থায় একটু সাবধানে ওঠা-নামা করতে হবে কি না। দাও তো ছাতাটা, ছেলে পড়িয়ে আসি। যাওয়া হয় তো চলো কালই যাই।—হ্যাঁ একটা সিগারেট দাও না?

—আবার সিগারেট! আটটা সিগারেট সকাল থেকে খেয়েছো—আর পাবে না—আবার পড়িয়ে এলে একটা পাবে।

—দাও দাও লক্ষ্মীটি—রাতে আর চাইব না—দাও একটি।

অপর্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হাসিমুখে বলিল—আবার রাত্রে তুমি কি ছাড়বে আর একটা না নিয়ে? তেমন ছেলে তুমি কি না!...

বেশী সিগারেট খায় বলিয়া অপুই সিগারেটের টিন অপর্ণার জিম্মায় রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। অপর্ণার কড়াকড়ি বন্দোবস্ত সব সময় খাটে না, অপু বরাদ্দ অনুযায়ী সিগারেট নিঃশেষ করিবার পর আরও চায়, পীড়াপীড়ি করে, অপর্ণাকে শেষকালে দিতেই হয়। তবে ঘরে সিগারেট না মিলিলে বাহিরে গিয়া সে পারতপক্ষে কেনে না—অপর্ণাকে প্রবঞ্চনা করিতে মনে বড় বাধে—কিন্তু সর্বদিন নয়, ছুটি-ছাটার দিন বাড়িতে প্রাপ্য আদায় করিয়াও আরও দু-এক বাক্স কেনে, যদিও সে অপর্ণাকে জানায় না।

ছেলে পড়াইয়া আসিয়া অপু দেখিল উপরের রুগ্ন ভদ্রলোকটির ছোট মেয়ে পিণ্টু তাহাদের ঘরের এককোণে ভীত, পাংশু মুখে বসিয়া আছে। বাড়িসুদ্ধ হৈ-চৈ! অপর্ণা বলিল, ওগো এই পিণ্টু গাঙ্গুলীদের ছোট খুকীকে নিয়ে গোলদীঘিতে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ও-বুঝি চিনেবাদাম খেয়ে কলে জল খেতে গিয়েছে, আর ফিরে এসে দ্যাখে খুকী নেই, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর মা তো একেই জুজু হয়ে থাকে, আহা সে বেচারী তো নবমীর পাঁঠার মত কাঁপছে আর মাথা কুটছে। আমি পিণ্টুকে এখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, নইলে ওর মা ওকে আজ গুঁড়ো ক'রে দেবে। আর গাঙ্গুলী গিন্নী যে কি কাণ্ড করছে, জানোই তো তাকে, তুমিও একটু দেখো না গো!

গাঙ্গুলী-গিন্নী মরাকান্নার আওয়াজ করিতেছেন, কানে গেল।—ওগো আমি দুধ দিয়ে কি কালসাপ পুষেছিলাম গো! আমার এ কি সর্বনাশ হ'ল গো মা; ওগো তাই আপদেরা বিদেয় হয় না আমার ঘাড় থেকে—এতদিনে মনোবাঞ্ছা—ইত্যাদি।

অপু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, বলিল—পিন্টু খেয়েছে কিছু?

—খাবে কি? ও-কি ওতে আছে? গাঙ্গুলী-গিন্নী দাঁত পিষছে, আহা, ওর কোন দোষ নেই, ও কিছুতেই নিয়ে যাবে না, সেও ছাড়বে না, তাকে আগলে রাখা কি ওর কাজ!

সকলে মিলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে খুকীকে কলুটোলা থানায় পাওয়া গেল। সে পথ হারাইয়া ঘুরিতেছিল, বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম বলিতে পারে না, একজন কনস্টেবল এ অবস্থায় তাহাকে পাইয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল।

বাড়ি আসিলে অপর্ণা বলিল—পাওয়া গিয়েছে ভালই হ'ল, আহা বৌটাকে আর মেয়েটাকে কি ক'রেই গাঙ্গুলী-গিন্নী দাঁতে পিষছে গো! মানুষ মানুষকে

এমনও বলতে পারে! কাল নাকি এখান থেকে বিদেয় হতে হবে—হুকুম হয়ে গিয়েছে।

অপু বলিল—কিছু দরকার নেই। কাল আমরা তো চলে যাচ্ছি, আমার তো আসতে এখনও চার-পাঁচ দিন দেরি। ততদিন ওঁরা রুগী নিয়ে আমাদের ঘরে এসে থাকুন, আমি এলেও অসুবিধে হবে না. আমি না হয় এই পাশেই বরদাবাবুদের মেসে গিয়ে রাত্রে শোব। তুমি গিয়ে বলো বৌ-ঠাকরুনকে। আমি বুঝি, অপর্ণা! আমার মা আমার বাবাকে নিয়ে কাশীতে আমার ছেলেবেলায় ওই রকম বিপদে পড়েছিলেন—তোমাকে সে সব কথা কখনও বলি নি, অপর্ণা। বাবা মারা গেলেন, হাতে একটা সিকি-পয়সা নেই আমাদের, সেখানে দু-একজন লোক কিছু কিছু সাহায্য করলে, হবিষ্যির খরচ জোটে না—মা-তে আমাতে রাত্রে শুধু অড়রের ডাল-ভিজে খেয়ে কাটিয়েছি। আমি তখন ছেলেমানুষ, বছর দশেক মোটে বয়েস—গরীব হওয়ার কষ্ট যে কি, তা আমার বুঝতে বাকী নেই—কাল সকালেই ওঁরা এখানে আসুন।

অপর্ণা যাইবার সময় পিণ্টুর-মা খুব কাঁদিল। এ বাড়িতে বিপদে-আপদে অপর্ণা যথেষ্ট করিয়াছে। রোগীর সেবা করিয়া ছেলেমেয়েকে দেখিতে সময় পাইত না, তাহাদের চুল বাঁধা. টিপ পরানো, খাবার খাওয়ানো. সব নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া অপর্ণা করিত। পিণ্টু তো মাসীমা বলিতে অজ্ঞান, সকলের কান্না থামে তো পিণ্টুকে আর থামানো যায় না। বউয়ের বয়স অপর্ণার চেয়ে অনেক বেশী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল. চিঠি দিও ভাই, দুটো দু-ঠাঁই ভালয় ভালয় হয়ে গেলে আমি মায়ের পুজো দেবো।

ঘরের চাবি পিণ্টুর মায়ের কাছে রহিল।

রেলে ও স্টীমারে অনেক দিন পর চড়া। দুজনেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুজনেই খুব খুশী। অপর্ণাও পল্লীগ্রামের মেয়ে, শহর তাহার ভাল লাগে না। অতটুকু ঘরে কোনদিন থাকে নাই. সকাল ও সন্ধ্যাবেলা যখন সব বাসাড়ে মিলিয়া একসঙ্গে কয়লার উনুনে আগুন দিত, ধোঁয়ায় অপর্ণার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত, চোখ জ্বালা করিত, সে কি ভীষণ যন্ত্রণা। সে নদীর ধারের মুক্ত আলো বাতাসে প্রকাণ্ড বাড়িতে মানুষ হইয়াছে। এসব কষ্ট জীবনে এই প্রথম—এক একদিন তাহার তো কান্না পাইত। কিন্তু এই দুই বৎসরে সে নিজের সুখ-সুবিধার কথা বড় একটা ভাবে নাই। অপুর

উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মত। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষি, খেয়াল, সংসারানভিজ্ঞতা, হাসি-খুশি, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর স্বামীর দুঃখময় জীবনের কথা, ছাত্রাবস্থায় দারিদ্র্য, অনাহারের সঙ্গে সংগ্রাম—সে সব শুনিয়াছে। সে-সব অপু বলে নাই, সে-সব বলিয়াছে প্রণব বরং অপু নিজের অবস্থা অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছিল—নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারের পৈতৃক বৃহৎ দোতলা বাড়িটার কথাটা আরও দু-একবার না তুলিয়াছিল এমন নহে—নিজে কলেজ হোস্টেলে ছিল এ কথাও বলিয়াছে। বুদ্ধিমতী অপর্ণার স্বামীকে চিনিতে বাকী নাই। কিন্তু স্বামীর কথা সে যে সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়াছে এ ভাব একদিনও দেখায় নাই। বরং সস্নেহে বলে—দ্যাখো, তোমাদের দেশের বাড়িটাতে যাবে যাবে বললে, একদিনও তো গেলে না—ভাল বাড়িখানা,—পুলুদার মুখে শুনেছি জমিজমাও বেশ আছে—একদিন গিয়ে বরং সব দেখে-শুনে এসো। না দেখলে কি ও-সব থাকে?···

অপু আমতা আমতা করিয়া বলে—তা যেতামই তো কিন্তু বড় ম্যালেরিয়া; তাতেই তো সব ছাড়লাম কিনা? নৈলে আজ অভাব কি?···

কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে দু-একটা বেফাঁস কথা মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলে, ভুলিয়া যায় আগে কি বলিয়াছিল কোন্ সময়। অপর্ণা কখনও দেখায় নাই যে, এ সব কথার অসামঞ্জস্য সে বুঝিতে পারিয়াছে। না খাইয়া যে কষ্ট পায় অপর্ণার এ কথা জানা ছিল না। সচ্ছল ঘরের আদরে লালিতা মেয়ে, দুঃখ-কষ্টের সন্ধান সে জানে না। মনে মনে ভাবে, এখন হইতে স্বামীকে সে সুখে রাখিবে।

এটা একটা নেশার মত তাহাকে পাইয়াছে। অল্পদিনেই সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, অপু কি কি খাইতে ভালবাসে। তালের ফুলুরি সে করিতে জানিত না, কিন্তু অপু খাইতে ভালবাসে বলিয়া মনসাপোতায় নিরুপমার কাছে শিখিয়া লইয়াছিল।

এখানে সে কতদিন অপুকে কিছু না জানাইয়া বাজার হইতে তাল আনাইয়াছে, সব উপকরণ আনাইয়াছে। অপু হয়তো বর্ষার জলে ভিজিয়া আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া হাসিমুখে বলিত—কোথায় গেলে অপর্ণা? এত সকালে রান্নাঘরে কি, দেখি? পরে উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিত, তালের বড়া ভাজা হচ্ছে বুঝি! তুমি জানলে কি ক'রে—বা রে!···

অপর্ণা উঠিয়া স্বামীর শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিত, বলিত, এসো না, ওখানেই ব'সে খাবে, গরম গরম ভেজে দি—। অপুর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিত। ঠিক এইভাবেই কথা বলিত মা। অপুর অদ্ভুত মনে হয়, মায়ের মত স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, সেইরকমই অন্তর্যামিনী। বার্ধক্যের কর্মক্লান্ত মা যেন ইহারই নবীন হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন! মেয়েদের দেখিবার চোখ তাহার নতুন করিয়া ফোটে, প্রত্যেককে দেখিয়া মনে হয়, এ কাহারও মা, কাহারও স্ত্রী, কাহারও বোন। জীবনে এই তিনরূপেই নারীকে পাইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল হস্তের পরিবেষণে এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবন পুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কি চিনিতে বাকী আছে তাহার?

স্টীমার ছাড়িয়া দুজনে নৌকায় চড়িল। অপর্ণার খুড়তুতো ভাই মুরারি উহাদের নামাইয়া লইতে আসিয়াছিল, সে-ও গল্প করিতে করিতে চলিল। অপর্ণা ঘোমটা দিয়া একপাশে সরিয়া বসিয়াছিল। হেমন্ত-অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ছায়া নদীর বুকে নামিয়াছে, বাঁ দিকের তীরে সারি সারি গ্রাম, একখানা বড় হাঁড়ি-কলসী বোঝাই ভড় যশাইকাটির ঘাটে বাঁধা।

অপুর মনে একটা মুক্তির আনন্দ - আর মনেও হয় না যে জগতে শীলেদের আফিসের মত ভয়ানক স্থান আছে। তাহার সহজ আনন্দ-প্রবণ মন আবার নাচিয়া উঠিল, চারিধারের এই শ্যামলতা, প্রসার, নদীজলের গন্ধের সঙ্গে তাহার যে নাড়ীর যোগ আছে।

কৌতুক দেখিবার জন্য অপর্ণাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল—ওগো কলাবৌ, ঘোমটা খোলো, চেয়ে দ্যাখো, বাপের বাড়ির দ্যাশটা চেয়ে দ্যাখো গো—

মুরারি হাসিমুখে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অপর্ণা লজ্জায় আরও জড়সড় হইয়া বসিল। আরও খানিকটা আসিয়া মুরারি বলিল—তোমরা যাও, এইখানের হাটে যদি বড় মাছ পাওয়া যায়, জ্যাঠাইমা কিনতে বলে দিয়েছেন! এইটুকু হেঁটে যাব এখন!

মুরারি নামিয়া গেলে অপর্ণা বলিল—আচ্ছা তুমি কি? দাদার সামনে ওইরকম ক'রে আমায়—তোমার সেই দুষ্টুমি এখনও গেল না? কি ভাবলে বল তো দাদা - ছিঃ। পরে রাগের সুরে বলিল—দুষ্টু কোথাকার, তোমার সঙ্গে আমি আর কোথাও কখ্‌খনো যাবো না—কখ্‌খনো না, থেকো একলা বাসায়!

—বয়েই গেল! আমি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে সেধেছিলুম কিনা! আমি নিজে মজা ক'রে রেঁধে খাব!

—তাই খেও। আহা-হা, কি রান্নার ছাঁদ, তবু যদি আমি না জানতাম! আলু ভাতে, বেগুন ভাতে, সাত রকম তরকারী সব ভাতে—কি রাঁধুনী!

—নিজের দিকে চেয়ে কথা বলো। প্রথম যেদিন খুলনার ঘাটে রেঁধেছিলে, মনে আছে সব আলুনি?

—ওমা আমার কি হবে! এত বড় মিথ্যেবাদী তুমি, সব আলুনী! ওমা আমি কোথায়—

—সব। বিলকুল। মায় পটলভাজা পর্যন্ত।

অপর্ণা রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল,—বলিল—তুমি ভাঙন মাছ খাও নি? আমাদের এ নোনা গাঙের ভাঙন মাছ ভারী মিষ্টি। কাল মাকে বলে তোমায় খাওয়াব।

—লজ্জা করবে না তার বেলায়? কি বলবে মাকে - ও মা, এই আমার—

অপর্ণা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—চুপ।

ঠিক সন্ধ্যার সময় অপর্ণাদের ঘাটে নৌকা লাগিল। দুজনেরই মনে এক অপূর্ব ভাব। শটিবনের সুগন্ধভরা স্নিগ্ধ হেমন্ত-অপরাহ্ণ তার সবটা কারণ নয়, নদীতীরে ঝুপ্সি হইয়া থাকা গোলগাছের সবুজ সারিও নয়, কারণ—তাহাদের আনন্দ-প্রবণ অনাবিল যৌবন—ব্যগ্র, নবীন, আগ্রহভরা যৌবন।

জ্যোৎস্নারাত্রে উপরের ঘরে ফুলশয্যার সেই পালঙ্কে বাতি জ্বালিয়া বসিয়া পড়িতে পড়িতে সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় থাকে। নারিকেলশাখায় দেবীপক্ষের বকের পালকের মত শুভ্র চাঁদের আলো পড়ে, বাহিরের রাত্রির দিকে চাহিয়া কত কথা মনে আসে, কত সব পুরাতন স্মৃতি—কোথায় যেন এই ধরণের সব পুরানো দিনের কত জোৎস্না-ঝরা রাত। এ যেন সব আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী, সে ছিল কোন্ কুঁড়ে ঘরে, পেট পুরিয়া সব দিন খাইতেও পাইত না—সে আজ এত বড় প্রাচীন জমিদার ঘরের জামাই, অথচ আশ্চর্য এই যে, এইটাই মনে হইতেছে সত্য। পুরানো দিনের জীবনটা অবাস্তব, অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়।

হেমন্তের রাত্রি। ঠাণ্ডা বেশ। কেমন একটা গন্ধ বাতাসে, অপুর মনে হয় কুয়াসার গন্ধ। অনেক রাত্রে অপর্ণা আসে। অপু বলে—এত রাত যে!—

আমি কতক্ষণ জেগে বসে থাকি !

অপর্ণা হাসে। বলে—নিচে কাকাবাবুর শোবার ঘর। আমি সিঁড়ি দিয়ে এলে পায়ের শব্দ ওঁর কানে যায়—এই জন্য উনি ঘরে খিল না দিলে আসতে পারি নে। ভারী লজ্জা করে।

অপু জানালার খড়খড়িটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। অপর্ণা লাজুক মুখে বলিল—এই শুরু হল বুঝি দুষ্টুমি? তুমি কী!—কাকাবাবু এখনও ঘুমোন নি যে!···

অপু আবার খটাস্ করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল—অপর্ণা, এক গ্লাস জল আনতে ভুলে গেলে যে!···ও অপর্ণা—অপর্ণা?···

অপর্ণা লজ্জায় বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

ভোর রাত্রেও দুজনে গল্প করিতেছিল।

সকালের আলো ফুটিল। অপর্ণা বলিল—তোমার ক'টায় স্টীমার?··· সারারাত তো নিজেও ঘুমুলে না, আমাকেও ঘুমুতে দিলে না—এখন খানিকটা ঘুমিয়ে থাকো—আমি অনাদিকে পাঠিয়ে তুলে দেব'খন বেলা হলে। গিয়েই চিঠি দিও কিন্তু। জানালার পর্দাগুলো ধোপার বাড়ি দিও—আমি না গেলে আর সাবান কে দেবে? সস্নেহে স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছ—এখন তোমাকে কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করে না—কলকাতায় না মেলে দুধ, না মেলে কিছু। এখানে এসময় কিছুদিন থাকলে শরীরটা সারত। রোজ আফিস থেকে এসে মোহনভোগ খেও—পিন্টুর মাকে বলে এসেছি—সে-ই ক'রে দেবে। এখন তো খরচ কমল? বেশী ছেলে পড়ানোতে কাজ নেই। যাই তাহলে?

অপু বলিল—ব'স ব'স—এখনও কোথায় তেমন ফর্সা হয়েছে?—কাকার উঠতে এখন দেরি!

অপর্ণা বলিল—হ্যাঁ আর একটা কথা—দ্যাখো, মনসাপোতার ঘরটা এবার খুঁটি দিয়ে রেখো। নইলে বর্ষার দিকে বড্ড খরচ পড়ে যাবে, কলকাতার বাসায় তো চিরদিন চলবে না—ওই হ'ল আপন ঘরদোর। এবার মনসাপোতায় ফিরব, বাস না করলে খড়ের ঘর টেঁকে না। যাই এবার, কাকা এবার উঠবেন। যাই?

অপর্ণা চলিয়া গেলে অপুর মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এখনও বাড়ির কেহই উঠে নাই—কেন সে অপর্ণাকে ছাড়িয়া দিল? কেন বলিল—যাও!

তাহার সম্মতি না পাইলে অপর্ণা কখনই যাইত না।

কিন্তু অপর্ণা আর একবার আসিয়াছিল ঘণ্টাখানেক পরে, চা দেওয়া হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে—অপু তখন ঘুমাইতেছে। খোলা জানালা দিয়া মুখে রৌদ্র লাগিতেছে। অপর্ণা সন্তর্পণে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে এমন দেখায়!—এমন একটা মায়া হয় ওর ওপরে! সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ভাবিল, মা সত্যিই বলে বটে, পটের মুখ—পটে আঁকা ঠাকুর দেবতার মত মুখ—

চলিয়া আসিবার সময়ে কিন্তু অপর্ণার সঙ্গে দেখা হইল না। অপুর আগ্রহ ছিল, কিন্তু আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনে বাড়ি সরগরম—কাহাকে যে বলে অপর্ণাকে একবার ডাকিয়া দিতে? মুখচোরা অপু ইচ্ছাটা কাহাকেও জানাইতে পারিল না। নৌকায় উঠিয়া মুরারির ছোট ভাই বিশু বলিল—আসবার সময় দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে এলেন না কেন, জামাইবাবু? দিদি সিঁড়ির ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, আপনি যখন চলে আসেন—

কিন্তু নৌকা তখন জোর ভাঁটার টানে যশাইকাটির বাঁকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এবার কলিকাতায় আসিয়া অনেকদিন পরে দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হইল। সে আমেরিকা যাইতেছে। পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ায় কেহ কাহারও ঠিকানা জানিত না। অথচ দেবব্রত এখানেই কলেজে পড়িতেছিল, এবার বি, এস্-সি পাস করিয়াছে।···অপুর কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য ঠেকিল, আনন্দ হইল, হিংসাও হইল। প্রতি শনিবারে বাড়ি না যাইয়া যে থাকিতে পারিত না, সেই ঘর-পাগল দেবব্রত আমেরিকা চলিয়া যাইতেছে!

মাস দুই-তিন বড় কষ্টে কাটিল। আজ এক বছরের অভ্যাস—আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া অপর্ণার হাসিভরা মুখ দেখিয়া কর্মক্লান্ত মন শান্ত হইত। আজকাল, এমন কষ্ট হয়! বাসায় না ফিরিয়াই সোজা ছেলে পড়াইতে যায় আজকাল, বাসায় মন লাগে না, খালি খালি ঠেকে।

লীলারা কেহ এখানে নাই। বর্ধমানের বিষয় লইয়া কি সব মামলা মকদ্দমা চলিতেছে, অনেকদিন হইতে তাহারা সেখানে।

একদিন রবিবারে সে বেলুড় মঠ বেড়াইয়া আসিয়া অপর্ণাকে এক লম্বা

চিঠি দিল, ভারী ভাল লাগিয়াছিল জায়গাটা, অপর্ণা এখানে আসিলে একদিন বেড়াইয়া আসিবে। এসব পত্রের উত্তর অপর্ণা খুব শীঘ্র দেয় কিন্তু পত্রখানার কোন জবাব আসিল না—দু'দিন, চারদিন, সাতদিন হইয়া গেল। তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল—কি ব্যাপার? অপর্ণা হয়ত নাই, সে মারা গিয়াছে—ঠিক তাই। রাত্রে নানা রকম স্বপ্ন দেখে—অপর্ণা ছলছল চোখে বলিতেছে—তোমায় তো বলেছিলাম আমি বেশীদিন বাঁচব না, মনে নেই?… সেই মনসাপোতায় একদিন রাত্রে?—আমার মনে কে বলত। যাই—আবার আর জন্মে দেখা হবে।

পরদিন পড়িবে শনিবার। সে আফিসে গেল না, চাকুরির মায়া না করিয়াই সুটকেস গুছাইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে এমন সময় শ্বশুরবাড়ির পত্র পাইল। সকলেই ভাল আছে। যাক্—বাঁচা গেল! উঃ, কি ভয়ানক দুর্ভাবনার মধ্যে ফেলিয়াছিল উহারা! অপর্ণার উপর একটু অভিমানও হইল। কি কাণ্ড, মন ভাল না থাকিলে এমন সব অদ্ভুত কথাও মনে আসে। কয়দিন সে ক্রমাগত ভাবিয়াছে, 'ওগো মাঝি তরী হেথা' গানটা কলিকাতায় আজকাল সবাই গায়। কিন্তু গানটার বর্ণনার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির এত হুবহু মিল হয় কি করিয়া? গানটা কি তাহার বেলায় খাটিয়া যাইবে?

শনিবার আফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, মুরারি তাহার বাসায় বারবারান্দায় চেয়ারখানাতে বসিয়া আছে। শ্যালককে দেখিয়া অপু খুব খুশী হইল—হাসিমুখে বলিল, এ কি, বাস্‌রে! সাক্ষাৎ বড়কুটুম যে। কার মুখ দেখে না জানি যে আজ সকালে—

মুরারি খামে-আঁটা একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল—কোন কথা বলিল না। অপু পত্রখানা হাত বাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখিল, মুরারির মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে। সে যেন চোখের জল চাপিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

অপুর বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন হিম হইয়া গেল। কেমন করিয়া আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—অপর্ণা নেই?

মুরারি নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না।

—কি হয়েছিল?

—কাল সকালে আটটার সময় প্রসব হ'ল—সাড়ে ন'টার সময়—

—জ্ঞান ছিল?

—আগাগোড়া। ছোট কাকীমার কাছে চুপি চুপি নাকি বলেছিল ছেলে হওয়ার কথা তোমাকে তার ক'রে জানাতে। তখন ভালই ছিল। হঠাৎ ন'টার পর থেকে—

ইহার পরে অপু অনেক সময় ভাবিয়া আশ্চর্য হইত—সে তখন স্বাভাবিক সুরে অতগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে করিয়াছিল কি করিয়া! মুরারি বাড়ি ফিরিয়া গল্প করিয়াছিল—অপূর্বকে কি ক'রে খবরটা শোনাব, সারা রেল আর স্টীমারে শুধু তাই ভেবেছিলাম—কিন্তু সেখানে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আমায় বলতে হ'ল না—ওই খবর টেনে বার করলে।

মুরারি চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে একবার অপুর মনে হইল, নবজাত পুত্রটি বাঁচিয়া আছে, না নাই? সে কথা তো মুরারিকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বা সে-ও কিছু বলে নাই। কে জানে, হয়ত নাই।

কথাটা ক্রমে বাসার সকলেই শুনিল। পরদিন যথারীতি আফিসে গিয়াছিল, আফিস হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতেছে, উপরের ভাড়াটে বন্ধু সেন মহাশয় অপুদের ঘরের বারান্দাতে উঠিলেন। অপু বলিল—এই যে সেন মশায়, আসুন, আসুন।

সেন মহাশয় জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা দুঃখসূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া টুলখানা টানিয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

—আহা-হা, রূপে সরস্বতী গুণে লক্ষ্মী! কলের কাছে সেদিন মা আমার সাবান নিয়ে কাপড় ধুচ্ছেন, আমি সকাল সকাল স্নান করব বলে ওপরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি। বললাম—কে বৌমা! তা মা আমার একটু হাসলেন – বলি তা থাক, মায়ের কাপড় কাচা হয়ে যাক! স্নানটা না হয় ন'টার পরেই করা যাবে এখন—একদিন ইলিশ মাছের দইমাছ রেঁধেছেন, অমনি তা বাটি ক'রে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আহা কি নরম কথা, কি লক্ষ্মীশ্রী,—সবই শ্রীহরির ইচ্ছে! সবই তাঁর—

তিনি উঠিয়া যাইবার পর আসিলেন গাঙ্গুলী-গৃহিণী। বয়সে প্রবীণা হইলেও ইনি কখনও অপুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্তা বলেন নাই। আধ-ঘোমটা দিয়া ইনি দোরের আড়াল হইতে বলিতে লাগিলেন—আহা, জলজ্যান্ত বৌটা, এমন হবে তা তো কখনও জানি নি, ভাবি নি—কাল আমায় আমার বড় ছেলে নবীন বলছে রাত্তিরে, যে, মা শুনেছ এইরকম, অপূর্ববাবুর

স্ত্রী মারা গিয়েছেন এই মাত্তর খবর এল—তা বাবা আমি বিশ্বাস করি নি। আজ সকালে আবার বাঁটুল বললে—তা বলি, যাই জেনে আসি—আসব কি বাবা, দুই ছেলের আফিসের ভাত, বাঁটুলের আজকাল আবার দমদমার গুলীর কারখানায় কাজ, দুটো নাকে-মুখে গুঁজেই দৌড়োয়, এখন আড়াই টাকা হপ্তা. সাহেব বলেছে বোশেখ মাস থেকে দেড় টাকা বাড়িয়ে দেবে। ওই এক ছেলে রেখে ওর মা মারা যায়, সেই থেকে আমারই কাছে—আহা তা ভেবো না বাবা —সবারই ও কষ্ট আছে,—তুমি পুরুষ মানুষ তোমার ভাবনা কি বাবা? বলে—

বজায় থাকুক্ চুড়ো-বাঁশী
মিলবে কত সেবাদাসী—

—একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে কর না কেন?—তোমার বয়েসটাই বা কি এমন—

অপু ভাবিল—এরা লোক ভাল তাই এসে এসে বলছে। কিন্তু আমায় কেন একটু একা থাকতে দেয় না? কেউ না আসে ঘরে সেই আমার ভাল। এরা কি বুঝবে?

সন্ধ্যা হইয়া গেল। বারান্দায় যে কোণে ফুলের টব সাজানো, দু-একটা মশা সেখানে বিন্ বিন্ করিতেছে। অন্যদিন সে সেই সময়ে আলো জ্বালে, স্টোভ জ্বালিয়া চা ও হালুয়া করে, আজ অন্ধকারের মধ্যে বারান্দার চেয়ার-খানাতে বসিয়াই রহিল, একমনে সে কি একটা ভাবিতেছিল—গভীরভাবে ভাবিতেছিল।

ঘরের মধ্যেই দেশলাই জ্বালার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—মুহূর্তের জন্য মনে হইল যেন অপর্ণা আছে! এখানে থাকিলে এই সময় সে স্টোভ ধরাইত, সন্ধ্যা দিত। ডাকিয়া বলিল—কে?

পিণ্টু আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু—মা আপনাদের কেরোসিনের তেলের বোতলটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে—

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—ঘরে কে রে, পিণ্টু? তোর মা?···ও! বৌ-ঠাকরুণ?—বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দেখিল পিণ্টুর মা ঘরের মেঝেতে স্টোভ মুছিতেছে।

—বৌ-ঠাকরুণ, তা' আপনি আবার কষ্ট ক'রে কেন মিথ্যে—আমিই বরং ওটা—

তেলের বোতলটা দিয়া সে আবার আসিয়া বারান্দাতে বসিল। পিণ্টুর মা স্টোভ জ্বালিয়া চা ও খাবার তৈরী করিয়া পিণ্টুর হাতে পাঠাইয়া দিল ও

রাত্রি নয়টার পর নিজের ঘর হইতে ভাত বাড়িয়া আনিয়া অপুদের ঘরের মেজেতে খাইবার ঠাঁই করিয়া ভাতের থালা ঢাকা দিয়া রাখিয়া গেল।

পিণ্টুর বাবা সারিয়া উঠিয়াছেন, তবে এখনও বড় দুর্বল, লাঠি ধরিয়া সকালে বিকালে একটু-আধটু গোলদীঘিতে বেড়াইতে যান, নিচের একঘর ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়াতে সেই ঘরেই আজকাল ইঁহারা থাকেন। ডাক্তার বলিয়াছে, আর মাসখানেকের মধ্যে দেশে ফেরা চলিবে। পরদিন সকালেও পিণ্টুর মা ভাত দিয়া গেল। বৈকালে আফিস হইতে আসিয়া কাপড় জামা না ছাড়িয়াই বাহিরে বারান্দাতে বসিয়াছে। বউটি স্টোভ ধরাইতে আসিল।

অপু উঠিয়া গিয়া বলিল—রোজ রোজ আপনাকে এ কষ্ট করতে হবে না, বৌদি। আমি এই গোলদীঘির ধারের দোকান থেকে খেয়ে আসব চা।

বউটি বলিল—আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ঠাকুরপো, আমার আর কি কষ্ট? টুলটা নিয়ে এসে এখানে বসুন, দেখুন চা তৈরী করি।

এই প্রথম পিণ্টুর মা তাহার সহিত কথা কহিল। পিণ্টু বলিল—কাকাবাবু, আমাকে গোলদীঘিতে বেড়াতে নিয়ে যাবে? একটা ফুলের চারা তুলে আনব, এনে পুঁতে দেব।

বউটির বয়স ত্রিশের মধ্যে, পাতলা একহারা গড়ন, শ্যামবর্ণ, মাঝামাঝি দেখিতে, খুব ভালও নয়, মন্দও নয়। অপু টুলটা দুয়ারের কাছে টানিয়া বসিল। বউটি চায়ের জল নামাইয়া বলিল—এক কাজ করি ঠাকুরপো, একেবারে চাট্টি ময়দা মেখে আপনাকে খানকতক লুচি ভেজে দি—ক'খানাই বা খান—একেবারে রাতের খাবারটা এই সঙ্গেই খাইয়ে দি—সারাদিন ক্ষিদেও তো পেয়েছে।

মেয়েটির নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে তাহার নিজের সঙ্কোচ ক্রমে চলিয়া যাইতেছিল। সে বলিল—বেশ। করুন মন্দ কি। ওরে পিণ্টু, ওই পেয়ালাটা নিয়ে আয়—

—থাক, থাক ঠাকুরপো, আমি ওকে আলাদা দিচ্ছি। কেটলিতে এখনও চা আছে—আপনি খান। আপনাদের বেলুনটা কোথায় ঠাকুরপো?

—সত্যি আপনি বড্ড কষ্ট করছেন, বৌ-ঠাকরুণ—আপনাকে এত কষ্ট দেওয়াটা—

পিণ্টুর মা বলিল—আপনি বার বার ও-রকম বলছেন কেন? আপনারা আমার যা উপকার করেছেন, তা নিজের আত্মীয়ও করে না আজকাল। কে পরকে

থাকবার জন্যে ঘর ছেড়ে দেয়? কিন্তু আমার সে বলবার মুখ তো দিলেন না ভগবান, কি করি বলুন। আমি রুগী সামলে মেয়েকে যদি খাওয়াতে না পারি, তাই সে দুবেলা আপনি খেয়ে আফিসে গেলেই পিণ্টুকে নিজে গিয়ে ডেকে এনে আপনার পাতে খাওয়াত। এক একদিন—

কথা শেষ না করিয়াই পিণ্টুর মা হঠাৎ চুপ করিল। অপুর মনে হইল ইহার সঙ্গে অপর্ণার কথা কহিয়া সুখ আছে, এ বুঝিবে, অন্য কেহ বুঝিবে না।

সারাদিন অপু কাজকর্মে ভুলিয়া থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, যখনই একটু মনে আসে অমনি একটা কিছু কাজ দিয়া সেটাকে চাপা দেয়। আগে সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া কি ভাবিত, খাতাপত্রে গল্প কবিতা লিখিত—কাজ ফাঁকি দিয়া অন্য বই পড়িত। কিন্তু অপর্ণার মৃত্যুর পর হইতে সে দশগুণ খাটিতে লাগিল, সকলের কাছে কাজের তাগাদা করিয়া বেড়ায়, সারাদিনের কাজ দু'ঘণ্টায় করিয়া ফেলে, তাহার লেখা চিঠি টাইপ করিতে করিতে নৃপেন বিরক্ত হইয়া উঠিল।

পূর্ণিমা তিথিটা···অপর্ণা ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া, এই তো গত কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষ্মীর মত মহিমময়ী, কি সুন্দর ডাগর চোখ দুটি, কি সুন্দর মুখশ্রী। অপুর মনে হইয়াছিল, ওর ঘাড় ফেরাবার ভঙ্গিটা যেন রানীর মত—এক এক সময় সম্ভ্রম আসে মনে। অপর্ণা হাসিয়া বলে—আমার যে লজ্জা করে, নইলে সকালে তোমার খাবার ক'রে দিতে ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোন লুচি ভাজতে জানে না,—সেজ খুড়ীমা ছেলে সামলে সময় পান না—মা—থাকেন ভাঁড়ারে, তোমার খাবার কষ্ট হয়—না? হঠাৎ অপুর মনে হয়—দূর ছাই—কি লিখে যাচ্ছি মিছে—কি হবে আর এসবে?

কি বিরাট শূন্যতা—কি যেন এক বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ হইবার নহে—কখনও না, কাহারও দ্বারা না—সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ফুলফল নাই—শুধু এক রুক্ষ, ধূসর বালুকাময় বহুবিস্তীর্ণ মরুভূমি!

মাসখানেক পরে পিণ্টুর মা বলিল—কখনো ভাই দেখি নি, ঠাকুরপো। আপনাকে সেই ভাইয়ের মত পেলুম, কিন্তু করতে পারলাম না কিছু—দিদি বলে যদি মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যান—তবে জানব সত্যিই আমি ভাই পেয়েছি।

অপু সংসারের বহু দ্রব্য পিণ্টুদের জিনিসপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দিল—

ডালা, কুলো, ধামা, বঁটি, চাকী, বেলুন। পিণ্টুর মা কিছুতেই সে সব লইতে রাজী নয়—অপু বলিল, কি হবে বৌদি, সংসার তো উঠে গেল, ওসব আর হবে কি, অন্য কাউকে বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে আপনারা নিয়ে যান, আমার মনে তৃপ্তি হবে তবুও।

মৃত্যুর পর কি হয় কেহই বলিতে পারে না? দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করিল—ওসব কথা ভাবিয়া তো তাহাদের ঘুম নাই। মেসে বরদাবাবুর উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার কাছেও একদিন কথাটা পাড়িল। বরদাবাবু তাহাকে মামুলী সান্ত্বনার কথা বলিয়া কর্তব্য সমাপন করিলেন। একদিন পল ও ভার্জিনিয়ার গল্প পড়িতে পড়িতে দেখিল মৃত্যুর পর ভার্জিনিয়া প্রণয়ী পলকে দেখা দিয়াছিল—হতাশ মন একটুকু সূত্রকেই ব্যগ্র আগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তবুও তো এতটুকু আলো!—সে আফিসে, মেসে, বাসায় যে সব লোকের সঙ্গে কারবার করে—তাহারা নিতান্ত মামুলী ধরণের সাংসারিক জীব—অপুর প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা আড়ালে হাসে, চোখ টেপাটেপি করে—করুণার হাসি হাসে। এইটাই অপু বরদাস্ত করিতে পারে না আদৌ। একদিন একজন সন্ন্যাসীর সন্ধান পাইয়া দরমাহাটার এক গলিতে তাঁহার কাছে সকালের দিকে গেল। লোকের খুব ভিড়, কেহ দর্শনপ্রার্থী, কেহ ঔষধ লইতে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর অপুর ডাক পড়িল। সন্ন্যাসী গেরুয়াধারী নহেন, সাদা ধুতি পরনে, গায়ে হাত-কাটা বেনিয়ান, জলচৌকির উপর আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। অপুর প্রশ্ন শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—আপনার স্ত্রী কতদিন মারা গেছেন? মাস দুই?—তাঁর পুনর্জন্ম হয়ে গিয়েছে। অপু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ক'রে আপনি —মানে—

সন্ন্যাসীজী বলিলেন—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হয়। এতদিন থাকে না—আপনাকে বলে দিচ্ছি, বিশ্বাস করতে হয় এসব কথা। ইংরিজি পড়ে আপনারা তো এ সব মানেন না! তাই হতে হবে।

অপুর একথা আদৌ বিশ্বাস হইল না। অপর্ণা তাহার অপর্ণা আর মাস আট-নয় পরে অন্য দেশে কোন গৃহস্থের ঘরে সব ভুলিয়া ছোট খুকী হইয়া জন্মিবে?...এত স্নেহ, এত প্রেম, এত মমতা—এসব ভুয়োবাজী? অসম্ভব!... সারারাত কিন্তু এই চিন্তায় সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল—একবার ভাবে, হয়ত সন্ন্যাসী ঠিকই বলিয়াছেন—কিন্তু তার মন সায় দেয় না, মন বলে, ও-কথাই

নয়—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা···স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেও সে-কথা বিশ্বাস করিবে না। দুঃখের মধ্যে হাসিও পাইল।—ভাবিল অপর্ণার পুনর্জন্ম হয়ে গেছে, ওর কাছে টেলিগ্রাম এসেছে! হাম্‌বাগ কোথাকার—দ্যাখ না কাণ্ড!

এত ভয়ানক সঙ্গীহীনতার ভাব গত দশ-এগারো মাস তাহার হয় নাই। পিণ্টুরা চলিয়া যাওয়ার পর বাসাও ভালো লাগে না. অপর্ণার সঙ্গে বাসাটা এতখানি জড়ানো যে, আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তদুপরি বিপদ, গাঙ্গুলী-গিন্নী তাঁহার কোন বোনঝির সঙ্গে তাহার বিবাহের যোগাযোগের জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহাকে একা একটু বসিতে দেখিলে সংসারের অসারত্ব, কথিত বোনঝিটির রূপগুণ, সম্মুখের মাঘ মাসে মেয়েটিকে একবার দেখিয়া আসিবার প্রস্তাব, নানা বাজে কথা।

নিজে রাঁধিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা—অবশ্য ইতিপূর্বে সে বরাবরই রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এবার যেন রাঁধিতে গিয়া কাহার উপর একটা সুতীব্র অভিমান। ঘরটাও বড় নির্জন, রাত্রিতে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। পাষাণভারের মত দারুণ নির্জনতা সব সময় বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে। এমন কি, শুধু ঘরে নয়, পথে-ঘাটে, আফিসেও তাই—মনে হয় জগতে কেহ কোথাও আপনার নাই।

তাহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে ঠিকানা নাই—প্রণবও নাই এখানে। মুখের আলাপী দু'চারজন বন্ধু আছে বটে কিন্তু ও-সব বে-দরদী লোকের সঙ্গ ভালো লাগে না। রবিবার ও ছুটির দিনগুলি তো আর কাটেই না—অপুর মনে পড়ে বৎসরখানেক পূর্বেও শনিবারের প্রত্যাশায় সে-সব আগ্রহভরা দিন গণনা—আর আজকাল? শনিবার যত নিকটে আসে তত ভয় বাড়ে।

বৌবাজারের এক গলির মধ্যে তাহার এক কলেজ বন্ধুর পেটেণ্ট ঔষধের দোকান। অপর্ণার কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া বসে। এ রবিবার দিনটাও বেড়াইতে বেড়াইতে গেল। কারবারের অবস্থা খুব ভাল নয়। বন্ধুটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—ও, তুমি?—আমার আজকাল হয়েছে ভাই—'কে আসিল বলে চমকিয়ে চাই, কাননে ডাকিলে পাখি'—সকাল থেকে হরদম পাওনাদার আসছে আর যাচ্ছে—আমি বলি বুঝি কোন পাওনাদার এল, ব'স ব'স।

অপু বসিয়া বলিল—কাবুলীর টাকাটা শোধ দিয়েছ?

—কোথা থেকে দেব দাদা? সে এলেই পালাই, নয় তো মিথ্যে কথা বলি।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের দেনার দরুন—ছোট আদালতে নালিশ করেছিল, পরশু এসে বাক্সপত্র আদালতের বেলিফ্ সীল ক'রে গিয়েছে। তোমার কাছে বলতে কি, এবেলার বাজার খরচটা পর্যন্ত নেই—তার ওপর ভাই বাড়িতে সুখ নেই। আমি চাই একটু ঝগড়াঝাঁটি হোক, মান-অভিমান হোক—তা নয়, বৌটা হয়েছে এমন ভাল মানুষ সাত চড়ে রা নেই—

অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বল কি হে, সে তোমার ভাল লাগে না বুঝি?…

—আঃ—পান্সে লাগে, ঘোর পান্সে। আমি চাই একটু দুষ্টু হবে, একগুঁয়ে হবে, স্মার্ট হবে—তা নয় এত ভাল মানুষ, যা বলছি তাই করছে সংসারের এই কষ্ট হয়তো একবেলা খাওয়াই হ'ল না—মুখে কথাটি নেই, কাপড় নেই—তাই সই, ডাইনে বললে তৎক্ষণাৎ ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে—নাঃ অসহ্য হয়ে পড়েছে। বৈচিত্র্য নেই রে ভাই। পাশের বাসার বৌটা সেদিন কেমন স্বামীর ওপর রাগ ক'রে কাচের গ্লাস, হাতবাক্স দুম্‌দাম্ ক'রে আছাড় মেরে ভাঙলে, দেখে হিংসে হ'ল, ভাবলুম হায় রে, আর আমার কি কপাল! না, হাসি না—আমি তোমাকে সত্যি সত্যি প্রাণের কথা বলছি ভাই—এরকম পান্সে ঘরকন্না আর আমার চলছে না—বিলিভ্ মি—অসম্ভব! ভালমানুষ নিয়ে ধুয়ে খাব?…একটা দুষ্টু মেয়ের সন্ধান দিতে পার?

—কেন আবার বিয়ে করবে না কি?—একটাকে পার না খেতে দিতে—তোমার দেখছি সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—

—না ভাই, এ সুখ আমার আর—জীবনটা এখন দেখছি একেবারে ব্যর্থ হ'ল, মনের কোনও সাধ মিটল না—এক এক সময় ভাবি ওর সঙ্গে আমার ঠিক মিলন হয় নি—মিলন যদি ঘটত তা হলে দ্বন্দ্বও হ'ত—বুঝলে না?…কে, টেঁপি?—এই আমার বড় মেয়ে—শোন্, তোর মা'র কাছ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে দু' পয়সার বেগুনি কিনে নিয়ে আয় তো আমাদের জন্যে, আর অমনি চায়ের কথা বলে দে—

আচ্ছা মরণের পর মানুষ কোথায় যায় জান? বলতে পার?

—ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই নি কখনও। পাওনাদার কি ক'রে তাড়ানো যায় বলতে পার? এখুনি কাবুলীওয়ালা একটা আসবে নেবুতলা থেকে। আঠার টাকা ধার নিয়েছি, চার আনা টাকা পিছু সুদ হপ্তায়—দু' হপ্তার সুদ বাকী, কি যে আজ তাকে বলি?—স্কাউণ্ড্রেলটা এল বলে—দিতে পার

দুটো টাকা ভাই ?

—এখন তো নেই কাছে, একটা আছে রেখে দাও। কাল সকালে আর একটা টাকা দিয়ে যাব এখন। এই যে টেঁপি, বেশ বেগুনি এনেছিস্—না না, আমি খাব না, তোমারা খাও, আচ্ছা এই এই একখানা তুলে নিলাম, নিয়ে যা টেঁপি।

বন্ধুর দোকান হইতে বাহির হইয়া সে খানিকটা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিল। লীলা এখানে আছে? একবার দেখিয়া আসিবে? প্রায় এক বৎসর লীলারা এখানে নাই, তাহার দাদামহাশয় মামলা করিয়া লীলার পৈতৃক-সম্পত্তি কিছু উদ্ধার করিয়াছেন. আজকাল লীলা মায়ের সঙ্গে আবার বর্ধমানের বাড়িতেই ফিরিয়া গিয়াছে। থার্ড ইয়ারে ভর্তি হইয়া এক বৎসর পড়িয়াছিল—পরীক্ষা দেয় নাই, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ভবানীপুরে লীলাদের ওখানে গেল। রামলগন বেয়ারা তাহাকে চেনে, বৈঠকখানায় বসাইল; মিঃ লাহিড়ী এখানে নাই, রাঁচি গিয়াছেন। লীলা দিদিমণি? কেন, সে-কথা কিছু বাবুর জানা নাই? দিদিমণির তো বিবাহ হইয়া গিয়াছে গত বৈশাখ মাসে। নাগপুরে জামাইবাবু বড় ইঞ্জিনিয়ার, বিলাতফেরত—একেবারে খাঁটি সাহেব, দেখিলে চিনিবার জো নাই। খুব বড় লোকের ছেলে—এদের সমান বড় লোক। কেন বাবুর কাছে নিমন্ত্রণের চিঠি যায় নাই?

অপু বিবর্ণমুখে বলিল—কই না, আমার কাছে, হ্যাঁ—না আর ব'সব না—আচ্ছা।

বাহিরে আসিয়া জগৎটা যেন অপুর কাছে একেবারে নির্জন, সঙ্গীহীন, বিস্বাদ ও বৈচিত্র্যহীন ঠেকিল। কেন এরকম মনে হইতেছে তাহার? লীলা বিবাহ করিবে ইহার মধ্যে অসম্ভব তো কিছু নাই! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে তাহাতে মন খারাপ করিবার কি আছে? ভালই তো। জামাই ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন—লীলার উপযুক্ত বর জুটিয়াছে, ভালই তো।

রাস্তা ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখের মাঠটাতে অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল।

লীলার বিবাহ হইয়াছে, খুবই আনন্দের কথা, ভাল কথা। ভালই তো।

কলিকাতা আর ভাল লাগে না, কিছুতেই না—এখানকার ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক কাজ, বদ্ধতা, একঘেয়েমি—এ যেন অপুর অসহ্য হইয়া উঠিল। তা ছাড়া একটা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনের মধ্যে ক্রমেই গড়িয়া উঠিতেছিল—কলিকাতা ছাড়িলেই যেন সব দুঃখ দূর হইবে—মনের শান্তি আবার ফিরিয়া পাওয়া যাইবে!

শীলেদের আফিসের কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে সে চাঁপদানীর কাছে একটা গ্রাম্য স্কুলের মাস্টারি লইয়া গেল। জায়গাটা না-শহর, না-পাড়াগাঁ গোছের—চারিধারে পাটের কল ও কুলিবস্তি, টিনের চালাওয়ালা দোকানঘর ও বাজার, কয়লার গুঁড়োফেলা রাস্তার কালো ধূলা ও ধোঁয়া, শহরের পারিপাট্যও নাই, পাড়াগাঁয়ের সহজ শ্রীও নাই।

বড়দিনের ছুটিতে প্রণব ঢাকা হইতে কলিকাতায় অপুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে জানিত অপু আজকাল কলিকাতায় থাকে না—সন্ধ্যার কিছু আগে সে গিয়া চাঁপদানী পৌঁছিল।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অপুর বাসাও বাহির করিল। বাজারের একপাশে একটা ছোট্ট ঘর—তার অর্ধেকটা একটা ডাক্তারখানা, স্থানীয় একজন হাতুড়ে ডাক্তার সকালে বিকালে রোগী দেখেন। বাকী অর্ধেকটাতে অপুর একখানা তক্তপোশ, একটা আধময়লা বিছানা, খানকতক বই, একটা বাঁশের আলনায় খানকতক কাপড় ঝুলানো। তক্তপোশের নীচে অপুর স্টীলের তোরঙ্গটা।

অপু বলিল—এসো এসো, এখানকার ঠিকানা কি ক'রে জানলে?

—সে কথায় দরকার নেই। তারপর কলকাতা ছেড়ে এখানে কি মনে ক'রে?—বাস! এমন জায়গায় মানুষ থাকে?

—খারাপ জায়গাটা কি দেখলি? তা ছাড়া কলকাতায় যেন আর ভাল লাগে না—দিনকতক এমন হ'ল যে, বাইরে যেখানে হয় যাব, সেই সময় এখানকার মাস্টারিটা জুটে গেল, তাই এখানে এলুম। দাঁড়া, তোর চায়ের কথা বলে আসি—।

পাশেই একটা বাঁকুড়ানিবাসী বামুনের তেলেভাজা পরোটার দোকান। রাত্রে তাহারই দোকানে অতি অপকৃষ্ট খাদ্য কলঙ্ক-ধরা পিতলের থালায় আনীত

হইতে দেখিয়া প্রণব অবাক হইয়া গেল—অপুর রুচি অন্ততঃ মার্জিত ছিল চিরদিন, হয়ত তাহা সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু অমার্জিত ছিল না। সেই অপুর এ কি অবনতি! এ-রকম একদিন নয়, রোজই রাত্রে নাকি এই তেলেভাজা পরোটাই অপুর প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। এত অপরিষ্কারও তো সে অপুকে কস্মিন্ কালে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না।

কিন্তু প্রণবের সব-চেয়ে বুকে বাজিল যখন পরদিন বৈকালে অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পাশের এক স্যাক্‌রার দোকানে নীচ-শ্রেণীর তাসের আড্ডায় অতি ইতর ও স্থূল ধরণের হাস্য-পরিহাসের মধ্যে বসিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া মহানন্দে তাস খেলিতে লাগিল।

অপুর ঘরটাতে ফিরিয়া আসিয়া প্রণব বলিল—কাল আমার সঙ্গে চল্ অপু—এখানে তোকে থাকতে হবে না—এখান থেকে চল্।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, কেন রে, কি খারাপ দেখলি এখানে? বেশ জায়গা তো, বেশ লোক সবাই। ওই যে দেখলি বিশ্বম্ভর স্বর্ণকার—উনি এদিকের একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক, ওঁর বাড়ি দেখিস নি? গোলা কত! মেয়ের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করেছিল, কি খাওয়ানোটাই খাওয়ালেন—উঃ! পরে খুশীর সহিত বলিল—এখানে ওঁরা সব বলেছেন আমায় ধানের জমি দিয়ে বাস করাবেন - নিকটেই বেগমপুরে ওঁদের—বেশ জায়গা—কাল তোকে দেখাব চল—ওঁরাই ঘরদোর বেঁধে দেবেন বলেছেন—আপাতত মাটির, মানে, বিচুলির ছাউনি, এদেশে উলুখড় হয় না কিনা!

প্রণব সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিল—অপু তর্ক করিল, নিজের অবস্থার প্রাধান্য প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে নানা যুক্তির অবতারণা করিল, শেষে রাগ করিল, বিরক্ত হইল—যাহা সে কখনও হয় না। প্রকৃতিতে তাহার রাগ বা বিরক্তি ছিল না কখনও। অবশেষে প্রণব নিরুপায় অবস্থায় পরদিন সকালের ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

যাইবার সময় তাহার মনে হইল, সে অপু যেন আর নেই—প্রাণশক্তির প্রাচুর্য একদিন যাহার মধ্যে উচ্ছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, আজ সে যেন প্রাণহীন নিষ্প্রভ। এমনতর স্থূল তৃপ্তি বা সন্তোষ-বোধ, এ ধরণের আশ্রয় আঁকড়াইয়া ধরিবার কাঙালপনা কই অপুর প্রকৃতিতে তো ছিল না কখনও?

স্কুল হইতে ফিরিয়া রোজ অপু নিজের ঘরের রোয়াকে একটা হাতলভাঙা

চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকে। এখানে সে অত্যন্ত একা ও সঙ্গীহীন মনে করে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাবেলা। সেটা এত অসহনীয় হইয়া উঠে, কোথাও একটু বসিয়া গল্প-গুজব করিতে ভাল লাগে, মানুষের সঙ্গ স্পৃহনীয় মনে হয়, কিন্তু এখানে অধিকাংশই পাটকলের সর্দার, বাবু, বাজারের দোকানদার, তাও সবাই তাহার অপরিচিত। বিশু স্যাকরার দোকানের সান্ধ্য আড্ডা সে নিজে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তবুও ন'টা-দশটা পর্যন্ত রাত একরকম কাটে ভালই।

অপুর ঘরের রোয়াকটার সামনেই মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন, সেটা পার হইয়া একটা পুকুর, জল যেমন অপরিষ্কার, তেমনি বিস্বাদ। পুকুরের ওপারে একটা কুলিবস্তি, দুবেলা যত ময়লা কাপড় সবাই এই পুকুরেই কাচিতে নামে। রোদ্র উঠিলেই কুলি লাইনের ছাপ-মারা খয়েরী-রংয়ের বারো-হাতী শাড়ি পুকুরের ও-পারের ঘাসের উপর রৌদ্রে মেলানো অপুর রোয়াক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কুলিবস্তির ও-পাশে গোটাকতক বাদাম গাছ, একটা ইটখোলা, খানিকটা ধানক্ষেত, একটা পাটের গাঁটবন্দী কল। এক একদিন রাত্রে ইটের পাঁজার ফাটলে ফাটলে রাঙা ও বেগুনী আলো জ্বলে, মাঝে মাঝে নিভিয়া যায়, আবার জ্বলে, অপু নিজের রোয়াকে বসিয়া বসিয়া মনোযোগের সঙ্গে দেখে। রাত দশটায় মার্টিন লাইনের একখানা গাড়ি হাওড়ার দিক হইতে আসে—অপুর রোয়াক ঘেঁষিয়া যায়—পোঁটলা-পুঁটুলি, লোকজন, মেয়েরা—পাশেই স্টেশনে গিয়া থামে, একটু পরেই বাঁকুড়াবাসী ব্রাহ্মণটি তেলেভাজা পরোটা ও তরকারী আনিয়া হাজির করে, খাওয়া শেষ করিয়া শুইতে অপুর প্রায় এগারোটা বাজে। দিনের পর দিন একই রুটিন। বৈচিত্র্যও নাই, বদলও নাই।

অপু কাহারও সহিত গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে চায় যে, কোন মতলব আঁটিয়া তাহা নহে, ইহা সে যখনই করে, তখনই সে করে নিজের অজ্ঞাতসারে—নিঃসঙ্গতা দূর করিবার অচেতন আগ্রহে। কিন্তু নিঃসঙ্গতা কাটিতে চেয় না সব সময়! যাইবার মত জায়গা নাই, করিবার মত কাজও নাই—চুপচাপ বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না। ছুটির দিনগুলি তো অসম্ভবরূপ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

নিকটেই ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস। অপু রোজ বৈকালে ছুটির পরে সেখানে গিয়া বসিয়া প্রতিদিনের ডাক অতি আগ্রহের সহিত দেখে। ঠিক বৈকালে পাঁচটার সময় সব্-আফিসের পিওন চিঠিপত্র-ভরা সীল-করা ডাক ব্যাগটি ঘাড়ে

করিয়া আনিয়া হাজির করে, সীল ভাঙিয়া বড় কাঁচি দিয়া সেটার মুখের বাঁধন কাটা হয়। এক একদিন অপুই বলে ব্যাগটা খুলি চরণবাবু?

চরণবাবু বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুলুন না, আমি ততক্ষণ ইস্টাম্পের হিসেবটা মিলেয়ে ফেলি—এই নিন কাঁচি!

পোস্টকার্ড, খাম, খবরের কাগজ, পুলিন্দা, মনি-অর্ডার। চরণবাবু বলেন —মনি-অর্ডার সাতখানা? দেখেছেন কান্ডটা মশাই, এদিকে টাকা নেই মোটে। টোটালটা দেখুন না একবার দয়া ক'রে—সাতান্ন টাকা ন' আনা? তবেই হয়েছে—রইল পড়ে, আমি তো আর ইস্ত্রির গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা এনে মনি অর্ডার তামিল করতে পারি না মশাই? এদিকে ক্যাশ বুঝে নেওয়া চাই বাবুদের রোজ রোজ—

প্রতিদিন বৈকালে পোস্টমাস্টারের টহলদারী করা অপুর কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক কাজ। সাগ্রহে স্কুলের ছুটির পর পোস্টাফিসে দৌড়ানো চাই-ই তাহার। তাহার সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু খামের চিঠিগুলি। প্রতিদিনের ডাকে বিস্তর খামের চিঠি আসে—নানাবরণের খাম, সাদা, গোলাপী, সবুজ। চিঠি-প্রাপ্তিটা চিরদিনই জীবনের একটি দুর্লভ ঘটনা বলিয়া চিরদিনই চিঠির, বিশেষ করিয়া খামের চিঠির প্রতি তাহার কেমন একটা বিচিত্র আকর্ষণ। মধ্যে দু' বৎসর অপর্ণা সে পিপাসা মিটাইয়াছিল—এক একখানা খাম বা তাহার উপরের লেখাটা এতটা হুবহু সে রকম, যে প্রথমটা হঠাৎ মনে হয় বুঝি বা সেই-ই চিঠি দিয়াছে। একদিন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাসায় এই রকম খামের চিঠি তাহারও কত আসিত।

তাহার নিজের চিঠি কোনদিন থাকে না, সে জানে তাহা কোথাও হইতে আসিবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু শুধু নানা ধরণের চিঠির বাহাদুরের মোহটাই তাহার কাছে অত্যন্ত প্রবল।

একদিন কাহার একখানি মালিকশূন্য সাকিমশূন্য পোস্টকার্ডের চিঠি ডেড-লেটার অফিস হইতে ঘুরিয়া সারা অঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের মত বহু ডাক মোহরের ছাপ লইয়া এখানে আসিয়া পড়িল। বহু সন্ধান করিয়াও তাহার মালিক জুটিল না। সেখানা রোজ এ-গ্রাম ও-গ্রাম হইতে ঘুরিয়া আসে—পিওন কৈফিয়ৎ দেয়, এ নামে কোন লোকই নাই এ অঞ্চলে। ক্রমে—চিঠিখানা অনাদৃত অবস্থায় এখানে-ওখানে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল—একদিন ঘরঝাঁট দিবার সময় জঞ্জালের সঙ্গে কে সামনের মাঠে ঘাসের উপর

ফেলিয়া দিয়াছিল, অপু কৌতূহলের সঙ্গে কুড়াইয়া লইয়া পড়িল—

শ্রীচরণকমলেষু,

মেজদাদা, আজ অনেকদিন যাবৎ আপনি আমাদের নিকট কোন পত্রাদি দেন না এবং আপনি কোথায় আছেন, কি ঠিকানা না জানিতে পারায় আপনাকেও আমরা পত্র লিখি নাই। আপনার আগের ঠিকানাতেই এ পত্রখানা দিলাম, আশা করি উত্তর দিতে ভুলিবেন না। আপনি কেন আমাদের নিকট পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝিতে সক্ষম হই নাই। আপনি বোধহয় আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা না হইলে আপনি আমাদের এখানে না আসিলেও একখানা পত্র দিতে পারেন। এতদিন আপনার খবর না জানিতে পারিয়া কি ভাবে দিন যাপন করিতেছি তাহা সামান্য পত্রে লিখিলে কি বিশ্বাস করিবেন মেজদাদা? আমাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে? সে যা হোক, যেরূপ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেইরূপ ফল। আপনাকে বৃথা দোষ দিব না। আশা করি আপনি অসন্তোষ হইবেন না। যদি অপরাধ হইয়া থাকে, ছোট বোন বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার শরীর কেমন আছে, আপনি আমার সভক্তি প্রণাম জানিবেন, খুব আশা করি পত্রের উত্তর পাইব। আপনার পত্রের আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি—

সেবিকা
কুসুমলতা বসু

কাঁচা মেয়েলি হাতের লেখা, লেখার অপটুত্ব ও বানান-ভুলে ভরা। সহোদর বোনের চিঠি নয়, কারণ পত্রখানা লেখা হইতেছে জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামের কোন লোককে। এত আগ্রহপূর্ণ, আবেগভরা পত্রখানার শেষকালে এই গতি ঘটিল? মেয়েটি ঠিকানা জানে না, নয় তো লিখিতে ভুলিয়াছে। অপটু লেখার ছত্রে ছত্রে যে আন্তরিকতা ফুটিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য পত্রখানা সে তুলিয়া লইয়া নিজের বাক্সে আনিয়া রাখিল। মেয়েটির ছবি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে—পনেরো-ষোল বৎসর বয়স, সুঠাম গঠন, ছিপছিপে পাতলা, একরাশ কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মাথায়। ডাগর চোখ।··· কোথায় সে তাহার মেজদার পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় বৃথাই পথ চাহিয়া আছে! মানবমনের এত প্রেম, এত আগ্রহভরা আহ্বান, পবিত্র বালিকাহৃদয়ের এ অমূল্য অর্ঘ্য কেন জগতে এভাবে ধূলায় অনাদরে গড়াগড়ি

যায়, কেহ পোঁছে না, কেহ তা লইয়া গর্ব করে না ?

বিশ্বম্ভর স্যাকরার দোকানে সেদিন রাত এগারটা পর্যন্ত জোর তাসের আড্ডা চলিল—সবাই উঠিতে চায়, সবাই বলে রাত বেশী হইয়াছে, অথচ অপু সকলকে অনুরোধ করিয়া বসায়, কিছুতেই খেলা ছাড়িতে চায় না। অবশেষে অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিতেছে, কলুদের পুকুরের কাছে স্কুলের থার্ড পণ্ডিত আশু সান্যাল লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চলিয়াছেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন, কি অপূর্ববাবু যে, এত রাত্রে কোথায় ?

—কোথাও না ; এই বিশু স্যাকরার দোকানে তাসের—

থার্ড পণ্ডিত এদিক-ওদিক চাহিয়া নিম্ন-সুরে বলিলেন—একটা কথা আপনাকে বলি, আপনি বিদেশী লোক—পূর্ণ দীঘড়ীর খপ্পরে পড়ে গেলেন কি ক'রে বলুন তো ?

অপু বুঝিতে না পারিয়া বলিল, খপ্পরে-পড়া কেমন বুঝতে পারছি নে—কি ব্যাপারটা বলুন তো ?

পণ্ডিত আরও সুর নীচু করিয়া বলিল—ওখানে অত ঘন-ঘন যাওয়া-আসা আপনার কি ভাল দেখাচ্ছে, ভাবছেন ? ওদের টাকাকড়ি দেওয়া ও-সব ? আপনি হচ্ছেন ইস্কুলের মাস্টার, আপনাকে নিয়ে অনেক কথা উঠেছে, তা বোধ করি জানেন না ?

—না ! কি কথা !

—কি কথা তা আর বুঝতে পারছেন না মশাই ? হুঃ—পরে কিছু থামিয়া বলিলেন—ওসব ছেড়ে দিন, বুঝলেন ? আরও একজন আপনার আগে ঐ রকম ওদের খপ্পরে পড়েছিল, এখানকার নন্দ গুঁইয়ের আবগারী দোকানে কাজ করত, ঠিক আপনার মত অল্প বয়স—মশাই, টাকা শুষে শুষে তাকে একেবারে—ওদের ব্যবসাই ঐ। সমাজে একঘরে করবার কথা হচ্ছে—থার্ড পণ্ডিত একটু থামিয়া একটু অর্থসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন,—আর ও-মেয়ের এমন মোহই বা কি, শহর অঞ্চলে বরং ওর চেয়ে ঢের—

অপু এতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতের কথাবার্তার গতি ও বক্তব্য-বিষয়ের উদ্দেশ্য কিছুই ধরিতে পারে নাই—কিন্তু শেষের কথাটাতে সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ মেয়ে, পটেশ্বরী ?

—হ্যা হ্যা হ্যা, থাক্ থাক্, একটু আস্তে—

—কি করেছে বল্‌ছেন—পটেশ্বরী ?

—আমি আর কি বলছি কিছু, সবাই যা বলে আমিও তাই বলছি। নতুন কথা আর কিছু বলছি কি? যাবেন না ও-সবে, তাতে বিদেশী লোক, সাবধান ক'রে দি। ভদ্রলোকের ছেলে, নিজের চরিত্রটা আগে রাখতে হবে ভাল, বিশেষ যখন ইস্কুলের শিক্ষক এখানকার।

থার্ড পণ্ডিত পাশের পথে নামিয়া পড়িলেন, অপু প্রথমটা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসায় ফিরিতে ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল।

পূর্ণ দীঘড়ীর বাড়িতে যাওয়া-আসার ইতিহাসটা এইরূপ—

প্রথমে এখানে আসিয়া অপু কয়েকজন ছাত্র লইয়া এক সেবা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। একদিন সে স্কুল হইতে ফিরিতেছে, পথে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহার হাত দু'টা জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, আপনারা না দেখলে আমার ছেলেটা মারা যেতে বসেছে—আজ পনেরো দিন টাইফয়েড্, তা আমি কলের চাকরি বজায় রাখব, না রুগীর সেবা করব? আপনি দিন-মানটার জন্যে জনকতক ভলাণ্টিয়ার যদি আমার বাড়ি—আর সেই সঙ্গে যদি দু'একদিন আপনি—

তেত্রিশ-দিনে রোগী আরাম হইল। এই তেত্রিশ দিনের অধিকাংশ দিনই অপু নিজে ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণপণে খাটিয়াছে। রাত্রি তিনটায় ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, অপু ছাত্রদিগকে জাগিতে না দিয়া নিজে জাগিয়াছে, তিনটা না বাজা পর্যন্ত বাহিরের দাওয়ার একপাশে বই পড়িয়া সময় কাটাইয়াছে, পাছে এমনি বসিয়া থাকিলে ঘুমাইয়া পড়ে।

একদিন দুপুরে টাল খাইয়া রোগী যায়-যায় হইয়াছিল। দীঘড়ী মশায় পাটকলে, সে দিন ভলাণ্টিয়ার দলের আবার কেহই ছিল না, দুপুরে ভাত খাইতে গিয়াছিল। অপু দীঘড়ী মশায়ের স্ত্রীকে ভরসা দিয়া বুঝাইয়া শান্ত রাখিয়া মেয়ে দুটির সাহায্যে গরম জল করাইয়া বোতলে পুরিয়া সেঁক-তাপ ও হাত-পা ঘষিতে ঘষিতে আবার দেহের উষ্ণতা ফিরিয়া আসে।

ছেলে সারিয়া উঠিলে দীঘড়ী মশায় একদিন বলিলেন—আপনি আমার যা উপকারটা করেছেন মাস্টার মশায়—তা এক মুখে আর কি বলব। আমার স্ত্রী বলছিল, আপনার তো রেঁধে খাওয়ার কষ্ট—এই একমাসে আপনি তো আমাদের আপনার লোক হয়ে পড়েছেন—তা আপনি কেন আমাদের ওখানেই খান না? আপনি বাড়ির ছেলের মত থাকবেন, খাবেন, কোনও অসুবিধে

আপনার হবে না।

সেই হইতেই অপু এখানে একবেলা করিয়া খায়।

পরিচয় অল্প দিনের বটে, কিন্তু বিপদের দিনের মধ্য দিয়া সে পরিচয়-কাজেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। পূর্ণ দীঘড়ীর স্ত্রীকে শুধু 'মাসিমা' বলিয়া ডাকে তাহাই নয়, মাসের বেতন পাইলে সবটা আনিয়া নতুন-পাতানো মাসিমার হাতে তুলিয়া দেয়। সে-টাকার হিসাব প্রতি মাসের শেষে মাসিমা মুখে বুঝাইয়া দিয়া আরও চার-পাঁচ টাকা বেশী খরচ দেখাইয়া দেন এবং পরের মাসের মাহিনা হইতে কাটিয়া রাখেন। বাজারে বিশু স্যাকরা একদিন বলিয়াছিল—দীঘড়ী বাড়ি টাকা রাখবেন না অমন ক'রে, ওরা অভাবী লোক, বিশেষ ক'রে দিঘড়ী-গিন্নী ভারী খেলোয়াড় মেয়েছেলে, বিদেশী লোক আপনি, আপনাকে বলে রাখি, ওদের সঙ্গে অত মেলামেশার দরকার কি আপনার?

মেয়ে-দুইটিরও সঙ্গে সে মেশে বটে। বড় মেয়েটির নাম পটেশ্বরী, বয়স বছর চৌদ্দ-পনেরো হইবে, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তবে তাহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলিয়া কোনদিনই মনে হয় নাই অপুর। তবে এটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার সুবিধা অসুবিধার দিকে বাড়ির এই মেয়েটিই একটু বেশী লক্ষ্য রাখে। পটেশ্বরী না রাঁধিয়া দিলে অর্ধেক দিন বোধহয় তাহাকে না খাইয়াই স্কুলে যাইতে হইত। তাহার ময়লা রুমালগুলি নিজে চাহিয়া লইয়া সাবান দিয়া রাখে, ছোট ভাইয়ের হাতে টিফিনের সময় তাহার জন্য আটার রুটি পাঠাইয়া দেয়, অপু খাইতে বসিলে পান সাজিয়া তাহার রুমালে জড়াইয়া রাখে। কি একটা ব্রতের সময় বলিয়াছিল, আপনার হাত দিয়ে ব্রতটা নেব মাস্টার মশায়! এ সবের জন্য সে মনে মনে মেয়েটির উপর কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ সব জিনিস যে বাহিরের দিক হইতে এরূপ ভাবে দেখা যাইতে পারে, একথা পর্যন্ত তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই—সে জানেই না, এ ধরণের সন্দিগ্ধ ও অশুচি মনোভাবের খবর।

সে বিস্মিত হইল, রাগও করিল। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন হইতে পূর্ণ দীঘড়ীর বাড়ি যাওয়া-আসা বন্ধ করিল। ভাবিল—কিছু না, মাঝে পড়ে পটেশ্বরীকে বিপদে পড়তে হবে।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়াবাসী বামুনটি রাশীকৃত বাজার-দেনা ফেলিয়া একদিন ঝাঁঝরা, হাতা ও বেলুনখানা মাত্র সম্বল করিয়া চাঁপদানীর বাজার হইতে

রাতারাতি উধাও হইয়াছিল, সুতরাং আহারাদির খুবই কষ্ট হইতে লাগিল।

দীঘ্‌ড়ী-বাড়ি হইতে ফিরিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ-রকম বাবা-মা তো কখনও দেখি নি? বেচারীকে এ-ভাবে কষ্ট দেওয়া—ছিঃ—যাক ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আর রাখব না।

সেদিন ছুটির পর অপু একখানা খবরের কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিতে পাইল একটা শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধের লেখক তাহার বন্ধু জানকী এবং নামের তলায় ব্রাকেটের মধ্যে লেখা আছে—On deputation to England.

জানকী ভাল করিয়া এম-এ ও বি-টি পাস করিবার পর গভর্ণমেন্ট স্কুলে মাস্টারি করিতেছে এ-সংবাদ পূর্বেই সে জানিত কিন্তু তাহার বিলাত যাওয়ার কোন খবরই তাহার জানা ছিল না। কে-ই বা দিবে? দেখি দেখি—বা রে! জানকী বিলাত গিয়াছে, বাঃ—

প্রবন্ধটা কৌতূহলের সহিত পড়িল। বিলাতের একটা বিখ্যাত স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা-সংক্রান্ত আলোচনা। বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে ভাবিল, উঃ জানকী যে জানকী সেও গেল বিলেত!

মনে পড়িল কলেজ-জীবনের কথা—বাগবাজারের সেই শ্যামরায়ের মন্দির ও ঠাকুরবাড়ি—গরীব ছাত্রজীবনে জানকীর সঙ্গে কতদিন সেখানে খাইতে যাওয়ার কথা। ভালই হইয়াছে, জানকী কম কষ্টটা করিয়াছিল কি একদিন! বেশ হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।

এ-অঞ্চলের রাস্তায় বড় ধুলো, তাহার উপর আবার কয়লার গুঁড়া দেওয়া —পথ হাঁটা মোটেই প্রীতিকর নয়। দুধারে কুলিবস্তী; ময়লা দড়ির চারপাই পাতিয়া লোকগুলা তামাক টানিতেছে ও গল্প করিতেছে। এ-পথে চলিতে চলিতে অপরিচ্ছন্ন, সংকীর্ণ বস্তীগুলির দিকে চাহিয়া সে কতবার ভাবিয়াছে, মানুষ কোন্ টানে, কিসের লোভে এ-ধরণের নরককুণ্ডে স্বেচ্ছায় বাস করে? জানে না, বেচারীরা জানে না, পলে পলে এই নোংরা আবহাওয়া তাহাদের মনুষ্যত্বকে, রুচিকে, চরিত্রকে, ধর্মস্পৃহাকে গলা টিপিয়া খুন করিতেছে। সূর্যের আলো কি ইহারা কখনও ভোগ করে নাই! বন-বনানীর শ্যামলতাকে ভালবাসে নাই! পৃথিবীর মুক্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করে নাই!

নিকটে মাঠ নাই, বেগমপুরের মাঠ অনেক দূরে, রবিবার ভিন্ন সেখানে যাওয়া চলে না। সুতরাং খানিকটা বেড়াইয়াই সে ফিরিল।

অনেকদিন হইতে এ-অঞ্চলের মাঠে ও পাড়াগাঁয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এদিকের

গাছপালা ও বনফুলের একটা তালিকা ও বর্ণনা সে একখানা বড় খাতায় সংগ্রহ করিয়াছে। স্কুলের দু-একজন মাস্টারকে দেখাইলে তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ও-সবের কথা লইয়া আবার বই! পাগল আর কাকে বলে!

বাসায় আসিয়া আজ আর সে বিশু স্যাক্‌রার আড্ডায় গেল না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে জানকীর কথা মনে পড়িল। বিলাতে—তা বেশ। কত-দিন গিয়াছে কে জানে? ব্রিটিশ মিউজিয়ম-টিউজিয়ম এতদিনে সব দেখা হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। পুরানো নর্ম্যান্ দুর্গ দু-একটা, পাশে পাশে জুনিপারের বন, দূরে ঢেউ খেলানো মাঠের সীমায় খড়িমাটির পাহাড়ের পিছনে সন্ধ্যাধূসর আটলান্টিকের উদার বুকে অস্ত আকাশের রঙীন প্রতিচ্ছায়া, কি কি গাছ, পাড়াগাঁয়ের মাঠের ধারে বনের কি কি ফুল? ইংল্যাণ্ডের বনফুল নাকি ভারী দেখিতে সুন্দর—পপি, ক্লিম্যাটিস, ডেজী।

বিশু স্যাক্‌রার দোকান হইতে লোক ডাকিতে আসে, আসিবার আজ এত দেরি কিসের? খেলুড়ে ভীম সাধুখাঁ, মহেশ সাঁবুই, নীলু ময়রা, ফকির আড্ডি —ইহারা অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া আছে—মাস্টার মশায়ের যাইবার অপেক্ষায় এখনও খেলা যে আরম্ভ হয় নাই।

অপু যায় না—তাহার মাথা ধরিয়াছে—না—আজ সে আর খেলায় যাইবে না।

ক্রমে রাত্রি বাড়ে, পদ্মপুকুরের ওপারে কুলিবস্তীর আলো নিবিয়া যায়, নৈশ-বায়ু শীতল হয়, রাত্রি সাড়ে দশটায় আপ ট্রেন হেলিতে-দুলিতে ঝক্-ঝক্ শব্দে রোয়াকের কোল ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়, পয়েণ্টস্‌ম্যান আঁধারলণ্ঠন হাতে আসিয়া সিগ্‌ন্যালের বাতি নামাইয়া লইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে—মাস্টারবাবু; এখনও বসিয়ে আছেন?

—কে ভজুয়া? হ্যাঁ—সে এখনো বসিয়া আছে।

কিসের ক্ষুধা! কিসের যেন একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা।

ও-বেলা একখানা পুরানো জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল—একখানা খুব ভাল বই এ-সম্বন্ধে। শীলদের বাড়ির চাকরি-জীবনে কিনিয়াছিল—এখানা হইতে অপর্ণাকে কতদিন নীহারিকা ও নক্ষত্র-পুঞ্জের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিত—ও-বেলা যখন সেখানা লইয়া পড়িতেছিল, তখন তাহার চোখে পড়িল, অতি ক্ষুদ্র, সাদা রংয়ের—খালি চোখের খুব তেজ না থাকিলে দেখা প্রায় অসম্ভব—এরূপ একটা পোকা

বইয়ের পাতায় চলিয়া বেড়াইতেছে। ওর সম্বন্ধে ভাবিয়াছিল—এই বিশাল জগৎ, নক্ষত্রপুঞ্জ, উল্কা নীহারিকা, কোটি কোটি দৃশ্য-অদৃশ্য জগৎ লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব --ও-ও তো এরই একজন অধিবাসী—এই যে চলিয়া বেড়াইতেছে পাতাটার উপরে, ও-ই ওর জীবনানন্দ --কতটুকু ওর জীবন, আনন্দ কতটুকু ?

কিন্তু মানুষেরই বা কতটুকু ? ঐ নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি ? আজকাল তাহার মনে একটা নৈরাশ্য ও সন্দেহবাদের ছায়া মাঝে মাঝে যেন উঁকি মারে। এই বর্ষাকালে সে দেখিয়াছে, ভিজা জুতার উপর এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতা গজায়। কতদিন মনে হইয়াছে মানুষও তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই রকম ছাতার মত জন্মিয়াছে--এখানকার উষ্ণ বায়ুমণ্ডল ও তাহার বিভিন্ন গ্যাসগুলো প্রাণপোষণের অনুকূল একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া। এরা নিতান্তই এই পৃথিবীর, এরই সঙ্গে এদের বন্ধন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, ব্যাঙের ছাতার মতই হঠাৎ গজাইয়া উঠে, লাখে, লাখে, পালে পালে জন্মায়, আবার পৃথিবীর বুকেই যায় মিলাইয়া। এরই মধ্য হইতে সহস্র ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনার আনন্দ, হাসি-খুশিতে দৈন্য-ক্ষুদ্রতাকে ঢাকিয়া রাখে-- গড়ে চল্লিশটা বছর পরে সব শেষ : যেমন ঐ পোকার সব শেষ হইয়া গেল তেমনি।

এই অবোধ জীবগণের সঙ্গে ঐ বিশাল নক্ষত্র জগতের ঐ গ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু—ঐ নিঃসীম নাক্ষত্রিক বিরাট শূন্যের কি সম্পর্ক ? সুদূরের পিপাসাও যেমন মিথ্যা, অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমনি মিথ্যা—ভিজা জুতার বা পচা বিচালী-গাদার ব্যাঙের ছাতার মত যাহাদের উৎপত্তি—এই মহনীয় অনন্তের সঙ্গে তাহাদের কিসের সম্পর্ক ?

মৃত্যুপারে কিছুই নাই, সব শেষ। মা গিয়াছেন—অপর্ণা গিয়াছে—অনিল গিয়াছে—সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে পূর্ণচ্ছেদ।

ঐ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইখানাতে যে বিশ্বজগতের ছবি ফুটিয়াছে, ঐ পোকাটার পক্ষে যেমন তাহার কল্পনা ও ধারণা অসম্ভব, এমন সব উচ্চতর বিবর্তনের প্রাণী কি নাই যাহাদের জগতের তুলনায় মানুষের জগৎটা ঐ বইয়ের পাতায় বিচরণশীল প্রায় আণুবীক্ষণিক পোকাটার জগতের মতই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য ?

হয়ত তাহাই সত্য, হয়ত মানুষের সকল কল্পনা, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান মিলিয়া যে বিশ্বটার কল্পনা করিয়াছে সেটা বিরাট বাস্তবের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ

নয়—তাহা নিতান্ত এ পৃথিবীর মাটির···মাটির,··· মাটির।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতের তুলনায় ঐ পোকাটা এই জগতের মত! হয়ত তাহাই, কে বলিবে হ্যাঁ কি না?

মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? ভিজা জুতাকে রৌদ্রে দিলে তাহার উপরকার ছাতা কোথায় যায়?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

স্কুলের সেক্রেটারী স্থানীয় বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী রামতারণ গুইয়ের বাড়ি এবার পূজার খুব ধুমধাম। স্কুলের বিদেশী মাস্টার মহাশয়েরা কেহ বাড়ি যান নাই, এই বাজারে চাকুরিটা যদি বা জুটিয়া গিয়াছে, এখন সেক্রেটারীর মনস্তুষ্টি করিয়া সেটা তো বজায় রাখিতে হইবে! তাঁহারা পূজার কয়দিন সেক্রেটারীর বাড়িতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া লোকজনের আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ানোর বিলি-বন্দোবস্ত প্রভৃতিতে মহাব্যস্ত, সকলেই বিজয়া দশমীর পরদিন বাড়ি যাইবেন। অপুর হাতে ছিল ভাঁড়ার ঘরের চার্জ—কয়দিন রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত খাটিবার পর বিজয়া দশমীর দিন বৈকালে সে ছুটি পাইয়া কলিকাতায় আসিল।

প্রায় এক বৎসরের একঘেয়ে ওই পাড়াগেঁয়ে জীবনের পর বেশ লাগে শহরের এই সজীবতা! এই দিনটার সঙ্গে বহু অতীত দিনের নানা উৎসব-চপল আনন্দস্মৃতি জড়ানো আছে, কলিকাতায় আসিলেই যেন পুরানো দিনের সে-সব উৎসবরাজি তাহাকে পুরাতন সঙ্গী বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়া প্রীতিমধুর কলহাস্যে আবার তাহাকে ব্যগ্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। পথে চলিতে চলিতে নিজের ছেলের কথা মনে হইতে লাগিল বারবার। তাহাকে দেখা হয় নাই—কি জানি কি রকম দেখিতে হইয়াছে। অপর্ণার মত, না তাহার মত?···ছেলের উপর অপু মনে মনে খুব সন্তুষ্ট ছিল না, অপর্ণার মৃত্যুর জন্য সে মনে মনে ছেলেকে দায়ী করিয়া বসিয়াছিল বোধ হয়। ভাবিয়াছিল, পূজার সময় একবার সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিবে—কিন্তু যাওয়ার কোন তাগিদ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে খোকার পোশাকের দরুন পাঁচটি টাকা শ্বশুরবাড়িতে মনি-অর্ডার

করিয়া পাঠাইয়া পিতার কর্তব্য সমাপন করিয়াছে।

আজিকার দিনে শুধু আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু তাহার কোনও পূর্বপরিচিত বন্ধু আজকাল আর কলিকাতায় থাকে না, কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল—কোথায় যাওয়া যায় ?

তার পরে সে লক্ষ্যহীনভাবে চলিল। একটা সরু গলি, দুজন লোকে পাশাপাশি যাওয়া যায় না, দুধারে একতলা নীচু স্যাঁতসেঁতে ঘরে ছোট ছোট গৃহস্থেরা বাস করিতেছে—একটা রান্নাঘরে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি বৌ লুচি ভাজিতেছে, দুটি ছোট মেয়ে ময়দা বেলিয়া দিতেছে—অপু ভাবিল এক বৎসর পর আজ হয়ত ইহাদের লুচি খাইবার উৎসব-দিন। একটা উঁচু রোয়াকে অনেকগুলি লোক কোলাকুলি করিতেছে, গোলাপী সিল্কের ফ্রকপরা কোঁকড়াচুল একটি ছোট মেয়ে দরজার পর্দা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। একটা দৃশ্যে তাহার ভারী দুঃখ হইল। এক মুড়ির দোকানে প্রৌঢ়া মুড়িওয়ালীকে একটি অল্পবয়সী নীচশ্রেণীর পতিতা মেয়ে বলিতেছে—ও দিদি—দিদি ? একটু পায়ের ধুলো দ্যাও। পরে পায়ের ধুলা লইয়া বলিতেছে, একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না, শোনো—ও দিদি ? মুড়িওয়ালী তাহার কথায় আদৌ কান না দিয়া সোনার মোটা অনন্ত-পরা ঝিয়ের সহিত কথাবার্তা কহিতেছে—মেয়েটি তাহার মনোযোগ ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করিবার জন্য আবার প্রণাম করিতেছে ও আবার বলিতেছে—দিদি, ও দিদি ?···একটু পায়ের ধুলো দ্যাও। পরে হাসিয়া বলিতেছে—একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না, ও দিদি ?

অপু ভাবিল, এ রূপহীনা হতভাগিনীও হয়ত কলিকাতায় তাহার মত একাকী, কোন খোলার ঘরের অন্ধকার গর্ভগৃহ হইতে আজিকার দিনের উৎসবে যোগ দিতে তাহার চুনুরি শাড়িখানা পরিয়া বাহির হইয়াছে। পাশের দোকানের অবস্থাপন্ন মুড়িওয়ালীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে, উৎসবের অংশ হইতে যাহাতে সে বঞ্চিত না হয়। ওর চোখে ওই মুড়িওয়ালীই হয়ত কত বড়লোক !

ঘুরিতে ঘুরিতে সেই কবিরাজ-বন্ধুটির দোকানে গেল। বন্ধু দোকানেই বসিয়া আছে, খুব আদর করিয়া বলিল—এসো, এসো ভাই, ছিলে কোথায় এতদিন ? বন্ধুর অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও খারাপ, পূর্বের বাসা ছাড়িয়া নিকটের

একটা গলিতে সাড়ে তিন টাকা ভাড়াতে এক খোলার ঘর লইয়াছে—নতুবা চলে না। বলিল—আর ভাই পারি নে, এখন হয়েছে দিন-আনি দিন-খাই অবস্থা। আমি আর স্ত্রী দুজনে মিলে বাড়িতে আচার-চাটনি, পয়সা প্যাকেট চা—এই সব ক'রে বিক্রি করি—অসম্ভব স্ট্রাগল করতে হচ্ছে ভাই, এসো বাসায় এসো।

নীচু স্যাঁতসেঁতে ঘর। বন্ধুর বৌ বা ছেলেমেয়ে কেহই বাড়ি নাই—পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেছে। বন্ধু বলিল—এবার আর ছেলেমেয়েদের কাপড়-টাপড় দিতে পারি নি—বলি ঐ পুরানো কাপড়ই ধোপার বাড়ি থেকে কাচিয়ে পর্। বৌটার চোখে জল দেখে শেষকালে ছোট মেয়েটার জন্য একখানা ডুরে শাড়ি—তাই। ব'স ব'স, চা খাও, বাঃ, আজকের দিনে যদি এলে। দাঁড়াও ডেকে আনি ওকে।

অপু ইতিমধ্যে গলির মোড়ের দোকান হইতে আট আনার খাবার কিনিয়া আনিল। খাবারের ঠোঙা হাতে যখন সে ফিরিয়াছে তখন বন্ধু ও বন্ধুপত্নী বাসায় ফিরিয়াছে।—বাঃ রে, আবার কোথায় গিয়েছিলে—ওতে কি? খাবার? বাঃ রে, খাবার তুমি আবার কেন—

অপু হাসিমুখে বলিল—তোমার আমার জন্য তো আনি নি? খুকী রয়েছে, ঐ খোকা রয়েছে এস তো মানু—কি নাম? রমলা? ও বাবা, বাপের শখ দ্যাখ—রমলা! বৌ-ঠাকরুণ—ধরুন তো এটা।

বন্ধুপত্নী আধঘোমটা টানিয়া প্রসন্ন হাসিভরা মুখে ঠোঙাটি হাত হইতে লইলেন। সকলকে চা ও খাবার দিলেন। সেই খাবারই।

আধঘন্টাটাক পর অপু বলিল—উঠি ভাই, আবার চাঁপদানীতেই ফিরব—বেশ ভাল ভাই-কষ্টের সঙ্গে তুমি এই যে লড়াই করছ—এতে তোমাকে ভাল করে চিনে নিলাম—কিন্তু বৌ-ঠাকরুণকে একটা কথা বলে যাই—অত ভালমানুষ হবেন না—আপনার স্বামী তা পছন্দ করেন না। দু-একদিন একটু-আধটু চুলোচুলি, হাতা-যুদ্ধ, বেলুন-যুদ্ধ-জীবনটা বেশ একটু সরস হয়ে উঠবে-বুঝলেন না? এ আমার মত নয় কিন্তু, আমার এই বন্ধুটির মত—আচ্ছা আসি, নমস্কার।

বন্ধুটি পিছু পিছু আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওহে তোমার বৌ-ঠাকরুণ বলছেন, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস কর, উনি বিয়ে করবেন, না, এই রকম সন্ন্যিসি

হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন ?···উত্তর দাও।

অপু হাসিয়া বলিল - দেখে শুনে আর ইচ্ছে নেই ভাই, বলে দাও।

বাহিরে আসিয়া ভাবে—আচ্ছা, তবুও এরা আজ ছিল বলে বিজয়ার আনন্দটা করা গেল। সত্যিই শান্ত বৌটি। ইচ্ছে করে এদের কোনও হেল্প করি—কি ক'রে হয়, হাতে এদিকে পয়সা কোথায় ?

তাহার পর কিসের টানে সে ট্রামে উঠিয়া একেবারে ভবানীপুরে লীলাদের বাড়ি গিয়া হাজির হইল। রাত তখন প্রায় সাড়ে-আটটা। লীলার দাদামশায়ের লাইব্রেরী-ঘরটাতে লোকজন কথাবার্তা বলিতেছে, গাড়ি-বারান্দাতে দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে—পোকার উপদ্রবের ভয়ে হলের ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলিতে রাঙা সিল্কের ঘেরাটোপ্‌ বাঁধা। মার্বেলের সিঁড়ির ধাপ বাহিয়া হলের সামনের চাতালে উঠিবার সময় সেই গন্ধটা পাইল—কিসের গন্ধ ঠিক সে জানে না, হয়ত দামী আসবাব-পত্রের গন্ধ, হয়ত লীলার দাদামশায়ের দামী চুরুটের গন্ধ—এখানে আসিলেই ওটা পাওয়া যায়।

লীলা—এবার হয়ত লীলা···অপুর বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে লাগিল।

লীলার ছোট ভাই বিমলেন্দু তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিল।

এই বালকটিকে অপুর বড় ভালো লাগে—মাত্র বার দুই ইহার আগে সে অপুকে দেখিয়াছে, কিন্তু কি চোখেই যে দেখিয়াছে! একটু বিস্ময়মাখানো আনন্দের সুরে বলিল—অপূর্ববাবু, আপনি এতদিন পর কোথা থেকে? আসুন, আসুন. বসবেন। বিজয়ার প্রণামটা, দাঁড়ান।

—এসো এসো, কল্যাণ হোক, মা কোথায় ?

—মা গিয়েছেন বাগবাজারের বাড়িতে—আসবেন এখুনি—বসুন।

—ইয়ে—তোমার দিদি এখানে তো ?—না ?—ও।

এক মুহূর্তে সারা বিজয়া দশমীর উৎসবটা, আজিকার সকল ছুটাছুটি ও পরিশ্রমটা অপুর কাছে বিস্বাদ, নীরস, অর্থহীন হইয়া গেল। শুধু আজ বলিয়া নয়, পূজো আরম্ভ হইবার সময় হইতেই সে ভাবিতেছে—লীলা পূজার সময় নিশ্চয় কলিকাতায় আসিবে—বিজয়ার দিন গিয়া দেখা করিবে। আজ চাঁপদানীর চটকলে পাঁচটার ভোঁ বাজিয়া প্রভাত সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অসীম আনন্দের সহিত বিছানায় শুইয়া ভাবিয়াছিল—বৎসর দুই পরে আজ লীলার সঙ্গে ওবেলা দেখা হইবে এখন। সেই লীলাই নাই এখানে!···

বিমলেন্দু তাহাকে উঠিতে দিল না। চা ও খাবার আনিয়া খাওয়াইল বলিল—বসুন, এখন উঠতে দেব না, নতুন আইসক্রিমের কলটা এসেছে—বড় মামার বন্ধুদের জন্যে সিদ্ধির আইসক্রিম হচ্ছে—খাবেন সিদ্ধির আইসক্রিম? রোজ্‌ দেওয়া—আপনার জন্যে এক ডিস্‌ আনতে বলে এলুম। আপনার গান শোনা হয় নি কতদিন, না সত্যি, একটা গান করতেই হবে—ছাড়ছি নে।

—লীলা কি সেই রায়পুরেই আছে? আসবে-টাসবে না?···

—এখন তো আসবে না দিদি—দিদির নিজের ইচ্ছেতে তো কিছু হবার জো নেই—দাদামশায় পত্র লিখেছিলেন, জামাইবাবু উত্তর দিলেন এখন নয়, দেখা যাবে এর পর।

তাহার পর সে অনেক কথা বলিল। অপু এ-সব জানিত না।—জামাইবাবু লোক ভাল নয়, খুব রাগী, বদ্‌মেজাজী। দিদি খুব তেজী মেয়ে বলিয়া পারিয়া উঠে না—তবু ব্যবহার আদৌ ভাল নয়। নিচু সুরে বলিল—নাকি খুব মাতালও—দিদি তো সব কথা লেখে না, কিন্তু এবার বড়দিদির ছেলে কিছুদিন বেড়াতে গিয়েছিল নাকি গরমের ছুটিতে, সে এসে সব বললে। বড়দিদিকে আপনি চেনেন না? সুজাতাদি? এখানেই আছেন, এসেছেন আজ—ডাকব তাঁকে?

অপুর মনে পড়িল সুজাতাকে। বড়বৌরাণীর মেয়ে বাল্যের সেই সুন্দরী, তন্বী সুজাতা—বর্ধমানের বাড়িতে তাহারই যৌবনপুষ্পিত তনুলতাটি একদিন অপুর অনভিজ্ঞ শৈশবচক্ষুর সম্মুখে নারী-সৌন্দর্যের সমগ্র ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল—বারো বৎসর পূর্বের সে উৎসবের দিনটা আজও এমন স্পষ্ট মনে পড়ে।

একটু পরে সুজাতা হাসিমুখে পর্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু একজন অপরিচিত, সুদর্শন, তরুণ যুবককে ঘরের মধ্যে দেখিয়া প্রথমটা সে তাড়াতাড়ি পিছু হটিয়া পর্দাটা পুনরায় টানিতে যাইতেছিল—বিমলেন্দু হাসিয়া বলিল—বাঃ রে, ইনিই তো অপূর্ববাবু, বড়দি চিনতে পারেন নি?

অপু উঠিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। সে সুজাতা আর নাই, বয়স ত্রিশ পার হইয়াছে, খুব মোটা হইয়া গিয়াছে, মাথার সামনের দিকে দু-এক গাছা চুল উঠিতে শুরু হইয়াছে, যৌবনের চটুল লাবণ্য গিয়া মুখে মাতৃত্বের কোমলতা। বর্ধমানে থাকিতে অপুর সঙ্গে একদিনও সুজাতার আলাপ হয় নাই—রাঁধুনীর ছেলের সঙ্গে বাড়ির বড় মেয়ের কোন্‌ আলাপই বা সম্ভব ছিল? সবাই তো আর লীলা নয়! তবে বাড়ির রাঁধুনী বামনীর ছেলেটিকে ভয়ে ভয়ে

বড়লোকের বাড়ির একতলা দালানের বারান্দাতে অনেকবার সে বেড়াইতে, ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছে বটে।

সুজাতা বলিল—এসো এসো, ব'স। এখানে কি কর? মা কোথায়?

—মা তো অনেকদিন মারা গিয়াছেন।

—তুমি বিয়ে-থাওয়া করেছ তো—কোথায়?

সে সংক্ষেপে সব বলিল। সুজাতা বলিল—তা আবার বিয়ে কর নি? না না, বিয়ে ক'রে ফেল, সংসারে থাকতে গেলে ও-সব তো আছেই, বিশেষ যখন তোমার মা-ও নেই। সে বাড়ির আর মেয়ে-টেয়ে নেই?

অপুর মনে হইল লীলা থাকলে, সে 'তোমার মা' এ কথা না বলিয়া শুধু 'মা' বলিত, তাহাই সে বলে। লীলার মত আর কে এমন দয়াময়ী আছে যে তাহার জীবনে, তাহার সকল দারিদ্র্যকে, সকল হীনতাকে উপেক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ করুণার ও মমতার স্নেহপাণি সহজ বন্ধুত্বের মাধুর্যে তাহার দিকে এমন প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল? সুজাতার কথার উত্তর দিতেই এ-কথাটা ভাবিয়া সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

সুজাতা ভিতরে চলিয়া গেলে অপুর মনে হইল, শুধু মাতৃত্বের শান্ত কোমলতা নয়, সুজাতার মধ্যে গৃহিণীপনার প্রবীণতাও আসিয়া গিয়াছে। বলিল—আসি ভাই বিমল, আমার আবার সাড়ে দশটায় গাড়ি।

বিমলেন্দু তাহাকে আগাইয়া দিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর আসিল। বলিল—আর বছর ফাগুন মাসে দিদি এসেছিল, দিন পনেরো ছিল। কাউকে বলবেন না, আপনার পুরানো আফিসে একবার আমায় পাঠিয়েছিল আপনার খোঁজে—সবাই বললে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছেন, কোথায় কেউ জানে না। আপনার কথা আমি লিখব, আপনার ঠিকানা দিন না?···দাঁড়ান, লিখে নি।

মাঘীপূর্ণিমার দিনটা ছিল ছুটি। সারাদিন সে আশেপাশের গ্রামগুলো পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যার অনেক পরে সে বাসায় আসিয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। কত রাত্রে জানে না, তক্তপোশের কাছের জানালাতে কাহার মৃদু করাঘাতের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শীত এখনও বেশী বলিয়া জানালা বন্ধই ছিল, বিছানার উপর বসিয়া সে জানালাটা খুলিয়া ফেলিল। কে যেন বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া। কে?···উত্তর নাই। সে তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া অবাক হইয়া গেল—কে

একটি স্ত্রীলোক এত রাত্রে তাহার জানালার কাছে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিষন্নভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

অপু আশ্চর্য হইয়া কাছে গিয়া বলিল—কে ওখানে? পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—পটেশ্বরী! তুমি এখানে এত রাত্রে? কোথা থেকে—তুমি শ্বশুরবাড়ি ছিলে, এখানে কি ক'রে—

পটেশ্বরী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, কথা বলিল না—অপু চাহিয়া দেখিল, তাহার পায়ের কাছে একটা ছোট পুঁটুলি পড়িয়া আছে। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেঁদো না পটেশ্বরী কি হয়েছে বল। আর এখানে এ-ভাবে দাঁড়িয়েও তো—শুনি কি হয়েছে? তুমি এখন আসছ কোত্থেকে বল তো?

পটেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—রিষড়ে থেকে হেঁটে আসছি—অনেক রাত্তিরে বেরিয়েছি, আমি আর সেখানে যাব না—

—আচ্ছা, চলো চলো, তোমায় বাড়িতে দিয়ে আসি—কি বোকা মেয়ে! এত রাত্তিরে কি এ ভাবে বেরুতে আছে?···ছিঃ—আর এই কন্‌কনে শীতে, গায়ে একখানা কাপড় নেই, কিছু না—এ কি ছেলেমানুষি!

—আপনার পায়ে পড়ি মাস্টার মশাই. আপনি বাবাকে বলবেন, আর যেন সেখানে না পাঠায়—সেখানে গেলে আমি মরে যাব—পায়ে পড়ি আপনার—

বাড়ির কাছাকাছি গিয়া বলিল—বাড়িতে যেতে বড্ড ভয় করছে, মাস্টার মশায় —আপনি একটু বলবেন বাবাকে মাকে বুঝিয়ে—

সে এক কাণ্ড আর কি অত রাত্রে! ভাগ্যে রাত অনেক, পথে কেহ নাই!

অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া দীঘড়ী-বাড়ি আসিয়া পটেশ্বরীর বাবাকে ডাকিয়া তুলিয়া সব কথা বলিল। পূর্ণ দীঘড়ী বাহিরে আসিলেন, পটেশ্বরী আমগাছের তলায় বসিয়া পড়িয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে ও হাড়ভাঙা শীতে ঠক্‌-ঠক করিয়া কাঁপিতেছে—না-একখানা শীতবস্ত্র, না-একখানা মোটা চাদর।

বাড়ির মধ্যে গিয়া পটেশ্বরী কাঁদিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল—একটু পরে পূর্ণ দিঘড়ী তাহাকে ডাকিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া দেখাইলেন পটেশ্বরীর হাতে, পিঠে, ঘাড়ের কাছে প্রহারের কালশিরার দাগ, এক এক জায়গায় রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে—মাকে ছাড়া দাগগুলি সে আর কাহাকেও দেখায় নাই. তিনি আবার স্বামীকে দেখাইয়াছেন। ক্রমে জানা গেল পটেশ্বরী নাকি রাত বারোটা হইতে পুকুরের ঘাটে শীতের মধ্যে বসিয়া ভাবিয়াছে কি করা যায়—দু ঘণ্টা শীতে ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া কাঁপিবার পরও সে বাড়ি আসিবার সাহস সঞ্চয় করিতে না

পারিয়া মাস্টার মহাশয়ের জানলায় শব্দ করিয়াছিল।

মেয়েকে আর সেখানে পাঠানো চলিতে পারে না এ কথা ঠিক। দীঘড়ী মশায় অপুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কোন উকীল বন্ধু আছে কি-না, এ সম্বন্ধে একটা আইনের পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক—মেয়ের ভরণপোষণের দাবী দিয়া তিনি জামাইয়ের নামে নালিশ করিতে পারেন কিনা। অপু দিন দুই শুধুই ভাবিতে লাগিল এক্ষেত্রে কি করা উচিত।

সুতরাং স্বভাবতই সে খুব আশ্চর্য হইয়া গেল, যখন মাঘীপূর্ণিমার দিন পাঁচেক পরে সে শুনিল পটেশ্বরীর স্বামী আসিয়া পুনরায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে আরও বেশী আশ্চর্য হইতে হইল, সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপারে। একদিন সে স্কুল হইতে ছুটির পরে বাহিরে আসিতেছে, স্কুলের বেহারা তাহার হাতে একখানা খামের চিঠি দিল—খুলিয়া পড়িল, স্কুলের সেক্রেটারি লিখিতেছেন, তাহাকে আর বর্তমানে আবশ্যক নাই—এক মাসের মধ্যে সে যেন অন্যত্র চাকুরী দেখিয়া লয়।

অপু বিস্মিত হইল—কি ব্যাপার! হঠাৎ এ নোটিশের মানে কি? সে তখনই হেডমাস্টারের কাছে গিয়া চিঠিখানি দেখাইল। তিনি নানাকারণে অপুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রথম, সেবাসমিতির দলগঠন অপুই করিয়াছিল, নেতৃত্বও করিত সে। ছেলেদের সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তাহার কথায় ছেলেরা ওঠে বসে। জিনিসটা হেডমাস্টারের চক্ষুশূল। অনেকদিন হইতেই তিনি সুযোগ খুঁজিতেছিলেন—ছিদ্রটা এত দিন পান নাই- পাইলে কি আর একটা অনভিজ্ঞ ছোকরাকে জব্দ করিতে এতদিন লাগিত?

হেডমাস্টার কিছু জানেন না—সেক্রেটারীর ইচ্ছা, তাঁহার হাত নাই। সেক্রেটারী জানাইলেন, কথাটা এই যে, অপূর্ববাবুর নামে নানা কথা রটিয়াছে, দীঘড়ী বাড়ির মেয়েটির এই সব ঘটনা লইয়া। অনেকদিন হইতেই এ লইয়া তাঁহার কানে কোন কোন কথা গেলেও তিনি শোনেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যে অনেকে আপত্তি করিতেছেন যে, ও-রূপ চরিত্রের শিক্ষককে কেন রাখা হয়। অপুর প্রতিবাদ সেক্রেটারী কানে তুলিলেন না।

—দেখুন, ও-সব কথা আলাদা। আমাদের স্কুলের ও ছাত্রদের দিক থেকে এ-ব্যাপারটা অন্যভাবে আমরা দেখব বিনা! একবার যাঁর নামে কুৎসা রটেছে, তাঁকে আর আমরা শিক্ষক হিসাবে রাখতে পারি নে—তা সে সত্যিই হোক, বা

মিথ্যেই হোক।

অপুর মুখ লাল হইয়া গেল এই বিরাট অবিচারে। সে উত্তেজিত সুরে বলিল—বেশ তো মশায়, এ বেশ জাস্টিস্ হ'ল তো! সত্যি মিথ্যে না জেনে আপনারা একজনকে এই বাজারে অনায়াসে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন— বেশ তো?

বাহিরে আসিয়া রাগে ও ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিয়া গেল। মনে ভাবিল এসব হেডমাস্টারের কারসাজি—আমি যাব তাঁর বাড়ি খোশামোদ করতে? যায় যাক্ চাকরি! কিন্তু এদের অদ্ভুত বিচার বটে—ডিফেণ্ড্ করার একটা সুযোগ তো খুনী আসামীকেও দেওয়া হয়ে থাকে, তা-ও এরা আমায় দিলে না!

কয়দিন সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখানকার চাকুরির মেয়াদ তো আর এই মাসটা—তারপর কি করা যাইবে? স্কুলে এক নতুন মাস্টার কিছুদিন পূর্বে কোন এক মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিয়া দশটা টাকা পাইয়াছিলেন। গল্পটা সেই ভদ্রলোকের কাছে অপু অনেকবার শুনিয়াছে! আচ্ছা, সেও এখানে বসিয়া বসিয়া খাতায় একটা উপন্যাস লিখিতে শুরু করিয়াছিল— মনে মনে ভাবিল—দশ-বারো চ্যাপ্টার তো লেখা আছে, উপন্যাসখানা যদি লিখে শেষ করতে পারি, তার বদলে কেউ টাকা দেবে না? কেমন হচ্ছে কে জানে; একবার রামবাবুকে দেখাব।

নোটিশ-মত অপুর কাজ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, একদিন পোস্টাফিসের ডাক-ব্যাগ খুলিয়া খাম ও পোস্টকার্ডগুলি নাড়িতে-চাড়িতে একখানা বড়, চৌকা সবুজ রংয়ের মোটা খামের ওপর নিজের নাম দেখিয়া বিস্মিত হইল—কে তাহাকে এত বড় শৌখিন খামে চিঠি দিল! প্রণব নয়, অন্য কেহ নয়, হাতের লেখাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

খুলিয়া দেখিলেই তো তাহার সকল রহস্য এখনই চলিয়া যাইবে, এখন থাক, বাসায় গিয়া পড়িবে এখন। এই অজানার আনন্দটুকু যতক্ষণ ভোগ করা যায়।

রান্না-খাওয়াব কাজ শেষ হইতে মার্টিন কোম্পানীর রাত দশটার গাড়ি আসিয়া পড়িল, বাজারের দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়িল। অপু পত্রখানা খুলিয়া দেখিল—দুখানা চিঠি, একখানা ছোট চার-পাঁচ লাইনের, আর একখানা মোটা সাদা কাগজে—পরক্ষণেই আনন্দে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তার বুকের রক্ত যেন চল্কাইয়া উঠিয়া গেল মাথায়—সর্বনাশ, কার চিঠি এ! চোখকে যেন বিশ্বাস

করা যায় না—লীলা তাহাকে লিখিতেছে ! সঙ্গের চিঠিখানা তার ছোট ভাইয়ের —সে লিখিতেছে, দিদির এ-পত্রখানা তাহার পত্রের মধ্যে আসিয়াছে, অপুকে পাঠাইবার অনুরোধ ছিল দিদির, পাঠানো হইল।

অনেক কথা, ন' পৃষ্ঠা ছোট ছোট অক্ষরের চিঠি ! খানিকটা পড়িয়া সে খোলা হাওয়ায় আসিয়া বসিল। কি অবর্ণনীয় মনোভাব, বোঝানো যায় না, বলা যায় না ! আরম্ভটা এই রকম—

ভাই অপূর্ব,

অনেকদিন তোমার কোন খবর পাই নি—তুমি কোথায় আছ, আজকাল কি কর, জানবার ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার কিন্তু কে বলবে, কার কাছেই বা খবর পাব ? সেবার কলকাতায় গিয়ে বিনুকে একদিন তোমার পুরানো ঠিকানায় তোমার সন্ধানে পাঠিয়েছিলাম—সে বাড়িতে অন্য লোকে আজকাল থাকে, তোমার সন্ধান দিতে পারে নি, কি করেই বা পারবে ? একথা বিনু বলে নি তোমায় ?

আমি বড় অশান্তিতে আছি এখানে, কখনও ভাবি নি এমন আমার হবে। কখনও যদি দেখা হয় তখন সব বলব। এই সব অশান্তির মধ্যে যখন আবার মনে হয় তুমি হয়ত মলিনমুখে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তখন মনের যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন বিনুর পত্রে জানলাম বিজয়া দশমীর দিন তুমি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলে, তোমার ঠিকানাও পেলাম।

বর্ধমানের কথা মনে হয় ? অত আদরের বর্ধমানের বাড়িতে আজকাল আর যাবার জো নেই। জ্যাঠামশায় মারা যাওয়ার পর থেকেই রমেন-দা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছিল। আজকাল সে যা করছে, তা তুমি হয়ত কখনও শোনও নি। মানুষের ধাপ থেকে সে যে কত নীচে নেমে গিয়েছে, আর যা কীর্তিকারখানা, তা লিখতে গেলে পুঁথি হয়ে পড়ে। কোন মারোয়াড়ীর কাছে নিজের অংশ বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিল—এখন তার পরামর্শে পার্টিশন স্যুট আরম্ভ করেছে—বিনুকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে। এ-সব তোমার মাথায় আসবে কোনও দিন ?

কত রাত পর্যন্ত অপু চোখের পাতা বুজাইতে পারিল না। লীলা যাহা লিখিয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী যেন লেখে নাই। সারা পত্রখানিতে একটা শান্ত সহানুভূতি, স্নেহ-প্রীতি, করুণা। এক মুহূর্তে আজ দু বৎসরব্যাপী এই নির্জনতা অপুর যেন কাটিয়া গেল—এইমাত্র সে ভাবিতেছিল সংসারে সে একা

—তাহার কেহ কোথাও নেই। লীলার পত্রে জগতের চেহারা যেন এক মুহূর্তে বদলাইয়া গেল। কোথায় সে—কোথায় লীলা !···বহুদূরের ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার প্রাণের উষ্ণ প্রেমময় স্পর্শ অপুর প্রাণে লাগিয়াছে—কিন্তু কি অপূর্ব রসায়ন এ স্পর্শটা—কোথায় গেল অপুর চাকুরি যাইবার দুঃখ—কোথায় গেল গোটা-দুই বৎসরের পাষাণভারের মত নির্জনতা—নারীহৃদয়ের অপূর্ব রসায়নের প্রলেপ তাহার সকল মনে, সকল অঙ্গে, কী যে আনন্দ ছড়াইয়া দিল! লীলা যে আছে !···সব সময় তাহার জন্য ভাবে—দুঃখ করে, জীবনে অপু আর কি চায় ?—সাক্ষাতের আবশ্যক নাই, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া এই স্পর্শটুকু অক্ষয় হইয়া বিরাজ করুক।

লীলার পত্র পাইবার দিন-বারো পরে তাহার যাইবার দিন আসিয়া গেল।

ছেলেরা সভা করিয়া তাহাকে বিদায়-সম্বর্ধনা দিবার উদ্দেশ্যে চাঁদা উঠাইতেছিল—হেডমাস্টার খুব বাধা দিলেন। যাহাতে সভা না হইতে পায় সেইজন্য দলের চাঁইদিগকে ডাকিয়া টেস্ট পরীক্ষার সময় বিপদে ফেলিবেন বলিয়া শাসাইলেন—পরিশেষে স্কুল-ঘরে সভার স্থানও দিতে চাহিলেন না, বলিলেন—তোমরা ফেয়ারওয়েল দিতে যাচ্ছ, ভাল কথা, কিন্তু এসব বিষয়ে আয়রন্ ডিসিপ্লিন্ চাই—যার চরিত্র নেই, তার কিছুই নেই, তার প্রতি কোনও সম্মান তোমরা দেখাও, এ আমি চাই নে, অন্তত স্কুল-ঘরে আমি তার জায়গা দিতে পারি নে।

সেদিন আবার বড় বৃষ্টি। মহেন্দ্র সাঁবুই-এর আটচালায় জনত্রিশেক উপরের ক্লাসের ছেলে হেডমাস্টারের ভয়ে লুকাইয়া হাতে লেখা অভিনন্দন-পত্র পড়িয়া ও গাঁদাফুলের মালা গলায় দিয়া অপুকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাইল, সভা ভঙ্গের পর জলযোগ করাইল। প্রত্যেকে পায়ের ধুলা লইয়া, তাহার বাড়ি আসিয়া বিছানাপত্র গুছাইয়া দিয়া, নিজেরা তাহাকে বৈকালে ট্রেনে তুলিয়া দিল।

অপু প্রথমে আসিল কলিকাতায়।

একটা খুব লম্বা পাড়ি দিবে—যেখানে সেখানে—যেদিকে দুই চোখ যায়—এতদিনে সত্যিই মুক্তি। আর কোনও জালে নিজেকে জড়াইবে না—সব দিক হইতে সতর্ক থাকিবে—শিকলের বাঁধন অনেক সময় অলক্ষিতে জড়ায় কিনা পায়ে!

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া সারা ভারতবর্ষের ম্যাপ ও য়্যাট্‌লাস কয়দিন

ধরিয়া দেখিয়া কাটাইল—ড্যানিয়েলের ওরিয়েণ্টাল সিনারি ও পিঙ্কার্টনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নানাস্থান নোট করিয়া লইল—বেঙ্গল নাগপুর ও ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলের নানাস্থানের ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইল। সত্তর টাকা হাতে আছে, ভাবনা কিসের ?

কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ছেলেকে চোখের দেখা দেখিয়া যাওয়া দরকার না ? সেই দিনই বেকালের ট্রেনে সে শ্বশুরবাড়ি রওনা হইল। অপর্ণার মা জামাইকে এতটুকু তিরস্কার করিলেন না, এতদিন ছেলেকে না দেখিতে আসার দরুন একটি কথাও বলিলেন না। বরং এত আদর-যত্ন করিলেন যে অপু নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। অপু বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেছে. এমন সময়ে তাহার খুড়শাশুড়ী একটি সুন্দর খোকাকে কোলে করিয়া সেখানে আসিলেন। অপু ভাবিল—বেশ খোকাটি তো ! কাদের ? খুড়শাশুড়ী বলিলেন—যাও তো খোকন, এবার তোমার আপনার লোকের কাছে ! ধন্যি যাহোক, এমন নিষ্ঠুর বাপ কখনও দেখি নি ! যাও তো একবার কোলে—

ছেলে তিন বৎসর প্রায় ছাড়াইয়াছে ফুটফুটে সুন্দর গায়ের রং—অপর্ণার মত ঠোঁট ও মুখের নীচেকার ভঙ্গী, চোখ বাপের মত ডাগর ডাগর। কিন্তু সবসুদ্ধ ধরিলে অপর্ণার মুখের আদলই বেশী ফুটিয়া উঠে খোকার মুখে। প্রথমে সে কিছুতেই বাবার কাছে আসিবে না, অপরিচিত মুখ দেখিয়া ভয়ে দিদিমাকে জড়াইয়া রহিল—অপুর মনে ইহাতে আঘাত লাগিল। সে হাসিমুখে হাত বাড়াইয়া বার বার খোকাকে কোলে আনিতে গেল—ভয়ে শেষকালে খোকা দিদিমার কাঁধে মুখ লুকাইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় খানিকটা ভাব হইল। তাহাকে দু একবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিলও। একবার কি একটা পাখি দেখিয়া বলিল—ফাখি, ফাখি, উই এত্তা ফাখি নেবো বাবা—

'প'কে কচি জিব ও ঠোঁটের কি কৌশলে 'ফ' বলিয়া উচ্চারণ করে. কেমন অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। আর এত কথাও বলে খোকা !

কিন্তু বেশীর ভাগই বোঝা যায় না—উল্‌টো-পাল্‌টা কথা, কোন্ কথার উপর জোর দিতে গিয়া কোন্ কথার উপর দেয়—কিন্তু অপুর মনে হয় কথা কহিলে খোকার মুখ দিয়া মানিক ঝরে—সে যাহাই কেন বলুক না, প্রত্যেক ভাঙা, অশুদ্ধ, অপূর্ণ কথাটি অপুর মনে বিস্ময় জাগায়। সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে কোন শিশু যেন কখনও 'বাবা' বলে নাই, 'জল' বলে নাই,—

কোন্ অসাধ্য সাধনই না তাহার খোকা করিতেছে!

পথে বাবার সঙ্গে বাহির হইয়াই খোকা বকুনি শুরু করিল। হাত পা নাড়িয়া কি বুঝাইতে চায় অপু না বুঝিয়াই অন্যমনস্ক সুরে ঘাড় নাড়িয়া বলে—ঠিক ঠিক। তারপর কি হল রে খোকা?

একটা বড় সাঁকো পথে পড়ে, খোকা বলে—বাবা যাব—ওই দেখব।

অপু বলে—আস্তে আস্তে নেমে যা—নেমে গিয়ে একটা কু-উ করবি—

খোকা আস্তে আস্তে ঢালু বাহিয়া নীচে নামে—জলনিকাশের পথটার ফাঁকে ওদিকের গাছপালা দেখা যাইতেছে—না বুঝিয়া বলে—বাবা, এই মধ্যে একতা বাগান—

—কু করো তো খোকা, একটা কু করো।

খোকা উৎসাহের সহিত বাঁশির মত সুরে ডাকে—কু-উ-উ—পরে বলে—তুমি কলুন বাবা?—

অপু হাসিয়া বলে—কু-উ-উ-উ-উ—

খোকা আমোদ পাইয়া নিজে আবার করে—আবার বলে—তুমি কলুন? —বাড়ি ফিরিবার পথে বলে, খাবিছাক এনো বাবা—দিদিমা খাবিছাক আঁড়্বে —খাবিছাক ভালো—। সন্ধ্যাবেলা খোকা আরও কত গল্প করে। এখানকার চাঁদ গোল। মাসিমার বাড়ি একবার গিয়াছিল, সেখানকার চাঁদ ছোট্ট—এতটুকু! অতটুকু চাঁদ কেন বাবা? শীঘ্রই অপু দেখিল খোকা দুষ্টুও বড়। অপু পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুনিতেছে, খোকা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া সবাইকে বলে—দ্যাখ, কত তাকা!—আয় আয়—

পরে একটা টাকা তুলিয়া লইয়া বলে—এতা আমি কিছুতে দেবো না। —হাতে মুঠো বাঁধিয়া থাকে—আমি কাঁচের ভাঁতা কিন্‌বো—অপু ভাবে খোকাটা দুষ্টুও তো হয়েছে—না—দে—টাকা কি করবি?

—না কিছুতি দেবো না—হি-হি—ঘাড় দুলাইয়া হাসে।

অপুর টাকাটা হাত হইতে লইতে কষ্ট হয়—তবু লয়। একটা টাকার ওর কি দরকার? মিছামিছি নষ্ট।

কলিকাতা ফিরিবার সময়ে অপর্ণার মা বলিলেন—বাবা আমার মেয়ে গিয়েছে, যাক্—কিন্তু তোমার কষ্টই হয়েছে আমার বেশী! তোমাকে যে কি চোখে দেখেছিলাম বলতে পারি নে, তুমি যে এ-রকম পথে পথে বেড়াচ্ছ, এতে আমার বুক ফেটে যায়, তোমার মা বেঁচে থাকলে কি বিয়ে না করে পারতে?

খোকনের কথাটাও তো ভাবতে হবে, একটা বিয়ে কর বাবা।

নৌকায় আবার পীরপুরের ঘাটে আসা। অপর্ণার ছোট খুড়তুতো ভাই ননী তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিতেছিল।

খররৌদ্রে বড়দলের নোনাজল চক্-চক্ করিতেছে। মাঝ নদীতে একখানা বাদাম-তোলা মহাজনী নৌকা, দূরে বড়দলের মোহনার দিকে সুন্দরবনের ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সীমারেখা।

আশ্চর্য! এরই মধ্যে অপর্ণা যেন কত দূরের হইয়া গিয়াছে। অসীম জলরাশির প্রান্তের ওই অনতিস্পষ্ট বনরেখার মতই দূরের—অনেক দূরের।

অপুদের ডিঙিখানা দক্ষিণতীর ঘেঁষিয়া যাইতেছিল, নৌকার তলায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ লাগিতেছে, কোথাও একটা উঁচু ডাঙা, কোথাও পাড় ধ্বসিয়া নদীগর্ভে পড়িয়া যাওয়ায় কাশঝোপের শিকড়গুলা বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। একটা জায়গায় আসিয়া অপুর হঠাৎ মনে হইল, জায়গাটা সে চিনিতে পারিয়াছে—একটা ছোট খাল, ডাঙার উপরে একটা হিজল গাছ। এই খালটিতেই অনেকদিন আগে অপর্ণাকে কলিকাতা হইতে আনিবার সময়ে সে বলিয়াছিল—ও কলা-বৌ, ঘোমটা খোল, বাপের বাড়ির দ্যাশটা চেয়েই দ্যাখ—

তারপর স্টীমার চড়িয়া খুলনা, বাঁ দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিয়া লইল। ওই যে ছোট্ট খড়ের ঘরটি—প্রথম যেখানে সে ও অপর্ণা সংসার পাতে।

সেদিনকার সে অপূর্ব আনন্দমুহূর্তটিতে সে কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, এমন একদিন আসিবে, যেদিন শূন্যদৃষ্টিতে খড়ের ঘরখানার দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘটনাটা মনে হইবে মিথ্যা স্বপ্ন ?

নির্নিমেষ, উৎসুক, অবাক চোখে সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অপুর কেমন এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল—একবার ঘরখানার মধ্যে যাইতে, সব দেখিতে। হয়তো অপর্ণার হাতের উনুনের মাটির ঝিঁকটা এখনও আছে—আর যেখানে বসিয়া সে অপর্ণার হাতের জলখাবার খাইয়াছিল। প্রথম যেখানটিতে অপর্ণা ট্রাঙ্ক হইতে আয়না-চিরুনি বাহির করিয়া তাহার জন্য রাখিয়া দিয়াছিল···

ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারে বসিয়া থাকে। স্টেশনের পর স্টেশন আসে ও চলিয়া যায়, অপু শুধুই ভাবে বড়দলের তীর, চাঁদাকাটার বন, ভাঁটার জল কল্‌কল্ করিয়া নাবিয়া যাইতেছে,···একটি অসহায় ক্ষুদ্র শিশুর অবোধ

হাসি—অন্ধকার রাত্রে বিকীর্ণ জলরাশির ওপারে কোথায় দাঁড়াইয়া অপর্ণা যেন সেই মনসাপোতার বাড়ির পুরাতন দিনগুলির মত দুষ্টুমিভরা চোখে হাসিমুখে বলিতেছে—আর কক্ষনো যাবো না তোমার সঙ্গে। আর কক্ষনো না —দেখে নিও।

ফাল্গুন মাস। কলিকাতায় সুন্দর দক্ষিণ হাওয়া বহিতেছে, সকালে একটু শীতও, বোর্ডিংয়ের বারান্দাতে অপু বিছানা পাতিয়া শুইয়াছিল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়াই তাহার মনে হইল, আজ আর স্কুল নাই, টিউশনি নাই—আর বেলা দশটায় নাকে-মুখে গুঁজিয়া কোথাও ছুটিতে হইবে না—আজ সমস্ত সময়টা তাহার নিজের, তাহা লইয়া সে যাহা খুশি করিতে পারে—আজ সে মুক্ত !···মুক্ত !···মুক্ত !—আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না সে !···কথাটা ভাবিতেই সারা দেহ অপূর্ব উল্লাসে শিহরিয়া উঠিল—বাঁধন-ছেঁড়া মুক্তির উল্লাস! বহুকাল পর স্বাধীনতার আস্বাদন আজ পাওয়া গেল। ঐ আকাশের ক্রমবিলীয়মান নক্ষত্রটার মতই আজ সে দূর পথের পথিক—অজানার উদ্দেশে সে যাত্রার আরম্ভ হয়ত আজই হয়, কি কালই হয়!

পুলকিত মনে বিছানা হইতে উঠিয়া নাপিত ডাকাইয়া কামাইল, ফর্সা কাপড় পরিল। পুরাতন শৌখিনতা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠার দরুন দরজির দোকানে একটা মটকার পাঞ্জাবি তৈয়ারি করিতে দিয়াছিল, সেটা নিজে গিয়া লইয়া আসিল। ভাবিল—একবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখে আসি নূতন বই কি এসেছে, আবার কতদিনে কলকাতায় ফিরি, কে জানে? বৈকালে মিউজিয়মে রকফেলার ট্রাস্টের পক্ষ হইতে মশক ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল। অপুও গেল। বক্তৃতাটি সচিত্র। একটি ছবি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। মশকের জীবনেতিহাসের প্রথম পর্যায়ে সেটা থাকে কীট—তারপর হঠাৎ কীটের খোলস ছাড়িয়া সেটা পাখা গজাইয়া উড়িয়া যায়। ঠিক যে সময়ে কীটদেহটা অসাড় প্রাণহীন অবস্থায় জলের তলায় ডুবিয়া যাইতেছে—নব-কলেবরধারী মশকটা পাখা ছাড়িয়া জল হইতে শূন্যে উড়িয়া গেল।

মানুষের তো এমন হইতে পারে! জলের তলায় সন্তরণকারী অন্যান্য মশক কীটের চোখে তাদের সঙ্গী তো মরিয়াই গেল—তাদের চোখের সামনে

দেহটা তলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু জলের ঊর্ধ্বে যে জগতে মশক নবজন্ম লাভ করিল, এরা তো তার কোনও খবরই রাখে না, সে জগতে প্রবেশের অধিকার তখনও তারা তো অর্জন করে নাই—মৃত্যু দ্বারা, অন্ততঃ তাদের চোখে তা মৃত্যু, তার দ্বারা। এই মশক নিম্নস্তরের জীব, তার পক্ষে যা বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের পক্ষে তা কি মিথ্যা?

কথাটা সে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

যাইবার আগে একবার পরিচিত বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া পরদিন সকালে সে সেই কবিরাজ বন্ধুটির দোকানে গেল। দোকানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না, উড়িয়া ছোকরা-চাকরকে দিয়া খবর পাঠাইয়া পরে সে বাসার মধ্যে ঢুকিল।

সেই খোলার-বাড়ি—সেই বাড়িটাই আছে। সংকীর্ণ উঠানের একপাশে দুখানা বেলেপাথরের শিল পাতা। বন্ধুটি নোড়া দিয়া কি পিষিতেছে, পাশে বড় একখানা খবরের কাগজের উপর একরাশ ধূসর রংয়ের গুঁড়া। সারা উঠান জুড়িয়া কুলায়-ডালায় নানা শিকড়-বাকড় রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে।

বন্ধু হাসিয়া বলিল, এসো এসো. তারপর এতদিন কোথায় ছিলে? কিছু মনে করো না ভাই খারাপ হাত, মাজন তৈরি করছি—এই দ্যাখ না ছাপানো লেবেল—চন্দ্রমুখী মাজন, মহিলা হোম ইণ্ডাস্ট্রীয়্যাল সিণ্ডিকেট—আজকাল মেয়েদের নাম না দিলে পাবলিকের সিমপ্যাথি পাওয়া যায় না, তাই ঐ নাম দিয়েছি। ব'স ব'স—ওগো, বার হয়ে এসো না! অপূর্ব এসেছে, একটু চা-টা করো।

অপু হাসিয়া বলিল, সিণ্ডিকেটের সভ্য তো দেখছি আপাতত মোটে দুজন, তুমি আর তোমার স্ত্রী এবং খুব যে য়্যাকটিভ সভ্য তাও বুঝছি।

হাসিমুখে বন্ধু-পত্নী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অপুর মনে হইল, অন্য শিলখানাতে তিনিও কিছু পূর্বে মাজন-পেষা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার আসিবার সংবাদ পাইয়াই শিল ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে পলাইয়াছিলেন। হাতে-মুখের গুঁড়া ধুইয়া ফেলিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বাহির হইলেও মাথার এলোমেলো উড়ন্ত চুলে ও কপালের পাশের ঘামে সে কথা জানাইয়া দেয়।

বন্ধু বলিল—কি করি বল ভাই, দিনকাল যা পড়েছে, পাওনাদারের কাছে

দুবেলা অপমান হচ্ছি, ছোট আদালতে নালিশ ক'রে দোকানের ক্যাশবাক্স সীল ক'রে রেখেছে। দিন একটা টাকা খরচ—বাসায় কোন দিন খাওয়া হয়, কোন দিন—

বন্ধু-পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি ও-কাঁদুনি গেয়ো অন্য সময়। এখন উনি এলেন এতদিন পর, একটু চা খাবেন, ঠাণ্ডা হবেন তা না তোমার কাঁদুনি শুরু হ'ল।

—আহা, আমি কি পথের লোককে ধরে বলতে যাই? ও আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, ওদের কাছে দুঃখের কথাটা বললেও—ইয়ে,পাতা চায়ের প্যাকেট একটা খুলে নাও না? আটা আছে নাকি? আর দ্যাখ, না হয় ওকে খানচারেক রুটি অন্তত—

—আচ্ছা, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। পরে অপুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—আপনি সেই বিজয়া দশমীর পর আর একদিনও এলেন না যে বড়?

চা ও পরোটা খাইতে খাইতে অপু নিজের কথা সব বলিল—শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছে, সে কথাটাও বলিল। বন্ধু বলিল, তবেই দ্যাখ ভাই, তবু তুমি একা আর আমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই কলকাতা শহরের মধ্যে আজ পাঁচ পাঁচটি বছর যে কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি তা আর—এই সব নিয়ে একরকম চালাই, পয়সা-প্যাকেট চা আছে, খদিরাদি মোদক আছে। মাজনের লাভ মন্দ না, কিন্তু কি জান, এই কৌটোটা পড়ে যায় দেড় পয়সার ওপর, মাজনে, লেবেলে, ক্যাপসুলে তাও প্রায় দু'পয়সা—তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি করব, স্বামী-স্ত্রীতে খাটি কিন্তু মজুরী পোষায় কই? তবুও তো দোকানীর কমিশন ধরি নি হিসেবের মধ্যে। এদিকে চার পয়সার বেশী দাম করলে কম্‌পিট করতে পারব না।

খানিক পরে বন্ধু বলিল—ওহে তোমার বৌঠাকরুণ বলছেন, আমাদের তো একটা খাওয়া পাওনা আছে, এবার সেটা হয়ে যাক্ না কেন? বেশ একটা ফেয়ারওয়েল ফিস্ট হয়ে যাবে এখন, তবে উল্‌টো, এই যা—

অপু মনে মনে ভারী কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল বন্ধু-পত্নীর প্রতি। ইহাদের মলিন বেশ ও ছেলেমেয়েগুলির শীর্ণ চেহারা হইতে ইহাদের ইতিহাস সে ভালই বুঝিয়াছিল। কিছু ভালো খাবার আনাইয়া খাওয়ানো একটু আমোদ আহলাদ করা—কিন্তু হয়ত সেটা দরিদ্র সংসারে সাহায্যের মত দেখাইবে। যদি ইহারা না লয় বা মনে কিছু ভাবে? ও-পক্ষ হইতে প্রস্তাবটা আসাতে সে ভারী খুশী হইল।

ভোজের আয়োজনে ছ-সাত টাকা ব্যয় করিয়া অপু বন্ধুর সঙ্গে ঘুরিয়া বাজার করিল। কই-মাছ, গলদা-চিংড়ি, ডিম, আলু, ছানা, দই, সন্দেশ।

হয়তো খুব বড় ধরণের কিছু ভোজ নয়, কিন্তু বন্ধু-পত্নীর আদরে হাসিমুখে তাহা এত মধুর হইয়া উঠিল। এমন কি এক সময়ে অপুর মনে হইল আসলে তাহাকে খাওয়ানোর জন্যই বন্ধু-পত্নীর এ ছল। লোকে ইষ্টদেবতাকেও এত যত্ন করে না বোধ হয়। পিছনে সব সময় বন্ধুর বৌটি পাখা হাতে বসিয়া তাহাদের বাতাস করিতেছিলেন, অপু হাত উঠাইতেই হাসিমুখে বলিলেন—ও হবে না, আপনি আর একটু ছানার ডালনা নিন—ও কি, মোচার চপ পাতে রাখলেন কার জন্যে? সে শুনব না—

এই সময় একটি পনেরো-ষোল বছরের ছেলে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধু বলিল—এসো, এসো কুঞ্জ, এসো বাবা, এইটি আমার শালীর ছেলে, বাগবাজারে থাকে। আমার সে ভায়েরা-ভাই মারা গেছে গত শ্রাবণ মাসে। পাটের প্রেসে কাজ করত, গঙ্গার ঘাটে রেললাইন পেরিয়ে আসতে হয়। তা রোজই আসে, সেদিন একখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তা ভাবলে, আবার অতখানি ঘুরে যাবে? যেমন গাড়ির তলা দিয়ে গলে আসতে গিয়েছে আর অমনি গাড়িখানা দিয়েছে ছেড়ে। তারপর চাকায় কেটে-কুটে একেবারে আর কি—দু'টি মেয়ে, আমার শালী আর এই ছেলেটি, একরকম ক'রে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে চলছে। উপায় কি?···তাই আজ ভাল খাওয়াটা আছে, কাল স্ত্রী বললে, যাও কুঞ্জকে বলে এসো—ওরে বসে যা বাবা, থালা না থাকে পাতা একখানা পেতে। হাত-মুখটা ধুয়ে আয় বাবা—এত দেরি ক'রে ফেললি কেন?

বেলা বেশী ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। অপু বলিল, আচ্ছা, আজ উঠি ভাই, বেশ আনন্দ হ'ল আজ অনেকদিন পরে—

বন্ধু বলিল, ওগো, অপূর্বকে আলোটা ধরে গলির মুখটা পার ক'রে দাও তো? আমি আর উঠতে পারি নে—

একটা ছোট্ট কেরোসিনের টেমি হাতে বৌটি অপুর পিছনে পিছনে চলিল।

অপু বলিল, থাক, বৌ-ঠাকরুণ, আর এগোবেন না, এমন আর কি অন্ধকার, যান আপনি—

—আবার কবে আসবেন?

—ঠিক নেই, এখন একটা লম্বা পাড়ি তো দি—

—কেন, একটা বিয়ে-থা করুন না? পথে পথে সন্ন্যাসী হয়ে এ রকম বেড়ানো কি ভাল? মাও তো নেই শুনেছি। কবে যাবেন আপনি?···যাবার আগে একবার আসবেন না, যদি পারেন।

—তা হয়ে উঠবে না বৌ-ঠাকরুণ। ফিরি যদি আবার তখন বরং—আচ্ছা নমস্কার।

বৌটি টেমি হাতে গলির মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সে সকালে উঠিয়া ভাবিয়া দেখিল, হাতের পয়সা নানারকমে উড়িয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন দেরি করিলে যাওয়াই হইবে না। এখানেই আবার চাকরির উমেদার হইয়া দোরে দোরে ঘুরিতে ইহবে। কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কিছু ঠিক হইল না। একবার মনে হয় এটা ভাল, আবার মনে হয় ওটা ভাল। অবশেষে স্থির করিল স্টেশনে গিয়া সম্মুখে যাহা পাওয়া যাবে, তাহাতেই উঠা যাইবে। জিনিস-পত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া হাওড়া স্টেশনে গিয়া দেখিল, আর মিনিট পনেরো পরে চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম হইতে গয়া প্যাসেঞ্জার ছাড়িতেছে। একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়া সোজা ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারের একটা জায়গায় সে নিজের বিছানাটি পাতিয়া বসিল।

অপু কি জানিত এই যাত্রা তাহাকে কোন্ পথে চালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে? এই চারটা বিশ মিনিটের গয়া প্যাসেঞ্জার—পরবর্তী জীবনে সে কতবার ভাবিয়াছে যে সে তো পাঁজি দেখিয়া যাত্রা শুরু করে নাই, কিন্তু কোন্ মহাশুভ মাহেন্দ্রক্ষণে সে হাওড়া স্টেশনে থার্ড ক্লাস টিকিট ঘরের ঘুলঘুলিতে ফিরিঙ্গি মেয়ের কাছে গিয়া একখানা টিকিট চাহিয়াছিল—দশ টাকার একখানা নোট দিয়া সাড়ে পাঁচ টাকা ফেরত পাইয়াছিল। মানুষ যদি তাহার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত!

অপু বর্তমানে এসব কিছুই ভাবিতেছিল না। এত বয়স হইল, কখনও সে গ্র্যান্ডকর্ড লাইনে বেড়ায় নাই, সেই ছোটবেলায় দুটিবার ছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলেও আর কখনও চড়ে নাই, রেলে চড়িয়া দূরদেশে যাওয়ার আনন্দে সে ছেলে-মানুষের মতই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাস্তার ধারে গাছপালা ক্রমশঃ কিরূপ বদলাইয়া যায়, লক্ষ্য করিবার ইচ্ছা

অনেকদিন হইতে তাহার আছে, বর্ধমান পর্যন্ত দেখিতে দেখিতে গেল কিন্তু পরেই অন্ধকারে আর দেখা গেল না।

পরদিন বৈকালে গয়ায় নামিয়া সে বিষ্ণুপাদমন্দিরে পিণ্ড দিল। ভাবিল, আমি এসব মানি বা না মানি, কিন্তু সবটুকু তো জানি নে? যদি কিছু থাকে, বাপমায়ের উপকারে লাগে! পিণ্ড দিবার সময় ভাবিয়া ভাবিয়া ছেলেবেলায় বা পরে যে যেখানে মারা গিয়াছে বলিয়া জানা ছিল, তাহাদের সকলেরই উদ্দেশে পিণ্ড দিল। এমন কি, পিসিমা ইন্দির ঠাকরুণকে সে মনে করিতে না পারিলেও দিদির মুখে শুনিয়াছে, তাঁর উদ্দেশে—আতুরী ডাইনী বুড়ির উদ্দেশেও।

বৈকালে বুদ্ধগয়া দেখিতে গেল। অপুর যদি কাহারও উপর শ্রদ্ধা থাকে তবে তাহার আবাল্য শ্রদ্ধা এই সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর। ছেলের নাম তাই সে রাখিয়াছে অমিতাভ।

বামে ক্ষীণস্রোতা ফল্গু কটা রংয়ের বালুশয্যায় ক্লান্তদেহ এলাইয়া দিয়াছে, ওপারে হাজারিবাগ জেলার সীমান্তবর্তী পাহাড়শ্রেণী, সারাপথে ভারী সুন্দর ছায়া, গাছপালা, পাখির ডাক, ঠিক যেন বাংলাদেশ। সোজা বাঁধানো রাস্তাটি ফল্গুর ধারে ধারে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় চলিয়াছে, সারাপথ অপু স্বপ্নাভিভূতের মত একার উপর বসিয়া রহিল। একজন হালফ্যাশানের কাপড়-পরা তরুণী মহিলা ও সম্ভবত তাঁহার স্বামী মোটরে বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিতেছেন, অপু ভাবিল হাজার হাজার বছর পরেও এ কোন্ নূতন যুগের ছেলেমেয়ে প্রাচীনকালের সেই পীঠস্থানটি এমন সাগ্রহে দেখিতে আসিয়াছিল? মনে পড়ে সেই অপূর্ব রাত্রি, নবজাত শিশুর চাঁদমুখ···ছন্দক···গয়ার জঙ্গলে দিনের পর দিন সে কি কঠোর তপস্যা। কিন্তু এ মোটর গাড়ি? শতাব্দীর ঘন অরণ্য পার হইয়া এমন একদিন নামিয়াছে পৃথিবীতে পুরাতনের সবই চূর্ণ করিয়া, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নবযুগের পত্তন করিয়াছে। রাজা শুদ্ধোদনের কপিলাবস্তুও মহাকালের স্রোতের মুখে ফেনার ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কোন চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই—কিন্তু তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র দিকে দিকে যে বৃহত্তর কপিলাবস্তুর অদৃশ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার প্রভুত্বের নিকট এই আড়াই হাজার বৎসর পরেও কে না

মাথা নত করিবে ?

গয়া হইতে পর দিন সে দিল্লী এক্সপ্রেসে চাপিল—একেবারে দিল্লীর টিকিট কাটিয়া। পাশের বেঞ্চিতেই একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিলেন। কথায় কথায় ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল। গাড়িতে আর কোন বাঙালী নাই, কথাবার্তার সঙ্গী পাইয়া তিনি খুব খুশী। অপুর কিন্তু বেশী কথাবার্তা ভাল লাগিতেছিল না। এরা এ-সময় এত বক-বক করে কেন? মারোয়াড়ী দুটি তো সাসারাম হইতে নিজেদের মধ্যে বকুনি শুরু করিয়াছে, মুখের আর বিরাম নাই।

খুশীভরা, উৎসুক, ব্যগ্র মনে সে প্রত্যেক পাথরের নুড়িটি, গাছপালাটি লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিল। বামদিকের পাহাড়শ্রেণীর পেছনে সূর্য অস্ত গেল, সারাদিন আকাশটা লাল হইয়া আছে, আনন্দের আবেগে সে দ্রুতগামী গাড়ির দরজা খুলিয়া দরজার হাতল ধরিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, উঁহু, পড়ে যাবেন, পাদানিতে সিপ করলেই—বন্ধ করুন মশাই।

অপু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগে কিন্তু, মনে হয় যেন উড়ে যাচ্ছি।

গাছপালা, খাল, নদী, পাহাড়, কাঁকর-ভরা জমি, গোটা শাহাবাদ জেলাটা তাহার পায়ের তলা দিয়া পলাইতেছে। অনেক দূর পর্যন্ত শোণ নদের বালুর চড়া জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাইতেছে। নীলনদ ? ঠিক এটা যেন নীলনদ। ওপারে সাত-আট মাইল গাধার পিঠে চড়িয়া গেলে ফ্যারাও রামেসিসের তৈরি আবু সিম্বেলের বিরাট পাষাণ মন্দির—ধূসর অস্পষ্ট কুয়াসায় ঘেরা মরুভূমির মধ্যে অতীতকালের বিস্মৃত দেবদেবীর মন্দির, এপিস, আইসিস, হোরাস, হাথর, রা—নীলনদ যেমন গতির মুখে উপলখণ্ড পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া চলে—মহাকালের বিরাট রথচক্র তাণ্ডব নৃত্যচ্ছন্দে সব স্থাবর অস্থাবর জিনিসকে পিছু ফেলিয়া মহাবেগে চলিবার সময় এই বিরাট গ্র্যানাইট মন্দিরকে পথের পাশে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, জনহীন মরুভূমির মধ্যে বিস্মৃত সভ্যতার চিহ্ন—মন্দিরটা কোন বিস্মৃত ও বাতিল দেবদেবীর উদ্দেশে গঠিত ও উৎসর্গীকৃত।

একটু রাত্রে ভদ্রলোকটি বলিলেন, এ লাইনে ভাল খাবার পাবেন না, আমার সঙ্গে খাবার আছে, আসুন খাওয়া যাক।

তাঁহার স্ত্রী কলার পাতা চিরিয়া সকলকে বেঞ্চির উপর পাতিয়া দিলেন—লুচি, হালুয়া ও সন্দেশ,—সকলকে পরিবেশন করিলেন। ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি খানকতক বেশী লুচি নিন, আমরা তো আজ মোগলসরাইয়ে ব্রেকজার্নি

করব, আপনি তো সোজা দিল্লী চলেছেন।

এ-ও অপুর এক অভিজ্ঞতা। পথে বাহির হইলে এত শীঘ্রও এমন ঘনিষ্ঠতা হয়! এক গলির মধ্যে শহরে শত বর্ষ বাস করিলেও তো তাহা হয় না? ভদ্রলোকটি নিজের পরিচয় দিলেন, নাগপুরের কাছে কোন গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ফরেস্টে কাজ করেন, ছুটি লইয়া কালীঘাটে শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিলেন, ছুটি অন্তে কর্মস্থানে চলিয়াছেন। অপুকে ঠিকানা দিলেন। বার বার অনুরোধ করিলেন, সে যেন দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে একবার অতি অবশ্য অবশ্য যায়, বাঙালীর মুখ মোটে দেখিতে পান না—অপু গেলে তাঁহারা তো কথা কহিয়া বাঁচেন। মোগলসরাই-এ গাড়ি দাঁড়াইল। অপু মালপত্র নামাইতে সাহায্য করিল। হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বৌ-ঠাকরুণ, নমস্কার, শীগ্‌গিরই আপনাদের ওখানে উপদ্রব করছি কিন্তু।

দিল্লীতে ট্রেন পেঁছাইল রাত্রি সাড়ে এগারোটায়।

গাজিয়াবাদ স্টেশন হইতেই সে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া দেখিল যে দিল্লীতে গাড়ি আসিতেছিল তাহা এস. কপুর কোম্পানীর দিল্লী নয়, লেজিস্‌লেটিভ য়্যাসেম্‌ব্লীর মেম্বারদের দিল্লী নয়, এসিয়াটিক পেট্রোলিয়মের এজেণ্টের দিল্লী নয়—সে দিল্লী সম্পূর্ণ ভিন্ন—বহুকালের বহুযুগের নরনারীদের মহাভারত হইতে শুরু করিয়া রাজসিংহ ও মাধবীকঙ্কণ,—সমুদয় কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কল্পনা ও ইতিহাসের মালমসলায় তাহার প্রতি ইটখানা তৈরি, তার প্রতি ধূলিকণা অপুর মনের রোমান্সে সকল নায়ক-নায়িকার পুণ্য-পাদপূত—ভীষ্ম হইতে আওরঙ্গজেব ও সদাশিব রাও পর্যন্ত—গান্ধারী হইতে যাহানারা পর্যন্ত—সাধারণ দিল্লী হইতে সে দিল্লীর দূরত্ব অনেক।—দিল্লী হনোজ দূর অস্ত্, বহুদূর—বহুশতাব্দীর দূর পারে, সে দিল্লী কেহ দেখে নাই।

আজ নয়, মনে হয় শৈশবে মায়ের মুখে মহাভারত শোনার দিন হইতে ছিরের পুকুরের ধারের বাঁশবনের ছায়ায় কাঁচা শেওড়ার ডাল পাতিয়া 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' পড়িবার দিনগুলি হইতে, সকল ইতিহাস, যাত্রা, থিয়েটার, কত গল্প, কত কবিতা, এই দিল্লী, আগ্রা, সমগ্র রাজপুতানা ও আর্যাবর্ত—তাহার মনে এক অতি অপরূপ, অভিনব, স্বপ্নময় আসন অধিকার করিয়া আছে—অন্য কাহারও মনে সে রকম আছে কিনা সেটা প্রশ্ন নয়, তাহার মনে আছে এইটাই বড় কথা।

কিন্তু বাহিরে ঘন অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না—অনেকক্ষণ চাহিয়া কেবল কতকগুলা সিগন্যালের বাতি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না. একটা প্রকাণ্ড ইয়ার্ড কেবিন, লেখা আছে 'দিল্লী জংসন ইস্ট'—একটা গ্যাসোলিনের ট্যাঙ্ক—তাহার পরই চারিদিকে আলোকিত প্ল্যাটফর্ম—প্রকাণ্ড দোতলা স্টেশন—সেই পিয়ার্স সোপ, কিটিংস পাউডার, হল্‌স্‌ ডিস্‌টেম্পার. লিপটনের চা। আবদুল আজিজ হাকিমের রোশনেসেকাৎ. উৎকৃষ্ট দাদের মলম।

নিজের ছোট ক্যান্‌ভাসের সুটকেস ও ছোট বিছানাটা হাতে লইয়া অপু স্টেশনে নামিল—রাত অনেক, শহর সম্পূর্ণ অপরিচিত, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ওয়েটিংরুম দোতলায়, রাত্রি সেখানে কাটানোই নিরাপদ মনে হইল।

সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র স্টেশনে জমা দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অর্ধমাইল-ব্যাপী দীর্ঘ শোভাযাত্রা করিয়া সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সোনার হাওদায় কোন শাহাজাদী নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছেন কি? দুধারে আবেদনকারী ও ওমরাহ্‌ দল আভূমি তসলীম্‌ করিয়া অনুগ্রহভিক্ষার অপেক্ষায় করজোড়ে খাড়া আছে কি? নব আগন্তুক নরেন্দ্রনাথ পাৎশাবেগমের কোন্‌ সরাইখানায় ধূম-পানরত বৃদ্ধ পারস্যদেশীয় শেখের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

কিন্তু এ যে একেবারে কলকাতার মতই সব! এমন কি মণিলাল জুয়েলার্সের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। দুজন লোক কলিকাতা হইতে বেড়াইতে আসিয়াছিল, টাঙা-ভাড়া সস্তা পড়িবে বলিয়া তাহাকে তাহার সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিল। কুতবের পথে একজন বলিল, মশাই, আরও বার-দুই দিল্লী এসেছি, কুতবের মুরগীর কাটলেট —আঃ, সে যা জিনিস, খান নি কখনও, না? চলুন, এক ডজন কাটলেট অর্ডার দিয়ে তবে উঠব কুতবমিনারে।

বাল্যকালে দেওয়ানপুরে পড়িবার সময় পুরনো দিল্লীর কথা পড়িয়া তাহার কল্পনা করিতে গিয়া বার বার স্কুলের পাশের একটা পুরাতন ইটখোলার ছবি অপুর মনে উদয় হইত, আজ অপু দেখিল পুরাতন দিল্লী বাল্যের সে ইটের পাজাটা নয়। কুতবমিনার নতুন দিল্লী শহর হইতে যে এতদূর তাহা সে ভাবে নাই। তদুপরি সে দেখিয়া বিস্মিত হইল, এই দীর্ঘ পথের দুধারে মরুভূমির মত অনুর্বর কাঁটাগাছ ও ফণিমনসার ঝোপে ভরা রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের এখানে-ওখানে সর্বত্র ভাঙা বাড়ি, মিনার-মসজিদ, কবর, খিলান, দেওয়াল। সাতটা প্রাচীন মৃত রাজধানীর মূক কঙ্কাল পথের দুধারে উঁচুনিচু জমিতে বাবলাগাছ ও ক্যাক্‌টাস গাছের ঝোপ-ঝাপের আড়ালে হৃতগৌরব নিস্তব্ধতায় আত্মগোপন

করিয়া আছে—পৃথ্বীরায় পিথোরার দিল্লী; লালকোট. দাসবংশের দিল্লী, তোগলকদের দিল্লী,আলাউদ্দীন খিলজীর দিল্লী,শিরি ও জাহানপনাহ্, মোগলদের দিল্লী। অপু জীবনে এ রকম দৃশ্য দেখে নাই, কখনো কল্পনাও করে নাই. সে অবাক হইল, অভিভূত হইল. নীরব হইয়া গেল, গাইড-বুক উল্টাইতে ভুলিয়া গেল, ম্যাপের নম্বর মিলাইয়া দেখিতে ভুলিয়া গেল—মহাকালের এই বিরাট শোভাযাত্রা একটার পর একটা বায়োস্কোপের ছবির মত চলিয়া যাইবার দৃশ্যে সে যেন সম্বিৎহারা হইয়া পড়িল। আরও বিশেষ হইল এইজন্য যে, মন তাহার নবীন আছে। কখনও কিছু দেখে নাই, চিরকাল আঁস্তাকুড়ের আবর্জনায় কাটাইয়াছে অথচ মন হইয়া উঠিয়াছে সর্বগ্রাসী, বুভুক্ষু। তাই সে যাহা দেখিতেছিল. তাহা যেন বাহিরের চোখটা দিয়া নয়. সে কোন তীক্ষ্ণদর্শী তৃতীয় নেত্র, যেন না খুলিলে বাহিরের চোখের দেখাটা নিষ্ফল হইয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে দুপুরের পর সে গেল কুতব হইতে অনেক দূরে গিয়াসউদ্দিন তোগলকের অসমাপ্ত নগর—তোগলকাবাদে। গ্রীষ্ম দুপুরের খররৌদ্রে তখন চারিধারের ঊষরভূমি আগুন-রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে তোগলকাবাদ দেখিয়া মনে হইল যেন কোন দৈত্যের হাতে গাঁথা এক বিরাট পাষাণ-দুর্গ! তৃণ-বিরল ঊষরভূমি, পত্রহীন বাবলা ও কণ্টকময় ক্যাক্টাসের পটভূমিতে খররৌদ্রে সে যেন এক বর্বর-অসুরবীর্য সুউচ্চ পাষাণ দুর্গপ্রাচীর হইতে সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, মালব, পাঞ্জাব,—সারা আর্যাবর্তকে ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রচেষ্টা নাই বটে. নিষ্ঠুর বটে. রুক্ষ বটে, কিন্তু সবটা মিলিয়া এমন বিশালতার সৌন্দর্য, পৌরুষের সৌন্দর্য. বর্বরতার সৌন্দর্য—যা মনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে. হৃদয়কে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরে। সব আছে. কিন্তু দেহে প্রাণ নাই, চারিধারে ধ্বংসস্তূপ, কাঁটাগাছ, বিশৃঙ্খলতা, বড় বড় পাথর গড়াইয়া উঠিবার পথ বুজাইয়া রাখিয়াছে—মৃতমুখের ভ্রূকুটি মাত্র।

সাধু নিজামউদ্দীনের অভিশাপ মনে পড়িল—ইয়ে বাসে গুজর, ইয়ে রাহে গুজর—

পৃথ্বীরায়ের দুর্গের চবুতরার উপর যখন সে দাঁড়াইয়া—হি-হি. কি মুশকিল. কি অদ্ভুতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের সেই বনের ধারের ছিরে পুকুরটা এ দুর্গের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে, বাল্যে তাহারই ধারের শেওড়াবনে বসিয়া 'জীবন-প্রভাত' পড়িতে পড়িতে কতবার কল্পনা করিত, পৃথ্বীরায়ের দুর্গ ছিরে পুকুরের উঁচু ও-দিকের পাড়াটার মত বুঝি!...এখনও ছবিটা দেখিতে পাইতেছে—কতকগুলি

গুগুলি শামুক, ও-পারের বাঁশঝাড়। যাক্, চবুতরার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দূরে পশ্চিম আকাশের চারিধারের মহাশ্মশানের উপর ধূসর ছায়া ফেলিয়া সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী আকাশের পটে আগুনের অক্ষরে লিখিয়া সূর্য অস্ত গেল। সে সব অতি পবিত্র, গোপনীয় মুহূর্তে অপুর জীবনে—দেবতারা তখন কানে কানে কথা বলেন, তাহার জীবনে এরূপ সূর্যাস্ত আর কটা বা আসিয়াছে? ভয় ও বিস্ময় দুই-ই হইল, সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল, কি অপূর্ব অনুভূতি! জীবনের চক্রবালনেমি এতদিন যে কত ছোট, অপরিসর ছিল, আজকার দিনটির অপু তাহা জানিত না।

নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মসজিদ প্রাঙ্গণে সম্রাট-দুহিতা জাহানারার তৃণাবৃত পবিত্র কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মসজিদ দ্বারে ক্রীত দু-চার পয়সার গোলাপফুল ছড়াইতে ছড়াইতে অপুর অশ্রু বাধা মানিল না। ঐশ্বর্যের মধ্যে, ক্ষমতার দম্ভের মধ্যে লালিত হইয়াও পুণ্যবতী শাহাজাদীর এ দীনতা, ভাবুকতা, তাহার কল্পনাকে মুগ্ধ রাখিয়াছে চিরদিন। এখনও যেন বিশ্বাস হয় না যে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেটা সত্যই জাহানারার কবর-ভূমি। পরে সে মসজিদ হইতে একজন প্রৌঢ় মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া কবরের শিরোদেশের মার্বেল ফলকের সেই বিখ্যাত ফার্সী কবিতাটি দেখাইয়া বলিল, মেহেরবানি করকে পড়িয়ে, হাম লিখ লেঙ্গে।

প্রৌঢ়টি কিঞ্চিৎ বকশিশের লোভে খামখেয়ালী বাঙালীবাবুটিকে খুশী করার জন্য জোরে জোরে পড়িল—

বিজুস গ্যাহ্ কসে ন-পোশদ্ মজার-ই-মা-রা।
কি কবরপোষ্-ই-গরীবান্ হামিন্ গীগ্যাহ্ বস অস্ত্।

পরে সে কবি আমীর খসরুর কবরের উপরও ফুল ছড়াইল।

পরদিন বৈকালে শাহ্‌জাহানের লাল পাথরের কেল্লা দেখিতে গিয়া অপরাহ্নের ধূসর ছায়ায় দেওয়ান-ই-খাসের পাশের খোলা ছাদে একখানা পাথরের বেঞ্চিতে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। মনে হইল এসব স্থানের জীবনধারার কাহিনী কেহ লিখিতে পারে নাই। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে কবিতায় যাহা পড়িয়াছে, সে সবটাই কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সে জেব্‌উন্নিসা, সে উদিপুরী বেগম, সে মমতাজমহল, সে জাহানারা—আবাল্য যাহাদের সঙ্গে পরিচয়, সবগুলিই কল্পনা-সৃষ্ট প্রাণী, বাস্তবজগতের মমতাজ বেগম, উদিপুরী, জেবউন্নিসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক! কে জানে এখানকার সে সব রহস্যভরা ইতিহাস? মূক

কণা তাহার সাক্ষী আছে, গৃহভিত্তির প্রতি পাষাণ খণ্ড তার সাক্ষী আছে, কিন্তু তাহারা তো কথা বলিতে পারে না!

তিনদিন পর সে বৈকালের দিকে কাট্‌নী লাইনের একটা ছোট্ট স্টেশনে নিজের বিছানা ও সুটকেসটা লইয়া নামিয়া পড়িল। হাতে পয়সা বেশী ছিল না বলিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এলাহাবাদ আসিতে বাধ্য হয়—তাই এত দেরি। কয়দিন স্নান নাই, চুল রুক্ষ উস্ক-খুস্ক—জোর পশ্চিমা বাতাসে ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছে।

ট্রেন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র স্টেশন, সম্মুখে একটা ছোট পাহাড়। দোকান-বাজারও চোখে পড়িল না।

স্টেশনের বাহিরের বাঁধানো চাতালে একটু নির্জন স্থানে সে বিছানার বাণ্ডিলটা খুলিয়া পাতিল। কিছুই ঠিক নাই, কোথায় যাইবে, কোথায় শুইবে, মনে এক অপূর্ব অজানা আনন্দ।

সতরঞ্চির উপর বসিয়া সে খাতা খুলিয়া খানিকটা লিখিল, পরে একটা সিগারেট খাইয়া সুটকেসটা ঠেস দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। টোকা মাথায় একজন গোঁড় যুবককে কাঁচা শালপাতার পাইপ খাইতে খাইতে কৌতূহলী চোখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অপু বলিল, উমেরিয়া হিয়াসে কেত্তা দূর হোগা?

প্রথমবার লোকটা কথা বুঝিল না। দ্বিতীয়বারে ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিল, তিশ মীল্।

ত্রিশ মাইল রাস্তা! এখন সে যায় কিসে? মহামুশকিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ত্রিশ মাইল পথের দুধারে শুধু বন আর পাহাড়। কথাটা শুনিয়া অপুর ভারি আনন্দ হইল। বন. 'ব রকম বন খুব ঘন? বাঘ পর্যন্ত আছে। বাঃ—কিন্তু এখন কি করিয়া যাওয়া যায়?

কথায় কথায় গোঁড় লোকটি বলিল, তিন টাকা পাইলে সে নিজের ঘোড়াটা ভাড়া দিতে রাজী আছে।

অপু রাজী হইয়া ঘোড়া আনিতে বলাতে লোকটা বিস্মিত হইল। আর বেলা কতটুকু আছে, এখন কি জঙ্গলের পথে যাওয়া যায়? অপু নাছোড়বান্দা। সামনের এই সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে জঙ্গলের পথে ঘোড়ায় চাপিয়া যাওয়ার একটা দুর্দমনীয় লোভ তাহাকে পাইয়া বসিল—জীবনে এ সুযোগ কটা আসে,

এ কি ছাড়া যায় ?

গোঁড় লোকটি জানাইল, আরও একটাকা খোরাকি পাইলে সে তল্পি বহিতে রাজী আছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইল—পিছনে মোট-মাথায় লোকটা।

স্নিগ্ধ রাত্রি—স্টেশন হইতে অল্পদূরে একটা বস্তি, একটা পাহাড়ী নালা, বাঁক ঘুরিয়াই পথটা শাল-বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল! চারিধারে জোনাকি পোকা জ্বলিতেছে—রাত্রির অপূর্ব নিস্তব্ধতা, ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো শাল-পলাশের পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাটির উপর যেন আলো-আঁধারের বুটি-কাটা জাল বুনিয়া দিয়াছে। অপু পাহাড়ী লোকটার নিকট হইতে একটা শালপাতার পাইপ ও সে-দেশী তামাক চাহিয়া লইয়া ধরাইল বটে, কিন্তু দু'টান দিতেই মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—শালপাতার পাইপটা ফেলিয়া দিল।

বন সত্যই ঘন—পথ আঁকা বাঁকা, ছোট ঝরণা এখানে-ওখানে, উপল বিছানো পাহাড়ী নদীর তীরে ছোট ফার্নের ঝোপ, কি ফুলের সুবাস, রাত্রিচর পাখির ডাক। নির্জনতা, গভীর নির্জনতা!

মাঝে-মাঝে সে ঘোড়াকে ছুটাইয়া দেয়, ঘোড়া-চড়া অভ্যাস তাহার অনেকদিন হইতে আছে। বাল্যকালে মাঠের ছুটা ঘোড়া ধরিয়া কত চড়িয়াছে, চাঁপদানীতেও ডাক্তারবাবুটির ঘোড়ায় প্রায় প্রতিদিনই চড়িত।

সারারাত্রি চলিয়া সকাল সাড়ে সাতটায় উমেরিয়া পেঁছিল। একটা ছোট গ্রাম,—পোস্টাফিস, ছোট বাজার ও কয়েকটা গালার আড়ত। ফরেস্ট রেঞ্জার ভদ্রলোকটির নাম অবনীমোহন বসু। তিনি তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—আসুন, আসুন, আপনি পত্র দিলেন না, কিছু না, ভাবলুম বোধ হয় এখনও আসবার দেরি আছে—এতটা পথ এলেন রাতারাতি? ভয়ানক লোক তো আপনি!

পথেই একটা ছোট নদীর জলে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সে ফিট্‌ফাট হইয়া আসিয়াছে। তখনই চা খাবারের বন্দোবস্ত হইল। অপু লোকটিকে নিজের মনিব্যাগ শূন্য করিয়া চার টাকা দিয়া বিদায় দিল।

দুপুরের আহারের সময় অবনীবাবুর স্ত্রী দুজনকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। অপু হাসিমুখে বলিল, এখানে আপনাদের জ্বালাতন করতে এলুম বৌঠাকরুণ!

অবনীবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, না এলে দুঃখিত হতাম—আমরা কিন্তু

জানি আপনি আসবেন। কাল ওঁকে বলছিলাম আপনার আসবার কথা, এমন কি আপনার থাকবার জন্যে সাহেবের বাংলোটা ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে রাখার কথাও হ'ল—ওটা এখন খালি পড়ে আছে কিনা।

—এখানে আর কোন বাঙালী কি অন্য কোন দেশের শিক্ষিত লোক নিকটে নেই?

অবনীবাবু বলিলেন, আমার এক বন্ধু খুরিয়ার পাহাড়ে তামার খনির জন্যে প্রস্পেক্টিং করছেন—মিঃ রায়চৌধুরী, জিওলজিস্ট, বিলেতে ছিলেন অনেক-দিন—তিনি ঐখানে তাঁবুতে আছেন—মাঝে মাঝে তিনি আসেন।

অল্প দিনেই ইঁহাদের সঙ্গে কেমন একটা সহজ মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল—যাহা কেবল এই সব স্থানে, এই সব অবস্থাতেই সম্ভব, কৃত্রিম সামাজিকতার ফুর্মাক এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক বন্ধুত্বের দাবিকে ঘাড় গুঁজিয়া থাকিতে বাধ্য করে না বলিয়াই। একদিন বসিয়া বসিয়া সে খেয়ালের বশে কাগজে একটা কথকতার পালা লিখিয়া ফেলিল। সেদিন সকালে চা খাইবার সময় বলিল, দিদি, আজ ও-বেলা আপনাদের একটা নতুন জিনিস শোনাব।

অবনীবাবুর স্ত্রীকে সে দিদি বলিতে শুরু করিয়াছে। তিনি সাগ্রহে বলিলেন, কি, কি বলুন না? আপনি গান জানেন—না? আমি অনেকদিন ওঁকে বলেছি আপনি গান জানেন।

— গানও গাইব, কিন্তু একটা কথকতার পালা শোনাব, আমার বাবার মুখে শোনা জড়ভরতের উপাখ্যান।

দিদির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া স্বামীকে কহিলেন দেখ্‌লে গো—দ্যাখ। বলি নি আমি, গলার স্বর অমন, নিশ্চয়ই গান জানেন—খাট্‌ল না কথা?

দুপুরবেলা দিদি তাহাকে তাস খেলার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করিলেন।

—লেখা এখন থাক্‌। তাস জোড়াটা না খেলে খেলে পোকায় কেটে দিলে—এখানে খেলার লোক মেলে না—যখন ও'র বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসেন তখন মাঝে মাঝে খেলা হয়—আসুন আপনি। উনি, আর আপনি—

—আর একজন?

—আর কোথায়? আমি আর আপনি বসব—উনি একা দু'হাত নিয়ে খেলবেন।

জ্যোৎস্না রাত্রে বাংলোর বারান্দাতে সে কথকতা আরম্ভ করিল। জড়ভরতের

বাল্যজীবনের করুণ কাহিনী নিজেরই শৈশব-স্মৃতির ছায়াপাতে সত্য ও পূত হইয়া উঠে, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বাবার গলার স্বর কেমন করিয়া অলক্ষিতে তাহার গলায় আসে—শালবনের পত্র-মর্মরে, নৈশ পাখির গানের মধ্যে রাজর্ষি ভরতের সরল বৈরাগ্য ও নিস্পৃহ আনন্দ যেন প্রতি সুরমূর্ছনাকে একটি অতি পবিত্র মহিমাময় রূপ দিয়া দিল। কথকতা থামিলে সকলেই চুপ করিয়া রহিল। অপু খানিকটা পর হাসিয়া বলিল—কেমন লাগল ?

অবনীবাবু একটু ধর্মপ্রাণ লোক, তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছে—কথকতা দু-একবার শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু এ কি জিনিস ! ইহার কাছে সে সব লাগে না।

কিন্তু সকলের চেয়ে মুগ্ধ হইলেন অবনীবাবুর স্ত্রী। জ্যোৎস্নার আলোতে তাঁহার চোখে ও কপোলে অশ্রু চিক্-চিক্ করিতেছিল। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলিলেন না। স্বদেশ হইতে দূরে এই নিঃসন্তান দম্পতির জীবনযাত্রা এখানে একেবারে বৈচিত্র্যহীন, বহুদিন এমন আনন্দ তাঁহাদের কেহ দেয় নাই।

দিন দুই পরে অবনীবাবুর বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসিলেন, ভারী মনখোলা ও অমায়িক ধরনের লোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কানের পাশে চুলে পাক ধরিয়াছে, বলিষ্ঠ গঠন ও সুপুরুষ। একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খান। জব্বলপুর হইতে হুইস্কি আনাইয়াছেন কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, খানিকক্ষণ তাহার বর্ণনা করিলেন। অবনীবাবুও যে মদ খান অপু তাহা ইতিপূর্বে জানিত না। মিঃ রায়চৌধুরী অপুকে বলিলেন, আপনার গুণের কথা সব শুনলাম, অপূর্ববাবু। সে আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে। আপনার চোখ দেখলে যে কোন লোক আপনাকে ভাবুক বলবে। তবে কি জানেন, আমরা হয়ে পড়েছি ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট। আজ আপনাকে আর একবার কথকতা করতে হবে, ছাড়ছি নে আজ !

কথাবার্তায়, গানে হাসিখুশিতে সেদিন প্রায় সারারাত কাটিল। মিঃ রায়চৌধুরী চলিয়া যাইবার দিন তিনেক পরে একজন চাপরাসী তাঁহার নিকট হইতে অপুর নামে একখানা চিঠি আনিল। তাঁহার ওখানে একটা ড্রিলিং তাঁবুর তত্ত্বাবধানের জন্য একজন লোক দরকার। অপূর্ববাবু কি আসিতে রাজী আছেন ? আপাতত মাসে পঞ্চাশ টাকা ও বাসস্থান। অপুর নিকট ইহা একেবারে অপ্রত্যাশিত। ভাবিয়া দেখিল, হাতে আনা দশেক পয়সা মাত্র অবশিষ্ট আছে, উঁহারা অবশ্য যতই আত্মীয়তা দেখান, গান ও কথকতা করিয়া চিরদিন তো এখানে কাটানো চলিবে না ? আশ্চর্যের বিষয়, এতদিন কথাটা

আদৌ তাহার মনে উদয় হয় নাই যে কেন !

মিঃ রায়চৌধুরীর বাংলো প্রায় মাইল কুড়ি দূর। তিনদিন পরে ঘোড়া ও লোক আসিল। অবনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন। পথ অতি দুর্গম, উমেরিয়া হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিম-দিকে গেলেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয়। দুই-তিনটা ছোট ছোট পাহাড়ী নদী, আবার ছোট ছোট ফার্ন ঝোপ, ঝরণা—একটার জলে অপু মুখ ধুইয়া দেখিল জলে গন্ধকের গন্ধ। পাহাড়িয়া করবী ফুটিয়া আছে,বাতাস নবীন মাদকতায় ভরা, খুব স্নিগ্ধ, এমন কি যেন একটু গা শির্-শির্ করে—এই চৈত্র মাসেও।

সন্ধ্যার পূর্বে সে গন্তব্য স্থানে পেঁাছাইয়া গেল। খনির কার্যকারিতা ও লাভালাভের বিষয় এখনও পরীক্ষাধীন, মাত্র খান চার-পাঁচ চওড়া খড়ের ঘর। দুইটা বড় বড় তাঁবু, কুলীদের থাকিবার ঘর, একটা অফিস ঘর। সর্বসুদ্ধ আটদশ বিঘা জমির উপর সব। চারিধার ঘেরিয়া ঘন, দুর্গম অরণ্য, পিছনে পাহাড়, আবার পাহাড়।

মিঃ রায়চৌধুরী বলিলেন—খুব সাহস আছে আপনার তা আমি বুঝেছি যখন শুনলাম আপনি রাত্রে ঘোড়ার চড়ে উমেরিয়া এসেছিলেন। ও পথে রাত্রে এদেশের লোকও যেতে সাহস পায় না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপুর এক সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু হইল এ-দিনটি হইতে। এমন এক জীবন, যাহা সে চিরকাল ভালবাসিয়াছে, যাহার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনদিন যে হাতের মুঠোয় নাগাল পাওয়া যাইবে তাহা ভাবে নাই।

তাহাকে যে ড্রিল তাঁবুর তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে, তাহা এখান হইতে আরও সতরো-আঠারো মাইল দূরে। মিঃ রায়চৌধুরী নিজের একটা ঘোড়া দিয়া তাহাকে পরদিনই কর্মস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। নতুন স্থানে আসিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। বন ভালবাসিলে কি হইবে, এ ধরণের বন কখনও দেখে নাই। নিবিড় বনানীর প্রান্তে উচ্চ তৃণভূমি, তারই মধ্যে খড়ের বাংলো-ঘর, একটা পাতকুয়া, কুলীদের বাসের খুপ্ড়ি, পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, সেদিকের ঘন বন কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তাহা চোখে দেখিয়া আন্দাজ করা যায়

না—ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া পাহাড়, একটার পিছনে আর একটা, আর গভীর জনমানবহীন অরণ্য, সীমা নাই, কূল-কিনারা নাই। চারিদিকের দৃশ্য অতি গম্ভীর। তাঁবুর পিছনেই ঠিক পাহাড় শ্রেণীর একটা স্থান আবার অনাবৃত, বেজায় খাড়া ও উঁচু—বিরাটকায় নগ্ন গ্রানাইট্ চূড়াটা বৈকালের শেষ রোদে কখনও দেখায় রাঙা, কখনও ধূসর, কখনও ঈষৎ তাম্রাভ কালো রংয়ের—এরূপ গম্ভীর-দৃশ্য অরণ্যভূমির কল্পনাও জীবনে সে করে নাই কখনও!

অপুর সারাদিনের কাজও খুব পরিশ্রমের, সকালে স্নানের পর কিছু খাইয়াই ঘোড়ায় উঠিতে হয়, মাইল চারেক দূরের একটা জায়গায় কাজ তদারক করিবার পর প্রায়ই মিঃ রায়চৌধুরীর ষোলো মাইল দূরবর্তী তাঁবুতে গিয়া রিপোর্ট করিতে হয়—তবে সেটা রোজ নয়, দু'দিন অন্তর অন্তর। ফিরিতে কোন দিন হয় সন্ধ্যা,কোন দিন বা রাত্রি এক প্রহর দেড়প্রহর। সবটা মিলিয়া কুড়ি-প'চিশ মাইলের চক্র, পথ কোথাও সমতল. কোথাও ঢালু. কোথাও দুর্গম। ঢালুটাতে জঙ্গল আছে তবে তার তলা অনেকটা পরিষ্কার, ইংরেজীতে যাকে বলে open forest—কিন্তু পোয়াটাক পথ যাইতে না যাইতে সে মানুষের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হইয়া ঘন অরণ্যের নির্জনতার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায়—সেখানে জন নাই, মানুষ নাই, চারিপাশে বড় বড় গাছ, ডালে পাতায় নিবিড় জড়াজড়ি, পথ নাই বলিলেও হয়, কখনও ঘোড়া চালাইতে হয় পাহাড়ী নদীর শুষ্ক খাত বাহিয়া, কখনও গভীর জঙ্গলের দুর্ভেদ্য বেত-বন ঠেলিয়া—যেখানে বন্যশূকর বা সম্বর হরিণের দল যাতায়াতের সুঁড়ি পথ তৈরি করিয়াছে—সে পথে। কত ধরণের গাছ, লতা, গাছের ডালে এখানে-ওখানে বিচিত্র রঙয়ের অর্কিড, নিচে য়্যাজোলিয়ার হলুদ ফুল ফুটিয়া প্রভাতের বাতাসকে গন্ধভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। ঘোড়া চালাইতে চালাইতে অপুর মনে হয় সে যেন জগতে সম্পূর্ণ একা, সারা দুনিয়ার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই—শুধু আছে সে, আর আছে তাহার ঘোড়াটি ও চারিপাশের এই অপূর্বদৃষ্ট বিজন বন! আর কি সে নির্জনতা! কলিকাতার বাসায় নিজের বন্ধ-দুয়ার ঘরটার কৃত্রিম নির্জনতা নয়, এ ধরণের নির্জনতার সঙ্গে তাহার কখনও পরিচয় ছিল না। এ নির্জনতা বিরাট, অদ্ভুত, এমন কিছু, যাহা পূর্ব হইতে ভাবিয়া অনুমান করা যায় না, অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে।

ভারী পছন্দ হয় এ জীবন, গল্পের বইয়ে-টইয়ে যে রকম পড়িত, এ যেন ঠিক তাহাই। খোলা জায়গা পাইলেই ঘোড়া ছাড়িয়া দেয়, গতির আনন্দে সারা

দেহে একটা উত্তেজনা আসে ; খানাখন্দ, শিলা, পাইওরাইটের স্তূপ কে মানে ? নত শাল-শাখা এড়াইয়া দোদুল্যমান অজানা লতার পাশ কাটাইয়া পৌরুষ-ভরা উদ্দামতার আনন্দে তীরবেগে ঘোড়া উড়াইয়া চলে।

ঠিক এই সব সময়েই তাহার মনে পড়ে—প্রায়ই মনে পড়ে—শীলেদের অফিসের সেই তিনবৎসর ব্যাপী বন্ধ, সংকীর্ণ, অন্ধকার কেরানী-জীবনের কথা। এখনও চোখ বুজিলে অফিসটা সে দেখিতে পায়, বাঁয়ে নৃপেন টাইপিস্ট বসিয়া খট-খট করিতেছে, রামধন নিকাশনবিস বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে, সেই বাঁধানো মোটা ফাইলের দপ্তরটা—নিকাশনবিসের পিছনের দেওয়াল চুন-বালি খসিয়া দেখিতে হইয়াছে যেন একটি পূজা-নিরত পুরুতঠাকুর। রোজ সে ঠাট্টা করিয়া বলিত, 'ও রামধনবাবু, আপনার পুরুতঠাকুর আজ ফুল ফেললেন না ?' উঃ সে কি বন্ধতা—এখন যেন সে-সব একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে বাংলোয় ফিরিয়া পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া এক প্রকার বন্য লেবুর রস মিশানো চিনির শরবত খায়—গরমের দিনে শরীর যেন জুড়াইয়া যায়—তার পরই রামচরিত মিশ্র আসিয়া রাত্রের খাবার দিয়া যায়—আটার রুটি, কুমড়া বা ঢ্যাঁড়সের তরকারী ও অড়হরের ডাল। বারো-তেরো মাইল দূরের এক বস্তি হইতে জিনিস-পত্র সপ্তাহ অন্তর কুলীরা লইয়া আসে—মাছ একেবারেই মেলে না, মাঝে-মাঝে অপু পাখি শিকার করিয়া আনে। একদিন সে বনের মধ্যে এক হরিণকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাইয়া অবাক হইয়া গেল—বড়শিঙ্গা কিংবা সম্বর হরিণ ভারী সতর্ক, মানুষের গন্ধ পাইলে তার ত্রিসীমানায় থাকে না—কিন্তু তাহার ঘোড়ার বারো-গজের মধ্যে এ হরিণটা আসিল কিরূপে ? খুশী ও আগ্রহের সহিত বন্দুক উঠাইয়া লক্ষ্য করিতে গিয়া সে দেখিল লতাপাতার আড়াল হইতে শুধু মুখটি বাহির করিয়া হরিণটিও অবাক চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—ঘোড়ায় চড়া মানুষ দেখিয়া ভাবিতেছে হয়ত, এ আবার কোন জীব !...হঠাৎ অপুর বুকের মধ্যটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—হরিণের চোখ দুটি যেন তাহার খোকার চোখের মত ! অমনি ডাগর ডাগর, অমনি অবোধ, নিষ্পাপ ; সে উদ্যত বন্দুক নামাইয়া তখনি টোটাগুলি খুলিয়া লইল। এখানে যতদিন ছিল, আর কখনও শিকারের চেষ্টা করে নাই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় সন্ধ্যার পরেই, তার পরে সে নিজের খড়ের বাংলোর কম্পাউণ্ডে চেয়ার পাতিয়া বসে।—অপূর্ব নিস্তব্ধতা ! অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ও আঁধারে পিছনকার পাহাড়ের গম্ভীরদর্শন অনাবৃত গ্রানাইট প্রাচীরটা কি অদ্ভুত

দেখায়। শালকুসুমের সুবাসভরা অন্ধকার, মাথার উপরকার আকাশে অগণিত নৈশ নক্ষত্র। এখানে অন্য কোন সাথী নাই, তাহার মন ও চিন্তার উপর অন্য কাহারও দাবী-দাওয়া নাই, উত্তেজনা নাই, উৎকণ্ঠা নাই—আছে শুধু সে, আর এই বিশাল অরণ্য প্রকৃতির কর্কশ, বন্ধুর, বিরাট সৌন্দর্য—আর আছে এই নক্ষত্রভরা নৈশ আকাশটা।

বাল্যকাল হইতেই সে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু এখানে তাদের এ কি রূপ! কুলীরা সকাল সকাল খাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়া পড়ে—রামচরিত মিশ্র মাঝে মাঝে অপুকে সাবধান করিয়া দেয়, তাম্বুকা বাহার মৎ বৈঠিয়ে বাবুজী—শেরকা বড়া ডর হ্যায়—পরে সে কাঠকুটা জ্বালিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া গ্রীষ্মের রাত্রেও বসিয়া আগুন পোহায়—অবশেষে সেও যাইয়া শুইয়া পড়ে, তাহার অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায়—অন্ধ রাত্রি, আকাশ অন্ধকার···পৃথিবী অন্ধকার···আকাশে বাতাসে অদ্ভুত নীরবতা, আবলুসের তালপাতার ফাঁকে দু-একটা তারা যেন অসীম রহস্যভরা মহাব্যোমের বুকের স্পন্দনের মত দিপ্‌দিপ্‌ করে, বৃহস্পতি স্পষ্টতর হন, উত্তর-পূর্ব কোণের পর্বতসানুর বনের উপরে কালপুরুষ উঠে, এখানে-ওখানে অন্ধকারের বুকে আগুনের আঁচড় কাটিয়া উল্কাপিণ্ড খসিয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলো কি অদ্ভুতভাবে স্থান পরিবর্তন করে! আবলুস ডালের ফাঁকে তারাগুলো ক্রমশঃ নিচে নামে, কালপুরুষ ক্রমে পর্বতসানুর দিক হইতে মাথার উপরকার আকাশে সরিয়া আসে, বিশালকায় ছায়াপথটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়, বৃহস্পতি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ে। রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া উঠিল—অদ্ভুতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল!···জীবনে কখনও তাহার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই বিশাল নক্ষত্র-জগৎটার সঙ্গে, এ-ভাবে হইবার আশাও কখনও কি ছিল?

অপুর বাংলো-ঘরের পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, পিছনকার পাহাড়তলী আধ মাইলের কম, দক্ষিণের পাহাড় মাইল দুই দূরে। সামনের বহুদূর বিস্তৃত উঁচুনীচু জমিটা শাল ও পপরেল চারা ও এক প্রকার অর্ধশুষ্ক তৃণে ভরা—অনেক দূর পর্যন্ত খোলা। সারা পশ্চিম দিক্‌চক্রবাল জুড়িয়া বহুদূরে, বিন্ধ্য পর্বতের নীল অস্পষ্ট সীমারেখা, ছিন্দওয়ারা ও মহাদেও শৈলশ্রেণী—পশ্চিমা

বাতাসের ধূলা-বালি যেদিন আকাশকে আবৃত না করে সেদিন বড় সুন্দর দেখায়। মাইল এগারো দূরে নর্মদা বিজন বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, খুব সকালে ঘোড়ায় উঠিয়া স্নান করিতে গেলে বেলা নয়টার মধ্যে ফিরিয়া আসা যায়।

দক্ষিণে পর্বতসানুর ঘন বন নিবিড়, জনমানবহীন, রুক্ষ ও গম্ভীর। দিনের শেষে পশ্চিম গগন হইতে অস্ত-সূর্যের আলো পড়িয়া পিছনের পাহাড়ের যে অংশটা খাড়া ও অনাবৃত, তাহার গ্রানাইট্ দেওয়ালটা প্রথমে হয় হল্‌দে, পরে হয় মেটে সিঁদুরের রং, পরে জরদা রঙের হইতে হইতে হঠাৎ ধূসর ও তারপরেই কালো হইয়া যায়। ওদিকে দিগন্তলক্ষ্মীর ললাটে আলোর টিপের মত সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠে, অরণ্যানী ঘন অন্ধকারে ভরিয়া যায়, শাল ও পাহাড়ী বাঁশের ডাল-পালায় বাতাস লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হয়—রামচরিত ও জহুরী সিং নেকড়ে বাঘের ভয়ে আগুন জ্বালে, চারিধারে শিয়াল ডাকিতে শুরু করে, বন-মোরগ ডাকে, অন্ধকার আকাশে দেখিতে দেখিতে গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্ক, ছায়াপথ একে একে দেখা দেয়। পৃথিবী, আকাশ-বাতাস অপূর্ব রহস্যভরা নিস্তব্ধতায় ভরিয়া আসে, তাঁবুর পাশের দীর্ঘ ঘাসের বন দুলাইয়া এক একদিন বন্যবরাহ পলাইয়া যায়, দূরে কোথায় হায়েনা উন্মাদের মত হাসিয়া উঠে, গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ পাহাড়ের পিছন হইতে ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে, এ যেন সত্যই গল্পের বইয়ে-পড়া জীবন।

এক এক দিন বৈকালে সে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যায়। শুধুই উঁচু-নীচু অর্ধশুষ্ক তৃণভূমি; ছোট বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো, মাঝে-মাঝে শাল ও বাদাম গাছ। আর এক জাতীয় বড় বন্য গাছের কি অপূর্ব আঁকাবাঁকা ডালপালা, চৈত্রের রৌদ্রে পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, নীল আকাশের পটভূমিতে পত্রশূন্য ডাল-পালা যেন ছবির মত দেখা যায়। অপুর তাঁবু হইতে মাইলতিনেক দূরে একটা ছোট পাহাড়ী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, অপু তাহার নাম রাখিয়াছে বক্রতোয়া। গ্রীষ্মকালে জল আদৌ থাকে না, তাহারই ধারে একটা শাল-ঝাড়ের নিচের একখানা পাথরের উপর সে এক একদিন গিয়া বসে, ঘোড়াটা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখে—স্থানটি ঠিক ছবির মত।

সুবর্ণাভ বালুর উপর অন্তর্হিত বন্যনদীর উপল-ঢাকা চরণ-চিহ্ন—হাত কয়েক মাত্র প্রশস্ত নদীখাত, উভয় তীরই পাষাণময়, ওপারে কঠিন ও দানাদার কোয়ার্ট্-জাইট ও ফিকে হল্‌দে রঙের বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে ভরা, অতীত কোন্ হিম্-যুগের তুষার নদীর শেষ প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া এখানে হয়ত আটকাইয়া

গিয়াছে, সোনালী রংয়ের নদী-বালু হয়ত সুবর্ণরেণু মিশানো, অস্ত-সূর্যের রাঙা আলোয় অত চক্-চক্ করে কেন নতুবা? নিকটে সুগন্ধ লতাকস্তুরীর জঙ্গল, খর বৈশাখী রৌদ্রে শুষ্ক শুঁটিগুলি ফাটিয়া মৃগনাভির গন্ধে অপরাহ্নের বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। বক্রতোয়া হইতে খানিকটা দূরে ঘন বনের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট ঝরণা, যেন উঁচু চৌবাচ্চা ছাপাইয়া জল পড়িতেছে এমন মনে হয়। নিচের একটা খাতে গ্রীষ্মদিনেও জল থাকে। রাত্রে ওখানে হরিণদের দল জল খাইতে আসে শুনিয়া অপু কতবার দেড় প্রহর রাত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে গিয়াছে, কখনও দেখে নাই। গ্রীষ্ম গেল, বর্ষাও কাটিল, শরৎকালে বন্য শেফালীবনে অজস্র ফুল ফুটিল, বক্রতোয়ার শাল-ঝাড়টার কাছে বসিলে তখনও ঝরণার শব্দ পাওয়া যায়—এমন সময়ের এক জ্যোৎস্নারাত্রে সে জহুরী সিংকে সঙ্গে লইয়া জায়গাটাতে গেল। দশমীর জ্যোৎস্না ডালে-পাতায় পাহাড়ী বাদাম বনের মাথায়—স্নিগ্ধ বাতাসে শেফালীর ঘন মিষ্ট গন্ধ। এই জ্যোৎস্না-মাখা বনভূমি, এই রাত্রির স্তব্ধতা, এই শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু—এরা যেন কত কালের কথা মনে করাইয়া দেয়, যেন দূর কোনও জন্মান্তরের কথা।

হরিণের দল কিন্তু দেখা গেল না।

এই সব নির্জন স্থানে অপু দেখিল মনের ভাব সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়। শহরে বা লোকালয়ে যে-মন আত্মসমস্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকে, ambition লইয়া ব্যস্ত থাকে, এখানকার উদার নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় সে-সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। মন আরও ব্যাপক হয়, উদার হয়, দ্রষ্টা হয়, angle of vision একদম বদলাইয়া যায়। এইজন্য অনেক অনেক বই-ই—গার্হস্থ্য সমাজে যা খুব ঘোরতর সমস্যামূলক ও প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়—এখানকার নিঃসঙ্গ ও বিশ্বতোমুখী জীবনে তা অতি খেলো, রসহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এখানে ভাল লাগে সেই সব, যাহা শাশ্বত কালের। এই অনন্তের সঙ্গে যাহার যোগ আছে। অপুর সেই গ্রহবিজ্ঞানের বইখানা যেমন—এখন যেন তাদের নতুন অর্থ হয়। এত ভাবিতে শেখায়! চৈতন্যের কোন নতুন দ্বার যেন খুলিয়া যায়।

ফাল্গুন মাসে একজন ফরেস্ট সার্ভেয়ার আসিয়া মাইল দশেক দূরে বনের মধ্যে তাঁবু ফেলিলেন। অপু তাহার সহিত ভাব করিয়া ফেলিল। মাদ্রাজী ভদ্রলোক, বেশ লেখাপড়া জানা। অপু প্রায়ই সন্ধ্যাটা সেখানে কাটাইত, চা খাইত, গল্পগুজব করিত, ভদ্রলোক থিওডোলাইট্ পাতিয়া এ-নক্ষত্র ও-

নক্ষত্র চিনাইয়া দিতেন, এক একদিন আবার দুপুরে নিমন্ত্রণ করিয়া একরকম ভাতের পিঠা খাওয়াইতেন, অপু সকালে উঠিয়া যাইত, দুপুরের পর খাওয়া সারিয়া ঘোড়ায় নিজের তাঁবুতে ফিরিত।

ফিরিবার পথে ডানদিকের পাহাড়ী ঢালুতে বহুদূর ব্যাপিয়া শীতের শেষে লোহিয়া ও বিজনির ফুলের বন। ঘোড়া থামাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিত, তাঁবুতে ফিরিবার কথা ভুলিয়া যাইত। যে কখনও এমন নির্জন অরণ্যভূমিতে —যেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ যাও লোক নাই, জন নাই, গ্রাম নাই, বস্তি নাই —সে-সব স্থানের মুক্ত আকাশের তলে কঠিন ব্যাসাল্ট্ কি গ্রানাইটের রুক্ষ পর্বত-প্রাচীরের ছায়ায়, নিম্নভূমিতে, ঢালুতে, ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে রাশি রাশি অগণিত বেগুনি, জরদা ও শ্বেতাভ হলুদ রঙের বন্য লোহিয়া ও বিজনির ফুলের বন না দেখিয়াছে—তাহাকে এ দৃশ্যের ধারণা করানো অসম্ভব হইবে। এমন কত শত বৎসর ধরিয়া প্রতি বসন্তে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া ঝরিতেছে, কেহ দেখিবার নাই, শুধু ভোমরা ও মৌমাছিদের মহোৎসব।

একদিন অমরকণ্টক দেখিতে যাইবার জন্য অপু মিঃ রায়চৌধুরীর নিকট ছুটি চাহিল।

মনটা ইহার আগে অত্যন্ত উতলা হইয়াছিল, কেন যে উতলা হইল, কারণটা কিছুতেই ভাল ধরিতে পারিল না। ভাবিল এই সময় একবার ঘুরিয়া আসিবে।

মিঃ রায়চৌধুরী শুনিয়া বলিলেন—যাবেন কিসে? পথ কিন্তু অত্যন্ত খারাপ, এখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূর হবে, এর মধ্যে ষাট মাইল ডেন্স ভার্জিন ফরেস্ট—বাঘ, ভালুক, নেকড়ের দল সব আছে। বিনা বন্দুকে যাবেন না, ঘোড়া সহিস নিয়ে যান—রাত হবার আগে আশ্রয় নেবেন কোথাও, —সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ার বাঘ, রসগোল্লাটির মত লুফে নেবে। ঐ জন্যে কত দিন আপনাকে বারণ করেছি এখানেও সন্ধ্যের পর তাঁবুর বাইরে বসবেন না বা অন্ধকারে বনের পথে একা ঘোড়া চালাবেন না—তা আপনি রেক্‌লেস।

তখন সে উৎসাহে পড়িয়া বিনা ঘোড়াতেই বাহির হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল—ধারাল পাথরের নুড়িতে জুতার তলা কাটিয়া চিরিয়া গেল, অতদূর পথ হাঁটিবার অভ্যাস নাই,

এক বিরাট ফোস্কা উঠিয়াছে। পিছনে রামচরিত বোঁচকা লইয়া আসিতেছিল, সে সমানে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছে, মুখে কথাটি নাই। বহু দূরের একটা পাহাড় দেখাইয়া বলিল, ওর পাশ দিয়া পথ। পাহাড়টা ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যায়, বোঝা যায় না, মেঘ না পাহাড়—এত দূরে। অপু ভাবিল পায়ে হাঁটিয়া অতদূর সে যাইবে ক'দিনে?

এ ধরণের ভীষণ অরণ্যভূমি, অপুর মনে হইল এ অঞ্চলে এতদিন আসিয়াও সে দেখে নাই। সে যেখানে থাকে, সেখানকার বন ইহার তুলনায় শিশু, নিতান্ত অবোধ শিশু। দুপুরের পর যে বন শুরু হইয়াছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

অন্ধকার নামিবার আগে একটা উঁচু পাহাড়ের উপরকার চড়াই পথে উঠিতে হইল—উঠিয়াই দেখা গেল—সর্বনাশ, সামনে আবার ঠিক এমনি আর একটা পাহাড়। অপুর পায়ের ব্যথাটা খুব বাড়িয়াছিল, তৃষ্ণাও পাইয়াছিল বেজায় —অনেকক্ষণ হইতে জলের সন্ধান মেলে নাই. আবলুস গাছের তলা বিছাইয়া অম্লমধুর কেঁদফল পড়িয়া ছিল—সারা দুপুর তাহাই চুষিতে চুষিতে কাটিয়াছে কিন্তু জল অভাবে আর চলে না।

দূরে দূরে, উত্তরে ও পশ্চিমে নীল পর্বতমালা। নিম্নের উপত্যকার ঘন বনানী সন্ধ্যার ছায়ায় ধূসর হইয়া আসিতেছে, সরু পথটা বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্মুখে পাহাড়টার ওপারে এক মাইলের মধ্যে বন-বিভাগের একটা ডাকবাংলো পাওয়া গেল। চারিধারে নিবিড় শাল বন, মধ্যে ছোট্ট খড়ের ঘর। খনি ও বনবিভাগের লোকেরা মাঝে মাঝে রাত্রি কাটায়।

এ রাত্রির অভিজ্ঞতা ভারী অদ্ভুত ও বিচিত্র। বাংলোতে অপুরা একটি প্রৌঢ় লোককে পাইল, সে ইহারই মধ্যে ঘরে খিল দিয়া বসিয়া কি পড়িতেছিল, ডাকাডাকিতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল. লোকটা মৈথিলী ব্রাহ্মণ, নাম আজবলাল ঝা। বয়স ষাট বা সত্তর হইবে। সে সেই রাত্রে নিজের ভাণ্ডার হইতে আটা ও ঘৃত বাহির করিয়া আনিয়া অপুর নিষেধ সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট পুরি ভাজিয়া আনিল—পরে অতিথিসৎকার সারিয়া সে ঘরের মধ্যে বসিয়া সুস্বরে সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছু পরেই অপু বুঝিল লোকটা সংস্কৃত ভাল জানে—নানা কাব্য উত্তমরূপে পড়িয়াছে। নানা স্থান হইতে শ্লোক মুখস্থ বলিতে লাগিল কাব্যচর্চার

অসাধারণ উৎসাহ, তুলসীদাসী রামায়ণ হইতেই অনর্গল দোঁহা আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে ওঝাজী নিজের কাহিনী বলিল। দেশ ছিল দ্বারভাঙ্গা জেলায়। সেখানেই শৈশব কাটে, তের বৎসর বয়সে উপনয়নের পর এক বেনিয়ার কাছে চাকরি লইয়া কাশী আসে। পড়াশুনা সেইখানেই—তারপরে কয়েক জায়গায় টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কোথাও সুবিধা হয় নাই। পেটের ভাত জুটে না, নানা স্থানে ঘুরিবার পর এই ডাকবাংলোয় আজ সাত আট বছর বসবাস করিতেছে। লোকজন বড় এখানে কেহ আসে না, কালেভদ্রে এক-আধজন, সে-ই একা থাকে, মাঝে-মাঝে তের মাইল দূরের বস্তি হইতে খাবার জিনিস ভিক্ষা করিয়া আনে, বেশ চলিয়া যায়। সে আছে আর আছে তাহার কাব্যগ্রন্থগুলি—তাহার মধ্যে দুখানা হাতে লেখা পুঁথি, মেঘদূত ও কয়েক সর্গ ভট্টি।

অপুর এত সুন্দর লাগিল এই নিরীহ, অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথাবার্তা ও তাহার আগ্রহভরা কাব্যপ্রীতি—এই নির্জন বনবাসেও একটা শান্ত সন্তোষ। তবে লোকটি যেন একটু বেশী বকে, বিদ্যাটা যেন বেশী জাহির করিতে চায়—কিন্তু এত সরলভাবে করে যে, দোষ ধরাও যায় না। অপু বলিল—পণ্ডিতজী, আপনাকে থাকতে দেয়, কেউ কিছু বলে না?

—না বাবুজী, নাগেশ্বরপ্রসাদ বলে একজন ইঞ্জিনীয়ার আছেন, তিনি আমাকে খুব মানেন, সেই জন্যে কেউ কিছু বলে না।

কথায় কথায় সে বলিল—আচ্ছা পণ্ডিতজী, এ বন কি অমরকণ্টক পর্যন্ত এমনি ঘন?

—বাবুজী, এই হচ্ছে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যারণ্য। অমরকণ্টক ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বন, এমনি ঘন—চিত্রকূট ও দণ্ডকারণ্য এই বনের পশ্চিমদিকে। এ বর্ণনা শুনুন তবে নৈষধচরিতে—দময়ন্তী রাজ্যভ্রষ্ট নলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে এই বনে পথ হারিয়ে ঘুরেছিলেন—ঋক্ষবান্ পর্বতের পাশের পথ দিয়ে তিনি বিদর্ভ দেশে যান। রামায়ণেও এই বনের বর্ণনা শুনবেন আরণ্যকাণ্ডে শুনুন তবে।

অপু ভাবিল লোকটা বর্তমানের কোনও ধার ধারে না, প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষায় একেবারে ডুবিয়া আছে—সব কথায় পুরাণের কথা আনিয়া ফেলে। লোকটিকে ভারী অদ্ভুত লাগিতেছিল—সারাজীবন এখানে-ওখানে ঘুরিয়া

হুই করিতে পারে নাই—এই বনবাসে নিজের প্রিয় পুঁথিগুলো লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া চলিয়াছে, কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। ঐ ধরণের লোকের দেখা মেলে না বেশী।

ওঝাজী সুস্বরে রামায়ণের বনবর্ণনা পড়িতেছিল। কি অদ্ভুতভাবে যে চারিপাশের দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খায়। নির্জন শালবনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, তেন্দু ও চিরঞ্জীগাছের পাতাগুলি এক এক জায়গায় ঘন কালো দেখাইতেছে, বনের মধ্যে শিয়ালের দল ডাকিয়া উঠিয়া প্রহর ঘোষণা করিল।

কোথায় রেল, মোটর, এরোপ্লেন, ট্রেড-ইউনিয়ন? ওঝাজীর মুখে আরণ্যকাণ্ডের শ্লোক শুনিতে শুনিতে সে যেন অনেক দূরের এক সুপ্রাচীন জাতির অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পড়িল একেবারে: অতীতের গিরিতরঙ্গিণী-তীরবর্তী তপোবন, হোমধূমপবিত্র গোধূলির আকাশতলে বিস্তৃত অগ্নিশালা, স্রুগভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ, জলকলস, চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিহিত জপা মুনিগণের বেদপাঠধ্বনি···শান্ত গিরিসানু···বনজ কুসুমের সুগন্ধ··· গোদাবরীতটে পুন্নাগ নাগকেশরের বনে পুষ্প-আহরণরতা সুমুখী আশ্রম-বালকগণ—কৃশাঙ্গী রাজবধূগণ···ক্ষীণজ্যোৎস্নায় নদীজল আলো হইয়া উঠিয়াছে, তীরে স্থূলবেতসের বনে ময়ূর ডাকিতেছে···

সে যেন স্পষ্ট দেখিল, এই নিবিড় অজানা অরণ্যানীর মধ্য দিয়া নির্ভীক, কবাটবক্ষ, ধনুষ্পাণি প্রাচীন রাজপুত্রগণ সকল বিপদকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। দূরে নীল মেঘের মত পরিদৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত ঘন বন, দুর্গম পথের নানা স্থানে শ্বাপদ রাক্ষসে পূর্ণ খন্দ, গুহা, গহ্বর, মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত—অজানা মৃত্যুসংকুল—চারিধারে পর্বতরাজির ধাতুরঞ্জিত শৃঙ্গ-সকল আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কুন্দগুল্ম, সিন্দুবার, শিরীষ, অর্জুন, শাল, নীপ, বেতস, তিনিশ ও তমাল তরুতে শ্যামায়মান গিরিসানু··· শরদ্বারা বিদ্ধ রুরু ও পৃষত মৃগ আগুনে ঝলসাইয়া খাওয়া, বিশাল ইঙ্গুদী তরুমূলে সতর্ক রাত্রি যাপন···

ওঝাজী উৎসাহ পাইয়া অপুকে একটা পুঁটলি খুলিয়া একরাশ সংস্কৃত কবিতা দেখাইলেন, গর্বের সহিত বলিলেন, বাবুজী, ছেলেবেলা থেকেই সংস্কৃত কবিতায় আমার হাত আছে, একবার কাশী-নরেশের সভায় আমার গুরুদেব ঈশ্বরশরণ আমায় নিয়ে যান। একজোড়া দোশালা বিদায় পেয়েছিলাম, এখনও আছে। ত্রিশ-প'য়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।—তারপর তিনি অনেকগুলি

কবিতা শুনাইলেন, বিভিন্ন ছন্দের সৌন্দর্য ও তাহাতে তাঁহার রচিত শ্লোকের কৃতিত্ব উৎসাহে বর্ণনা করিলেন। এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ওঝাজী বহু কবিতা লিখিয়াছেন, ও এখনও লেখেন, সবগুলি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও দিয়াছেন, একটিও নষ্ট হইতে দেন নাই, তাহাও জানাইলেন।

একটি অদ্ভুত ধরণের দুঃখ ও বিষাদ অপুর হৃদয় অধিকার করিল। কত কথা মনে আসিল, তাহার বাবা এই রকম গান ও পাঁচালি লিখিতেন তাহার ছেলেবেলায়। কোথায় গেল সে সব? যুগ যে বদল হইয়া যাইতেছে, ইহারা তাহা ধরিতে পারে না। ওঝাজীর এত আগ্রহের সহিত লেখা কবিতা কে পড়িবে? কে আজকাল ইহার আদর করিবে? কোন্ আশা ইহাতে পুরিবে ওঝাজীর? অথচ কত ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দ ইহাদের পিছনে আছে চাঁপদানীর পোস্টাফিসে কুড়াইয়া পাওয়া সেই ছোট মেয়েটির নাম-ঠিকানা-ভুল পত্রখানার মতই তাহা ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া যাইবে!

সকালে উঠিয়া সে ওঝাজীকে একখানা দশটাকার নোট দিয়া প্রণাম করিল। নিজের একখানা ভাল বাঁধানো খাতা লিখিবার জন্য দিল—কাছে আর টাকা বেশী ছিল না, থাকিলে হয়তো আরও দিত। তাহার একটা দুর্বলতা এই যে, যে একবার তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে তাহাকে দিবার বেলায় সে মুক্তহস্ত, নিজের সুবিধা-অসুবিধা তখন সে দেখে না।

ডাকবাংলো হইতে মাইল খানেক পরে পথ ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, ক্রমে আরও উপরে, উচ্চ মালভূমির উপর দিয়া পথ—শাল, বাঁশ, খয়ের আবলুসের ঘন অরণ্য—ডাইনে বামে উঁচুনীচু ছোট বড় পাহাড় ও টিলা—শাল-পুষ্পসুরভি সকালের হাওয়া যেন মনের আয়ু বাড়াইয়া দেয়। চতুর্থ দিন বৈকালে অমরকণ্টক হইতে কিছু দূরে অপরূপ সৌন্দর্যভূমির সঙ্গে পরিচয় হইল—পথটা সেখানে নীচের দিকে নামিয়াছে, দুই দিকে পাহাড়ের মধ্যে সিকিমাইল চওড়া উপত্যকা, দুধারে রসানুদেশের বন অজস্র ফুলে ভরা—পলাশের গাছ যেন জ্বলিতেছে। হাত দুই উঁচু পাথরের পাড়, মধ্যে গৈরিক বালু ও উপল-শয্যায় শিশু শোণ—নির্মল জলের ধারা হাসিয়া খুশিয়া আনন্দ বিলাইতে বিলাইতে ছুটিয়া চলিয়াছে—একটা ময়ূর শিলাখন্ডের আড়াল হইতে নিকটের গাছের ডালে উঠিয়া বসিল। অপুর পা আর নড়িতে চায় না—তার মুগ্ধ ও বিস্মিত চোখের সম্মুখে শৈশব কল্পনার স্বর্গকে কে আবার এভাবে বাস্তবে পরিণত করিয়া খুলিয়া বিছাইয়া দিল!

এত দূরবিসর্পিত দিগ্‌বলয় সে কখনও দেখে নাই, এত নির্জনতার কখনও ধারণা ছিল না তাহার—বহুদূরে পশ্চিম আকাশের অনতিস্পষ্ট সুদীর্ঘ নীল শৈলরেখার উপরকার আকাশটাতে সে কি অপরূপ বর্ণসমুদ্র !

কি অপূর্ব দৃশ্য চোখের সম্মুখে যে খুলিয়া যায় ! এমন সে কখনও দেখে নাই—জীবনে কখনও দেখে নাই ।

এ বিপুল আনন্দ তাহার প্রাণে কোথা হইতে আসে !

এই সন্ধ্যা, এই শ্যামলতা, এই মুক্ত প্রসারের দর্শনে যে অমৃত মাখানো আছে. সে মুখে তাহা কাহাকে বলিবে ?···কে তাহার এ চোখ ফুটাইল, কে সাঁঝ-সকালের, সূর্যাস্তের, নীল বনানীর শ্যামলতার মায়া-কাজল তাহার চোখে মাখাইয়া দিল ?

দূরবিসর্পিত চক্রবালরেখা দিগন্তের যতটুকু ঘিরিয়াছে, তাহারই কোন কোন অংশে, বহুদূরে নেমির শ্যামলতা অনতিস্পষ্ট সান্ধ্যদিগন্তে বিলীন, কোন কোন অংশে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা-যাওয়া বনরেখায় পরিস্ফুট, কোন দিকে সাদা সাদা বকের দল আকাশের নীলপটে ডানা মেলিয়া দূর হইতে দূরে চলিয়াছে···মন কোথাও বাধে না। অবাধ উদার দৃষ্টি, পরিচয়ের গণ্ডি পার হইয়া যাইয়া অদৃশ্য অজানার উদ্দেশে ভাসিয়া চলে···

তাহার মনে হইল সত্য, সত্য সত্য—এই শান্ত নির্জন আরণ্যভূমিতে মনের ডালপালার আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদারের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া এক একটি নব জগতের জন্ম হয়—ঐ দূর ছায়াপথের মত তাহা দূরবিসর্পিত, এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়—তাহাকে ধরা যায় না অথচ এই সব নীরব জীবনমুহূর্তে অনন্ত দিগন্তের দিকে বিস্তৃত তাহার রহস্যময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব করা যায়। এই এক বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে সে তাহা অনুভব করিয়াছেও—এই অদৃশ্য জগৎটার মোহস্পর্শ মাঝে মাঝে বৈশাখী শালমঞ্জরীর উন্মাদ সুবাসে, সন্ধ্যা-ধূসর অনতিস্পষ্ট গিরিমালার সীমারেখায়, নেকড়ে বাঘের ডাকে ভরা জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র জনহীন আরণ্যভূমির গাম্ভীর্যে, অগণিত তারাখচিত নিঃসীম শূন্যের ছবিতে। বৈকালে ঘোড়াটি বাঁধিয়া যখনই বক্রতোয়ার ধারে বসিয়াছে, যখনই অপর্ণার মুখ মনে পড়িয়াছে, কতকাল ভুলিয়া যাওয়া দিদির মুখখানা মনে পড়িয়াছে, একদিন-শৈশব-মধ্যাহ্নে মায়ের-মুখে-শোনা মহাভারতের দিনগুলার কথা মনে পড়িয়াছে—তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইয়াছে যে, যে-জীবন যে-জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে

পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা···

আজ তাহার বসিয়া বসিয়া মনে হয়, শীলেদের বাড়ি চাকুরি তাহার দৃষ্টিতে আরও শক্তি দিয়াছিল, অন্ধকার অফিস ঘরে একটুখানি জায়গায় দশটা হইতে সাতটা পর্যন্ত আবদ্ধ থাকিয়া একটুখানি খোলা জায়গার জন্য সে কি তীব্র লোলুপতা, বুভুক্ষা - দুই টিউশানির ফাঁকে গড়ের মাঠের দিকের বড় গির্জাটার চূড়ার পিছনকার আকাশের দিকে তৃষিত চোখে চাহিয়া থাকার সে কি হ্যাংলামি! কিন্তু সেই বদ্ধ জীবনই পিপাসাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল, শক্তির অপচয় হইতে দেয় নেই, ধরিয়া বাঁধিয়া সংহত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ মনে হয় চাঁপদানীর হেড মাস্টার যতীশবাবুও তাহার বন্ধু—জীবনের পরম বন্ধু—সেই নিষ্পাপ দরিদ্র ঘরের উৎপীড়িতা মেয়ে পটেশ্বরীও। ভগবান তাহাকে নিমিত্তস্বরূপ করিয়াছিলেন —তাহারা সকলে মিলিয়া চাঁপদানীর সেই কুলী-বস্তির জীবন হইতে তাহাকে জোর করিয়া দূর করিয়া না দিলে আজও সে সেখানেই থাকিয়া যাইত। এমন সব অপরাহ্নে সেখানে বিশু স্যাকরার দোকানের সান্ধ্য আড্ডায় মহা খুশিতে আজও বসিয়া তাস খেলিত।

একথাও প্রায়ই মনে হয়, জীবনকে খুব কম মানুষেই চেনে। জন্মগত ভুল সংস্কারের চোখে সবাই জীবনকে বুঝিবার চেষ্টা করে, দেখিবার চেষ্টা করে, দেখাও হয় না, বোঝাও হয় না। তা ছাড়া সে চেষ্টাই বা ক'জন করে?···

অমরকণ্টক তখনও কিছু দূর। অপু বলিল, রামচরিত, কিছু শুকনো ডাল আর শালপাতা কুড়িয়ে আন, চা করি। রামচরিতের ঘোর আপত্তি তাহাতে। সে বলিল, হুজুর এসব বনে বড় ভালুকের ভয়। অন্ধকার হবার আগে অমরকণ্টকের ডাকবাংলোয় যেতে হবে। অপু বলিল, তাড়াতাড়ি চা হয়ে যাবে, যাও না তুমি। পরে সে বড় লোটাটায় শোণের জল আনিয়া তিন টুকরা পাথরের উপর চাপাইয়া আগুন জ্বালিল। হাসিয়া বলিল, একটা ভজন গাও রামচরিত, যে আগুন জ্বলেছে, এর কাছে তোমার ভালুক এগোবে না, নির্ভয়ে গাও।

জ্যোৎস্না উঠিল। চারিধারে অদ্ভুত, গম্ভীর শোভা। কল্যকার কাব্য-পুরাণের রেশ তাহার মন হইতে এখনও যায় নাই। বসিয়া বসিয়া মনে হইল সত্যই

যেন কোন সুন্দরী, চারুনেত্রা রাজবধূ—নব-পুষ্পিতা মল্লীলতার মত তন্বী লীলাময়ী—এই জনহীন নিষ্ঠুর আরণ্যভূমিতে পথ হারাইয়া বিপন্নার মত ঘুরিতেছেন—তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—দূরে ঋক্ষবান্‌ পর্বতের পার্শ্ব দিয়া বিদর্ভ যাইবার পথটি কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে !

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নন্‌-কো-অপারেশনের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি তখন বছর তিনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে একদিন প্রণব রাজসাহী জেল হইতে খালাস পাইল।

জেলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয় নাই, কেবল চোখের কেমন একটা অসুখ হইয়াছে, চোখ কর্‌কর্‌ করে, জল পড়ে। জেলের ডাক্তার মিঃ সেন চশমা লইতে বলিয়াছেন এবং কলিকাতার এক চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞের নামে একটি পত্রও দিয়াছেন।

জেল হইতে বাহির হইয়া সে ঢাকা রওনা হইল এবং সেখান হইতে গেল স্বগ্রামে। এক প্রৌঢ়া খুড়ীমা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই, বাপ-মা শৈশবেই মারা গিয়াছেন, এক বোন ছিল সেও বিবাহের পর মারা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে বাড়ি পৌঁছিল। খুড়ীমা ভাঙা রোয়াকের ধারে কম্বলের আসন পাতিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। খুড়ীমার নিজের ছেলেটি মানুষ নয়, গাঁজা খাইয়া বেড়ায়, প্রণবকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছেন, ভালওবাসেন, কিন্তু লেখাপড়া জানিলে কি হইবে, তাহার পুনঃ পুনঃ সদুপদেশ সত্ত্বেও সে কেবলই নানা হাঙ্গামায় পড়িতেছে, ইচ্ছা করিয়া পড়িতেছে !

এ বৃদ্ধবয়সে শুধু তাঁহারই মরণ নাই, ইত্যাদি নানা কথা ও তিরস্কার প্রণবকে রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। বাগানের বড় কাঁঠাল গাছের একটা ডাল কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, খুড়ীমা চৌকি দিয়া বেড়ান কখন, তিনি ও-সব পারিবেন না, তাঁহাকে যেন কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ কর্তাদের অত কষ্টের বিষয়-সম্পত্তি চোখের উপর নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য দেখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

দিনচারেক বাড়ি থাকিয়া খুড়ীমাকে একটু শান্ত করিয়া চশমার ব্যবস্থার

দোহাই দিয়া সে কলিকাতায় রওনা হইল। সোদপুরে খুড়ীমার একজন ছেলেবেলার-পাতানো গোলাপফুল আছেন, তাঁহারা প্রণবকে দেখিতে চান একবার, সেখানে যেন সে অবশ্য অবশ্য যায়, খুড়ীমার মাথার দিব্য। প্রণব মনে মনে হাসিল। বৎসর-চার পূর্বে গোলাপফুলের বড় মেয়েটির যখন বিবাহের বয়স হইয়াছিল, তখন খুড়ীমা এই কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রণব যাওয়ার সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তারপরই আসিল নন্-কো-অপারেশনের ঢেউ, এবং নানা দুঃখ-দুর্ভোগ। সেটির বিবাহ হইয়াছে এবার বোধ হয় ছোটটির পালা।

কলিকাতায় আসিয়া সে প্রথমে অপুর খোঁজ করিল, পরিচিত স্থানগুলিতে গিয়া দেখিল, দু-একদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী খুঁজিল, কারণ যদি অপু কলিকাতায় থাকে তবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। চাঁপদানীতে যে অপু নাই তাহা তিন বৎসর আগে জেলে ঢুকিবার সময় জানিত, কারণ তাহারও প্রায় এক বৎসর আগে অপু সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

একদিন সে মন্মথদের বাড়ি গেল। তখন রাত প্রায় আটটা, বাহিরের ঘরে মন্মথ বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছে, সে আজকাল এটর্নি, খুড়-শ্বশুরের বড় নামডাক ও পশারের সাহায্যে নতুন বসিলেও দু'পয়সা উপার্জন করে। মন্মথ যে ব্যবসায়ে উন্নতি করিবে, তাহার প্রমাণ প্রণব সেদিনই পাইল।

ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পরে রাত সাড়ে সাতটার কাছাকাছি মন্মথ যেন একটু উসখুস করিতে লাগিল—যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। একটু পরেই একখানা বড় মোটরগাড়ি আসিয়া দরজায় লাগিল, একটি প'য়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের যুবকের হাত ধরিয়া দু'জন লোক ঘরে প্রবেশ করিল। প্রণব দেখিয়াই বুঝিল, যুবকটি মাতাল অবস্থায় আসিয়াছে। সঙ্গের লোক দুইটির মধ্যে একজনের একটা চোখ খারাপ, ঘোলাটে ধরণের—বোধ হয় সে চোখে দেখিতে পায় না, অপর লোকটি বেশ সুপুরুষ। মন্মথ হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে মল্লিক মশায়, আসুন, ইনিই মিঃ সেন শর্মা?···বসুন, নমস্কার। গোপালবাবু, বসুন এইখানে। আর ও'কে আমাদের কনডিশন্‌স্ সব বলেছেন তো?

ধরণে প্রণব বুঝিল মল্লিক মশায় বড় পাকা লোক। উত্তর দিবার পূর্বে তিনি একবার প্রণবের দিকে চাহিলেন। প্রণব উঠিতে যাইতেছিল, মন্মথ বলিল—না, না, বসো হে। ও আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, একসঙ্গে কলেজে পড়তুম—ও ঘরের লোক, বলুন আপনি। মল্লিক মশায় একটা পুঁটুলি খুলিয়া কি সব কাগজ বাহির করিলেন,

তাঁহাদের মধ্যে নিম্নস্বরে খানিকক্ষণ কি কথাবার্তা হইল। সঙ্গের অন্য লোকটি দু'বার যুবকটির কানে-কানে ফিস্-ফিস্ করিয়া কি কি বলিল, পরে যুবক একটা কাগজে নাম সই করিল। মন্মথ দু'বার সইটা পরীক্ষা করিয়া কাগজখানা একটা খামের মধ্যে পুরিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল ও একরাশ নোটের তাড়া মল্লিক মশায়কে গ.নিয়া দিল। পরে দলটি গিয়া মোটরে উঠিল।

প্রণব অপুর মত নির্বোধ নয়, সে ব্যাপারটা বুঝিল। যুবকটির নাম অজিতলাল সেন-শর্মা, কোনও জমিদারের ছেলে। যে-জন্যই হউক, সে দুই হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া দেড় হাজার টাকা লইয়া গেল এবং মল্লিক মশায় তাহার দালাল, কারণ, সকলকে মোটরে উঠাইয়া দিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন ও পুনরায় প্রণবের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে চাহিয়া মন্মথের সঙ্গে নিম্নস্বরে কিসের তর্ক উঠাইলেন—সাড়ে সাত পার্সেণ্টের জন্য তিনি যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেন নাই, এ কথা কয়েকবার শুনাইলেন। ঠিক সেই সময়েই প্রণব বিদায় লইল।

পরদিন মন্মথের সঙ্গে আবার দেখা। মন্মথ হাসিয়া বলিল—কালকের সেই কাপ্তেন বাবুটি হে—আবার শেষরাত্রে তিনটের সময় মোটরে এসে হাজির। আবার চাই হাজার টাকা.—থোকে থার্টিফাইভ পার্সেণ্ট লাভ মেরে দিলুম। মল্লিক লোকটা ঘুঘু দালাল। বড়লোকের কাপ্তেন ছেলে যখন শেষরাতে হ্যাণ্ডনোট কাটছেন, তখন আমরা যা পারি ক'রে নিতে—আমার কি. লোকে যদি দেড়হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কেটে এক হাজার নেয় আমার তাতে কি? দোষ কি? এই-সব চরিয়েই তো আমাদের খেতে হবে! কত রাত এমন আসে দ্যাখ না. টাকার যা বাজার কলকাতায়. কে দেবে?

প্রণব খুব আশ্চর্য হইল না। ইহাদের কার্যকলাপ সে কিছু কিছু জানে. এক অপ্রকৃতিস্থ মাতাল যুবকের নিকট হইতে ইহারা এক রাত্রিতে হাজার টাকা অসৎ উপায়ে উপার্জন করিয়া বড় গলায় সেইটাই আবার বাহাদুরি করিয়া জাহির করিতেছে! হতভাগ্য যুবকটির জন্য প্রণবের কষ্ট হইল—মত্ত অবস্থায় সে যে কি সই করিল, কত টাকা তাহার বদলে পাইল, হয়ত বা তাহা সে বুঝিতেও পারিল না।

কলিকাতা হইতে সে মামার বাড়ি আসিল। মাতৃসমা বড় মামীমা আর ইহজগতে নাই। গত বৎসর পূজার সময় তিনি—প্রণব তখন জেলে। সেখানেই সে সংবাদটা পায়। গঙ্গানন্দকাটির ঘাটে নৌকা ভিড়িতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাল ট্রেনে সারা রাত ঘুম হয় নাই আদৌ, তাড়াতাড়ি স্নানাহার

সারিয়া দোতলার কোণের ঘরে বিশ্রামের জন্য যাইয়া দেখিল, বিছানার উপর একটি পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে চুপ করিয়া শুইয়া! দেখিয়া মনে হইল, একরাশ বাসি গোলাপফুল কে যেন বিছানার উপর উপুড় করিয়া ঢালিয়া রাখিয়াছে—হ্যাঁ, সে যাহা ভাবিয়াছে তাই—জ্বরে ছেলেটির গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে. মুখ জ্বরের ধমকে লাল. ঠোঁট কাঁপিতেছে, কেমন যেন দিশেহারা ভাব। মাথার দিকে একখানা রেকাবিতে দুখানা আধ-খাওয়া ময়দার রুটি ও খানিকটা চিনি। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাজল, না?

খোকা যেন হঠাৎ চমক ভাঙিয়া কতকটা ভয় ও কতকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কোনও কথা বলিল না।

প্রণবের মনে বড় কষ্ট হইল - ইহাকে ইহারা এভাবে একা উপরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছে! অসহায় বালক একলাটি শুইয়া মুখ বুজিয়া জ্বরের সঙ্গে যুঝিতেছে, পথ্য দিয়াছে কি—না, দুখানা ময়দার হাতে-গড়া রুটি ও খানিকটা লাল চিনি! আর কিছু জোটে নাই ইহাদের? জ্বরের ঘোরে তাহাই বালক যাহা পারিয়াছে খাইয়াছে। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল - খোকা রুটি কেন. সাবু দেয় নি তোমায়?

খোকা বলিল—ছাবু নেই।

—নেই কে বললে?

– মা —মামীমা বললে ছাবু নেই।

সে জ্বরে হাঁপাইতেছে দেখিয়া প্রণব ঠাণ্ডা জল আনিয়া তাহার মাথাটা বেশ করিয়া ধুইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এরূপ করিতেই জ্বরটা একটু কমিয়া আসিল. বালক একটু সুস্থ হইল। দিশেহারা ও হাঁস-ফাঁস ভাবটা কাটিয়া গেল। প্রণব বলিল—বল তো আমি কে?

খোকা বলিল—জা-জা-জা জানি নে তো?

প্রণব বলিল. - আমি তোমার মামা হই খোকা। তোমার বাবা বুঝি আসে নি এর মধ্যে?

কাজল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ন্-ন্-না তো, বাবা কতদিন আসে নি।

প্রণব কৌতূহলের সুরে বলিল—তুমি এত তোৎলা হ'লে কি ক'রে, কাজল?

সে অপুর ছেলেকে খুব ছোটবেলায় দেখিয়াছিল। আজ দেখিয়া মনে হইল, অপুর ঠোঁটের সুকুমার রেখাটুকু ও গায়ের সুন্দর রংটি বাদে ইহার মুখের বাকী সবটুকু মায়ের মত।

কাজল ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—আমার বাবা আসবে না?

—আসবে না কেন ? বাঃ !

—ক্-ক-কবে আসবে ?

—এই এল বলে। বাবার জন্যে মন কেমন করে বুঝি ?

কাজল কিছু বলিল না।

অপুর উপরে প্রণবের খুব রাগ হইল। ভাবিল—আচ্ছা পাষণ্ড তো ? মা-মরা কাঁচ বাচ্চাটাকে বেঘোরে ফেলে রেখে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে বসে আছে ! ওকে এখানে কে দেখে তার নেই ঠিক—দয়া মায়া নেই শরীরে ?

শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে প্রণবের নিকট জামাইয়ের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন—বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের যোগাযোগটি তো ঘটিয়েছিলে, ভেবে দ্যাখো তো সে আজ পাঁচ বচ্ছরের মধ্যে নিজের ছেলেকে একবার চোখের দেখা দেখতে এল না, ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মাইনের চাকরি করছেন আর ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভবঘুরের মত, চাল নেই চুলো নেই, কোন জন্মে যে করবেন সে আশাও নেই—ব'লো না, হাড়ে চটেছি আমি—এদিকে ছেলেটি কি অবিকল তাই !···এই বয়েস থেকেই তেমনি নির্বোধ, অথচ যেমনি চঞ্চল তেমনি একগুঁয়ে। চঞ্চল কি একটু-আধটু ? ঐটুকু তো ছেলে, একদিন করেছে কি, একদল গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে চলে গিয়েছে সেই পীরপুরের বাজারে—এদিকে আমরা খুঁজে পাই নে, চারিদিকে লোক পাঠাই—শেষে মাখন মুহুরীর সঙ্গে দেখা, সে ধরে নিয়ে আসে। খাওয়াও, দাওয়াও, মেয়ের ছেলে কখনও আপনার হয় না, যে পর সে-ই পর।

খোকা বাপের মত লাজুক ও মুখচোরা—কিন্তু প্রণবের মনে হইল, এমন সুন্দর ছেলে সে খুব কম দেখিয়াছে। সারা গা বহিয়া যেন লাবণ্য ঝরিতেছে, সদাসর্বদা মুখ টিপিয়া কেমন এক করুণ, অপ্রতিভ ধরণের হাসি হাসে—মুখখানা এত লাজুক ও অবোধ দেখায় সে সময় !···কেমন যে একটা করুণা হয় ! এখানে কয়েক দিন থাকিয়া প্রণব বুঝিয়াছে, দিদিমা মারা যাওয়ার পর এ বাড়িতে বালককে যত্ন করিবার আর কেহ নাই—সে কখন খায়, কখন শোয়, কি পরে—এ সব বিষয়ে বাড়ির কাহারও দৃষ্টি নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে তো নাতিকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না, সর্বদা কড়া শাসনে রাখেন। তাঁহার বিশ্বাস এখন হইতে শাসন না করিলে এ-ও বাপের মত ভবঘুরে হইয়া যাইবে, অথচ বালক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, দাদামহাশয় কেন তাহাকে অমন উঠিতে-তাড়া বসিতে-তাড়া দেন—ফলে সে দাদামহাশয়কে যমের মত ভয় করে, তাঁহার ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটিতে চায় না।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রণব দেবব্রতের সঙ্গে দেখা করিল। দেবব্রত একটু বিষণ্ন—বিলাত যাইবার পূর্বে সে একটি মেয়েকে নিজের চোখে দেখিয়া বিবাহের জন্য পছন্দ করিয়াছিল—কিন্তু তখন নানা কারণে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়—সে আজ তিন বৎসর পূর্বের কথা। এবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া সে নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া সন্ধান লইয়া জানে মেয়েটির এখনও বিবাহ হয় নাই। মেয়েটির ডান পায়ের হাঁটুতে নাকি কি হইয়াছে, ডাক্তারে সন্দেহ করিতেছেন বোধ হয় তাহাতে চিরজীবনের জন্য ঐ পা খাটো হইয়া থাকিবে—এ অবস্থায় কে-ই বা বিবাহ করিতে অগ্রসর হইবে? শুনিবামাত্র দেবব্রত ধরিয়া বসিয়াছে সে ঐ মেয়েকেই বিবাহ করিবে—মায়ের ঘোর আপত্তি, পিসেমহাশয়ের আপত্তি, মামাদের আপত্তি—সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। হয় ঐ মেয়েকে বিবাহ করিবে, নতুবা দরকার নাই বিবাহে।

দেবব্রতের সঙ্গে প্রণবের খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না, অপুর সঙ্গে ইতিপূর্বে বার-দুই-তিন তাহার কাছে গিয়াছিল এই মাত্র। এবার সে যায় অপুর কোন সন্ধান দিতে পারে কিনা তাহাই জানিবার জন্য। কিন্তু এই বিবাহ-বিভ্রাটকে অবলম্বন করিয়া মাস-দুইয়ের মধ্যে দু'জনের একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিল।

দেবব্রত এই সব গোলমালের দরুন পিসেমশায়ের বাসা ছাড়িয়া কলিকাতায় হোটেলে উঠিয়াছিল—বৈকালে সেখানে একদিন প্রণব বেড়াইতে গিয়া শুনিল, দেবব্রতের মা এ বিবাহে মত দিয়াছেন। দেবব্রত বলিল—ঠিক সময়ে এসেছেন, আমি ভাবছিলুম আপনার কথা—কাল পিসেমশায় আর বড় মামা যাবেন মেয়েকে আশীর্বাদ করতে, আপনিও যান ওদের সঙ্গে। ঠিক বিকেল পাঁচটায় এখানে আসবেন।

মেয়ের বাড়ি গোয়াবাগানে। ছোট দোতলা বাড়ি, নিচে একটা প্রেস। মেয়ের বাপ গভর্ণমেণ্টের চাকরি করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া খুব সুন্দরী বলিয়া মনে হইল না প্রণবের, গায়ের রং যে খুব ফর্সা তাও নয়, তবে মুখে এমন কিছু আছে যাতে একবার দেখিলে বার বার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। ঘাড়ের কাছে একটা জতুকচিহ্ন, চুল বেশ বড় বড় ও কোঁকড়ানো। বিবাহের দিনও উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ধার্য হইয়া গেল।

দেবব্রত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ-ঘরের ছেলে। দুঃখ কষ্ট কাহাকে বলে জানে না, এ পর্যন্ত বরাবর যথেষ্ট পয়সা হাতে পাইয়াছে, তাহার পিসেমহাশয় অপুত্রক, তাঁহার সম্পত্তি ও কলিকাতার দু'খানা বাড়ি দেবব্রতই পাইবে। কিন্তু পয়সা অপব্যয় করার দিকে দেবব্রতের ঝোঁক নাই, সে খুব হিসাবী ও সতর্ক এ বিষয়ে।

সাংসারিক বিষয়ে দেবব্রত খুব হুঁশিয়ার—পাটনায় যে চাকরিটা সে সম্প্রতি পাইয়াছে, সে শুধু তাহার যোগাড়-যন্ত্র ও সুপারিশ ধরিবার কৃতিত্বের পুরস্কার—নতুবা কুড়ি-বাইশ জন বিলাত-ফেরত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের দরখাস্তের মধ্যে তাহার মত তরুণ ও অনভিজ্ঞ লোকের চাকুরি পাইবার কোনই আশা ছিল না। শাঁখারিটোলায় দেবব্রতের পিসেমহাশয় তারিণী মিত্রের বাড়ি হইতেই দেবব্রত বিবাহ করিতে গেল। পিসিমার ইচ্ছা ছিল খুব বড় একটা মিছিল করিয়া বর রওনা হয়, কিন্তু পিসেমহাশয় বুঝাইলেন ও-সব একালের ছেলে—বিশেষ করিয়া দেবব্রতের মত বিলাত-ফেরত ছেলে—পছন্দ করিবে না। মায়ের নিকট বিবাহ করিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার সময় দেবব্রতের চোখ ভিজিয়া উঠিল—স্বর্গগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া দেবব্রতর মা-ও চোখের জল ফেলিলেন সবাই বকিল, তিরস্কার করিল। একজন প্রতিবেশিনী হাসিয়া বলিলেন—দোর-ধরুণীর টাকা কৈ?···

দেবব্রতর পিসিমা বলিলেন—আমার কাছে গুণে নিও মেজবৌ। ও-কি দোর-ধরা হ'ল? আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাঙ্গাল দেশে নিয়ম ছিল দেখেছি সাতজন এয়ো আর সাতজন কুমারী এই চোদ্দজনকে দোর-ধরুণীর টাকা দিয়ে তবে বর বেরুতে পেত বাড়ি থেকে। একালে তো সব দাঁড়িয়েছে—

দেবব্রত একটুখানি দাঁড়াইল। ফিরিয়া বলিল—মা শোন একটু।···

আড়ালে গিয়া চুপি চুপি বলিল—চাটুয্যে বাড়ির মেয়েটা দোর ধরার জন্যে দাঁড়িয়েছিল, আমি জানি, ছোট পিসিমা তাকে সরিয়ে দিয়েছেন—এ-সবেতে আমার মনে বড় কষ্ট হয়, মা। এই দশ টাকার নোটটা রাখো, তাকে তুমি দিও—কেন তাকে সরালে বল তো—আমি জানি অবশ্য কেন সরিয়েছে—কিন্তু এতে লোকের মনে কষ্ট হয় তাও ওরা বোঝে না!

মা বলিলেন—ও-কথা তোর ওদের বলবার দরকার নেই—টাকা দিলি আমি দেবো এখন। ছোট ঠাকুরঝির দোষ কি, বিধবা মেয়েকে কি বলে আজ সামনে রাখে বল না? হিঁদুর নিয়মগুলো তো মানতে হবে, সবাই তো তোমার মত বেহ্মজ্ঞানী হয়নি এখনো। মেয়েটার দোষ দিইনে, তার আর বয়স কি—ছেলমানুষ—সে না-হয় অত বোঝে সোঝে না, আমোদে নেচে দোর ধরবে বলে দাঁড়িয়েছে—তার বাপ-মায়ের তো এটা দেখতে হয়। শুভকাজের দিন বিধবা মেয়েকে কেন এখানে পাঠানো বাপু? তা নয়—গরীব কিনা, পাঠিয়েছে—যা কিছু ঘরে আসে—যাক্। আমি দেবো এখন—তা হ্যাঁ রে পাঁচটা দিলেই তো হ'ত—এত কেন?···

—না মা ঐ থাক্, দিও। ছোটপিসিমাকে ব'লো বুঝিয়ে ওতে শুভকাজ

এগোয় না, আরও পিছিয়ে যায়।

দু-তিনখানা বাড়ির মোড়ে চাটুয্যে বাড়িটা। ইহারা সবাই ছাপাখানায় কাজ করে, বৃদ্ধ চাটুয্যেমশায়ও আগে কম্পোজিটরের কাজ করিতেন, আজকাল চোখে দেখেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজকাল তাঁহার কাজ প্রতিবেশীদের নিকট অভাব জানাইয়া আধুলি ধার করিয়া বেড়ানো। দেবব্রত ইঁহাদের সকলকেই অনেক দিন হইতে চেনে। তাহার গোলাপফুল সাজানো মোটরখানা চাটুয্যেবাড়ির সম্মুখে মোড় ঘুরিবার সময় দেবব্রত কেবলই ভাবিতেছিল, কোনও জানালার ফাঁক দিয়া তের বৎসরের বিধবা মেয়েটা হয়ত কৌতূহলের সহিত তাহাদের মোটর ও ফিটন গাড়ির সারির দিকে চাহিয়া আছে।

রাত্রের গোড়ার দিকেই বিবাহ ও বরযাত্রীভোজন মিটিয়া গেল।

দেবব্রত বাসরে গিয়া দেখিল, সেখানে অত্যন্ত ভিড়—বাসরের ঘর খুব বড় নয়—সামনের দালানেও স্থান নাই, অন্য অন্য ঘরের বাক্স তোরঙ্গ সব দালানে বাহির করা হইয়াছে; অথচ মেয়েদের ভিড় এত বেশী যে বসা তো দূরের কথা, সকলের দাঁড়াইবার জায়গাও নাই। সে বড় শালাকে বলিল—দেখুন, যদি অনুমতি করেন, একটু ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যে জাহির করি। এই ট্রাঙ্কগুলো এখানে রাখার কোন মানে নেই—লোক ডাকিয়ে দেওয়ালের দিকে এক সারি, এখানে আর এক সারি ক'রে দিন সিঁড়ির ধাপে ধাপে—বুঝলেন না?···যাবার আসবারও কষ্ট হবে না অথচ এদের জায়গা হবে এখন। তাহার ছোট শালীরা ব্যাপারটা লইয়া তাহাকে কি একটা ঠাট্টা করিল। সবাই হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি একটার পর কিন্তু যে-যাহার স্থানে চলিয়া গেল। দেবব্রত বাসর হইতে বাহির হইয়া দালানের একটা স্টীলের তোরঙ্গের উপর বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। তাহার মনে আনন্দের সঙ্গে কেমন একটা উত্তেজনা।···মনে মনে খুব একটা তৃপ্তিও অনুভব করিল।···জীবন এখন সুনির্দিষ্ট পথে চলিবে—লক্ষ্মী ছাড়ার জীবন শেষ হইল। পাটনার চাকুরিতে একটা সুবিধা এই যে, জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর, বাড়িভাড়া সস্তা, বছরে পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাহিনা বাড়িবে—তবে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সুদ কিছু কম। সে ভাবিল—যাই তো আগে, ফৈজুদ্দীন হোসেনকে একটু হাতে রাখতে হবে, ওর হাতেই সব—অন্য সব ডিরেক্টার তো কাঠের পুতুল। ক্যাণ্টনমেণ্টের ক্লাবে গিয়েই ভর্তি হয়ে যাবো—ওরা আবার ওসব দেখলে ভেজে কিনা!

নববধূ এখনও ঘুমায় নাই, দেবব্রত গিয়া বলিল—বাইরে এসো না সুনীতি,

কউ নেই। আসবে?

নববধূ চেলীর পুঁটুলি নয়, কিন্তু পায়ের জন্য তার উঠিতে কষ্ট হয়—দেবব্রত তাহাকে সযত্নে ধরিয়া দালানে আনিয়া তোরঙ্গটার উপর ধীরে ধীরে বসাইয়া দিল।

বধূ হাসিয়া বলিল—ওই দোরটা বন্ধ ক'রে দাও—সিঁড়ির ওইটে—শেকল টেনে দাও—হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে—নৈলে এক্ষুণি কেউ এসে পড়বে।

দেবব্রত পাশে বসিয়া বলিল—রাত জেগে কষ্ট হচ্ছে খুব—না?

—কি এমন কষ্ট, তা ছাড়া দুপুরবেলা আমি ঘুমিয়েছি খুব।

—আচ্ছা, তুমি কনে-চন্দন পরো নি কেন সুনীতি? এখানে যে চন্দন নেই?

মেয়েটি সলজ্জমুখে বলিল— মা পরাতে বলেছিলেন—

—তবে?

—জ্যাঠাইমা বললেন, তুমি নাকি পছন্দ করবে না।

দেবব্রত হাসিয়া উঠিয়া বলিল কেন বল তো—বিলেত-ফেরত বলে? বা ...

পরে সে বলিল—আমি সাত তারিখে পাটনায় যাব, বুঝলে তোমাকে আর ...কে এসে নিয়ে যাব মাস-দুই পরে, সুনীতি। তোমার বাবাকে বলে রেখেছি।

মেয়েটি নতমুখে বলিল—আচ্ছা একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না?···

—বল না, কি মনে করব?—

—আচ্ছা, আমার এই পা নিয়ে তুমি যে বিয়ে করলে, যদি আমার পা না ...রে? দ্যাখ, তোমার গা ছুঁয়ে সত্যি বলছি আমার ইচ্ছে ছিল না বিয়ের। ...কে কতবার বুঝিয়ে বলেছি, মা এই তো আমার পায়ের দশা, পরের ওপর ...র্থক কেন বোঝা চাপানো সারাজীবন—তা মা বললেন তুমি নাকি খুব ...তোমার নাকি খুব ইচ্ছে। আচ্ছা কেন বল তো এ মতি তোমার হ'ল?

দেবব্রত বলিল—স্পষ্ট কথা বললে তুমিও কিছু মনে করবে না সুনীতি? ...হলে বলি শোন, তোমার এই পায়ের দোষ যদি না হত তবে আমি অন্য ...গায় বিয়ে ক'রে ফেলতুম—যেদিন থেকে শুনেছি পায়ের দোষের জন্য তোমার ...য়ে এই তিন বছরের মধ্যে হয় নি—সেদিন থেকে আমার মন বলেছে ওখানেই ...য়ে করব, নয় তো নয়। অন্য জায়গায় বিয়ে করলে মনে শান্তি পেতাম ...সুনীতি। সেই যে তোমাকে দেখে গিয়েছিলুম, তারপর বিয়ে তখন ভেঙে ...ল, কিন্তু তোমার মুখখানা কতবার যে মনে হয়েছে!···কেন কে জানে—আমি ...ব্য করছি নে সুনীতি, ওসব আমার আসে না, আমি সত্যি কথা বলছি।

তারপর সে আজ ওবেলার চাটুয্যে-বাড়ির বিধবা মেয়েটির কথা বলিল। বলিল —দ্যাখ এও তো কাব্যের কথা নয়—আজ বিয়ের আসনে বসে কেবলই সেই ছোট মেয়েটার কথা মনে হয়েছে। ছোট পিসিমা তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আজ আমার অর্ধেক আনন্দ মাটি করেছেন সুনীতি -- তোমার কাছে বলছি, আর কাউকে ব'লো না যেন! এ কেউ বুঝবে না, আমার মা-ও বোঝেন নি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল।

কাজলের মুশকিল বাধে রোজ সন্ধ্যার সময়। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে তাহার মামীমা বলেন, ওপরে চলে যাও, শুয়ে পড় গিয়ে। কাজল বিপন্নমুখে রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। ওপরে কেউ নাই, মধ্যে একটা অন্ধকার সিঁড়ি, তাহার উপর দোতলার পাশের ঘরটাতে আলনায় একরাশ লেপকাঁথা বাঁধা আছে। আধ-অন্ধকারে সেগুলো এমন দেখায়

আগে আগে দিদিমা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিতেন। দিদিমা আর নাই, মামীমারা খাওয়াইয়া দিয়াই খালাস। সেদিন সে সেজ দিদিমাকে বলিয়াছিল। তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এখন তোমায় যাই শোওয়াতে! একা এটুকু আর যেতে পারেন না, সেদিন তো পীরপুরের হাটে একা পালিয়ে যেতে পেরেছিলে ছেলের ন্যাক্‌রা দেখে বাঁচিনে!

নিরুপায় হইয়া ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতে আর সাহস না করিয়া প্রথমটা দোরের কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। কোণে কাঁড় আলনার নীচে দাদামহাশয়ের একরাশ পুরানো হুঁকার খোল ও হুঁকাদান এককোণে মিটমিটে তেলের প্রদীপ, তাতে সামান্য একটুখানি আলো হয় মা কোণের অন্ধকার তাহাতে আরও যেন সন্দেহজনক দেখায়। এখানে একব আসিলে আর কেহ কোথাও নাই, ছোট মামীমা নাই, ছোটদিদিমা নাই, দলু না টাঁটি নাই - শুধু সে আর চারিপাশের এই-সব অজানা বিভীষিকা। কিন্তু এখানে বা সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে? ছোট মাসীমা ও বিন্দু-ঝি এ ঘরে শো তাহাদের আসিতে এখনও বহু দেরি, শীতের হাওয়ায় হাড়-কাঁপুনি ধরিয়া য যে! অগত্যা সে অন্যান্য দিনের মত চোখ বুজিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিজে বিছানার উপর উঠিয়াই ছোট লেপটা একেবারে মুড়ি দিয়া ফেলে। কি বেশীক্ষণ লেপমুড়ি দিয়া থাকিতে পারে না—ঘরের মধ্যে কোন কিছু নাই তো

মুখ খুলিয়া একবার ভীতচোখে চারিধারে চাহিয়া দেখিয়া আবার লেপমুড়ি দেয় —আর যত রাজ্যের ভূতের গল্প কি ঠিক ছাই এই সময়টাতেই মনে আসে ?

দিদিমা থাকিতে এ-সব কষ্ট ছিল না। দিদিমা তাহাকে ঘুম না পাড়াইয়া নামিতেন না। কাজল উপরে আসিয়াই বিছানার উপরকার সাজানো লেপ-কাঁথার স্তূপের উপর খুশী ও আমোদের সহিত বার বার লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইতে থাকিত—আমি জলে ঝাঁপাই—হি-হি—আমি জলে ঝাঁপাই—ও দিদিমা—হি-হি—

কোনোরকমে দিদিমা তাহার লাফানো হইতে নিবৃত্ত করিয়া শোয়াইতে কৃতকার্য হইলে সে দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত,—এইবার একটা গ-গ-অ-প্প!—কথার শেষের দিকে পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটি ফুলের কুঁড়ির মত এক জায়গায় জড় করিয়া না আনিলে কথা মুখ দিয়া বাহির হইত না। তাহার দিদিমা হাসিয়া বলিত—যে গুড় খাস, খেয়ে খেয়ে এমনি তোৎলা। গল্প বলব, কিন্তু তুমি পাশ ফিরে চুপটি ক'রে শোবে, নড়বেও না, চড়বেও না। কাজল ভ্রূ কুঁচকাইয়া ঘাড় সামনের দিকে নামাইয়া থুৎনী প্রায় বুকের উপর লইয়া আসিত। পরে চোখের ভুরু উপরের দিকে উঠাইয়া হাসি-ভরা চোখে চুপ করিয়া দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। দিদিমা বলিত, দুষ্টুমি ক'রো না দাদাভাই, আমার এখন অনেক কাজ, তোমার দাদু আবার এখুনি পাশার আড্ডা থেকে আসবেন, তাঁকে খেতে দেব। ঘুমোও তো লক্ষ্মী ভাইটি! কাজল বলিত, ইল্লি! ...দা-দা-দাদুকে খাবার দেবে তো ছোট মামীমা, তু-তুমি এখন যাবে বৈ কি ?—একটা গ-গ-অ-প্প কর, হ্যাঁ দিদিমা—

এ ধরণের কথা সে শিখিয়াছে বড় মাসতুতো ভায়েদের কাছে। তাহার বড় মাসীমার ছেলে দলু কথায় কথায় বলে ইল্লি! কাজলও শুনিয়া শুনিয়া তাহাই ধরিয়াছে।

তাহার পর দিদিমা গল্প করিতেন, কাজল জানালার বাহিরে তারাভরা, স্তব্ধ, নৈশ আকাশের দিকে চাহিয়া একবার মুখ ফুলাইত আবার হাঁ করিত, আবার ফুলাইত আবার হাঁ করিত। দিদিমা বলিত, আঃ, ছিঃ দাদু। ও-রকম দুষ্টুমি করলে ঘুমুবে কখন ? এখুনি তোমার দাদু ডাকবেন আমায়, তখন তো আমায় যেতে হবে। চুপটি ক'রে শোও? নইলে ডাকব তোমার দাদুকে ?

দাদামশায়কে কাজল বড় ভয় করে, এইবার সে চুপ হইয়া যাইত। কোথায় গেল সেই দিদিমা! সে আরও বছর দেড় আগে, তখন তাহার বয়স সাড়ে-চার বছর —একদিন ভারী মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সে রাত্রে ঘুমাইতেছিল, সকালে

উঠিলে অনু চুপি চুপি বলিল—ঠাকুমা কাল রাতে মারা গিয়েছে, জানিস ?
কাজল ?

—কো-কোথায় গিয়েছে ?

—মারা গিয়েছে, সত্যি আজ শেষরাত্রে নিয়ে গিয়েছে। তুই ঘুমুচ্ছিলি তখন।

—আবার ক-কবে আসবে ?

অনু বিজ্ঞের স্বরে বলিল—আর বুঝি আসে ? তুই যা বোকা ! ঠাকুরমাকে তো পোড়াতে নিয়ে চলে গেছে ওই দিকে।—সে হাত তুলিয়া নদীর বাঁকের দিক দেখাইয়া দিল।

অনু ভারি চালবাজ। সব তাতেই ওইরকম চাল দেয়, ভারী তো ... বছরের বড়, দেখায় যেন সব জানে, সব বোঝে। ওই চালবাজীর জন্যই তো কাজল অনুকে দেখিতে পারে না।

সে খুব বিস্মিত হইল। দিদিমা আর আসিবে না ! কেন ?···কি হইল দিদিমার ?···বা রে !

কিন্তু সেই হইতে দিদিমাকে আর সে দেখিতে পায় নাই। গোপনে গোপনে অনেক কাঁদিয়াছে, কোথায় দিদিমা এরকম একরাত্রের মধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়াছে, কিছু ঠিক করিতে পারে নাই।

আজকাল আর কেহ কাছে বসিয়া খাওয়ায় না, সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আসে না, গল্প করে না। একলাটি এই অন্ধকারের মধ্য দিয়া আসিয়া উপরের ঘরে শুইতে হয়। সকলের চেয়ে মুশকিল হইয়াছে এইটাই বেশী কি-না !

অপরাজিত বিংশ পরিচ্ছেদ

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চৈত্র মাস যায়-যায়।

অপু অনেকদিন পরে দেশে ফিরিতেছিল। গাড়ির মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোক লক্ষ্ণৌ-এর খরমুজার গুণবর্ণনা করিতেছিলেন, অনেকে মন দিয়া শুনিতেছিল—অপু অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল। কতক্ষণে গাড়ি বাংলা দেশে আসিবে ? সাতসমুদ্র তেরোনদী পারের রূপকথার রাজ্য বাংলা ! আজ দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বৎসর সে বাংলার শান্ত, কমনীয় রূপ দেখে নাই।

ই বৈশাখে বাঁশের বনে বনে শুকনো বাঁশখোলার তলা-বিছাইয়া-পড়িয়া-থাকা, লেবুফুলে-ভরা সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটে সদ্যস্নাত নতমুখী তরুণীর মূর্তি —কলিকাতার মেস-বাড়ী, দালানের নীলচে-এ ল্যাম্প জ্বালা—দেওয়ালে বাবুরা সব অফিসে, নিচের বারান্দায় ঝিটা কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছে এসব সুপরিচিত এই প্রিয় দৃশ্যগুলি আর একবার দেখিবার জন্য—উঃ, মন কি ছটফটই না করিয়াছে গত ছ'বছর! বাংলা ছাড়িয়া সে ভাল করিয়া বাংলাকে চিনিয়াছে, বুঝিয়াছে। কতক্ষণে বাংলাকে দেখা যাইবে আজ? সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময়।

রাণীগঞ্জ ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিবার পরে, বালুময় মাঠের মধ্যে সিঙ্গারণ র গ্রীষ্মের জল খররৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে—দূরে গ্রামের মেয়েরা আসিয়া খাতের বালু খুঁড়িয়া সেই জলে কলসী ভর্তি করিয়া লইতেছে—একটি যুবক-বধূ জল-ভরা কলসী কাঁখে রেলের ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া গাড়ি দেখিতেছে—অপু দৃশ্যটা দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল—সারা শরীরে একটা অপূর্ব আনন্দ-শিহরণ! কতদিন বাংলার মেয়ের এ পরিচিত ভঙ্গিটি সে দেখে নাই! চোখ, মন জুড়াইয়া গেল।

বর্ধমান ছাড়াইয়া নিদাঘ অপরাহ্নের ঘন ছায়ায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। একটা ছোট পুকুর প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে একেবারে ভরা, ফুলে পাতায় জল দেখা যায় না—ওপারে বিচালি-ছাওয়া গৃহস্থের বাড়ী, একটা প্রাচীন সজিনা গাছ জলের ধারে ভাঙিয়া পড়িয়া গলিয়া খসিয়া যাইতেছে, একটা গোবরগাদা—আজ সারাদিনের আগুন-বৃষ্টির পরে, বিহার ও সাঁওতাল পরগণার বন্ধুর, আগুন-রাঙা ভূমিশ্রীর পরে, ছায়াভরা পদ্মপুকুরটা যেন সারা বাংলার কমনীয় রূপের প্রতীক হইয়া তাহার চোখে দেখা দিল।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা আসিয়া দাঁড়াইতেই সে যেন খানিকটা অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এত আলো, এত লোকজন, এত ব্যস্ততা, এত গাড়ি-ঘোড়া জীবনে যেন সে এই প্রথম দেখিতেছে, হাওড়া পুল পার হইবার সময় ওপারের আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর দৃশ্যে সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল—ওগুলো কি? মোটর বাস? কই আগে তো ছিল না কখনও? কি বড় বড় বাড়ি কলিকাতায়, ফুটপাতে কি লোকজনের ভিড়! বাড়ির মাথায় একটা কিসের বিজ্ঞাপনের বিজলী আলোর রঙীন হরপ একবার জ্বলিতেছে, আবার নিভিতেছে—উঃ, কী কাণ্ড!

হ্যারিসন রোডের একটা বোর্ডিং-এ উঠিয়া একা একটা ঘর লইল—স্নানের ঘর হইতে সাবান মাখিয়া স্নান সারিয়া সারাদিনের ধুমধুলি ও গরমের পর ভারী আরাম পাইল। ঘরের আলোর সুইচ টিপিয়া ছেলেমানুষের মত আনন্দে আলোটাকে একবার জ্বালাইতে একবার নিভাইতে লাগিল—সবই নতুন মনে হয়। সবই অদ্ভুত লাগে।

পরদিন সে কলিকাতার সর্বত্র ঘুরিল—কোন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা হইল না। বৌবাজারের সেই কবিরাজ বন্ধুটি বাসা উঠাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, পূর্বপরিচিত মেসগুলিতে নতুন লোকেরা আসিয়াছে, কলেজ স্কোয়ারের সেই পুরাতন চায়ের দোকানটি উঠিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় সে একটা নতুন বাংলা থিয়েটারে গেল শুধু বাংলা গান শোনার লোভে। বেশী দামের টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের সারির আসনে বসিয়া পুলকিত ও উৎসুক চোখে সে চারিদিকের দর্শকের ভিড়টা দেখিতেছিল। একটা অঙ্কের শেষে সে বাহিরে আসিল, ফুটপাতে একজন বুড়ী পান বিক্রী করিতেছে, অপুকে বলিল, বাবু, পান নেবেন না? নেন না! অপু ভাবিল, সবাই মিঠে পান কিনছে বড় আয়নাওয়ালার দোকান থেকে। এ বুড়ীর পান বোধ হয় কেউ কেনে না—আহা, নিই এর কাছ থেকে।

সকলেরই উপর কেমন একটা করুণার ভাব, সবারই উপর কেমন একটা ভালবাসা, সহানুভূতির ভাব—অপুর মনের বর্তমান অবস্থায় বুড়ী পানওয়ালী হাত পাতিয়া দশটা টাকা চাহিয়া বসিলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে পারিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সে বাহির হইয়া বুড়ীটার কাছে পান কিনিতে যাইতেছে, এমন সময় পিছনের আসনের দিকে তাহার নজর পড়িল।

সে একটু আগাইয়া গিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিল—সুরেশ্বরদা, চিনতে পারেন?

কলিকাতায় প্রথম ছাত্র-জীবনের সেই উপকারী বন্ধু সুরেশ্বরদা, সঙ্গে একটি তরুণী মহিলা। সুরেশ্বর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গুডনেস্ গ্রেসাস্! আমাদের সেই অপূর্ব না?

অপূর্ব হাসিয়া বলিল—কেন, সন্দেহ হচ্ছে না কি? ওঃ কত দিন পরে আপনার সঙ্গে, ওঃ?

—দেখে সন্দেহ হবার কথা বটে। মুখের চেহারা বদলেছে, রঙটা একটু তামাটে—যদিও you are as handsome as ever—ও, তোমার সঙ্গে আলাপ

করিয়ে দি—ইনি আমার বেটার-হাফ—আর ইনি আমার বন্ধু অপূর্ববাবু—কবি, ভাবুক, লেখক, ভবঘুরে এ্যাণ্ড হোয়াট নট্—তারপর, কোথায় ছিলে এতদিন ?

—কোথায় ছিলুম না তাই বরং জিজ্ঞেস করুন—in all sorts of places—তবে সভ্য জগৎ থেকে দূরে—ছ'বছর 'পর কাল কলকাতায় এসেছি। ও ড্রপ উঠল বুঝি, এখন থাক, বলব এখন।

—মোস্ট বাজে প্লে। তার চেয়ে চলো, তোমার সঙ্গে বাইরে যাই—

অপু বন্ধুকে সিগারেট দিয়া নিজে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল—আপনার এ-সব দেখে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, তাই ভাল লাগছে না বোধ হয়। আমার চোখ নিয়ে যদি দেখতেন, তবে ছ'বছর বনবাসের পর উড়িয়াদের রামযাত্রাও ভাল লাগত। জানেন সুরেশ্বরদা, সেখানে আমার ঘর থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একটা গিরগিটি থাকত—সেটা এবেলা-ওবেলা রঙ বদলাত, দু'টি বেলা তাই শখ ক'রে দেখতে যেতুম—তাই ছিল একমাত্র তামাশা, তাই দেখে আনন্দ পেতুম।

রাত সাড়ে ন'টায় থিয়েটার ভাঙিল। তারপর সে থিয়েটার-ঘর হইতে নিঃসৃত সুবেশ নরনারীর স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিল—এই আলো. লোকজন, সাজানো দোকানপসার—এসব সে ছেলেমানুষের মত আনন্দে চাহিয়া চাহিযা দেখিতেছিল।

স্ত্রীকে মানিকতলায় শ্বশুরবাড়িতে নামাইয়া দিয়া সুরেশ্বর অপুর সহিত কর্পোরেশন স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় গিয়া উঠিল। অপুর কথা সব শুনিয়া বলিল—এই পাঁচ বছর ওখানে ছিলে ? মন-কেমন করত না দেশের জন্যে ?

—Oh, at times I felt so terribly homesick—homesick for Bengal—শেষ দু-বছর দেশ দেখবার জন্য পাগল হয়েছিলুম—।

ফুটপাত বাহিয়া কয়েকটি ফিরিঙ্গি মেয়ে হাসি কলরব করিতে করিতে পথ চলিতেছে, অপু সাগ্রহে সেদিকে চাহিয়া রহিল। মানুষের গলার সুর মানুষের কাছে এত কাম্যও হয়। রাস্তাভরা লোকজন, মোটর গাড়ি, পাশের একটি একতলা বাড়িতে সাজানো গোছানো ছোট্ট ঘরে কয়েকটি সাহেবের ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করিয়া খেলা করিতেছে—সবই অদ্ভুত, সবই সুন্দর বলিয়া মনে হয়। আলোকোজ্জ্বল রেস্তোরাঁটায় অনবরত লোকজন ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে, মোটর হর্নের আওয়াজ, মোটর বাইকের শব্দ, একখানা রিক্সা গাড়ি ঠুং ঠুং করিতে করিতে চলিয়া গেল—অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—যেন এসব সে কখনও দেখে নাই।

সুরেশ্বরকে বলিল—দেখুন জানলার ধারে এসে—ঐ যে নক্ষত্রটা দেখছেন, আজ ক'বছর ধরে ওটাকে উঠতে দেখেছি ঘন বন-জঙ্গল-ভরা পাহাড়ের মাথার ওপরে। আজ ওটাকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর বাড়ির মাথার ওপরে উঠতে দেখে কেমন নতুন নতুন ঠেকছে। এই তো পোনে দশটা রাত? এ সময় গত পাঁচ বৎসর শুধু আমি জঙ্গল পাহাড়—আর ভেভিয়ার ডাক, কখনো কখনো বাঘের ডাকও—। আর কি! ne jes[illegible]! শহরে বসে সে সব বোঝা যাবে না।

সুরেশ্বরও নিজের কথা বলিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন কলেজের অধ্যাপক, বিবাহ করিয়াছে কলিকাতায়। সম্প্রতি শালীর বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছে। বলিল—দ্যাখ ভাই, তোমার ও জীবন একবার আস্বাদ করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু তখন কি জানতুম বিয়ে এমন জিনিস হয়ে দাঁড়াবে? যদি কিছু করতে চাও জীবনে, বিয়ে ক'রো না কখনও, বলে দিলুম। বিয়ে করো নি ত?

অপু হাসিয়া বলিল—ওঃ, আমি ভাবছি আপনার এ লেকচার যদি বৌদি শুনতেন!···

—না না, শোনো। সত্যি বলছি, যে উনিশ-শো পনেরো সালের সুরেশ্বর আর নেই আমি। সংসারের হাড়িকাঠে যৌবন গিয়েছে, শক্তি গিয়েছে, স্বপ্ন গিয়েছে, জীবনটা বৃথা খুইয়েছি কত কি করবার ইচ্ছে ছিল ওঃ, যেদিন এম. এ. ডিপ্লোমাটা নিয়ে কনভোকেশন হল থেকে বেরুলাম, মনে আছে মাঘের শেষ, গোলদীঘির দেবদারু গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, সবে দখিনা হাওয়া শুরু হয়েছে, গাউন সমেত এক দোকানে গিয়ে ফটো ওঠালুম, কি খুশী! মনে হ'ল, সারা পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায়! ফটোখানা আজও আছে—চেয়ে দেখে ভাবি, কি ছিলুম, কি হয়ে দাঁড়িয়েছি! পাড়াগাঁয়ের কলেজে তিনশো চব্বিশ দিন একই কথা আওড়াই, দলাদলি করি, প্রিন্সিপ্যালের মন যোগাই, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করি, ছেলেদের ডাক্তার দেখাই, এর মধ্যে মেয়ের বিয়ের ভাবনাও ভাবি—না না, তুমি হেসো না, এসব ঠাট্টা নয়।

অপু বলিল—এত সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়লেন কেন হঠাৎ সুরেশ্বরদা—এক পেয়ালা কফি—

—না না, তোমাকে পেয়ে সব বললুম, কারুর কাছে বলি নে,কে বুঝবে, তারা সবাই দেখছে, দিব্যি চাকরি করছি, মাইনে বাড়ছে, তবে তো বেশই আছি। আমি যে মরে যাচ্ছি, তা কেউ বুঝবে না।

রেস্তোরাঁ হইতে বাহির হইয়া পরস্পর বিদায় লইল। অপু বলিল—জানেন

তো বলেছে—In each of us a child has lived and a child has died—a child of promise, who never grew up—কিন্তু জীবনটা অদ্ভুত জিনিস সুরেশ্বরদা—অত সহজে তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আচ্ছা আসি, বড় আনন্দ পেলুম আজ। যখন প্রথম কলকাতায় পড়তে আসি, জায়গা ছিল না, তখন আপনারা জায়গা দিয়েছিলেন, সে কথা ভুলি নি এখনও।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে ঘুমাইয়া কাটাইল। বৈকালের দিকে ভবানীপুরে লীলার মামার বাড়ি গেল। অনেক দিন সে লীলার কোন সংবাদ জানে না—দূর হইতে লাল ইটের বাড়িটা চোখে পড়িতেই একটা আশা ও উদ্বেগে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল, লীলা এখানে আছে, না নাই—যদি গিয়া দেখে সে আছে! সেই একদিন দেখা হইয়াছিল অপর্ণার মৃত্যুর পূর্বে! আজ আট বৎসর হইতে চলিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন দিন দেখা হয় নাই।

প্রথমেই দেখা হইল লীলার ভাই বিমলেন্দুর সঙ্গে। সে আর বালক নাই, খুব লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের চেহারা অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে। বিমলেন্দু প্রথমটা যেন অপুকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বৈঠকখানার পাশের ঘরে লইয়া বসাইল। দু'পাঁচ মিনিট এ কথা ও-কথার পরে অপু যতদূর সম্ভব সহজ স্বরে বলিল—তারপর তোমার দিদির খবর কি—এখানে না শ্বশুরবাড়ি?

বিমলেন্দু কেমন একটা আশ্চর্য সুরে বলিল—ও, ইয়ে আসুন আমার সঙ্গে—চলুন।

কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় অপুর মন ভরিয়া উঠিল, ব্যাপার কি? একটু পরে গিয়া বিমলেন্দু রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া নিচু সুরে বলিল—দিদির কথা কিছু শোনেন নি আপনি?

অপু উদ্বিগ্নমুখে বলিল—না—কি? লীলা আছে তো?

—আছেও বটে, নেইও বটে। সে সব অনেক কথা, আপনি ফ্যামিলির ফ্রেণ্ড বলে বলছি। দিদি ঘর ছেড়েছে। স্বামী গোড়া থেকেই ঘোর মাতাল—অতি কু-চরিত্র। বেণ্টিক স্ট্রীটের এক ইহুদী মেয়েকে নিয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রে দিলে—তাকে নিজের বাসাতে রাত্রে নিয়ে যেতে শুরু করলে। দিদিকে জানেন তো? তেজী মেয়ে, এ সব সহ্য করার পাত্রী নয়—সেই রাত্রেই ট্যাক্সি ডাকিয়ে পদ্মপুকুরে চলে আসে নিজের ছোট মেয়েটাকে নিয়ে। মাস দুই পর একদিন দাদাবাবু এল, মেয়েকে সিনেমা দেখাবার ছুতো ক'রে নিয়ে গেল জব্বলপুরে—

আর দিদির কাছে পাঠায় না। তারপর দিদি যা করেছে—সে যে আবার দিদি করতে পারত তা কখনও কেউ ভাবে নি। হীরক সেনকে মনে আছে? সেই যে ব্যারিস্টার হীরক সেন, আমাদের এখানে পার্টিতে দেখেছেন অনেকবার। সেই হীরক সেনের সঙ্গে দিদি একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এক বৎসর কোথায় রইল —আজকাল ফিরে এসেছে, কিন্তু হীরক সেনকে ছেড়েছে। একা আলিপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। এ বাড়িতে তার নাম আর করার উপায় নেই। মা কাশীবাসিনী হয়েছেন, আর আসবেন না।

কথা শেষ করিয়া বিমলেন্দু নিজেকে একটু সংযত করার জন্যই বোধ হয় একটু চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল,—হীরক সেন কিছু না—এ শুধু তার একটা শোধ তোলা মাত্র, সেন তো শুধু উপলক্ষ। আচ্ছা, তবে আসি অপূর্ববাবু, এখন কিছু দিন থাকবেন তো এখানে?—বিমলেন্দু চলিয়া যায় দেখিয়া অপু কথা খুঁজিয়া পাইল, তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা ধরিয়া অকারণে বলিল,—শোনো, শোনো, লীলা আলিপুরে আছে তা হলে?

এ প্রশ্ন সে করিতে চাহে নাই, সে জানে এ প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। কিন্তু একসঙ্গে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল—কোন্‌টা সে জিজ্ঞাসা করিবে?

বিমলেন্দু বলিল,—এতে আমাদের যে কি মর্মান্তিক—বর্ধমানে আমাদের বাড়ির সেই নিস্তারিণী ঝিকে মনে আছে? সে দিদিকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছে, পুজোর সময় বাড়ি গেলুম, সে ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল। সে-বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত করার জো নেই। রমেনদা আজকাল বাড়ির মালিক, বুঝলেন না? দিদিও সুখে নেই, বলবেন না কাউকে. আমি লুকিয়ে যাই, এত কাঁদে মেয়ের জন্যে! হীরক সেন দিদির টাকাগুলো দু হাতে উড়িয়েছে. আবার বলেছিল বিলেতে বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই লোভ দেখিয়েই নাকি টানে —দিদি আবার তাই বিশ্বাস করত। জানেন তো দিদিরও ঝোঁক আছে, চিরকাল।

বিমলেন্দু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, অপু আবার গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—তুমি মাঝে মাঝে কোন সময়ে যাও?—বিমলেন্দু বলিল,—রোজ যে যাই তা নয়, বিকেলে দিদি মোটরে বেড়াতে আসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে, ঐখানে দেখা করি।

বিমলেন্দু চলিয়া গেলে অপু অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে রসা রোডে

আসিয়া পড়িল—কি ভাবিতে ভাবিতে সে শুধুই হাঁটিতে লাগিল। পথের ধারে একটা পার্ক, ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে। দড়ি ঘুরাইয়া ছোট মেয়েরা লাফাইতেছে, সে পার্কটায় ঢুকিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিল। লীলার উপর রাগ বা অভিমান কোনটাই হইল না, সে অনুভব করিল, এত ভালবাসে নাই সে কোনদিনই লীলাকে। এই আট বৎসরে লীলা তো তাহার কাছে অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ পর্যন্ত ভাল মনে হয় না, অথচ মনের কোন্ গোপন অন্ধকার কোণে এত ভালবাসা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার জন্য! ভাবিল, ওর দাদামশায়েরই যত দোষ, কে এ বিয়ে দিতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল তাঁকে বেচারী? লীলা! সবাই মিলে ওর জীবনটা নষ্ট ক'রে দিলে!

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবার পরে সে বাসা বদলাইয়া অন্য এক বোর্ডিং-এ গিয়া উঠিল। পুরানো দিনের কষ্টগুলো আবার সবই আসিয়া জুটিয়াছে—একা একঘরে থাকিবার মত পয়সা হাতে নাই, অথচ দুই তিনটি কেরানীবাবুর সঙ্গে একঘরে থাকা আজকাল তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। লোক তাঁহারা ভালই, অপুর চেয়ে বয়স অনেক বেশী, সংসারী, ছেলেমেয়ের বাপ। ব্যবহারও তাঁহাদের ভাল। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাদের মনের ধারা যে-পথ অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে অপু তাহার সহিত আদৌ পরিচিত নয়। সে নির্জনতাপ্রিয়, একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, সেইটাই এখানে হইবার জো নাই। হয়ত সে বৈকালের দিকে বারান্দাটাতে সবে আসিয়া বসিয়াছে—কেশববাবু হুঁকা হাতে পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—এই যে অপূর্ববাবু, একাটি বসে আছেন? চৌধুরী ব্রাদার্স বুঝি এখনও আফিস থেকে ফেরেন নি? আজ শোনেন নি বুঝি মোহনবাগানের কাণ্ডটা? আরে রামোঃ—শুনুন তবে—

কলিকাতা তাহার পুরাতন রূপে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই ধুলো, ধোঁয়া, গোলমাল, একঘেয়েমি, সঙ্কীর্ণতা, সব দিনগুলা এক রকমের হওয়া—সেই সব।

সে চলিয়া আসিত না, কিংবা হয়ত আবার এতদিনে চলিয়া যাইত, মুশকিল এই যে, মিঃ রায়চৌধুরীও ওখানকার কাজ শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী গড়িবার চেষ্টায় আছেন, অপুকে তাঁহার আফিসে কাজ দিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু অপু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, গত ছ' বছরের জীবনের পরে আবার কি সে আফিসের ডেস্কে বসিয়া কেরানীগিরি করিতে

পারিবে? এদিকে পয়সা ফুরাইয়া আসিল যে! না করিলেই বা চলে কিসে?

সেখানে থাকিতে এই ছয় বৎসরে যা হইয়াছিল, অপু বোঝে এখানে তা চব্বিশ বৎসরেও হইত না। আর্টের নতুন স্বপ্ন সেখানে সে দেখিয়াছে।

ওখানকার সূর্যাস্তের শেষ আলোয়, জনহীন প্রান্তরে, নিস্তব্ধ আরণ্যভূমির মায়ায়, অন্ধকার-ভরা নিশীথ রাত্রির আকাশের নীচে, শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসভরা দুপুরের রোদে সে জীবনের গভীর রহস্যময় সৌন্দর্যকে জানিয়াছে।

কিন্তু কলিকাতার মেসে তাহা তো মনে আসে না—সে ছবিকে চিন্তায় ও কল্পনায় গড়িয়া তুলিতে গভীরভাবে নির্জন চিন্তার দরকার হয়—সেইটাই তাহার হয় না এখানকার মেস-জীবনে। সেখানে তাহার নির্জন প্রাণের গভীর, গোপন আকাশে সত্যের যে নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতিষ্মান্ হইয়া দেখা দিয়াছিল, এখানকার তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তাহারা চিরদিনই অপ্রকাশ রহিয়া যাইত।

মনে আছে সে ভাবিয়াছিল, ঐ সৌন্দর্যকে, জীবনের ঐ অপূর্ব রূপকে সে যতদিন কালিকলমে বন্দী করিয়া দশজনের চোখের সামনে না ফুটাইতে পারিবে—ততদিন সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না।

আর একদিন সেখানে সে কি অদ্ভুত শিক্ষাই না পাইয়াছিল!

ঘোড়া করিয়া বেড়াইতেছিল। এক জায়গায় বনের ধারে ঝোপের মধ্যে অনেক লতাগাছে গা লুকাইয়া একটা তেলাকুচা গাছ। তেলাকুচা বাংলার ফুল—অপরিচিত মহলে একমাত্র পরিচিত বন্ধু, সেখানে দাঁড়াইয়া গাছটাকে দেখিতে বড় ভাল লাগিতেছিল।...তেলাকুচা লতার পাতাগুলা সব শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল অগ্রভাগে ঝুলিতেছিল একটা আধ-পাকা ফল। তারপর দিনের পর দিন সে ঐ লতাটার মৃত্যু-যন্ত্রণা লক্ষ্য করিয়াছে। ফলটা যতই পাকিয়া উঠিতেছে, বোঁটার গোড়ায় যে অংশ সবুজ ছিল, সেটুকু যতই রাঙা সিঁদুরের রং হইয়া উঠিতেছে, লতাটা ততই দিন দিন হলদে শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া আসিতেছে।

একদিন দেখিল, গাছটা সব শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটাও বোঁটা শুকাইয়া গাছে ঝুলিতেছে, তুলতুলে পাকা, সিঁদুরের মত টুকটুকে রাঙা—যে কোন পাখি, বনের বানর কি কাঠবেড়ালীর অতি লোভনীয় আহার্য। যে লতাটা এতদিন ধরিয়া ন' কোটি মাইল দূরের সূর্য হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া, চারিপাশের বায়ুমণ্ডল হইতে উপাদান লইয়া মৃত, জড়পদার্থ হইতে এ উপাদেয় খাবার তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে—ঐ পাকা টুকটুকে ফলটাই তাহার

জীবনের চরম পরিণতি ! ফলটা পাখিতে কাঠবেড়ালীতে খাইবে, এজন্য গাছটাকে তাহারা ধন্যবাদ দিবে না ; তেলাকুচা লতাটা অজ্ঞাত, অখ্যাতই থাকিয়া যাইবে। তবুও জীবন তাহার সার্থক হইয়াছে,—ঐ টুকটুকে ফলটাতে ওর জীবন সার্থক হইয়াছে। যদি ফলটা কেউ না-ই খায় তাহাতেও ক্ষতি নাই, মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়া আরও কত তেলাকুচার জন্ম ঘোষণা করিবে, আরও কত লতা কত ফুল-ফল কত পাখির আহার্য !

মন তখন ছিল অদ্ভুত রকমের তাজা, সবল, গ্রহণশীল, সহজ আনন্দময়। তেলাকুচা-লতার এই ঘটনাটা তাহার মনে বড় ধাক্কা দিয়াছিল—সে কি ঐ সামান্য বন-ঝোপের তেলাকুচা-লতাটার চেয়েও হীন হইবে ? তাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য নাই ? সে জগতে কি কিছু দিবে না ?

সেখানে কতদিন শালবনের ছায়ায় পাথরের উপর বসিয়া দুপুরে এ প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে।…কত নিস্তব্ধ তারাভরা রাত্রে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁবুর বাহিরের ঘন নৈশ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই সব স্বপ্নই মনে জাগিত। বহু দূর,দূর ভবিষ্যতের শিরীষফুলের পাপড়ির মত নরম ও কচি মুখ কত শত অনাগত বংশধরদের কথা মনে পড়িত, খোকার মুখখানা কি অপূর্ব প্রেরণা দিত সে সময় !—ওদেরও জীবনে কত দুঃখরাত্রের বিপদ আসিবে, কত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইবে—তখন যুগান্তের এপার হইতে দৃঢ়হস্ত বাড়াইয়া দিতে হইবে তোমাকে—তোমার কত শত বিনিদ্র রজনীর মৌন জনসেবা, হে বিস্মৃত পথের মহাজন পথিক, একদিন সার্থক হইবে—অপরের জীবনে।

দুঃখের নিশীথে তাহার প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে—তা সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে, জীবনকে সে কি ভাবে দেখিল তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে।

নিজের প্রথম বইখানির দিনে দিনে প্রবর্ধমাণ পাণ্ডুলিপিকে সে সস্নেহ প্রতীক্ষার চোখে দেখে—বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কথা তাহার আগ্রহভরা বক্ষস্পন্দনে আশা, আনন্দের সঙ্গীত জাগায়—মা যেমন শিশুকে চোখের সম্মুখে কান্নাহাসির মধ্য দিয়া বাড়িতে দেখেন,দুরু-দুরু বক্ষে তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবেন—তেমনি।

বই-লেখার কষ্টটুকু করার চেয়ে বইয়ের কথা ভাবিতে ভাল লাগে। কাদের কথা বইয়ে লেখা থাকিবে ?—কত লোকের কথা। গরীবদের কথা। ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না।

পথে-ঘাটে, হাটে, গ্রামে, শহরে, রেলে কত অদ্ভুত ধরণের লোকের সঙ্গে

পরিচয় ঘটিয়াছে জীবনে—কত সাধু-সন্ন্যাসী, দোকানী, মাস্টার, ভিখারী, গায়ক, পুতুল-নাচওয়ালা, আম-পাড়ানি, ফেরিওয়ালা, লেখক, কবি, ছেলেমেয়ে—এদের কথা।

আজিকার দিন হইতে অনেক দিন পরে—হয়তো শত শত বৎসর পরে তাহার নাম যখন এ বছরের-ফোটা-শালফুলের মঞ্জরীর মত—কিংবা তাহার ঘরের কোণের মাকড়সার জালের মত—কোথায় মিলাইয়া যাইবে, তখন তাহার কত অনাগত বংশধর কত সকালে সন্ধ্যায়,মাঠে, গ্রাম্য নদীতীরে, দুঃখের দিনে, শীতের সন্ধ্যায় অথবা অন্ধকার গহন নিস্তব্ধ দুপুর-রাত্রে, শিশির-ভেজা ঘাসের উপর তারার আলোর নীচে শুইয়া শুইয়া তাহার বই পড়িবে—কিংবা বইয়ের কথা ভাবিবে!

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশঙ্কাও জাগে। যদি কেউ না পড়ে? আবার ভাবে, পৃথিবীর কোন্ অতীতে আদিম যুগের শিল্পীদল দুর্গম গিরিগুহার অন্ধকারে বৃষ, বাইসন, ম্যামথ আঁকিয়া গিয়াছিল—প্রাচীনদিনের বিস্মৃত প্রতিভা এতকাল পর তাহার দাবি আদায় করিতেছে—নতুবা ক্যাণ্টাব্রিয়া, দর্দঞ্ ও পিরেনিজের পর্বতগুহাগুলায় দেশবিদেশের মনীষী ও ভ্রমণকারীদের এত ভিড় কিসের? তেলাকুচা লতাটা শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে জীবন দিয়া ফলটাকে মানুষ করিয়া গিয়াছে যে! আত্মদানের ফল বৃথা যাইবে না। কত গাছ গজাইবে ওর বীজে—

নিজের প্রথম বইখানি—মনে কত চিন্তাই আসে। অনভিজ্ঞ মন সবতাতেই অবাক্ হইয়া যায়, সবতাতেই গাঢ় পুলক অনুভব করে।

এই তাহার বই লেখার ইতিহাস।

কিন্তু প্রথম ধাক্কা খাইল বইখানার পাণ্ডুলিপি হাতে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া। অজ্ঞাতনামা লেখকের বই কেহ লওয়া দূরে থাকুক, ভাল করিয়া কথাও বলে না। একটা দোকানে খাতা রাখিয়া যাইতে বলিল। দিন পাঁচেক পরে তাহাদের একখানা পোস্টকার্ড পাইয়া অপু ভাল কাপড় পরিয়া, জুতা বুরুশ করিয়া বন্ধুর চশমা ধার করিয়া দুরু-দুরু বক্ষে সেখানে গিয়া হাজির হইল। অত ভাল বই তাহার—পড়িয়া হয়ত উহারা অবাক হইয়া গিয়াছে।

দোকানের মালিক প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বলিল—ও! ওহে সতীশ, এঁর সেই খাতাখানা এঁকে দিয়ে দাও তো—বড় আলমারির

দেরাজে দেখো।

অপুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। খাতা ফেরত দিতে চায় কেন? সে বিবর্ণ মুখে বলিল—আমার বইখানা কি—

না। নতুন লেখকের বই নিজের খরচে তাহারা ছাপাইবে না। তবে যদি সে পাঁচ শত টাকা খরচ দেয়, তবে সে অন্য কথা। অপু অত টাকা কখনও এক জায়গায় দেখে নাই।

পরদিন সকালে বিমলেন্দু অপুর বাসায় আসিয়া হাজির। বৈকালে পাঁচটার সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে লীলা আসিবে, বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে তাহাকে লইয়া যাইতে।

বৈকালে বিমলেন্দু আবার আসিল। দু'জনে মাঠে গিয়া ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিবার পর বিমলেন্দু একটা হলদে রঙের মোটর দেখাইয়া বলিল, ঐ দিদি আসছে—আসুন, গাছতলায় গাড়ি পার্ক করবে, এখানে ট্র্যাফিক পুলিসে আজকাল বড় কড়কড়ি করে।

অপুর বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করিতেছিল। কি বলিবে, কি বলিবে সে লীলাকে?

বিমলেন্দু আগে আগে, অপু পিছনে পিছনে। লীলা গাড়ি হইতে নামে নাই, বিমলেন্দু গাড়ির জানালার কাছে গিয়া বলিল,—দিদি, অপূর্ববাবু এসেছেন, এই যে।—পরক্ষণেই অপু গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল—এই যে, কেমন আছ, লীলা?

সত্যই অপূর্ব সুন্দরী! অপুর মনে হইল, যে-কবি বলিয়াছেন, সৌন্দর্যই একটা মহৎ গুণ, যে সুন্দর তাহার আর কোন গুণের দরকার করে না, তিনি সত্যদর্শী, অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার উক্তি সত্য।

তবুও আগের লীলা নাই, একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের সে তরুণ লাবণ্য আর কই? মুখের পরিণত সৌন্দর্য ঠিক তাহার মা মেজবৌরানীর এ বয়সে যাহা ছিল তাই, সেই ছেলেবেলায় বর্ধমানের বাটীতে দেখা মেজবৌরানীর মুখের মত। উদ্দাম লালসামাখা সৌন্দর্য নয়—শান্ত, বরং যেন কিছু বিষণ্ণ।

বাড়ির বাহির হইয়া গিয়াছে যে-মেয়ে, তাহার ছবির সঙ্গে অপু কিছুতেই এই বিষণ্ণনয়না দেবীমূর্তিকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। লীলা ব্যস্ত হইয়া হাসিমুখে বলিল—এসো, অপূর্ব এসো। তুমি তো আমাদের ভুলেই গিয়েচ একেবারে। উঠে এসে বসো। চলো, তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। শোভা সিং, লেক—

লীলা মধ্যে বসিল, ও-পাশে বিমলেন্দু, এ-পাশে অপু, অপুর মনে পড়িল

বাল্যকাল ছাড়া লীলার এত কাছে সে আর কখনও বসে নাই। বার বার লীলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। এতকাল পরে লীলাকে আবার এত কাছে পাইয়াছে—বার বার দেখিয়াও যেন তৃপ্তি হইতেছিল না। লীলা অনর্গল বকিতেছিল, নানা রকম মোটরগাড়ির তুলনামূলক সমালোচনা করিতেছিল, মাঝে মাঝে অপুর সম্বন্ধে এটা-ওটা প্রশ্ন করিতেছিল। লেক দেখিয়া অপু কিন্তু নিরাশ হইল। সে মনে মনে ভাবিল—এই লেক। এরই এত নাম! এ কলকাতার বাবুদের ভাল লাগতে পারে—ভারী তো! লীলা আবার এরই এত সুখ্যাতি করছিল—আহা, বেচারী কলকাতা ছেড়ে বিশেষ কোথাও তো যায় নি!—লীলা পাছে অপ্রতিভ হয় এই ভয়ে সে নিজের মতটা আর ব্যক্ত করিল না। একটা নারিকেল গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা—সেখানে দু'জনে বসিল। বিমলেন্দু মোটর লইয়া লেক ঘুরিতে গেল। লীলা হাসিমুখে বলিল—তারপর, তুমি নাকি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলে?

—তোমার শ্বশুরবাড়ির দেশে গিয়েছিলুম—জব্বলপুরের কাছে।—বলিয়া ফেলিয়া অপু ভাবিল—কথাটা বলা ভাল হয় নাই, হয়তো লীলার মনে কষ্ট হইবে—ছিঃ—

কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা ঐ দ্বীপ-মতন ব্যাপারগুলো—ওতে যাবার পথ নেই···

—সাঁতার দিয়ে যাওয়া যায়। তুমি তো ভাল সাঁতার জানো - না? ও-সব কথা যাক—এতদিন কোথায় ছিলে, কি করছিলে বলো। তোমাকে দেখে আজ এত খুশী হয়েছি!···আমার বাসায় এসো আলিপুরে—চা খাবে। একটু তামাটে রঙ হয়েছে কেন?···রোদে ঘুরে-ঘুরে বুঝি—আচ্ছা, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

অপু একটু হাসিল। কোন নাটুকে ধরণের কথা সে মুখে বলিতে পারে না। আর এই সময়েই যত মুখচোরা রোগ আসিয়া জোটে! কতকাল পরে তো লীলাকে একা কাছে পাইয়াছে—কিন্তু মুখে কথা যোগায় কৈ?···কত কথা লীলাকে বলিবে ভাবিয়াছিল—এখন লীলাকে কাছে পাইয়া সে-সব কথা মুখ দিয়া তো বাহির হয়ই না—বরং হীনতাভ হাস্যকর বলিয়া মনে হয়।

হঠাৎ লীলা বলিল—হ্যাঁ ভালো কথা, তুমি নাকি বই লিখেছ? একদিন আমাকে দেখাবে না, কি লিখলে? আমি জানি তুমি একদিন বড় লেখক হবে, তোমার সেই ছেলেবেলার গল্প লেখার কথা মনে আছে? তখন থেকেই জানি।

পরে সে একটা প্রস্তাব করিল। বিমলেন্দুর মুখে সে সব শুনিয়াছে, ...ইওয়ালারা বই লইতে চায় না—ছাপাইতে কত খরচ পড়ে? এ বই ছাপাইয়া বাহির করিবার সমুদয় খরচ দিতে সে রাজী।

অপ্রত্যাশিত আনন্দে অপুর সারা শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের ঢেউ খেলিয়া গেল। সব খরচ! যত লাগে! তবুও আজ সে মুখে কিছু বলিল না।

অপুর মনে লীলার জন্য একটা করুণা ও অনুকম্পা জাগিয়া উঠিল, ঠিক পুরাতন দিনের মত। লীলারও কত আশা ছিল আর্টিস্ট হইবে, ছবি আঁকিবে, অনভিজ্ঞ তরুণ বয়সে তাহারই মত কি স্বপ্নের জাল বুনিত! এখন শুধু নতুন নতুন মোটর গাড়ি কিনিতেছে, সাহেবী দোকানে লেস্ কিনিয়া বেড়াইতেছে—পুরাতন দিনের যজ্ঞবেদীতে আগুন কই, নিভিয়া গিয়াছে। যজ্ঞ কিন্তু অসমাপ্ত। কৃপার পাত্র লীলা! অভাগিনী লীলা!

ঠিক সেই পুরাতন দিনের মত মনটি আছে কিন্তু। তাহাকে সাহায্য করিতে মায়ের-পেটের-মমতাময়ী-বোনের মতই হাত বাড়াইয়া দিয়াছে অমনি। আশৈশব তাহার বন্ধু···তাহার সম্বন্ধে অন্ততঃ ওর মনের তারটি খাঁটি সুরেই বাজিল চিরদিন। এখানেও হয়ত করুণা, মমতা,অনুকম্পা—ওদেরই বাড়িতে না তাহার মা ছিল রাঁধুনী, কে জানে হয়তো কোন্ শুভ মুহূর্তে তাহার হীনতা, দৈন্য,অসহায় বাল্যজীবন বড়লোকের মেয়ে লীলার কোমল বাল্য-মনে ঘা দিয়াছিল, সহানুভূতি, করুণা, মমতা জাগাইয়াছিল। সকল সত্যকার ভালবাসার মশলা এরাই—এরা যেখানে নাই, ভালবাসা সেখানে মাদকতা আনিতে পারে, মোহ আনিতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়িত্বের স্নিগ্ধতা আনে না।

সে ভাবিল, লীলার মনটা ভাল বলে সেই সুযোগে সবাই ওর টাকা নিচ্ছে। ...বেচারী এখনও মনে সেই ছেলেমানুষটি আছে—আমি ওকে exploit করতে ...পারব না। দরকার নেই আমার বই ছাপানোয়।

এদিকে মুশকিল। হাতের টাকা ফুরাইল। চাকুরিও জোটে না।

মিঃ রায়চৌধুরী অনবরত ঘুরাইতে ও হাঁটাইতে লাগিলেন। অপু যেখানে ছিল সেখানে আবার এঁরা ম্যাঙ্গানিজের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, অপু ধরিয়া পড়িল তাহাকে আবার সেখানে পাঠানো হউক। অনেকদিন ঘোরানোর পর মিঃ রায়চৌধুরী একদিন প্রস্তাব করিলেন, সে আরও কম টাকা বেতনে সেখানে যাইতে ...রাজী আছে কি না? অপমানে অপুর চোখে জল আসিল, মুখ রাঙা হইয়া ...উঠিল। একথা বলিতে উহারা আজ সাহস করিল শুধু এইজন্য যে, উহারা জানে

যতই কমে হউক না কেন সে সেখানে ফিরিয়া যাইতে রাজী হইবে, অর্থের জন্য নয়—অর্থের জন্য এ অপমান সে সহ্য করিবে না নিশ্চয় ।

কিন্তু…

শরতের প্রথম—নিচের অধিত্যকায় প্রথম আবলুস ফল পাকিতে শুরু করিয়াছে বটে, কিন্তু মাথার উপরে পর্বতসানুর উচ্চস্থানে এখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। টেঁপারী বনে এখন ফল পাকিয়া হলদে হইয়া আছে, ভালুকদল এখনও সন্ধ্যার পরে টেঁপারী খাইতে নামে, টিয়া পাখির ঝাঁক সারাদিন কলরব করে, আরও উপরে যেখান হইতে বাদাম ও সেগুন বনের শুরু, সেখানে অজস্র সাদা মাজুফল, আরও উপরে রিঠাগাছে থোলো-থোলো ফল ধরিয়াছে, এমন কি ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে দু-একটা রিঠাগাছে এখনও দু-এক ঝাড় দেরিতে-ফোটা রিঠা ফুলও পাওয়া যাইতে পারে।

সেখানকার সেই বিরাট রুক্ষ আরণ্যভূমি, নক্ষত্রালোকিত আলো-আঁধার, উদার জনহীন বিশাল তৃণভূমি, সেই টানা একঘেয়ে পশ্চিমে হাওয়া, সেই অবাধ জ্যোৎস্না, স্বাধীনতা, প্রসারতা, সেই বিরাট নির্জনতা তাহাকে আবার ডাকিতেছে।

এক এক সময় তাহার মনে হয় কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে, আফ্রিকায় মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছপালাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রপিক্‌স্‌-এর অরণ্য আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারা তাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিরিবে। ধরাবিদ্রাবণকারী সভ্যতাদর্পী মানুষ যে স্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পর্বতমালার নাম দিয়াছে নিজের দেশের রাজার নামে, হ্রদের নাম দিয়াছে রাজমন্ত্রীর নামে; ওর শুশুক, পাখি, শিল, বল্‌গা হরিণ, ভালুককে খুন করিয়াছে—তেল, ব্যবসা, চামড়ার লোভে, ওর মহিমময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে।

এ যেন এমন একটা শক্তি যা বিপুল, বিশাল, বিরাট। অসীম ধৈর্যের ও গাম্ভীর্যের সহিত সে সংহত শক্তিতে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, কারণ সে জানে তাহার নিজ শক্তির বিপুলতা। অপু একবার ছিন্দওয়ারার জঙ্গলে একটা খনির সাইডিং লাইন তৈরি হওয়ার সময়ে আরণ্যভূমির তপস্যাস্তব্ধ, দূরদর্শী, রুদ্রদেবের মত এই মৌন, গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। ঐ শক্তিটা ধীরভাবে শুধু সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।

অপুর কিন্তু চাকরি হইল না। এবার একা মিঃ রায়চৌধুরীর হাত নয়। স্টক কোম্পানীর অন্যান্য ডাইরেক্টররা নাকি রাজী হইল না। হয়ত বা তাহারা ভাবিল, এ লোকটার সেখানে ফিরিবার এত আগ্রহ কেন? পুরানো লোক, চুরির সুলুক-সন্ধান জানে, সেই লোভেই যাইতেছে। তা ছাড়া ডাইরেক্টররাও মানুষ, তাহাদেরও প্রত্যেকেরই বেকার ভাগনে, ভাইপো, শালীর ছেলে আছে।

সে ভাবিল, চাকরি না হয়, বইখানা বাহির করিয়া দেখিবে চলে কিনা। মাসিক পত্রিকায় দু-একটা গল্পও দিল, একটা গল্পের বেশ নাম হইল, কিন্তু টাকা কেহ দিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল—অপর্ণার গহনাগুলি শ্বশুরবাড়িতে আছে, সেগুলি সেখান হইতে এই সাত-আট বৎসর সে আনে নাই। সেগুলি বেচিয়া তো বই বাহির করার খরচ যোগাড় হইতে পারে! এই সহজ উপায়টা কেন এতদিন মাথায় আসে নাই?

সে লীলার কাছে আরও কয়েকবার গেল, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করিল না। উপন্যাসের খাতাখানা লইয়া গিয়া পড়িয়া শোনাইল। লীলা খুব উৎসাহ দেয়। একদিন লীলা হিসাব করিতে বসিল বই ছাপাইতে কত লাগিবে। অপু ভাবিল - অন্য কেউ যদি দিত হয়ত নিতুম, কিন্তু লীলা বেচারীর টাকা নেব না।

একদিন সে হঠাৎ খবরের কাগজে তাহার সেই কবিরাজ বন্ধুটির ঔষধের দোকানের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল। সেইদিনই সন্ধ্যার পর সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল, সুকিয়া স্ট্রীটের একটা গলিতে দোকান। বন্ধুটি বাহিরেই বসিয়া ছিল, দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ—তুমি! তুমি বেঁচে আছ দাদা?

অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, কম খুঁজি নি তোমায়! ভাগ্যিস আজ তোমার শিল্পাশ্রমের বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল, তাই তো এলুম। তারপর কি খবর বল? দোকানের আসবাবপত্র দেখে মনে হচ্ছে, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছ!

বন্ধু খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা এ-গল্প ও-গল্প করিল। পরে বলিল—এসো, বাসায় এসো।

ছোট সাদা রঙের দোতলা বাড়ি, নীচের উঠানে একটা টিনের শেডের তলায় আট-দশটি লোক কি সব জিনিস প্যাক্ করিতেছে, লেবেল আঁটিতেছে, অন্যদিকে একটা কল ও চৌবাচ্চা, আর একটা টিনের শেডে গুদাম। উপরে উঠিয়াই একটা মাঝারি হলঘর, দু'পাশে দু'টা ছোট ছোট ঘর, বেশ সাজানো। একটা সেঠ্ টমাসের বড় ক্লক ঘড়ি দালানে টক্‌টক্ করিতেছে। বন্ধু ডাকিয়া বলিল —ওরে বিন্দু, শোন, তোর মাকে বল, এক্ষুণি দু'পেয়ালা চা দিতে।

অপু উৎসুকভাবে বলিল—তার আগে একবার বৌঠাকরুণের সঙ্গে দেখাটা করি—বিন্দুকে বল তাঁকে এদিকে একবার আসতে বলতে? না কি, এখন অবস্থা ফিরেছে বলে তিনি আর আমার সঙ্গে দেখা করবেন না?

কবিরাজ বন্ধু ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিল—পরে নিম্নসুরে অনেকটা যেন আপন মনেই বলিল—সে আর তোমার সঙ্গে দেখা করবে না ভাই। তাকে আর কোথায় পাবে? রমলা আর সে দুজনেই ফাঁকি দিয়েছে!

অপু অবাক মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

—এক মাঘে রমলা গেল, পরের শ্রাবণে সে গেল। ওঃ, সে কি সোজা কষ্ট গিয়েছে ভাই? তখন ওদিকে কাবুলীর দেনা, এদিকে মহাজনের দেনা—যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। তোমার কথা কত বলত। এই শ্রাবণে পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে! তারপরে বিয়ে করব, না, করব না,—আজ বছর তিনেক হ'ল বাদ্যবাটীতে—

তারপর বন্ধুর কথায় নতুন-বৌ চা ও খাবার লইয়া অপুর সামনেই আসিল শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, কিশোরী মেয়েটি, চোখ মুখ দেখিয়া মনে হয় খুব চটপটে, চতুর। খাবার খাইতে গিয়া খাবারের দলা যেন অপুর গলায় আটকাইয়া যায়। বন্ধুটি নিজের কোন্ কালির বড়ি ও পাতা চায়ের প্যাকেটের খুব বিক্রী ও ব্যবসায়ের দিক হইতে এ-দুটি দ্রব্যের সাফল্যের গল্প করিতেছিল।

উঠিবার সময় বাহিরে আসিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—নতুন বৌটি দেখতে তো বেশ, এ-দিকেও বেশ গুণবতী, না?

—মন্দ না। কিন্তু বড় মুখরা ভাই। আগের তাকে তো জানতে? সে ছিল ভাল মানুষ। এর পান থেকে চুন খসলেই—কি করি ভাই, আমার ইচ্ছে ছিল না যে আবার—

ফুটপাথে একা পড়িয়াই অপুর মনে পড়িল, পটুয়াটোলার সেই খোলার বাড়ির দরজার প্রদীপহাতে হাস্যমুখী, নিরাভরণা, দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে—আজ ছ'বছর কাটিয়া গেলেও মনে হয় যেন কালকার কথা!

কাজল বড় হইয়া উঠিয়াছে, আজকাল গ্রামের সীতানাথ পণ্ডিত সকালে একবেলা করিয়া পড়াইয়া যান. কিন্তু একটু ঘুমকাতুরে বলিয়া সন্ধ্যার পর দাদামশায়ের অনেক বকুনি সত্ত্বেও সে পড়িতে পারে না. চোখের পাতা যেন জড়াইয়া আসে, অনেক সময় যেখানে-সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে—রাত্রে কেহ যদি ডাকিয়া খাওয়ায়, তবেই খাওয়া হয়। তা ছাড়া, বেশী রাত্রে খাইতে হইলে দাদামশায়ের সঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়—সে এক বিপদ।

দাদামশায়ের সহিত পারতপক্ষে কাজল খাইতে বসিতে চাহে না। বড় ভাত ফেলে. ছড়ায়—গুছাইয়া খাইতে জানে না বলিয়া দাদামশায় তাকে খাইতে বসিয়া সহবৎ শিক্ষা দেন।

কাজল আলুভাতে দিয়া শুকনা ভাত খাইতেছে—দাদামশায় হাঁকিয়া বলিলেন—ডাল দিয়ে মাখো—শুধু ভাত খাচ্চ কেন ?—মাখো—মেখে খাও—

তাড়াতাড়ি কম্পিত ও আনাড়ী হাতে ডাল মাখিতে গিয়া থালার কানা ছাড়াইয়া কিছু ডাল-মাখা ভাত মাটিতে পড়িয়া গেল। দাদামশায় ধমক দিয়া উঠিলেন—পড়ে গেল, পড়ে গেল—আঃ, ছোঁড়া ভাতটা পর্যন্ত যদি গুছিয়ে খেতে জানে !—তোল্ তোল—খুঁটে খুঁটে তোল্—

কাজল ভয়ে ভয়ে মাটি-মাখা ভাতগুলি থালার পাশ হইতে আবার থালায় তুলিয়া লইল।

—বেগুন পটোল ফেলেছিস্ কেন ?—ও খাবার জিনিস না ?—সব একসঙ্গে মেখে নে—

খানিকটা পরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, কাজল উচ্ছেভাজা খায় নাই—তখন অম্বল দিয়া খাওয়া হইয়া গিয়াছে—তিনি বলিলেন—উচ্ছেভাজা খাস্‌নি ? —খাও—ও অম্বলমাখা ভাত ঠেলে রাখো। উচ্ছেভাজা তেতো বলিয়া কাজলের মুখে ভালো লাগে না—সে তাতে হাতও দেয় নাই। দাদামশায়ের ভয়ে অম্বল-মাখা ভাত ঠেলিয়া রাখিয়া তিক্ত উচ্ছেভাজা একটি একটি করিয়া খাইতে হইল—একখানি ফেলিবার জো নাই—দাদামশায়ের সতর্ক দৃষ্টি। ভাত খাইবে কি কান্নায় কাজলের গলায় ভাতের দলা আটকাইয়া যায়। খাওয়া হইয়া গেলে মেজ মামীমার কাছে গিয়া বলিয়া কহিয়া একটা পান লয়—পান খুলিয়া

দেখে কি কি মশলা আছে, পরে মিনতির সুরে একবার মেজ মামীমার কাছে একবার ছোট মামীমার কাছে বলিয়া বেড়ায়—ইতি একটু কাৎ, ও মামীমা তোমার পায়ে পড়ি। একটু কাৎ দাও না—। কাঠ অর্থাৎ দারুচিনি। মামীমারা ঝঙ্কার দিয়া বলেন—রোজ রোজ ডালচিনি চাই—ছেলে আবার শৌখিন কত !...উঃ, তার আবার জিব দেখা চাই—মুখ রাঙা হ'ল কিনা—

তবে পড়াশুনার আগ্রহ তাহার বেশী ছাড়া কম নয়। বিশ্বেশ্বর মুহুরীর হাতবাক্সে কেশরঞ্জনের উপহারের দরুন গল্পের বই আছে অনেকগুলি। খুনী আসামী কেমন করিয়া ধরা পড়িল, সেই সব গল্প। আর পড়িতে ইচ্ছা করে আরব্য উপন্যাস, কি ছাব ! কি গল্প ! দাদামশায়ের বিছানার উপর একদিন পড়িয়া ছিল—সে উল্‌টাইয়া দেখিতেছে, টের পাইয়া বিশ্বেশ্বর মুহুরী কাড়িয়া লইয়া বলিল, এঃ, আট বছরের ছেলের আবার নভেল পড়া ? এইবার একদিন তোমার দাদামশায় শুনতে পেলে দেখো কি করবে !

কিন্তু বইখানা কোথায় আছে সে জানে—দোতলার শোবার ঘরের সেই কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকটার মধ্যে—একবার যদি চাবিটা পাওয়া যাইত ! সারারাত জাগিয়া পড়িয়া ভোরের আগেই তাহা হইলে তুলিয়া রাখে।

এ কয়েকদিন বেকালে দাদামশায় বসিয়া বসিয়া তামাক খান, আর সে পণ্ডিতমশায়ের কাছে বসিয়া বসিয়া পড়ে। সেই সময় পণ্ডিতমশায়ের পেছনকার অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপের উত্তর-ধারের সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা অদ্ভুত ঘটনার রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়, ঘটনাটাও হয়ত খুব স্পষ্ট নয়, সে ঠিক বুঝাইয়া বলিতে তো পারে না ! কিন্তু দিদিমার মুখে শোনা নানা গল্পের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্রেরা নাম-না-জানা নদীর ধারে ঠিক এই সন্ধ্যাবেলাটাতেই পৌঁছায়—কোন্ রাজপুরীকে কাঁপাইয়া রাজকন্যাদের সোনার রথ বেকালের আকাশপানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—সে অন্যমনস্ক হইয়া দেওয়ালের পাশে ঝুঁকিয়া আকাশটার দিকে চাহিয়া থাকে কেমন যেন দুঃখ হয়—ঠিক সেই সময় সীতানাথ পণ্ডিত বলেন—দেখুন, দেখুন, বাঁড়ুয্যেমশায়, আপনার নাতির কাণ্ডটা দেখুন, শ্লেটে বুড়ুকে লিখতে দিলাম, তা গেল চুলোয়—হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছে দেখুন—এমন অমনোযোগী ছেলে যদি—

দাদামশায় বলেন—দিন না ধাঁ করে এক থাপ্পড় বসিয়ে গালে—হতভাগা ছেলে কোথাকার—হাড় জ্বালিয়েছে, বাবা করবে না খোঁজ, আমার ঘাড়ে এ বয়সে যত ঝুকি।

তবে কাজল যে দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা সবাই বলে। একদণ্ড সুস্থির নয়, সর্বদা চঞ্চল, একদণ্ড চুপ করিয়া থাকে না, সর্বদা বকিতেছে। পণ্ডিতমশায় বলেন—দেখ্ তো দলু কেমন অঙ্ক কষে? ওর মধ্যে অনেক জিনিস আছে—আর তুই অঙ্কে একেবারে গাধা।—পণ্ডিত পিছন ফিরিলেই কাজল মামাতোভাই দলুকে আঙুল দিয়া ঠেলিয়া চুপি চুপি বলে,—তো-তোর মধ্যে অনেক জিনিস আছে, কি জিনিস আছে রে, ভাত ডাল খি-খিচুড়ি···খিচুড়ি? হি-হি ইল্লি! খিচুড়ি খাবি, দলু?

দাদামশায়ের কাছে আবার নালিশ হয়।

তখন দাদামশায় ডাকিয়া শাস্তিস্বরূপ বানান জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন—বানান কর সূর্য। কাজল বানানটা জানে, কিন্তু ভয়জনিত উত্তেজনার দরুণ হঠাৎ তাহার তোতলামিটা বেশী করিয়া দেখা দেয়। দু'একবার চেষ্টা করিয়াও 'দন্ত স্য' কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিবেনা বুঝিয়া অবশেষে বিপন্নমুখে বলে —তা-তালব্য শয়ে দীর্ঘ্য-উকার—

ঠাস্ করিয়া এক চড় গালে। ফরসা গাল, তখনই দাড়িমের মত রাঙা হইয়া ওঠে, কান পর্যন্ত রাঙা হইয়া যায়। কাজলের ভয় হয় না, একটা নিষ্ফল অভিমান হয়—বাঃ রে, বানানটা তো সে জানে, কিন্তু মুখে যে আটকাইয়া যায় তা তার দোষ কিসের? কিন্তু মুখে অত কথা বলিয়া বুঝাইয়া প্রতিবাদ বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার মত এতটা জ্ঞান তাহার হয় নাই—সবটা মিলিয়া অভিমানের মাত্রাটাই বাড়াইয়া তোলে। কিন্তু অভিমানটা কাহার উপর সে নিজেও ভাল বোঝে না।

এই সময়ে কাজলের জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

সীতানাথ পণ্ডিতমহাশয় একটু-আধটু জ্যোতিষের চর্চা করিতেন। কাজলের পড়িবার সময় তাহার দাদামশায়ের সঙ্গে সীতানাথ পণ্ডিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন—পাঁজি দেখিয়া ঠিকুজি তৈয়ারী, জন্মের লগ্ন ও যোগ গণনা, আয়ুষ্কাল নির্ণয় ইত্যাদি। আজ বছরখানেক ধরিয়া কাজল প্রায়ই এসব শুনিয়া আসিতেছে —যদিও সেখানে সে কোন কথা বলে না।

কার্তিক মাসের শেষ, শীত তখনও ভাল পড়ে নাই। বাড়ির চারিপাশে অনেক খেজুরবাগান, শিউলিরা কার্তিকের শেষে গাছ কাটিয়াছে। শীতের ঠাণ্ডা সান্ধ্য বাতাসে টাটকা খেজুর-রসের গন্ধ মাখানো থাকে।

কাজলদের পাড়ার ব্রহ্মঠাকরুন এই সময় কি রোগে পড়িলেন। ব্রহ্মঠাকরুনের বয়স কত তা নির্ণয় করা কঠিন—মুড়ি ভাজিয়া বিক্রয় করিতেন, পতি-পুত্র

কেহই ছিল না— কাজল অনেকবার মুড়ি কিনিতে গিয়াছে তাঁহার বাড়ি। অত্যন্ত খিট্‌খিটে মেজাজের লোক, বিশেষ করিয়া ছেলেপিলেদের দু'চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারিতেন না—দূর দূর করিতেন, উঠানে পা দিলে পাছে গাছটা ভাঙে, উঠানটা খুঁড়িয়া ফেলে— এই ছিল তাঁহার ভয়। কাজলকে বাড়ির কাছাকাছি দেখিলে বলিতেন—একটা যেন মগ—মগ একটা—বাড়ি যা বাপু - কঞ্চি-টঞ্চির খোঁচা মেরে বসাবি—যা বাপু এখান থেকে। ঝালের চারাগুলো মাড়াস নে—

সেদিন দুপুরের পর তাহার মামাতো-বোন অরু বলিল— বেহ্ম-ঠাকুমা মর-মর হয়েছে, সব্বাই দেখতে যাচ্ছে—যাবি কাজল ?

ছোট্ট একতলা বাড়ির ঘর, পাড়ার অনেকে দেখিতে আসিয়াছে—মেজেতে বিছানা পাতা, কাজল ও অরু দোরের কাছে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। ব্রহ্মঠাকরুনকে আর চেনা যায় না, মুখের চেহারা যেমন শীর্ণ তেমনি ভয়ঙ্কর, চক্ষু কোটরগত, তাহার ছোট-মামা কাছে বসিয়া আছে, হারু কবিরাজ দাওয়ায় বসিয়া লোকজনের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে।

বৈকালে দু-তিনবার শোনা গেল ব্রহ্মঠাকরুনের রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ।

কাজল কিছু বিস্মিত হইল। এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রহ্মঠাকরুন, যাঁহাকে গামছা পড়িয়া উঠানে গোবরজল ছিটাইতে দেখিয়া সে তখনই ভাবিত— তাহার দাদামশায়ের মত লোক পর্যন্ত যাঁহাকে মানিয়া চলে—তাঁহার এ কি দশা হইয়াছে আজ !···এত অসহায়, এত দুর্বল তাঁহাকে কিসে করিয়া ফেলিল ?···

ব্রহ্মঠাকরুন সন্ধ্যার আগে মারা গেলেন। কাজলের মনে হইল পাড়াময় একটা নিস্তব্ধতা—কেমন একটা অবোধ্য বিভীষিকার ছায়া যেন সারা পাড়াকে অন্ধকারের মত গ্রাস করিতে আসিতেছে···সকলেরই মুখে যেন একটা ভয়ের ভাব।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়াছে। পাড়ার সকলে ব্রহ্মঠাকরুনের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার বাড়ির উঠানে সমবেত হইয়াছে। কাজলের দাদামশায়ও গিয়াছেন। কাজল ভয়ে ভয়ে খানিকটা দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল – কিন্তু ব্রহ্মঠাকরুনের বাড়ি পর্যন্ত যাইতে পারিল না – কিছু দূরে একটা বাঁশঝাড়ের নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। সেখান হইতে উঠানটা বা বাড়িটা দেখা যায় না— কথাবার্তার শব্দও কানে আসে না। বাতাস লাগিয়া বাঁশঝাড়ের কঞ্চিতে কঞ্চিতে শব্দ হইতেছে— চারিধার নির্জন···কাজলের বুক দুরু-দুরু করিতেছিল···একটা অদ্ভুত ধরনের ভাবে তাহার মন পূর্ণ হইল – ভয় নয়, একটা বিস্ময়-মাখানো রহস্যের ভাব···অন্ধকারে গা লুকাইয়া দু-একটা বাদুড় আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে···অন্যদিন এমন

সময়ে বাদুড় দেখিলেই কাজল বলিয়া উঠে – বাদুড় বাদুড় মেথর, যা খাবি তা তেতর

আজ উড়ন্তশীল বাদুড়ের দৃশ্য তাহার মনে কৌতুক না জাগাইয়া সেই অজানা রহস্যের ভাবই যেন ঘনীভূত করিয়া তুলিল ! –

ব্রহ্মঠাকরুন মারা গেলেন বটে—কিন্তু মৃত্যুকে কাজল এই প্রথম চিনিল। দিদিমা মারা গিয়াছিলেন কাজলের পাঁচবছর বয়সে—তাহাও গভীর রাত্রে, কাজল তখন ঘুমাইয়া ছিল—কিছু দেখে নাই - বোঝেও নাই, এবার মৃত্যুর বিভীষিকা, এই অপূর্ব রহস্য তাহার শিশু-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একা একা বেড়ায়, তেমন সঙ্গী-সেজুড় নাই—আর ঐ সব কথা ভাবে। একদিন তাহার মনে হইল যদি সেও ব্রহ্মঠাকরুনের মত মরিয়া যায়!···হাত-পায়ে যেন সে বল হারাইয়া ফেলিল,—সত্য, সে-ও হয়তো মারা যাইবে !···

দিনের পর দিন ভয়টা বাড়িতে লাগিল। একলা শুইয়া শুইয়া কথাটা ভাবে—নদীর বাঁধা ঘাটের পৈঠায় সন্ধ্যার সময় বসিয়া ঐ কথাই মনে ওঠে।···এই বড়-দলের তীরে দিদিমার মত, ব্রহ্মঠাকরুনের মত তার দেহও একদিন পুড়াইতে –

কথাটা ভাবিতেই ভয়ে সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া আসে···

কাজল তাহার জন্মের সালটা জানিত ; কিছুদিন আগে তাহার দাদামশায় সীতানাথ পণ্ডিতের কাছে কাজলের ঠিকুজি করাইয়াছিলেন —সে সে-সময় সেখানে ছিল। কিন্তু তারিখটা জানে না—তবে মাঘ মাসের শেষের দিকে, তা জানে।

একদিন সে দুপুরে চুপি চুপি কাছারিঘরে ঢুকিল। তাকের উপরে রাশীকৃত পুরানো পাঁজি সাজানো থাকে। চুপি চুপি সবগুলি নামাইয়া ১৩৩০ সালের পাঁজিখানা বাছিয়া লইয়া মাঘ মাসের শেষের দিকের তারিখগুলো দেখিতে লাগিল——কি সে বুঝিল সে-ই জানে – তাহার মনে হইল ২৫-শে মাঘ বড় খারাপ দিন। ঐ দিন জন্মিলে আয়ু কম হয়, খুব কম। তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল—ঐ দিনটা-তেই হয়তো সে জন্মিয়াছে।···ঠিক।

বড় মামীকে বিকালে জিজ্ঞাসা করিল—আমি জন্মেছি কত তারিখে মামীমা ? ···বড় মামীমার তো তাহা ভাবিয়া ঘুম নাই ! তিনি জানেন না। বড় মামাতো ভাই পটলকে জিজ্ঞাসা করিল আমি কবে জন্মেছি জানিস্ পটলদা ?···পটলের বয়স বছর দশেক, সে কি করিয়া জানিবে ? দাদামশায়ের কাছে ঠিকুজি আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় না। একদিন সীতানাথ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন - কেন, সে খোঁজে তোমার কি দরকার ? সে থাকিতে

না পারিয়া সোজাসুজি বলিয়াই ফেলিল—আ-আমি ক-কতদিন বাঁচব, পণ্ডিতমশায় ?···

সীতানাথ পণ্ডিত অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—এমন কথা কোন ছেলের মুখে কখনও তিনি শুনেন নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যেকে ডাকিয়া কহিলেন···শুনেছেন ও বাঁড়ুয্যেমশায়, আপনার নাতি কি বলছে ?·· শশীনারায়ণ শুনিয়া বলিলেন—এদিকে তো বেশ ইঁচড়-পাকা ? দু'মাসের মধ্যে আজও তো দ্বিতীয় নামতা রপ্ত হ'ল না—বলো বারো পোনেরং কত ?

কাজলের তর্কে কেহই বুঝিল না। কাজল ধমক খাইল বটে, কিন্তু ভয় কি তাতে যায় ? এক এক সময়ে তাহার মন হাঁপাইয়া ওঠে--কাহাকেও বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না···এখন সে কি করে ? এখানে তাহার কথা কেহ শুনিবে না, রাখিবে না তাহা সে বোঝে। তাহার বাবাকে বলিতে পারিলে হয় তো উপায় হইত।

বর্ষাকালের শেষের দিকে সে দু-একবার জ্বরে পড়ে। জ্বর আসিলে উপরের ঘরে একলাটি একটা কিছু টানিয়া গায়ে দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। কাহারও পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া বলে·· ও মামীমা জ্বর এয়েচে আমার —একটা লে-এ-এপ বে-বের করে দাও না ?—ইচ্ছা করে কেহ কাছে বসে, কিন্তু বাড়ির এত লোক সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। জ্বরের প্রথম দিকে কিন্তু চমৎকার লাগে, কেমন যেন একটা নেশা, সব কেমন অদ্ভুত লাগে। ঐ জানালার গরাদটাতে একটা ডেও-পিঁপড়ে বেড়াইতেছে, চুনে-কালিতে মিশাইয়া জানালার কবাটে একটা দাড়িওয়ালা মজার মুখ। জানালার বাহিরের নারিকেল গাছে নারিকেলসুদ্ধ একটা কাঁদি ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। নিচে তাহার ছোট মামাতো বোন অরু 'ভাত ভাত' করিয়া চিৎকার শুরু করিয়াছে--বেশ লাগে। কিন্তু শেষের দিকে বড় কষ্ট, গা জ্বালা করে, হাত-পা ব্যথা করে, সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে, মাথা যেন ভার বোঝা, এ সময়টা কেহ কাছে আসিয়া যদি বসে !

কাছারির উত্তর গায়ে পথের ধারে এক বুড়ীর খাবারের দোকান, বারো মাস খুব সকালে উঠিয়া সে তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরি ভাজে। কাজল তাহার বাঁধা খরিদ্দার। অনেকবার বকুনি খাইয়াও সে এ লোভ সামলাইতে সমর্থ হয় নাই। সারিবার দিন-দুই পরেই কাজল সেখানে গিয়া হাজির। অনেকক্ষণ সে বসিয়া বসিয়া ফুলুরিভাজা দেখিল, পুঁইপাতার বেগুনি, জবাপাতার তিল-পিটুলি ! অবশেষে সে অপ্রতিভ মুখে বলে— আমায় পুঁইপাতার বেগুনি দাও না দিদিমা ?

দেবে? এই নাও পয়সা। বুড়ী দিতে চায় না, বলে—না খোকা দাদা, সেদিন জ্বর থেকে উঠেছ, তোমার বাড়ির লোকে শুনলে আমায় বকবে—কিন্তু কাজলের নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে দিতে হয়।

একদিন বিশেশ্বর মুহুরীর কাছে ধরা পড়িয়া যায়। বুড়ীর দোকান হইতে বাহির হইয়া জবাপাতার তিল-পিটুলির ঠোঙা-হাতে খাইতে খাইতে পুকুরপাড় পর্যন্ত গিয়াছে—বিশেশ্বর আসিয়া ঠোঙাটি কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা পাজি ছেলে তো? আবার ঐ তেলে-ভাজা খাবারগুলো রোজ রোজ খাওয়া?

কাজল বলিল—আমি খা-খা-খাচ্ছি তা তো-তোমার কি?

বিশেশ্বর মুহুরী হঠাৎ আসিয়া তাহার কান ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—আমার কি, বটে?—রাগে অপমানে কাজলের মুখ রাঙা হইয়া গেল। ইহাদের হাতে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা তাহার এই প্রথম। সে ছেলেমানুষি সুরে চিৎকার করিয়া বলিল—মুখপুড়ি, হতচ্ছাড়া তু-তুমি মারলে কেন?

বিশেশ্বর তাহার গালে জোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—আমি কেন, এসো তো কর্তার কাছে একবার—এসো।

কাজল পাগলের মত যা-তা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। চড়ের চোটে তখন তাহার কান মাথা ঝা-ঝা করিতেছে, এবং বোধ হয় এ অপমানের কোনও প্রতিকার এখানকার কাহারও নিকট হইতে হইবার আশা নাই, মুহূর্ত মধ্যে ঠাওরাইয়া বুঝিয়া চিৎকার করিয়া বলিল—আমার বা-বাবা আসুক, বলে দেব, দেখো—দেখো তখন—

বিশেশ্বর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা যাও, তোমার বাবার ভয়ে আমি একেবারে গর্তের মধ্যে যাব আর কি? আজ পাঁচ বছরের মধ্যে খোঁজ নিলে না, ভারী তো—। হয়ত একথা বলিতে বিশেশ্বর সাহস করিত না, যদি সে না জানিত তাঁহার এ জামাইটির প্রতি কর্তার মনোভাব কিরূপ।

কাজল রাগের মাথায় ও কতকটা পাছে বিশেশ্বর দাদামশায়ের কাছে ধরিয়া লইয়া যায় সেই ভয়ে, পুকুরের দক্ষিণ-পাড়ের নারিকেল বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—দেখো না, দেখো তুমি, বাবা আসুক না—পরে পিছন দিকে চাহিয়া খুব কড়া কথা শুনানো হইতেছে, এমন সুরে বলিল—তোমার পেটে খি-খিচুড়ি-আছে, খি-খিচুড়ি খাবে—খিচুড়ি?

নদীর বাঁধাঘাটে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ দিদিমার কথা

ভাবিল। দিদিমা থাকিলে বিশেশ্বর মুহুরী গায়ে হাত তুলিতে পারিত? সে জবাপাতার বেগুনি খায় তো ওর কি?

ঐ একটা নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। দিদিমা বলিত নক্ষত্র খসিয়া পড়িলে সেই সময় পৃথিবীতে কেউ না কেউ জন্মায়। মরিয়া কি নক্ষত্র হয়? সে যদি মারা যায়, হয়তো অমনি আকাশের গায়ে নক্ষত্র হইয়া ফুটিয়া থাকিবে।

আরও মাস কয়েক পরে ভাদ্রমাসের শেষের দিকে। দাদামশায়ের বৈকালিক মিছরির পানা খাওয়ার শ্বেত পাথরের গেলাসটা তাহার বড় মামীমা মাজিয়া ধুইয়া উপরের ঘরের বাসনের জলচৌকিতে রাখিতে তাহার হাতে দিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় কেমন করিয়া গেলাস হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল ভাঙ্গিয়া। কাজলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের গতি যেন মিনিটখানেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, যাঃ, সর্বনাশ! দাদামশায়ের মিছরিপানার গেলাসটা যে! সে দিশেহারা অবস্থায় টুকরাগুলো তাড়াতাড়ি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিল; পরে অন্য জায়গায় ফেলিলে পাছে কেহ টের পায়, তাই তাড়াতাড়ি আরব্য উপন্যাস যাহার মধ্যে আছে সেই বড় কাঠের সিন্দুকটার পিছনে গোপনে রাখিয়া দিল। এখন সে কি করে! কাল যখন গেলাসের খোঁজ পড়িবে বিকালবেলা, তখন সে কি জবাব দিবে?

কাহারও কাছে কোন কথা বলিল না, বাকী দিনটুকু ভাবিয়া ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতেও পারিল না; এক জায়গায় বসিতে পারে না, উদ্বিগ্ন মুখে ছট্‌ফট করিয়া বেড়ায়—ঐ রকম একটা গেলাস আর কোথাও পাওয়া যায় না? একবার সে এক খেলুড়ে বন্ধুকে চুপি চুপি বলিল,—ভাই তো-তোদের বাড়ি একটা পাথরের গে-গেলাস আছে?

কোথায় সে এখন পায় একটা শ্বেত পাথরের গেলাস? রাত্রে একবার তাহার মনে হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। কলিকাতা কোন্ দিকে? সে বাবার কাছে চলিয়া যাইবে কলিকাতায়—কাল বৈকালের পূর্বেই।

কিন্তু রাত্রে পালানো হইল না। নানা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিল, দুই-তিন বার কাঠের সিন্দুকটার পিছনে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল, গেলাসের টুকরাগুলা সেখান হইতে কেহ বাহির করিয়াছে কিনা। বড় মামীমার সামনে আর যায় না, পাছে গেলাসটা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। দুপুরের কিছু পর বাড়ির রাস্তা দিয়া কে একজন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে

দেখিয়া সে নাট-মন্দিরের বেড়ার কাছে ছুটিয়া দেখিতে গেল—কিন্তু সাইকেল দেখা তাহার হইল না, নদীর বাঁধাঘাটে একখানা কাহাদের ডিঙিনৌকা লাগিয়াছে, একজন ফর্সা চেহারার লোক একটা ছড়ি ও ব্যাগ হাতে ডিঙি হইতে নামিয়া ঘাটের সিঁড়িতে পা দিয়া মাঝির সঙ্গে কথা কহিতেছে—কাজল অবাক্ হইয়া ভাবিতেছে, লোকটা কে. এমন সময় লোকটা মাঝির সঙ্গে কথা শেষ করিয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে কাজল অল্পক্ষণের জন্য চোখে যেন ধোঁয়া দেখিল, পরক্ষণেই সে নাটমন্দিরের বেড়া গলাইয়া বাহিরের নদীর ধারে রাস্তাটা বাহিয়া বাঁধাঘাটের দিকে ছুটিল। যদিও অনেক বছর পরে দেখা, তবুও কাজল চিনিয়াছে লোকটিকে—তাহার বাবা!

অপু খুলনার স্টীমার ফেল করিয়াছিল। নতুবা সে কাল রাত্রেই এখানে পৌঁছিত। সে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতেছিল, পরশু ভোরে নৌকা এখানে আনিয়া তাহাকে বরিশালের স্টীমার ধরাইয়া দিতে পারিবে কিনা। কথা শেষ করিয়াই ফিরিয়া চাহিয়া সে দেখিল একটি ছোট সুশ্রী বালক ঘাটের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। পরক্ষণেই সে চিনিল। আজ সারা পথ নৌকায় সে ছেলের কথা ভাবিয়াছে, না জানি সে কত বড় হইয়াছে, কেমন দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে. না মনে রাখিয়াছে! ছেলের আগেকার চেহারা তাহার মনে ছিল না। এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া সে যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইল—তাহার সেই তিন বছরের ছোট্ট খোকা এমন সুদর্শন লাবণ্যভরা বালকে পরিণত হইল কবে?

সে হাসিমুখে বলিল—কি রে খোকা, চিন্‌তে পারিস?

কাজল তৎক্ষণে আসিয়া অসীম নির্ভরতার সহিত তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—ফুলের মত মুখটি উঁচু করিয়া হাসি-ভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না বৈ কি? আমি বেড়ার ধার থেকে দেখেই ছুট দিইছি——এতদিন আস নি কে-কেন বাবা?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। এতদিন তো ভুলিয়া ছিল, কিন্তু আজ এইমাত্র—হঠাৎ দেখিবামাত্রই অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য, এই ক্ষুদ্র বালকটি তাহারই ছেলে, জগতে নিতান্ত অসহায় হাত-পা হারা, অবোধ—জগতে সে ছাড়া ওর আর কেউ তো নাই! কি করিয়া এতদিন সে ভুলিয়া ছিল!

কাজল বলিল—ব্যাগে কি বাবা?

—দেখাবি ? চল দেখাব এখন। তোর জন্য কেমন পিস্তল আছে, একসঙ্গে দুম্ দুম্ আওয়াজ হয়, ছবির বই আছে দুখানা। কেমন একটা রবারের বেলুন—

—তো-তো-তোমাকে একটা কথা বলব বাবা ? তো-তোমার কাছে একটা পাথরের গে-গেলাস আছে ?

—পাথরের গেলাস ? কেন রে, পাথরের গেলাস কি হবে ?

কাজল চুপি চুপি বাবাকে গেলাস ভাঙার কথা সব বলিল। বাবার কাছে কোন ভয় হয় না। অপু হাসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—আচ্ছা চল্, কোনো ভয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে কাজলের সব ভয়টা কাটিয়া গেল, একজন অসীম শক্তিধর বজ্রপাণি দেবতা যেন হঠাৎ বাহুদ্বয় মেলিয়া তাহাকে আশ্রয় ও অভয়দান করিয়াছে—মাভৈঃ।

রাত্রে কাজল বলিল—আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা !

অপুর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় এখন নিজেরই অচল। সে ভুলাইবার জন্য বলিল—আচ্ছা হবে, হবে। শোন্ একটা গল্প বলি খোকা। কাজল চুপ করিয়া গল্প শুনিল। বলিল—নিয়ে যাবে তো বাবা ? এখানে সবাই বকে, মারে বাবা ! তুমি নিয়ে চল, তোমার কত কাজ করে দেব।

অপু হাসিয়া বলে, কাজ করে দিবি ? কি কাজ করে দিবি রে খোকা ?

তারপর সে ছেলেকে গল্প শোনায়—একবার চাহিয়া দেখে, কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খানিক রাত্রি পর্যন্ত সে একখানা বই পড়িল, পরে আলো নিভাইবার পূর্বে ছেলেকে ভাল করিয়া শোয়াইতে গেল। ঘুমন্ত অবস্থায় বালককে কি অদ্ভুত ধরণের অবোধ, অসহায়, দুর্বল ও পরাধীন মনে হইল অপুর। কি অসহায় ও পরাধীন ! সে ভাবে, এই যে ছেলে, পৃথিবীতে এ তো কোথাও ছিল না, যাচিয়াও তো আসে নাই—অপর্ণা ও সে, দু'জনে যে উহাকে কোন্ অনন্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার পর সংসারে আনিয়া অবোধ নিষ্পাপ বালককে একা এভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে ? কিন্তু এখন কোথায়ই বা লইয়া যায় ?

প্রাচীন গ্রীসের এক সমাধির উপরে সেই যে স্মৃতিফলকটির কথা সে পড়িয়াছিল ফ্রেডারিক হ্যারিসনের বই-এ—

This child of ten years
Philip, his father laid here
His great hope, Nikoteles.

সে দূর কালের ছোট্ট বালকটির সুন্দর মুখ, সুন্দর রং, দেব-শিশুর মত সুন্দর দশ বৎসরের বালক নিকোটিলিস্‌কে আজ রাত্রে সে যেন নির্জন প্রান্তরে খেলা করিতে দেখিতে পাইতেছে—সোনালী চুল, ডাগর ডাগর চোখ। তাহার স্নেহস্মৃতি গ্রীসের সে নির্জন প্রান্তরের সমাধিক্ষেত্রের বুকে অমর হইয়া আছে? শত শতাব্দী পূর্বে সেই বিরহী পিতৃ-হৃদয়ের সঙ্গে সে যেন আজ নিজের নাড়ীর যোগ অনুভব করিল। মনে হইল, মানুষ সব কালে, সব অবস্থায় এক, এক। কিংবা···দেবতার মন্দির-দ্বারে আরোগ্যকামী বহু যাত্রী জড় হইয়াছে নানা দিক্‌-দেশ হইতে···ছোট ছেলেটির গরীব বাবা তাহাকে আনিয়াছে···ছেলেটি অসুখে ভোগে, রুগ্‌ণ, স্বপ্নে দেবতা আসিয়া বলিলেন—যদি তোমার রোগ সারিয়ে দিই, আমায় কি দেবে ইউফেনিস্‌? উঃ, সত্যি! অসুখ সারিলে সে বাঁচে! ছেলেটি উৎসাহের সুরে বলিল—দশটা মার্বেল আমার আছে, সব কটাই দিয়ে দেব—দেবতা খুশীর সুরে বলিলেন—স—ব ক—টা! বলো কি?—বেশ বেশ, রোগ সারিয়ে দেব তোমার।

বাৎসল্যরসের এমন গভীর অনুভূতি জীবনে তাহার এই প্রথম···

অনেক দিন পরে উপরের ঘরটাতে শুইল। সেই তাহার ফুলশয্যার খাটটাতে। কাজল পাশেই ঘুমাইতেছে—কিন্তু কত রাত পর্যন্ত তাহার নিজের ঘুম আসিল না। জানালার বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। গত পাঁচ ছয় বৎসর বিদেশে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবনযাত্রা ও নবতর অনুভূতিরাজির ফলে পুরাতন দিনের অনেক অনুভূতিই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—এখানকার তো আরও, কারণ আট নয় বৎসর এখানকার জীবনের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তাই আজ এই চিলে-কোঠার বহু পরিচিত ঘরটা, এই পালঙ্কটা, ঐ সুপারি বনের সারি—এসব যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। ঠিক আবার পুরানো দিনের মত জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ঠিক সেই সব দিনের মত নাটমন্দির হইতে নৈশ কীর্তনের খোলের আওয়াজ আসিতেছে—কিন্তু সে অপু নাই—বদলাইয়া গিয়াছে—বেমালুম বদলাইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীর গহনা বেচিয়া বই ছাপাইয়া ফেলিল পূজার পরেই।

কেবল হার ছড়াটা বেচিতে পারিল না। অপর্ণার অন্যান্য গহনার অপেক্ষা সে এই হার ছড়াটার সঙ্গে বেশী পরিচিত। তাই হারটা সামনে খুলিয়া খানিকক্ষণ ভাবিল, অপর্ণার সেই হাসি-হাসি মুখখানা যেন ঝাপসা-মত মনে পড়ে—প্রথমটাতে

হঠাৎ যেন খুব অস্পষ্ট মনে আসে—আধ সেকেণ্ড কি সিকি সেকেণ্ড মাত্র সময়ের জন্য—তারপরই ঝাপসা হইয়া যায়। ঐ আধ সেকেণ্ডের জন্য মনে হয়, সে-ই সে-রকম ঘাড় বাঁকাইয়া মুখে হাসি টিপিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

ছাপানো বই-এর প্রথম কপিখানা দপ্তরীর বাড়ি হইতে আনাইয়া দেখিয়া সে দুঃখ ভুলিয়া গেল। কিছু না, সব দুঃখ দূর হইবে। এই বই-এ সে নাম করিবে।

আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হইতে সে নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো ভিটাকে অভিনন্দন পাঠাইল মনে মনে। যেখানেই থাকি, ভুলি নি! যাহাদের বেদনার রঙে তাহার বইখানা রঙান, কত স্থানে, কত অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে পরিচয়, হয়ত কেউ বাঁচিয়া আছে, কেউ বা নাই। তাহারা আজ কোথায় সে জানে না, এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-শান্তির মধ্য দিয়া সে মনে মনে সকলকেই আজ তাহার ধন্যবাদ জানাইতেছে।

মাসকয়েকের জন্য একটা ছোট আফিসে একটা চাকরি জুটিয়া গেল তাই রক্ষা। এক জায়গায় আবার ছেলে পড়ায়। এসব না করিলে খরচ চলে বা কিসে, বই-এর বিজ্ঞাপনের টাকাই বা আসে কোথা হইতে। আবার সেই সাড়ে নয়টার সময় আফিসে দৌড়, সেখান হইতে বাহির হইয়া একটা গলির মধ্যে একতলা বাসার ছোট্ট ঘরে দুটি ছেলে পড়ানো। বাড়ির কর্তার কিসের ব্যবসা আছে, এই ঘরে তাঁহাদের বড় বড় প্যাকবাক্স ছাদের কড়ি পর্যন্ত সাজানো। তাহারই মাঝখানে ছোট তক্তপোশে মাদুর পাতিয়া ছেলে-দুটি পড়ে—সন্ধ্যার পরে অপু যখনই পড়াইতে গিয়াছে, তখনই দেখিয়াছে কয়লার ধোঁয়ায় ঘরটা ভরা।

শীতকাল কাটিয়া পুনরায় গ্রীষ্ম পড়িল। বই-এর অবস্থা খুব সুবিধা নয়, নিজে না খাইয়া বিজ্ঞাপনের খরচ যোগায়, তবু বই-এর কাটতি নাই! বইওয়ালারা উপদেশ দেয়, এডিটারদের কাছে, কি বড় বড় সাহিত্যিকদের কাছে যান, একটু যোগাড়যন্ত্র ক'রে ভাল সমালোচনা বার করুন, আপনাকে চেনে কে, বই কি হাওয়ায় কাটবে মশাই? অপু সে সব পারিবে না, নিজের লেখা বই বগলে করিয়া দোরে দোরে ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার কর্ম নয়। এতে বই কাটে ভাল, না কাটে সে কি করিবে?

অতএব জীবন পুরাতন পরিচিত পথ ধরিয়াই বহিয়া চলিল—আফিস আর ছেলেপড়ানো। রাত্রে আর একটা নতুন বই লেখে। ও যেন একটা নেশা, বই বিক্রী হয়-না-হয়, কেউ পড়ে-না-পড়ে, তাহাকে যেন লিখিয়া যাইতেই হইবে।

মেসে লেখার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া সে একটা ছোট একতলা

বাড়ির নীচেকার একটা ঘর আট টাকায় ভাড়া লইয়া সেখানে উঠিয়া গেল। মেসের বাবুরা লোক বেশ ভালই—কিন্তু তাঁহাদের মানসিক ধারা যে পথ অবলম্বনে চলে অপুর পথ তা নয় তাঁহাদের মূর্খতা, সংস্কার, সীমাবদ্ধতা ও সর্বরকমের মানসিক দৈন্য অপুকে পীড়া দেয়। খানিকক্ষণ মিষ্টালাপ হয়তো এদের সঙ্গে চলিতে পারে—কিন্তু বেশীক্ষণ আড্ডা দেওয়া অসম্ভব—বরং কারখানার ননী মিস্ত্রী, কি চাঁপদানীর বিশু স্যাকরার আড্ডার লোকজনকে ভালই লাগিত—কারণ তাহারা যে জগৎটাতে বাস করিত—অপুর কাছে সেটা একেবারেই অপরিচিত—তাহাদের মোহ ছিল, সেই অজানা ও অপরিচয়ের মোহ, কাশীর কথক ঠাকুর কি অমরকণ্টকের আজবলাল ঝা-কে যে কারণে ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু এরা সে ধরণের অনন্যসাধারণ নয়, নিতান্তই সাধারণ ও নিতান্ত ক্ষুদ্র। কাজেই বেশীক্ষণ থাকিলেই হাঁপ ধরে—অপুর নতুন ঘরটাতে দরজা জানালা কম, দক্ষিণ দিকের ছোট জানালাটা খুলিলে পাশের বাড়ির ইঁট-বার-করা দেওয়ালটা দেখা যায় মাত্র। ভাবিল—তবুও তো একা থাকতে পারব—লেখাটা হবে।

বাড়ি বদল করার দিনটা জিনিসপত্র সরাইতে ও ঘর গুছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল।

আজ রবিবার ছেলে-পড়ানো নাই। বাপ্! নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সেই অতটুকু ঘর, কয়লার ধোঁয়া আর রাজ্যের প্যাকবাক্সের টার্পিন তেলের মত গন্ধ। আজ কয়েক দিন হইল কাজলের একখানা চিঠি পাইয়াছে, এই প্রথম চিঠি, কাটাকুটি বানান ভুলে ভর্তি। আর একবার পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িল—বার-পনেরো হইল এইবার লইয়া। বাবার জন্য তাহার মন কেমন করে, একবার যাইতে লিখিয়াছে, একখানা আরব্য উপন্যাস ও একটা লণ্ঠন লইয়া যাইতে লিখিয়াছে, যেন বেশী দেরি না হয়! অপু ভাবে, ছেলেটা পাগল, লণ্ঠন কি হবে? লণ্ঠন?...দ্যাখ তো কাণ্ড। উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া ছেলের পত্রের জবাব লিখিল। সে আগামী শনিবার তাহাকে দেখিতে যাইতেছে।

সোম ও মঙ্গল বার ছুটি, ট্রেনে স্টীমারে বেজায় ভিড়। খুলনার স্টীমার এবারও ফেল করিল! শ্বশুরবাড়ি পেঁৗছিতে বেলা দুপুর গড়াইয়া গেল।

নৌকা হইতে দেখে কাজল ঘাটে তাহার অপেক্ষায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া—নৌকা থামিতে-না-থামিতে সে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। মুখ উঁচু করিয়া বলিল—বাবা,—আমার আরব্য উপন্যাস?—অপু সে-কথা একেবারেই

ভুলিয়া গিয়াছে। কাজল কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল —হুঃ-উঁ বাবা,এত ক'রে লিখলাম, তুমি ভুলে গেলে—লণ্ঠন ?···অপু বলিল,—আচ্ছা, তুই পাগল নাকি—লণ্ঠন কি করবি ?—কাজল বলিল, সে লণ্ঠন নয় বাবা !···হাতে ঝুলনো যায় রাঙা কাচ, সবুজ কাচ বের করা যায় এমনি ধারা। হুঃ-উঁ, তুমি আমার কোন কথা শোনো না। একটা আর্শি আনবে বাবা ?

—আর্শি ?—কি করবি আর্শি ?

—আমি আর্শিতে ছি য়া দেখ্‌বো—

অপর্ণার দিদি মনোরমা অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি আসিয়াছেন। বেশ সুন্দরী, অনেকটা অপর্ণার মত মুখ। ছোট ভগ্নীপতিকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন, স্বর্গগত মা ও বোনের নাম করিয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপু তাঁহার কাছে একটা সত্যকার স্নেহ ভালবাসা পাইল। সন্ধ্যাবেলা অপু বলিল—আসুন দিদি, ছাদের উপর বসে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি।

ছাদ নির্জন, নদীর ধারেই, অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অপু বলিল—আমার বিয়ের রাতের কথা মনে হয় মনোরমাদি ?

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সে যেন এক স্বপ্ন। কোথা থেকে কি যেন সব হয়ে গেল ভাই—এখন ভেবে দেখলে—ওদিন তাই এই ছাদের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলুম—তোমাকেও তো আমি সেই বিয়ের পর আর কখনও দেখি নি। এবার এসেছিলুম ভাগ্যিস, তাই দেখাটা হ'ল।

হাসির ভঙ্গি ঠিক অপর্ণার মত, মুখের কত কি ভাব, ঠিক তাহারই মত—বিস্মৃতির জগৎ হইতে সে-ই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে !

মনোরমা অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুমি তো দিদি বলে খোঁজও কর না ভাই। এবার পুজোর সময় বরিশালে যেও- বলা রইল, মাথার দিব্যি। আর তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিও তো।

কোথা হইতে কাজল আসিয়া বলিল—বাবা একটা অর্থ জান ?···

—অর্থ ? কি অর্থ ?

কাজলের মুখ তাহার অপূর্ব সুন্দর মনে হয়—কেমন একধরণের ঘাড় একেবারে বাঁকাইয়া চোখে খুশীর হাসি হাসিয়া কথাটা শেষ করে, আবার তখন বোকার মতই হাসে—হঠাৎ যেন মুখখানা করুণ ও অপ্রতিভ দেখায়। ঠিক এই সময়েই অপুর মনে ওই স্নেহের বেদনাটা দেখা দেয়—কাজলের ঐ ধরণের মুখভঙ্গিতে।

—বল দেখি, বাবা, 'এখান থেকে দিলাম সাড়া, সাড়া গেল সেই বামুনপাড়া ?' কি অর্থ ?

অপু ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল —পাখি।

কাজল ছেলেমানুষি হাসির খই ফুটাইয়া বলিল, ইল্লি ! পাখি বুঝি ? শাঁক তো—শাঁকের ডাক। তুমি কিচ্ছু জানো না বাবা।

অপু বলিল—ছিঃ বাবা, ওরকম ইল্লি টিল্লি বলো না, বলতে নেই ও-কথা, ছিঃ।

—কেন বলতে নেই বাবা ?···

—ও ভাল কথা নয়।

আসিবার আগের দিন রাত্রে কাজল চুপি চুপি বলিল—এবার আমায় নিয়ে যাও বাবা, আমার এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগে না।

অপু ভাবিল—নিয়েই যাই এবারে, এখানে ওকে কেউ দেখে না, তাছাড়া লেখাপড়াও এখানে থাকলে যা হবে !

পরদিন সকালে ছেলেকে লইয়া সে নৌকায় উঠিল। অপর্ণার তোরঙ্গ ও হাত-বাক্সটা এখানে আট-নয় বৎসর পড়িয়া আছে, তাহার বড় শালী সঙ্গে দিয়া দিলেন। ইহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপুকে বার বার বরিশালে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সকালের নবীন রোদ ভাঙা নাটমন্দিরের গায়ে পড়িয়াছে। নদীজল হইতে একটা আমিষ গন্ধ আসিতেছে। শ্বশুর মহাশয়ের তামাক খাওয়ার কয়লা পোড়ানোর জন্য শুকনা ডালপালায় আগুন দেওয়া হইয়াছে নদীর ধারটাতেই। কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়ার রাশ উপরে উঠিতেছে। সকালের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। আজ বহু বৎসর আগে যেদিন বন্ধু প্রণবের সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে এ বাটী আসিয়াছিল তখন সে কি ভাবিয়াছিল এই বাড়িটার সহিত তাহার জীবনে এমন একটি অদ্ভুত যোগ সাধিত হইবে, আজও সেদিনটার কথা বেশ স্পষ্ট মনে হয়। মনে আছে, আগের দিন একটা গ্রামোফোনের দোকানে গান শুনিয়াছিল—'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি'। শুনিয়া গানটা মুখস্থ করিয়াছিল ও সারাপথে ও স্টীমারে আপন মনে গাহিয়া-ছল। এখনও গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিলে সেই দিনটা আবার ফিরিয়া আসে।

ছেলেকে সঙ্গে লইয়া অপু প্রথমে মনসাপোতা আসিল। বছর ছয়-সাত খানে আসা ঘটে নাই। এই সময়ে দিনকয়েকের ছুটি আছে, এইবার একবার

না দেখিয়া গেলে আর আসা ঘটিবে না অনেকদিন।

ঘরদোরের অবস্থা খুব খারাপ। অপুর মনে পড়িল, ঠিক এই রকম অপরিষ্কার ভাঙা ঘরে এই বালকের মাকে সে একদিন আনিয়া তুলিয়াছিল। তেলিদের বাড়ি হইতে চাবি আনিয়া ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল। খড় নানাস্থানে উড়িয়া পড়িয়াছে, ইঁদুরের গর্ত, পাড়ার গরু-বাছুর উঠিয়া দাওয়া ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, উঠানে বনজঙ্গল।

কাজল চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া অবাক্ হইয়া বলিল—বাবা, এইটে তোমাদের বাড়ি!

অপু হাসিয়া বলিল—তোমাদেরও বাড়ি বাবা। মামার বাড়ির কোঠা দেখেছ জন্মে অবধি, তাতে তো চলবে না, পৈতৃক সম্পত্তি তোমার এই।

সকালে উঠিয়া একটি খবরে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নিরুপমা আর নাই। সে গত পৌষ মাসে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, পথে কলেরা হয়, সেখানেই মারা যায়। নিরুপমার জ্যাঠা বৃদ্ধ সরকার মহাশয় বলিতেছেন—আর দাদাঠাকুর, তোমরা লেখাপড়া শিখে দেশে তো আর আসবে না? মেয়েটার কথা মনে হলে আর অন্ন মুখে ওঠে না। হ'ল কি জান, বললে কুড়ুলের পাটে মেলা দেখতে যাব। তার তো জানো পুজো-আচ্চা এক বাতিক ছিল। পাড়ার সবাই যাচ্ছে, আমি বলি, তা যাও। ওমা, তিন দিন পর সকালে খবর এল নিরু মা মর-মর, শান্তিপুরের পথে একটা দোকানে—কি সমাচার, না কলেরা। গেলুম সবাই ছুটে। পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমরা যখন গেলুম তখন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে, চিনতে পারলে, চোখ দিয়ে হু-হু জল পড়তে লাগল। দাদাঠাকুর—মা আমার পাড়াসুদ্ধ সবারই উপকার ক'রে বেড়াত—তুমি সবই জান—আর অসুখ দেখে সেই পাড়ার লোকই ···যারা সঙ্গে ছিল, পথের ধারের একটা দোচালা ভাঙা ঘরে মাকে আমার ফেলে সবাই পালিয়েছে। পাশের দোকানীটা লোক ভাল—সে-ই একটু দেখাশুনা করেছে। চিকিৎসে হয় নি, পত্তরও হয় নি, বেঘোরে নিরু-মাকে হারালুম।

সরকার-বাড়ি হইতে ফিরিতে একটু বেলা হইয়া গেল। উঠানে পা দিয়া ডাকিল—ও খোকা—কাজল দুপুরে ঘুমাইতেছিল, কখন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে এবং তেলি-বাড়ি হইতে আঁকশি যোগাড় করিয়া আনিয়া উঠানের গাছের চাঁপা ফুল পাড়িবার জন্য নিচের একটা ডালে আঁকশি বাধাইয়া টানাটানি করিতেছে।

দৃশ্যটা তাহার কাছে অদ্ভুত মনে হইল। অপর্ণার পোঁতা সেই চাঁপাফুল গাছটা। কবে তাহার ফুল ধরিয়াছে, কবে গাছটা মানুষ হইয়াছে, গত সাত বৎসরের

মধ্যে অপুর সে খোঁজ লওয়ার অবকাশ ছিল না—কিন্তু খোকা কেমন করিয়া—

সে বলিল—খোকা ফুল পাড়ছিস্ তো, গাছটা কে পুঁতেছিল জানিস্ ?

কাজল বাবার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি এসো না বাবা, ঐ ডালটা চেপে ধরো না! মোটে দুটো পড়েছে।

অপু বলিল—কে পুঁতেছিল জানিস গাছটা ? তোর মা!

কিন্তু মা বলিলে কাজল কিছুই বোঝে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে দিদিমা ছাড়া আর কাহাকেও চিনিত না, দিদিমাই তাহার সব। মা একটা অবাস্তব কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। মায়ের কথায় তার মনে কোনও বিশেষ সুখ বা দুঃখ জাগায় না।

অনেকদিন পরে মনসাপোতা আসা। সকলেই বাড়িতে ডাকে, নানা সদুপদেশ দেয়। ক্ষেত্র কপালী অপুকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিল, দুধ পাঠাইয়া দিল—ঘর ছাইবার জন্য ভড়েরা একগাড়ি উলুখড় দিতে চাহিল।

রাত্রে আবার কি কাজে সরকার-বাড়ির সামনের পথ দিয়া আসিতে হইল। বাড়িটার দিকে যেন চাওয়া যায় না। গোটা মনসাপোতাটা নিরুদির অভাবে ফাঁকা হইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। নিরুদি, আজ খোকাকে নিয়ে এসেছি, তুমি এসে ওকে দেখবে না, আদর করবে না, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দেবে না ?

রাত্রে অপু আর কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না। চোখের সামনে নিরুপমার সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই অনুযোগের সুর কানে। আর একটি বার দেখা হয় না তাহার সঙ্গে ?

কাজলকে সে কলিকাতায় লইয়া আসিল পরদিন বৈকালের ট্রেনে। সন্ধ্যার পর গাড়িখানা শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকিল। এত আলো, এত বাড়ি-ঘর, এত গাড়িঘোড়া—কি কাণ্ড এ সব! কাজল বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। সে শুধু বাবার হাত ধরিয়া চারিদিকে ডাগর চোখে চাহিতে চাহিতে চলিল।

হ্যারিসন রোডের বড় বড় বাড়িগুলা দেখাইয়া একবার সে বলিল—ওগুলো কাদের বাড়ি, বাবা ? অত বাড়ি ?

বাবার বাসাটায় ঢুকিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া বড় রাস্তার গাড়িঘোড়া দেখিতে লাগিল। অবাক-জলপান জিনিসটা কি ? বাবার দেওয়া দুটো পয়সা কাছে ছিল, এক পয়সার অবাক-জলপান কিনিয়া খাইয়া সে সত্যই অবাক্ হইয়া গেল। মনে হইল, এমন অপূর্ব জিনিস সে জীবনে আর কখনও খায় নাই। চাল-ছোলা ভাজা সে অনেক খাইয়াছে। কিন্তু কি মশলা

দিয়া ইহারা তৈরী করে এই অবাক-জলপান ?

অপু তাহাকে ডাকিয়া বাসার মধ্যে লইয়া গেল—ওরকম একলা কোথাও যাস্ নে খোকা। হারিয়ে যাবি কি, কি হবে। যাওয়ার দরকার নেই।

কাজলের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। আর দাদামশায়ের বকুনি খাইতে হইবে না, একা গিয়া দোতলার ঘরে রাত্রিতে শুইতে হইবে না, মামীমাদের ভয়ে পাতের প্রত্যেক ভাতটি খুঁটিয়া গুছাইয়া খাইতে হইবে না। একটি ভাত পাতের নিচে পড়িয়া গেলে বড় মামীমা বলিত—পেয়েছ পরের, দেদার ফেল আর ছড়াও—বাবার অন্ন তো খেতে হ'ল না কখনো!

ছেলেমানুষ হইলেও সব সময় এই বাবার খোঁটা কাজলের মনে বাজিত—

অপু বাসায় আসিয়া দেখিল, কে একখানা চিঠি দিয়াছে তাহার নামে—অপরিচিত হস্তাক্ষর। আজ পাঁচ-ছয় দিন পত্রখানা আসিয়া চিঠির বাক্সে পড়িয়া আছে। খুলিয়া পড়িয়া দেখিল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাহাকে লিখিতেছেন. তাহার বই পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, শুধু তিনি নহেন, তাঁহার বাড়িসুদ্ধ সবাই—প্রকাশকের নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া এই পত্র লিখিতেছেন, তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন।

দু-তিনবার চিঠিখানা পড়িল। এতদিন পরে বোঝা গেল যে, অন্ততঃ একটি লোকেরও ভাল লাগিয়াছে তাহার বইখানা!···

পরের প্রশংসা শুনিতে অপু চিরকালই ভালবাসে, তবে বহু দিন তাহার অদৃষ্টে সে জিনিসটা জোটে নাই—প্রথম যৌবনের সেই সরল হামবড়া ভাব বয়সের অভিজ্ঞতার ফলে দূর হইয়া গিয়াছিল, তবুও সে আনন্দের সহিত বন্ধুবান্ধবের নিকট চিঠিখানা দেখাইয়া বেড়াইল।

পরের দিন কাজল চিড়িয়াখানা দেখিল, গড়ের মাঠ দেখিল। মিউজিয়ামে অধুনালুপ্ত ?: কালের কচ্ছপের প্রস্তরীভূত বৃহৎ খোলা দুটি দেখিয়া সে অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। পরে অপু ফিরিয়া যাইতেছে. কাজল বাবার কাপড় ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া বলিল—শোন বাবা!—কচ্ছপ দুটোর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আচ্ছা এ দুটোর মধ্যে যদি যুদ্ধ হয় তবে কে জেতে বাবা?···অপু গম্ভীর মুখে ভাবিয়া ভাবিয়া বলে—ওই বাঁ দিকেরটা জেতে।—কাজলের মনের দ্বন্দ্ব দূর হয়।

কিন্তু গোলদীঘিতে মাছের ঝাঁক দেখিয়া সে সকলের অপেক্ষা খুশী। এত বড় বড় মাছ আর এত একসঙ্গে! মেলা ছেলেমেয়ে মাছ দেখিতে জুটিয়াছে বৈকালে,

সেও বাবার কথায় এক পয়সায় মুড়ি কিনিয়া জলে ছড়াইয়া দিয়া অধীর আগ্রহে মাছের খেলা দেখিতে লাগিল। তুমি ছিপে ধরবে বাবা? কত বড় বড় মাছ?

অপু বলিল—চুপ্ চুপ্—ও মাছ ধরতে দেয় না।

ফুটপাতে একজন ভিখারী বসিয়া। কাজল ভয়ের সুরে বলিল—শিগগির একটা পয়সা দাও বাবা, নইলে ছুঁয়ে দেবে!—তাহার বিশ্বাস, কলিকাতার যেখানে যত ভিখারী বসিয়া আছে ইহাদের পয়সা দিতেই হইবে, নতুবা ইহারা আসিয়া ছুঁইয়া দিবে, তখন তোমাকে বাড়ি ফিরিয়া স্নান করিতে হইবে সন্ধ্যাবেলা, কাপড় ছাড়িতে হইবে—সে এক মহা হাঙ্গামা।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপুর চাকরিটি গেল। অর্থের এমন কষ্ট সে অনেক দিন ভোগ করে নাই। ভাল স্কুলে দিতে না পারিয়া সে ছেলেকে কর্পোরেশনের ফ্রি স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ছেলেকে দুধ পর্যন্ত দিতে পারে না, ভাল কিছু খাওয়াইতে পারে না। বইয়ের বিশেষ কিছু আয় নাই। হাত এদিকে কপর্দক শূন্য।

কাজলের মধ্যে অপু একটা পৃথক জগৎ দেখিতে পায়। দু'টা টিনের চাক্তি, গোটা দুই মার্বেল, একটা কল-টেপা খেলনা, মোটর গাড়ি, খান দুই বই—হইতে যে মানুষ কিসে এত আনন্দ পায়—অপু তাহা বুঝিতে পারে না। চঞ্চল ও দুষ্ট ছেলে—পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে অপু তাহাকে মাঝে মাঝে ঘরে চাবি দিয়া রাখিয়া নিজের কাজে বাহির হইয়া যায়—এক একদিন চার-পাঁচ ঘণ্টাও হইয়া যায়—কাজলের কোনো অসুবিধা নেই সে রাস্তার ধারের জানালাটায় দাঁড়াইয়া পথের লোকজন দেখিতেছে—না হয়, বাবার বইগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া ছবি দেখিতেছে—মোটের উপর আনন্দেই আছে।

এই বিরাট নগরীর জীবনস্রোত কাজলের কাছে অজানা দুর্বোধ্য। কিন্তু তাহার নবীন মন ও নবীন চক্ষু যে-সকল জিনিস দেখে ও দেখিয়া আনন্দ পায়—বয়স্ক লোকের ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাহা অতি তুচ্ছ। হয়তো আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে—দ্যাখো বাবা, ওই চিলটা একটা কিসের ডাল মুখে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, সামনের ছাদের আলসেতে লেগে ডালটা—ওই দ্যাখো বাবা রাস্তায় পড়ে গিয়েচে—

বাবার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া এত ট্রাম, মোটর, লোকজনের ভিড়ের মাঝখানে কোথায় একটা কাক ফুটপাতের ধারে ড্রেনের জলে স্নান করিতেছে তাই দেখিয়া তাহার মহা আনন্দ—তাহা আবার বাবাকে না দেখাইলে কাজলের মনে তৃপ্তি হইবে

না। সব বিষয়েই বাবাকে আনন্দের ভাগ না দিতে পারিলে, কাজলের আনন্দ পূর্ণ হয় না। খাইতে খাইতে বেগুনিটা, কি তেলে-ভাজা কচুরিখানা এক কামড় খাইয়া ভাল লাগিলে বাকী আধখানা বাবার মুখে গুঁজিয়া দিবে—অপুও তাহা তখনি খাইয়া ফেলে—ছিঃ, আমার মুখে দিতে নেই—একথা বলিতে তার প্রাণ কেমন করে—কাজেই পিতৃত্বের গাম্ভীর্যভরা ব্যবধান অকারণে গড়িয়া উঠিয়া পিতা-পুত্রের সহজ সরল মৈত্রীকে বাধাদান করে নাই, কাজল জীবনে বাবার মত সহচর পায় নাই—এবং অপুও বোধ হয় কাজলের মত বিশ্বস্ত ও একান্ত নির্ভরশীল তরুণ বন্ধু খুব বেশী পায় নাই জীবনে।

আর কি সরলতা!···পথে হয়ত দুজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, কাজল বলিল—শোনো বাবা, একটা কথা—শোনো, চুপি চুপি বলব—পরে পথের এদিক ওদিক চাহিয়া লাজুক মুখে কানে কানে বলে—ঠাকুর বড় দুটোখানি ভাত দ্যায় হোটেলে—আমার খেয়ে পেট ভরে না—তুমি বলবে বাবা? বললে আর দুটো দেবে না?

দিনকতক গলির একটা হোটেলে পিতাপুত্রে দুজনে খায়—হোটেলের ঠাকুর হয়ত শহরের ছেলের হিসেবে ভাত দেয় কাজলকে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে কাজল বয়সের অনুপাতে দুটি বেশী ভাতই খাইয়া থাকে।

অপু মনে মনে হাসিয়া ভাবে—এই কথা আবার কানে কানে বলা!···রাস্তার মধ্যে ওকে চেনেই বা কে আর শুনছেই বা কে!···ছেলেটা বেজায় বোকা।

আর একদিন কাজল লাজুক মুখে বলিল—বাবা একটা কথা বলব?···

—কি?

—নাঃ বাবা—বলব না—

—বল্ না কি?

কাজল সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি লাজুক সুরে বলিল—তুমি মদ খাও বাবা?

অপু বিস্মিত হইয়া বলিল—মদ?···কে বলেছে তোকে?

—সেই যে সেদিন খেলে? সেই রাস্তার মোড়ে একটা দোকান থেকে? পান কিনলে আর সেই যে—

অপু প্রথমটা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল—পরে বুঝিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—দূর বোকা—সে হ'ল লেমনেড্—সেই পানের দোকানে তো?··· তোর ঠাণ্ডা লেগেছিল বলে তোকে দিই নি।···খাওয়াব তোকে একদিন, ও এক রকম মিষ্টি শরবৎ। দূর—

কাজলের কাছে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া

সে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল যে এখানে মোড়ে মোড়ে মদের দোকান—পান ও মদ একসঙ্গে বিক্রয় হয় প্রায় সর্বত্র। সোডা লেমনেড্ সে কখনো দেখে নাই ইহার আগে, জানিত না—কি করিয়া সে ধরিয়া লইয়াছে বোতলে ওগুলো মদ। তাই তো সেদিন বাবাকে খাইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল—এত দিন লজ্জায় বলে নাই। সেই দিনই অপু তাহাকে লেমনেড্ খাওয়াইয়া তাহার ভ্রম ঘুচাইয়া দিল।

এই অবস্থায় একদিন সে বিমলেন্দুর পত্র পাইল, একবার আলিপুরে লীলার ওখানে পত্রপাঠ আসিতে। লীলার ব্যাপার সুবিধা নয়। তাহারও আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয়। নিজের যাহা কিছু ছিল গিয়াছে, আর কেহ দেয়ও না, বাপের বাড়িতে তাহার নাম করিবার পর্যন্ত উপায় নাই। ইদানীং তাহার মা কাশী হইতে তাহাকে টাকা পাঠাইতেন। বিমলেন্দু নিজের খরচ হইতে বাঁচাইয়া কিছু টাকা দিদির হাতে দিয়া যাইত। তাহার উপর মুশকিল এই যে, লীলা বড়-মানুষের মেয়ে, কষ্ট করা অভ্যাস নাই, হাত ছোট করিতে জানে না।

এই রকম কিছুদিন গেল। লীলা যেন দিন দিন কেমন হইয়া যাইতেছিল। অমন হাস্যমুখী লীলা, তাহার মুখে হাসি নাই, মনমরা বিষন্ন ভাব। শরীরও যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে। গত বর্ষাকাল এই ভাবেই কাটে; বিমলেন্দু পূজার সময় পীড়াপীড়ি করিয়া ডাক্তার দেখায়। ডাক্তারে বলেন, থাইসিসের সূত্রপাত হইয়াছে, সতর্ক হওয়া দরকার।

বিমলেন্দু লিখিয়াছে—লীলার খুব জ্বর। ভুল বকিতেছে, কেহই নাই, সে একা ও একটি চাকর সারারাত জাগিয়াছে, আত্মীয়স্বজন কেহ ডাকিলে আসিবে না, কি করা যায় এ অবস্থায়। অপু এখানে আজকাল তত আসিতে পারে না, অনেকদিন লীলাকে দেখে নাই। লীলার মুখ যেন রাঙা, অস্বাভাবিকভাবে রাঙা ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

বিমলেন্দু শুষ্কমুখে বলিল—কাল রঘুয়ার মুখে খবর পেয়ে এসে দেখি এই অবস্থা। এখন কি করি বলুন তো? বাড়ির কেউ আসবে না, আমি কাউকে বলতেও যাব না, মাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দেব?

অপু বলিল—মা যদি না আসেন?

—কি বলেন? এক্ষুণি ছুটে আসবেন—দিদি-অন্ত প্রাণ। তিনি যে আজ চার বছর কলকাতামুখো হন নি, সে এই দিদির কাণ্ডই তো। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, কাল রাত্রেও বকেছে, শুধু খুকী, খুকী, অথচ তাকে আনানো অসম্ভব।

অপু বলিল,—আর এক কাজ করতে হবে, একজন নার্স আমি নিয়ে আসি ঠিক করে। মেয়েমানুষের নার্সিং পুরুষকে দিয়ে হয় না। বসো তোমরা।

দুই তিন দিনে সবাই মিলিয়া লীলাকে সারাইয়া তুলিল। জ্ঞান হইলে সে একদিন কেবল অপুকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিয়া ক্ষীণসুরে বলিল—কখন এলে অপূর্ব ?

রোগ হইতে উঠিয়াও লীলার স্বাস্থ্য ভাল হইল না। শুইয়া আছে তো শুইয়াই আছে, বসিয়া আছে তো বসিয়াই আছে। মাথার চুল উঠিয়া যাইতে লাগিল। আপন মনে গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে, ভাল করিয়া কথাও বলে না, হাসেও না। কোথাও নড়িতে চড়িতে চায় না। ইতিমধ্যে কাশী হইতে লীলার মা আসিলেন। বাপের বাড়ি থাকেন, রোজ মোটরে আসিয়া দু'তিন ঘণ্টা থাকেন—আবার চলিয়া যান। ডাক্তার বলিয়াছে, স্বাস্থ্যকর জায়গায় না লইয়া গেলে রোগ সারিবে না।

দুপুর বেলাটা—কিন্তু একটু মেঘ করার দরুন রৌদ্র নাই কোথাও। অপু লীলার বাসায় গিয়া দেখিল লীলা জানালার ধারে বসিয়া আছে। সে সব সময় আসিতে পারে না, কাজলকে একা বাসায় রাখিয়া আসা চলে না। ভারী চঞ্চল ও রীতিমত নির্বোধ ছেলে। তাহা ছাড়া রান্নাবান্না ও সমুদয় কাজ করিতে হয় অপুর, কাজলকে দিয়া কুটাগাছটা ভাঙিবার সাহায্য নাই, সে খেলাধুলা লইয়া সারাদিন মহা ব্যস্ত—অপু তাহাকে কিছু করিতে বলেও না, ভাবে—আহা, খেলুক একটু। পুওর মাদারলেস্ চাইল্ড!

লীলা ম্লান হাসিয়া বলিল—এস।

—এরা কোথায়? বিমলেন্দু কোথায়? মা এখনও আসেন নি?

—বসো। বিমলেন্দু এই কোথায় গেল। নার্স তো নিচে, বোধ হয় খেয়ে একটু ঘুমুচ্ছে।

— তারপর কোথায় যাওয়া ঠিক হ'ল—সেই ধরমপুরেই? সঙ্গে যাবেন কে—

—মা আর বিমল।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। পরে লীলা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল— আচ্ছা অপূর্ব, বর্ধমানের কথা মনে হয় তোমার?

অপু ভাবিল, আহা, কি হয়ে গিয়েচে লীলা!

মুখে বলিল—মনে থাকবে না কেন—খুব মনে আছে।

লীলা অন্যমনস্কভাবে বলিল—তোমরা সেই ওদিকের একটা ঘরে থাকতে—

সেই আমি যেতুম—

—তুমি আমাকে একটা ফাউন্টেন পেন দিয়েছিলে মনে আছে লীলা? তখন ফাউন্টেন পেন নতুন উঠেচে।—মনে নেই তোমার?

লীলা হাসিল।

অপু হিসাব করিয়া বলিল—তা হয় প্রায় আজ বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা।

লীলা খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—অপূর্ব, কেউ মোটরটা কিনবে বলতে পারো, তোমার সন্ধানে আছে?

লীলার অত সাধের গাড়িটা…এত কষ্টে পড়িয়াছে সে!—

লীলা বলিল,—আমি সে সব গ্রাহ্য করি নে কিন্তু মা-ও ভাবেন—যাক্ সে সব কথা। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে অপূর্ব?

—কোথায়?

—যেখানে হোক্। তোমার সেই পোর্তো প্লাতায়—মনে নেই, সেই যে সমুদ্রের মধ্যে কোন্ ডুবো জাহাজ উদ্ধার করে বলেছিলে সোনা আনবে? সেই যে 'মুকুলে' পড়ে বলেছিলে?

কথাটা অপুর মনে পড়িল। হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ সেই—ঠিক। উঃ, সে কথা মনে আছে তোমার!

—আমি বলেছিলাম, কেমন ক'রে যাবে? তুমি বলেছিলে, জাহাজ কিনে সমুদ্রে যাবে।

অপু হাসিল। শৈশবের সাধ-আশার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে সে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, লীলাও এ ধরণের নানা আশা পোষণ করিত, বিদেশে যাইবে, বড় আর্টিস্ট হইবে ইত্যাদি—ওর সামনে আর সে কথা বলার আবশ্যক নাই।

কিন্তু লীলাই আবার খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যাবে না? যাও যাও—পরে—হি-হি করিয়া হাসিয়া কেমন একটা অদ্ভুত সুরে বলিল—সমুদ্র থেকে সোনা আনবে তো তোমরাই—পোর্তো প্লাতো থেকে, না?…দ্যাখো, এখনও ঠিক মনে ক'রে রেখেছি—রাখি নি? হি-হি—একটু চা খাবে?

লীলার মুখের শীর্ণ হাসি ও তাহার বাঁধুনীহারা উদ্‌ভ্রান্ত আল্‌গা ধরণের কথাবার্তা অপুর বুকে তীক্ষ্ন তীরের মত বিঁধিল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিল এত ভালবাসে নাই সে লীলাকে আর কোনো দিন আজ যত বাসিয়াছে।

—দুপুর বেলা চা খাব কি ? —সেজন্যে ব্যস্ত হয়ো না লীলা।

লীলা বলিল—তোমার মুখে সেই পুরনো গানটা শুনি নি অনেকদিন—সেই 'আমি চঞ্চল হে'—গাও তো ?

মেঘলা দিনের দুপুর। বাহিরের দিকে একটা সাহেব-বাড়ির কম্পাউণ্ডে গাছের ডালে অনেকগুলি পাখি কলরব করিতেছে। অপু গান আরম্ভ করিল, লীলা জানালার ধারেই বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া গানটা শুনিতে লাগিল। লীলার মনে আনন্দ দিবার জন্য অপু গানটা দু-তিনবার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিল। গান শেষ হইয়া গেল, তবু লীলা জানালার বাহিরেই চাহিয়া আছে, অন্যমনস্কভাবে যেন কি জিনিস লক্ষ্য করিতেছে।

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। দুজনেই চুপ করিয়া ছিল। হঠাৎ লীলা বলিল —একটা কথার উত্তর দেবে ?

লীলার গলার স্বরে অপু বিস্মিত হইল। বলিল—কি কথা ?...

—আচ্ছা, বেঁচে লাভ কি ?

অপু এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—বলিল—এ কথার কি—এ কথা কেন ?

—বল না ?...

—না লীলা। এ ধরণের কথাবার্তা কেন ? এর দরকার নেই।

—আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে ?...

—কি বল ?...

—আচ্ছা, আমাকে লোকে কি ভাবে ?

সেই লীলা ! তাহার মুখে এ রকম দুর্বল ধরণের কথাবার্তা, সে কি কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল ! অপু এক মুহূর্তে সব বুঝিল—অভিমানিনী তেজস্বিনী লীলা আর সব সহ্য করিতে পারে, লোকের ঘৃণা তাহার অসহ্য। গত কয়েক বৎসরে ঠিক তাহাই জুটিয়াছে তাহার কপালে। এতদিন সেটা বোঝে নাই—সম্প্রতি বুঝিয়াছে—জীবনের উপর টান হারাইতে বসিয়াছে।

অপুর গলায় যেন একটা ডেলা আটকাইয়া গেল। সে যতদূর সম্ভব সহজ সুরে বলিল—এ ধরণের কথা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন লীলার কাছে বলে নাই, কোনো দিন না—দ্যাখো লীলা, অন্য লোকের কথা জানি নে, তবে আমার কথা শুনবে ?...আমি তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বড়ো তো ভাবিই—অনেকের চেয়ে বড় ভাবি—তোমাকে কেউ চেনে নি, চিনলে না, এই কথা ভাবি।—আজ নয় লীলা, এতটুকু বেলা থেকে তোমায় আমি জানি, অন্য লোকে ভুল করতে পারে,

কিন্তু আমি—

লীলা যেন অবাক্ হইয়া গেল, কখনও সে এরকম দেখে নাই অপুকে। সে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল— সত্যি বলছ ?— কিন্তু অপুর মুখ দেখিয়া হয়ত বুঝিল প্রশ্নটা অনাবশ্যক। পরক্ষণেই খেয়ালী অপু আর একটা কাজ করিয়া বসিল—এটাও সে ইহার আগে কখনও করে নাই—লীলার খুব কাছে সরিয়া গিয়া তার ডান হাতখানা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া লীলাকে নিজের দিকে টানিয়া তার মুখ ফিরাইল। পরে গভীর স্নেহে তার উত্তপ্ত ললাটে, কানের পাশের চূর্ণ কুন্তলে হাত বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ়স্বরে বলিল—তুমি আমি ছেলেবেলার সাথী, লীলা—আমরা কেউ কাউকে ভুলব না— কোনো অবস্থাতেই না। এতদিন ভুলি নি-ও কখনো লীলা।

লীলার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিল···যাহা আজ অপুর মুখে, কথার সুরে ডাগর চোখের অকপট দৃষ্টিতে পাইল— জীবনে কোনো দিন কাহারও কাছ হইতে তাহা সে কখনও পায় নাই—আজ সে দেখিল অপুকে সে চিরকাল ভালবাসিয়া আসিয়াছে—বিশেষ করিয়া অপুর মাতৃবিয়োগের পর লালদীঘির সামনের ফুটপাতে তাকে যেদিন শুষ্কমুখে নিরাশ্রয় ভাবে বেড়াইতে দেখিয়াছিল – সেদিনটি হইতে।

···অপুর চমক ভাঙিল— লীলা কখন তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়াছিল— তাহার অশ্রুপ্লাবিত পাণ্ডুর মুখখানি।······

অপু বাহিরে চলিয়া আসিল—সে অনুভব করিতেছিল, লীলার মত সে কাহাকেও ভালোবাসে না—সেই গভীর অনুকম্পামিশ্রিত ভালবাসা, যা মানুষকে সব ভুলাইয়া দেয়, আত্মবিসর্জনে প্রণোদিত করে।

লীলাকে যে করিয়া হউক সে সুখী করিবে। লীলাকে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না, নিজেকে ছোট ভাবিতে দিবে না। যাহার ইচ্ছা লীলাকে ছাড়ুক, সে লীলাকে ছাড়িতে পারিবে না। সে লীলাকে কোথাও লইয়া যাইবেই—এ অবস্থায় কলিকাতায় থাকিলে লীলা বাঁচিবে না। বিশ্ব একদিকে—লীলার মুখের অনুরোধ আর একদিকে।

সারাপথ ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

দিন তিনেক পরে।

বেলা আটটা। অপু সকালে স্নান সারিয়া কাজলকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে

বাহির হইবে—এমন সময়ে মিঃ লাহিড়ীর ছোট নাতি অরুণ ঘরে ঢুকিল। এককোণে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি উত্তেজিত সুরে বলিল—শিগ্‌গির আসুন, দিদি কাল রাত্রে বিষ খেয়েছে।

বিষ! সর্বনাশ!—লীলা বিষ খাইয়াছে!

কাজলকে কি করা যায়?—খোকা তুই—বরং—ঘরে থাক একা। আমি একটা কাজে যাচ্ছি। দেরি হবে ফিরতে।

কিন্তু কাজলের চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। কেন বাবা? কি কাজ? কোথায়? কত দেরি হইতে পারে?···কোনোমতে ভুলাইয়া তাহাকে রাখিয়া দুজনে ট্যাক্সি ধরিয়া লীলার বাসায় আসিল। আরও দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। ঢুকিতেই লীলাদের বাড়ির ডাক্তার বন্ধু কেদারবাবুর সঙ্গে দেখা। অরুণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি অবস্থা এখন?

কেদারবাবু বলিলেন—অবস্থা তেমনি। আর একটা ইন্‌জেক্‌শ্যন করেছি। হিল্‌কক্‌ সাহেব এলে যে বুঝতে পারি। অপুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—বড্‌ড স্যাড্‌ ব্যাপার—বড্‌ড স্যাড্‌। জিনিসটা? মরফিয়া। রাত্রে কখন খেয়েছে, তা তো বোঝা যায় নি, আজ সকালে তাও বেলা হলে তবে টের পাওয়া গেল। কর্ণেল হিল্‌কক্‌কে আনতে লোক গিয়েছে তিনি না আসা পর্যন্ত—

অরুণের সঙ্গে সঙ্গে উপরের সেই ঘরটাতে গেল—মাত্র দিন তিনেক আগে যেটাতে বসিয়া সে লীলাকে গান শুনাইয়া গিয়াছে। প্রথমটা কিন্তু সে ঘরে ঢুকিতে পারিল না, তাহার হাত কাঁপিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। ঘরটা অন্ধকার, জানালার পর্দাগুলো বন্ধ, ঘরে বেশী লোক নাই, কিন্তু বারান্দাতে আট-দশজন লোক। সবাই পদ্মপুকুরের বাড়ির।—সবাই চুপি চুপি কথা কহিতেছে, পা টিপিয়া টিপিয়া হাঁটিতেছে। কিছু বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিয়াছে এখানে, এমন বলিয়া কিন্তু অপুর মনে হইল না। অথচ একজন—যে পৃথিবীর সুখকে এত ভালবাসিত, আকাঙ্ক্ষা করিত, আশা করিত—উপেক্ষায় মুখ বাঁকাইয়া পৃথিবী হইতে ধীরে ধীরে বিদায় লইতেছে।

সেদিনকার সেই জানালার পাশের খাটেই লীলা শুইয়া। সংজ্ঞা নাই, পাণ্ডুর, কেমন যেন বিবর্ণ—ঠোঁট ঈষৎ নীল। একখানা হাত খাটের বাহিরে ঝুলিতেছিল—সে তুলিয়া দিল। গায়ে রেশমের বরফি-কাটা বিলাতী লেপ। কি অপূর্ব যে দেখাইতেছে লীলাকে!···মরণাহত মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের সৌন্দর্য যেন এ পৃথিবীর নয়—কিংবা হরিদ্রাভ হাতীর দাঁতে খোদাই মুখ যেন। দেবীর মত সৌন্দর্য আরও

অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার মনে হইল লীলা ঘামিতেছে। তবে বোধ হয় আর ভয় নাই, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। চুপি চুপি বলিল—ঘামছে কেন?

ডাক্তারবাবু বলিলেন—ওটা মরফিয়ার সিম্‌টম্‌।

মিনিট-দশ কাটিল। অপু বাহিরের বারান্দাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশের ঘরে লোকেরা একবার ঢুকিতেছে, আবার বাহির হইতেছে, অনেকেই আসিয়াছে, কেবল মিঃ লাহিড়ী ও লীলার মা নাই। মিঃ লাহিড়ী দার্জিলিং-এ, লীলার মা মাত্র কাল এখান হইতে বর্ধমানে কি কাজে গিয়াছেন। লীলা সত্যই অভাগিনী!

এমন সময় নীচে একটা গোলমাল। একখানা গাড়ির শব্দ উঠিল। ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন—তিনি উপরে উঠিয়া আসিলেন, পিছনে কেদারবাবু ও বিমলেন্দু। অনেকেই ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, কেদারবাবু নিষেধ করিলেন। মিনিট সাতেক পরে ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—Too late, কোনও আশা নাই।

আরও আধঘন্টা। এত লোক।—অপু ভাবিল, ইহারা এতকাল কোথায় ছিল? আজ too late! Too late!···

লীলা মারা গেল বেলা দশটায়। অপু তখন খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ লীলা চোখ বুজিয়াই ছিল, সে সময়টা হঠাৎ চোখ মেলিয়া চাহিল তারা গুলা বড় বড়, তাহার দিকেও চাহিল, অপুর দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—লীলা তাহাকে চিনিয়াছে বোধ হয়।···কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল—দৃষ্টি অর্থহীন, আভাহীন, উদাসীন, অস্বাভাবিক। তারপরই লীলা যেন চোখ তুলিয়া কড়িকাঠে, সেখান হইতে আরও অস্বাভাবিকভাবে মাথার শিয়রে কার্নিসের বিটের দিকে ইচ্ছা করিয়াই কি দেখিবার জন্য চোখ ঘুরাইল—স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ওরকম চোখ ঘুরাইতে পারে না।

তারপরেই সবাই ঘরের বাহির হইয়া আসিল। কেবল বিমলেন্দু ছেলেমানুষের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অপুও ফিরিল। হায়রে পাপ, হায় পুণ্য! কে মানদণ্ডে তৌল করিবে? মূর্খ···মূর্খ···মূর্খ···মূর্খ···লীলার বিচার করিবে কে? এই সব মূর্খের দল? দুঃখের মধ্যে তাহার হাসি আসিল।

কাজল এই কয়মাসেই বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে। বাড়িতেই পড়ে—অনেক সময় নিজের বই রাখিয়া বাবার বইগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখে। আজকাল বাবা কি কাজে প্রায় সর্বদাই বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, এইজন্য বাবার কাজও সে অনেক করে।

বাসায় অনেকগুলো বিড়াল জুটিয়াছে। সে যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন ছিল একটা মাত্র বিড়াল— এখন জুটিয়াছে আরও গোটা তিন। কাজল খাইতে বসিলেই পাতের কাছে সবগুলা আসিয়া জোটে। তাহারা ভাত খায় না, খায় শুধু মাছ। কাজল প্রথমে ভাবে কাহাকেও সে এক টুকরাও দিবে না—করুক মিউ মিউ। কিন্তু একটু পরে একটা অল্পবয়সের বিড়ালের উপর বড় দয়া হয়। এক টুকরা তাহাকে দিতেই অন্য সবগুলা করুণসুরে ডাক শুরু করে—কাজল ভাবে —আহা, ওরা কি বসে বসে দেখবে—দিই ওদেরও একটু একটু। একে ওকে দিতে কাজলের মাছ প্রায় সব ফুরাইয়া যায়। বাঁড়ুয্যেদের ছেলে অনু একটা বিড়াল-ছানাকে রাস্তার উপর দিয়া যে ইঞ্জিন যায়, ওরই তলায় ফেলিয়া দিয়াছিল—ভাগ্যে সেটা মরে নেই—যে ইঞ্জিন চালায়, সে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া ফেলে। কাজল আজকাল একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে বিড়ালগুলির থাকিবার জায়গা করিয়া দিয়াছে।

রাত্রে শুইয়াই কাজল অমনি বলে,—গল্প বল বাবা। আচ্ছা বাবা, ওই যে রাস্তায় ইঞ্জিন চালায় যারা, ওরা কি যখন হয় থামাতে পারে, যেদিকে ইচ্ছে চালাতে পারে? সে মাঝে মাঝে গলির মুখে দাঁড়াইয়া বড় রাস্তার স্টীম রোলার চালাইতে দেখিয়াছে। যে লোকটা চালায় তাহার উপর কাজলের মনে মনে হিংসা হয়। কি মজা ওই কাজ করা! যখন খুশি চালানো, যতদূর হয়, যখন খুশি থামানো। মাঝে মাঝে সিটি দেয়, একটা চাকা বসিয়া বসিয়া ঘোরায়। সব চুপ করিয়া আছে, সামনের একটা ডাণ্ডা যাই টেপে অমনি ঘটাং ঘটাং বিকট শব্দ।

এই সময়ে অপুর হঠাৎ অসুখ হইল। সকালে অন্য দিনের মত আর বিছানা হইতে উঠিতেই পারিল না—বাবা সকালে উঠিয়া মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খায়, কাজলের মনে হয় সব ঠিক আছে—কিন্তু আজ বেলা দশটা বাজিল, বাবা এখনও শুইয়া—জগৎটা যেন আর স্থিতিশীল নয়, নিত্য নয়—সব কি যেন হইয়া

গিয়াছে। সেই রোদ উঠিয়াছে, কিন্তু রোদের চেহারা অন্য রকম, গলিটার চেহারা অন্য রকম, কিছু ভাল লাগে না, বাবার অসুখ এই প্রথম, বাবাকে আর কখনো সে অসুস্থ দেখে নাই—কাজলের ক্ষুদ্র জগতে সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। সারা দিনটা কাটিল, বাবার সাড়া নাই, সংজ্ঞা নাই—জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া। কাজল পাঁউরুটি কিনিয়া আনিয়া খাইল। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। কাজল পরমানন্দ পানওয়ালার দোকান হইতে তেল পুরিয়া আনিয়া লণ্ঠন জ্বালিল। বাবা তখনও সেই রকমই শুইয়া। কাজল অস্থির হইয়া উঠিল তাহার কোনও অভিজ্ঞতা নাই এ-সব বিষয়ে, কি এখন সে করে? দু-একবার বাবার কাছে গিয়া ডাকিল, জ্বরের ঘোরে বাবা একবার বলিয়া উঠিল—স্টোভটা নিয়ে আয়, ধরাই খোকা – স্টোভটা—

অর্থাৎ সে স্টোভটা ধরাইয়া কাজলকে রাঁধিয়া দিবে।

কাজল ভাবিল, বাবাও তো সারাদিন কিছু খায় নাই—স্টোভ ধরাইয়া বাবাকে সাবু তৈরী করিয়া দিবে। কিন্তু স্টোভ সে ধরাইতে জানে না, কি করে এখন? স্টোভটা ঘরের মেঝেতে লইয়া দেখিল তেল নাই। আবার পরমানন্দের দোকানে গেল। পরমানন্দকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পাশেই একজন নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী। ডাক্তারটি একেবারে নতুন, একা ডাক্তার-খানায় বসিয়া কড়ি-বরগা গুণিতেছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে বাসায় আসিলেন, অপুকে ডাকিয়া তাহার হাত ও বুক দেখিলেন, কাজলকে ঔষধ লইবার জন্য ডাক্তারখানায় আসিতে বলিলেন। অপু তখন একটু ভাল—সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল—ও পারবে না, রাত্তিরে এখন থাক্, ছেলেমানুষ, এখন থাক্—

এই সবের জন্য বাবার উপরে রাগ হয় কাজলের। কোথায় সে ছেলেমানুষ, সে বড় হইয়াছে। কোথায় সে না যাইতে পারে, বাবা পাঠাইয়া দেখুক দিকি সে কেমন পারে না? বিশেষতঃ অপরের সামনে তাহাকে কচি বলিলে, ছেলেমানুষ বলিলে, আদর করিলে বাবার উপর তাহার ভারী রাগ হয়।

বাবার সামনে স্টোভ ধরাইতে গেলে কাজল জানে বাবা বারণ করিবে, বলিবে —উঁহু করিস নে খোকা, হাত পুড়িয়ে ফেলবি। সে সরু বারান্দাটার এক কোণে স্টোভটা লইয়া গিয়া কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও সেটা জ্বালিতে পারিল না। অপু একবার বলিল—কি কচ্ছিস্ ও খোকা, কোথায় গেলি ও খোকা?—আঃ, বাবার জ্বালায় অস্থির!...ঘরে আসিয়া বলিল—বাবা কি খাবে? মিছরী আর বিস্কুট কিনে আনবো? অপু বলিল—না না, সে তুই পারবি নে। আমি খাবো না কিছু। লক্ষ্মী বাবা, কোথায় যেও না ঘর ছেড়ে, রাত্তিরে কি কোথাও যায়?

হারিয়ে যাবি—

হ্যাঁ, সে হারাইয়া যাইবে! ছাড়িয়া দিলে সে সব জায়গায় যাইতে পারে, পৃথিবীর সর্বত্র একা যাইতে পারে. বাবার কথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

পরদিন সকালে উঠিয়া কাজল প্রথমে ঔষধ আনিল। বাবার জন্য ফুটপাতের দোকান হইতে খেজুর ও কমলালেবু কিনিল। একটু দূরের দুধের দোকান হইতে জ্বাল-দেওয়া গরম দুধও কিনিয়া আনিল। দুধের ঘটি হাতে ছেলে ফিরিলে অপু বলিল—কথা শুনবি নে খোকা? দুধ আনতে গেলি রাস্তা পার হয়ে সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের দোকানে? এখন গাড়ি ঘোড়ার বড় ভিড়—যেও না বাবা—দে বাকী পয়সা।

খুচরা পয়সা না থাকায় ছেলেকে সকালে ঔষধের দামের জন্য একটা টাকা দিয়াছিল, কাজল টাকাটা ভাঙাইয়া এগুলি কিনিয়াছে, নিজে মাত্র এক পয়সার বেগুনি খাইয়াছিল, (তেলে-ভাজা খাবারের উপর তাহার বেজায় লোভ) বাকী পয়সা বাবার হাতে ফেরত দিল।

অপু বলিল—একখানা পাঁউরুটি নিয়ে আয়, ওই দুধের আমি অতটা তো খাবো না, তুই অর্ধেকটা রুটি দিয়ে খা—

—না বাবা, এই তো কাছেই হোটেল, আমি ওখানে গিয়ে—

—না, না, সেও তো রাস্তা পার হয়ে, আফিসের সময় এখন মোটরের ভিড়, এ-বেলা ওই খাও বাবা, আমি তোমাকে ওবেলা দুটো রেঁধে দেবো।

কিন্তু দুপুরের পর অপুর আবার খুব জ্বর আসিল। রাত্রের দিকে এত বাড়িল, আর কোনও সংজ্ঞা রহিল না। কাজল দোরে চাবি দিয়া ছুটিয়া আবার ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার আবার আসিলেন, মাথায় জলপটির ব্যবস্থা দিলেন, ঔষধও দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে—আর কেউ থাকে না? তোমরা দুজনে মোটে? অসুখ যদি বাড়ে, তবে বাড়িতে টেলিগ্রাম ক'রে দিতে হবে। দেশে কে আছে?

—দেশে কেউ নেই। আমার মা তো নেই।···আমি আর বাবা শুধু—

—মুশকিল। তুমি ছেলেমানুষ কি করবে? হাসপাতালে দিতে হবে তা হলে, দেখি আজ রাতটা—।

কাজলের প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতাল! সে শুনিয়াছে সেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না! বাবার অসুখ কি এত বেশী যে, হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে?

ডাক্তার চলিয়া গেল। বাবা শুইয়া আছে—শিয়রের কাছে আধভাঙ্গা ডালিম, টোকতক লেবুর কোয়া। পালং শাকের গোড়া বাবা খাইতে ভালবাসে, বাজার তে সেদিন পালং শাকের গোড়া আনিয়াছিল,ঘরের কোণে চুপড়িতে শুকাইতেছে বাবা যদি আর না ওঠে? না রাঁধে? কাজলের গলায় কিসের একটা ডেলা লয়া উঠিল। চোখ ফাটিয়া জল আসিল—ছোট বারান্দাটার এক কোণে া সে আকুল হইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ভগবান বাবাকে সারাইয়া ল, পালং শাকের গোড়া বাবাকে খাইতে না দেখিলে সে বুক ফাটিয়া মরিয়া বে—ভগবান বাবাকে ভাল করিয়া দাও।

মেঝেতে তাহার পড়িবার মাদুরটা পাতিয়া সে শুইয়া পড়িল। ঘরে লণ্ঠনটা লিয়া রাখিল—একবার নাড়িয়া দেখিল কতটা তেল আছে, সারারাত জ্বলিবে না। অন্ধকারে তাহার বড় ভয়—বিশেষ বাবা আজ নড়ে না, চড়ে না, কথাও না।

দেয়ালে কিসের সব যেন ছায়া! কাজল চক্ষু বুজিল।

মাসদেড় হইল অপু সারিয়া ঠিয়াছে। হাসপাতালে যাইতে হয় নাই, এই রই মধ্যে বাড়ি,যোরা বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, তাঁহাদের এক ছেলে ভাল ডাক্তার। ন অপুর বাড়িওয়ালার মুখে সব শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন— ইনজেকশনের ব্যবস্থা করিলেন, শুশ্রূষার লোক দিলেন, কাজলকে নিজের বাড়ি ত খাওয়াইয়া আনিলেন। উহাদের বাড়ির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়া াছে।

চৈত্রের প্রথম। চাকুরি অনেক খুঁজিয়াও মিলিল না। তবে আজকাল লিখিয়া হু আয় হয়।

সকালে একদিন অপু মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কাজলকে পড়াইতেছে, জন কুড়ি-বাইশ বছরের চোখে-চশমা ছেলে দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ল—আজ্ঞে আসতে পারি?—আপনারই নাম অপূর্ববাবু? নমস্কার—

—আসুন, বসুন বসুন। কোত্থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আপনার বই পড়ে আপনার সঙ্গে া করতে এলুম। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সবাই এত মুগ্ধ হয়েছে, তাই পনার ঠিকানা নিয়ে—

অপু খুব খুশী হইল—বই পড়িয়া এত ভাল লাগিয়াছে যে, বাড়ি খুঁজিয়া

দেখা করিতে আসিয়াছে—একজন শিক্ষিত তরুণ যুবক। এ তার জীবনে এ
প্রথম!

ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে, ইয়ে, এই ঘরটাতে আপনি থাকে
বুঝি?

অপু একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, ঘরের আসবাবপত্র অতি হীন, ছে
মাদুরে পিতাপুত্রে বসিয়া পড়িতেছে। খানিকটা আগে কাজল ও সে দু
মুড়ি খাইয়াছে, মেঝের খানিকটাতে তার চিহ্ন। সে ছেলের ঘাড়ে সব দোষ
চাপাইয়া সলজ্জ সুরে বলিল—তুই এমন দুষ্টু হয়ে উঠ্‌ছিস খোকা, রোজ রো
তোকে বলি খেয়ে অমন করে ছড়াবি নে—তা তোর—আর বাটিটা অমন দো
গোড়ায়—

কাজল এ অকারণ তিরস্কারের হেতু না বুঝিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল
আমি কই বাবা, তুমিই তো বাটিটাতে মুড়ি—

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাম্, লেখ, বানানগুলো লিখে ফেল।

যুবকটি বলিল—আমাদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে খুব আলোচনা
আজ্ঞে হ্যাঁ। ওবেলা বাড়িতে থাকবেন? 'বিভাবরী' কাগজের এডিটার শা
চরণবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আমি—আরও তিন-চারজন
সঙ্গে আসব।—তিনটে? আচ্ছা, তিনটেতেই ভাল।

আরও খানিক কথাবার্তার পর যুবক বিদায় লইলে অপু ছেলের দি
চাহিয়া বলিল,—উস্-স্-স্-স্, খোকা?

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না বাবা

—না বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার, রাগ ক'রো না। কিন্তু কি করা যায়
তো?

—কি বাবা?

—তুই এক্ষুণি ওঠ, পড়া থাক এবেলা, এই ঘরটা ঝেড়ে বেশ ভাল ক
সাজাতে হবে—আর ওই তোর ছেঁড়া জামাটা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে
দিকি!—ওবেলা 'বিভাবরী'র সম্পাদক আসবে—

—বিভাবরী কি বাবা?

—'বিভাবরী' কাগজ রে পাগল, কাগজ—দৌড়ে যা তো পাশের বাসা
বালতিটা চেয়ে নিয়ে আয় তো!

বৈকালের দিকে ঘরটা একরকম মন্দ দাঁড়াইল না! তিনটার পরে সবাই আসিলেন। শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—আপনার বইটার কথা আমার কাগজে বে আসছে মাসে। ওটাকে আমিই আবিষ্কার করেছি মশাই! আপনার লেখা গল্পটল্প? দিন না।

পরের মাসে 'বিভাবরী' কাগজে তাহার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল. সঙ্গে সঙ্গে তাহার গল্পটাও বাহির হইল। শ্যামাচরণবাবু ভদ্রতা করিয়া পঁচিশটি টাকা গল্পের মূল্যস্বরূপ লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া আর একটা গল্প চাহিয়া পাঠাইলেন।

অপু ছেলেকে প্রবন্ধটি পড়িতে দিয়া নিজে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া শুনিতে লাগিল। কাজল খানিকটা পড়িয়া বলিল—বাবা এতে তোমার নাম লেখেছে যে! অপু হাসিয়া বলিল দেখেছিস খোকা, লোকে কত ভাল বলেছে আমাকে? তোকেও একদিন ওই রকম বলবে, পড়াশুনো করবি ভাল ক'রে, বুঝলি?

দোকানে গিয়া শুনিল 'বিভাবরী'তে প্রবন্ধ বাহির হইবার পরে খুব বই কাটিয়েছে—তাহা ছাড়া তিন বিভিন্ন স্থান হইতে তিনখানি পত্র আসিয়াছে। বইখানার অজস্র প্রশংসা!

একদিন কাজল বসিয়া পড়িতেছে, সে ঘরে ঢুকিয়া হাত দুখানা পিছনের দিকে লুকোইয়া বলিল.—খোকা, বল তো হাতে কি?...কথাটা বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল, শৈশবে একদিন তাহার বাবা—সেও এমনি বৈকাল বেলাটা—তাহার বাবা এইভাবেই, ঠিক এই কথা বলিয়াই খবরের কাগজের মোড়কটা তাহার হাতে দিয়াছিল! জীবনের চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি অদ্ভুতভাবেই আবর্তিত হইতেছে, চিরযুগ ধরিয়া! কাজল ছুটিয়া গিয়া বলিল.—কি বাবা, দেখি? —পরে বাবার হাত হইতে জিনিসটা লইয়া দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। অজস্র ছবিওয়ালা আরব্য উপন্যাস! দাদামশায়ের বইয়ে তো এত রঙীন ছবি ছিল না? নাকের কাছে ধরিয়া দেখিল কিন্তু তেমন পুরানো গন্ধ নাই, সেই এক অভাব।

অনেক দিন পরে হাতে পয়সা হওয়াতে সে নিজের জন্যও একরাশ বই ও ইংরেজী ম্যাগাজিন কিনিয়া আনিয়াছে।

পরদিন সে বৈকালে তাহার এক সাহেব বন্ধুর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়া গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সাহেবের বাড়ি কানাডায়, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স, নাম এ্যাশবার্টন। হিমালয়ের জঙ্গলে গাছপালা

খুঁজিতে আসিয়াছে, ছবিও আঁকে। ভারতবর্ষে এই দুইবার আসিল। স্টেট্‌স্‌ম্যানে তাঁহার লেখা হিমালয়ের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়িয়া অপু হোটেলে গিয়া মাস-দুই পূর্বে লোকটির সঙ্গে আলাপ করে। এই দু-মাসের মধ্যে দু-জনের বন্ধুত্ব খুব জমিয়া উঠিয়াছে।

সাহেব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ফ্লানেলের ঢিলা সুট পরা, মুখে পাইপ, খুব দীর্ঘাকার, সুশ্রী মুখ, নীল চোখ, কপালের উপরের দিকের চুল খানিকটা উঠিয়া গিয়াছে। অপুকে দেখিয়া হাসিমুখে আগাইয়া আসিল, বলিল —দেখ, কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। ও-রকম কোনদিন হয় নি। কাল একজন বন্ধুর সঙ্গে মোটরে কলকাতার বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা জায়গায় গিয়ে বসেছি, কাছে একটা পুকুর, ও-পারে একটা মন্দির, এক সার বাঁশগাছ, আর তালগাছ, এমন সময়ে চাঁদ উঠল, আলো আর ছায়ার কি খেলা! দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে! মনে হল Ah, this is the East!—The eternal East, অমন দেখি নি কখনও।

অপু হাসিয়া বলিল—And pray, who is the Sun?···

এ্যাশবার্টন হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—না, শোন, আমি কাশী যাচ্ছি, তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না কিন্তু। আসছে হপ্তাতেই যাওয়া যাক্‌ চলো।

কাশী! সেখানে সে কেমন করিয়া যাইবে! কাশীর মাটিতে সে পা দিতে পারিবে না। শত-সহস্র স্মৃতি-জড়ানো কাশী, জীবনের ভাণ্ডারের অক্ষয় সঞ্চয়—ও কি যখন-তখন গিয়া নষ্ট করা যায়!···সেবার পশ্চিম যাইবার সময় মোগল-সরাই দিয়া গেল, কিন্তু কাশী যাইবার অত ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে পারিল না কেন?···কেন, তাহা অপরকে সে কি করিয়া বুঝায়!···

বন্ধু বলিল, তুমি জাভায় এসো না আমার সঙ্গে?···বরোবুদরের স্কেচ আঁকব তা ছাড়া মাউন্ট শ্যালাকের বনে যাব। ওয়েস্ট জাভাতে বৃষ্টি কম হয় বলে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট তত জমকালো নয়, কিন্তু ইস্ট জাভার বন দেখলে তুমি মুগ্ধ হবে, তুমি তো বন ভালবাস, এস না!···

বন্ধুর কাছে লীলাদের বাড়ি অনেকদিন আগে দেখা বিয়াত্রিচে দান্তের সেই ছবিটা। অপু বলিল—বত্তিচেলির, না?

—না। আগে বলত লিওনার্ডোর—আজকাল ঠিক হয়েছে অ্যাম্বোজো ডা প্রেডিস-এর, বত্তিচেলির কে বললে?

লীলা বসিয়াছিল। বেচারী লীলা!

সপ্তাহের শেষে কিন্তু বন্ধুটির আগ্রহ ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাকে কাশী রওনা হইতে হইল। কাশীতে পরদিন বেলা বারোটার সময় পৌঁছিয়া বন্ধুকে ক্যান্টনমেন্টের এক সাহেবী হোটেলে তুলিয়া দিল ও নিজে একা করিয়া শহরে ঢুকিয়া গোধুলিয়ার মোড়ের কাছে 'পার্বতী আশ্রমে' আসিয়া উঠিল।

গোধুলিয়ার মোড় হইতে একটু দূরে সেই বালিকা বিদ্যালয়টা আজও আছে। ইহারই একটু দূরে তাহাদের সেই স্কুলটা! কোথায়? একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। এখানেই কোথায় যেন ছিল। একটা বাড়ি সে চিনিল। তাহার এক সহপাঠী এই বাড়িতে থাকিত—দু-একবার তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল। বাসা নয়, নিজেদের বাড়ি। একটি বাঙালী ভদ্রলোক শসা কিনিতেছিলেন—সে জিজ্ঞাসা করিল—এই বাড়িতে প্রসন্ন বলে একটা ছেলে আছে—জানেন?—ভদ্রলোক বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—প্রসন্ন? ছেলে!···অপু সামলাইয়া বলিল—ছেলে না, মানে এই আমাদেরই বয়সী। কথাটা বলিয়া সে অপ্রতিভ হইল—প্রসন্ন বা সে আজ কেহই ছেলে নয়—আর তাহাদের ছেলে বলা চলে না—একথা মনে ছিল না। প্রসন্নর ছেলে-বয়সের মূর্তিই মনে আছে কি না! প্রসন্ন বাড়ি নাই, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল সে আজকাল চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের বাপ।

স্কুলটা কোথায় ছিল চিনিতে পারিল না। একজন লোককে বলিল—মশায়, এখানে 'শুভংকরী পাঠশালা' বলে একটা স্কুল কোথায় ছিল জানেন?

—শুভংকরী পাঠশালা? কৈ না, আমি তো এই গলিতে দশ বছর আছি—

—তাতে হবে না, সম্ভবত বাইশ-তেইশ বছর আগেকার কথা।

—ও বসাক মশায়, বসাক মশায়, আসুন একবারটি এদিকে। এঁকে জিজ্ঞেস করুন, ইনি চাল্লিশ বছরের খবর বলতে পারবেন।

বসাক মশায় প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন—বিলক্ষণ! তা আর জানিনে? ঐ হর-গোবিন্দ শেঠের বাড়িতে স্কুলটা ছিল। ঢুকেই নিচু-মত তো! দুধারে উঁচু রোয়াক?

অপু বলিল—হাঁ—হাঁ ঠিক। সামনে একটা চৌবাচ্চা—

—ঠিক ঠিক—আমাদের আনন্দবাবুর স্কুল! আনন্দবাবু মারাও গিয়েছেন আজ আঠার-উনিশ বছর। স্কুলও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। আপনি এসব জানলেন কি করে?

—আমি পড়তুম ছেলেবেলায়। তারপর কাশী থেকে চলে যাই।

একটা বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল। তাদের বাড়ির মোড়েই। ইহারা তখন শোলার ফুল ও টোপর তৈরী করিয়া বেচিত। অপু বাড়িটার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। গৃহিণীকে চিনিল—বলিল, আমাকে চিনতে পারেন? ঐ গলির মধ্যে থাকতুম ছেলেবেলায়—আমার বাবা মারা গেলেন? -গৃহিণী চিনিতে পারিলেন। বসিতে দিলেন, বলিলেন—তোমার মা কেমন আছেন?

অপু বলিল—তাহার মা বাঁচিয়া নাই।

—আহা! বড় ভালমানুষ ছিল! তোমার মার হাতে—সোডার বোতল খুলতে গিয়ে হাত কেটে গিয়েছিল মনে আছে?

অপু হাসিয়া বলিল—খুব মনে আছে. বাবার অসুখের সময়!

গৃহিণীর ডাকে একটি বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের বিধবা মেয়ে আসিল। বলিলেন—একে মনে আছে?···

—আপনার মেয়ে না? উনি কি জন্যে রোজ বিকেলে জানলার ধারে খাটে শুয়ে কাঁদতেন! তা মনে আছে।

—ঠিক বাবা,—তোমার সব মনে আছে দেখছি। আমার প্রথম ছেলে তখন বছর-খানেক মারা গিয়েছে—তোমরা যখন এখানে এলে। তার জন্যেই কাঁদত। আহা, সে ছেলে আজ বাঁচলে চল্লিশ বছর বয়েস হ'ত।

একবার মণিকর্ণিকার ঘাটে গেল। পিতার নশ্বর দেহের রেণু-মেশানো পবিত্র মণিকর্ণিকা!

বৈকালে বহুক্ষণ দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া কাটাইল।

ঐ সেই শীতলা মন্দির ওরই সামনে বাবার কথকতা হইত সে-সব দিনে—সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ বাঙাল কথক ঠাকুরের কথা মনে হইয়া অপুর মন উদাস হইয়া গেল। কোন্ জাদুবলে তাহার বালকহৃদয়ের দুর্লভ স্নেহটুকু সেই বৃদ্ধ চুরি করিয়াছিল—এখন এতকাল পরেও তাহার উপর অপুর সে স্নেহ অক্ষুণ্ণ আছে—আজ তাহা সে বুঝিল।

পরদিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে সে স্নান করিতে নামিতেছে, হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল একজন বৃদ্ধা, একটা পিতলের ঘটিতে গঙ্গাজল ভর্তি করিয়া লইয়া স্নান সারিয়া উঠিতেছেন—চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া সে চিনিল—কলিকাতার সেই জ্যাঠাইমা! সুরেশের মা!···বহুকাল সে আর জ্যাঠাইমাদের বাড়ি যায় নাই, সেই নববর্ষের দিনটার অপমানের পর আর কখনও না। সে আগাইয়া গিয়া পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—চিনতে পারেন জ্যাঠাইমা? আপনারা

কাশিতে আছেন নাকি আজকাল ?—বৃদ্ধা খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন– নিশ্চিন্দিপুরের হরি ঠাকুরপোর ছেলে না ?—এসো, এসো, চিরজীবী হও বাবা—আর বাবা চোখেও ভাল দেখিনে—তার ওপর দেখ এই বয়সে একা বিদেশে পড়ে থাকা— ভারী-ঘটিটা কি নিয়ে উঠতে পারি ? ভাড়াটেদের মেয়ে জলটুকু বয়ে দেয়—তো তার আজ তিনদিন জ্বর—

—ও, আপনিই বুঝি একলা কাশীবাস—সুনীলদাদারা কোথায় ?

বৃদ্ধা ভারী ঘটিটা ঘাটের রাণার উপর নামাইয়া বলিলেন—সব কলকাতায়, আমায় দিয়েছে ভেন্ন করে বাবা ! ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিলুম সুনীলের, গুপ্তিপাড়ার মুখুয্যে—ওমা, বৌ এসে বাবা সংসারের হ'ল কাল—সে সব বলব এখন বাবা—তিন-এর-এক ব্রজেশ্বরের গলি—মন্দিরের ঠিক বাঁ গায়ে—একা থাকি, কারুর সঙ্গে দেখাশুনো হয় না। সুরেশ এসেছিল, পুজোর সময় দুদিন ছিল। থাকতে পারে না –তুমি এসো বাবা, আমার বাসায় আজ বিকেলে, অবিশ্যি অবিশ্যি।

অপু বলিল –দাঁড়ান জ্যাঠাইমা. চট ক'রে ডুব দিয়ে নি,আপনি ঘটিটা ওখানে রাখুন, পেঁছে দিচ্ছি।

—না বাবা, থাক. আমিই নিয়ে যাচ্ছি, তুমি বললে এই যথেষ্ট হ'ল—বেঁচে থাকো।

তবুও অপু শুনিল না, স্নান সারিয়া ঘটি হাতে জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁহার বাসায় গেল। ছোট্ট একতলা ঘরে থাকেন—পশ্চিম দিকের ঘরে জ্যাঠাইমা থাকেন, পাশের ঘরে আর একজন প্রৌঢ়া থাকেন—তাঁহার বাড়ি ঢাকা। অন্য ঘরগুলি একটি বাঙালী গৃহস্থ ভাড়া লইয়াছেন. যাঁদের ছোট মেয়ের কথা জ্যাঠাইমা বলিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন—সুনীল আমার তেমন ছেলে না। ঐ যে হাড়হাবাতে ছোটলোকের ঘরের মেয়ে এনেছিলাম, সংসারটাসুদ্ধ উচ্ছন্ন দিলে। কি থেকে শুরু হ'ল শোন। ও বছর শেষ মাসে নবান্ন করেছি, ঠাকুরঘরের বারকোশে নবান্ন মেখে ঠাকুরদের নিবেদন ক'রে রেখে দিইছি। দুই নাতিকে ডাকছি. ভাবলাম ওদের একটু একটু নবান্ন মুখে দি। বৌটা এমন বদমায়েস, ছেলেদের আমার ঘরে আসতে দিলে না—শিখিয়ে দিয়েছে, ও-ঘরে যাস নি, নবান্নর চাল খেলে নাকি ওদের পেট কামড়াবে। তাই আমি বললাম, বলি হ্যাঁ গা বৌমা, আমি কি ওদের নতুন চাল খাইয়ে. মেরে ফেলবার মতলব করছি ? তা শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, সেকেলে লোক

ছেলেপিলে মানুষ করার কি বোঝে? আমার ছেলে আমি যা ভাল বুঝব করব, উনি যেন তার ওপর কথা না কইতে আসেন। এই সব নিয়ে ঝগড়া শুরু, তারপর দেখি ছেলেও তো বৌমার হয়ে কথা বলে। তখন আমি বললাম, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি আর তোমার সংসারে থাকব না! বৌ রাত্রে কানে কি মন্তর দিয়েছে ছেলে দেখি তাতেই রাজী। তাহলেই বোঝ বাবা, এত ক'রে মানুষ ক'রে শেষে কিনা আমার কপালে—জ্যাঠাইমার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—কেন, সুরেশদা কিছু বললেন না?

—আহা, সে আগেই বলি নি? সে শ্বশুরবাড়ির বিষয় পেয়ে সেখানেই বাস করছে, সেই রাজসাহী না দিনাজপুর। সে একখানা পত্তর দিয়েও খোঁজ করে না, মা আছে কি মলো। তবে আর তোমাকে বলছি কি? সুরেশ কলকাতায় থাকলে কি আর কথা ছিল বাবা?

অপুকে খাইতে দিয়া গল্প করিতে করিতে তিনি বলিলেন, ও ভুলে গিয়েছি তোমাকে বলতে, আমাদের নিশ্চিন্দিপুরের ভুবন মুখুয্যের মেয়ে লীলা যে কাশীতে আছে, জান না?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—লীলাদি! নিশ্চিন্দিপুরের? কাশীতে কেন?

জ্যাঠাইমা বলিলেন—ওর ভাসুর কি চাকরি করে এখানে। বড় কষ্ট মেয়েটার, স্বামী তো আজ ছ'সাত বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, বড় ছেলেটা কাজ না পেয়ে বসে আছে, আরও চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ, ভাসুরের সংসারে ঘাড় গুঁজে থাকে। যাও না, দেখা ক'রে এসো আজ বিকেলে, কালীতলার গলিতে ঢুকেই বাঁদিকের বাড়িটা।

বাল্যজীবনের সেই রানুদির বোন লীলাদি! নিশ্চিন্দিপুরের মেয়ে। বৈকাল হইতে অপুর দেরি সহিল না, জ্যাঠাইমার বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই সে কালীতলার গলি খুঁজিয়া বাহির করিল—সরু ধরণের তেতলা বাড়িটা। সিঁড়ি যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি অন্ধকার, এত অন্ধকার যে পকেট হইতে দেশলাই-এর কাঠি বাহির করিয়া না জ্বালাইয়া সে এই বেলা দুইটার সময়ও পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না!

একটা ছোট দুয়ার পার হইয়া সরু একটা দালান। একটি দশ-বারো বছরের ছেলের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, এখানে কি নিশ্চিন্দিপুরের লীলাদি আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বলো গিয়ে। অপুর কথা শেষ না হইতে

পাশের ঘর হইতে নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, কে রে খোকা? সঙ্গে সঙ্গে একটি পাতলা গড়নের গৌরবর্ণ মহিলা দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরনে আধ-ময়লা শাড়ি. হাতে শাঁখা, বয়স বছর সাঁইত্রিশ, মাথায় একরাশ কালো চুল। অপু চিনিল, কাছে গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, চিনতে পার লীলাদি?

পরে লীলা তাহার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং চিনিতে পারে নাই দেখিয়া বলিল. আমার নাম 'অপু', বাড়ি নিশ্চিন্দিপুরে ছিল আগে—

লীলা তাড়াতাড়ি আনন্দের সুরে বলিয়া উঠিল—ও! অপু, হরিকাকার ছেলে! এসো, এসো ভাই, এসো। পরে সে অপুর চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিল এবং কি বলিতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অদ্ভুত মুহূর্ত! এমন সব অপূর্ব, সুপবিত্র মুহূর্তও জীবনে আসে। লীলাদির ঘনিষ্ঠ আদরটুকু অপুর সারা শরীরে একটা স্নিগ্ধ আনন্দের শিহরণ আনিল। গ্রামের মেয়ে, তাহাকে ছোট দেখিয়াছে. সে ছাড়া এত আপনার জনের মত অন্তরঙ্গতা কে দেখাইতে পারে? লীলাদি ছিল তাহাদের ধনী প্রতিবেশী ভুবন মুখুয্যের মেয়ে, বয়সে তাহার অপেক্ষা অনেক বড়. অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, তারপরেই শ্বশুরবাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল ও সেইখানেই থাকিত। শৈশবে অল্পদিন মাত্র উভয়ের সাক্ষাৎ কিন্তু আজ অপুর মনে হইল লীলাদির মত আপনার জন সারা কাশীতে আর কেহ নাই। শৈশব-স্বপ্নের সেই নিশ্চিন্দিপুর, তারই জলে বাতাসে দুজনের দেহ পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে একদিন।

তারপর লীলা অপুর জন্য আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, দালানেই পাতিল. ঘরদোর বেশী নাই. বিশেষ করিয়া পরের সংসার, নিজের নহে। সে নিজে কাছে বসিল, কত খোঁজ-খবর লইল। অপুর বারণ সত্ত্বেও ছেলেকে দিয়া জলখাবার আনাইল. চা করিয়া দিল।

তারপর লীলা নিজের অনেক কথা বলিল। বড় ছেলেটি চৌদ্দ বছরের হইয়া মারা গিয়াছে, তাহার উপর সংসারে এই দুর্দশা। উনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু, ভাসুরের সংসারে চোর হইয়া থাকা, ভাসুর লোক মন্দ নন. কিন্তু বড় জা—পায়ে কোটি কোটি দণ্ডবৎ। দুর্দশার একশেষ। সংসারের যত উঞ্ছ কাজ সব তাহার ঘাড়ে, আপন জন কেহ কোথাও নাই, বাপের বাড়িতে এমন কেহ নাই যাহার কাছে দুই দিন আশ্রয় লইতে পারে। সতু মানুষ নয়, লেখাপড়া শেখে নাই, গ্রামে মুদির দোকান করে, পৈতৃক সম্পত্তি একে একে বেচিয়া খাইতেছে—তাহার উপর দুইটি

বিবাহ করিয়াছে, একরাশ ছেলেপিলে। তাহার নিজেরই চলে না, লীলা সেখানে আর কি করিয়া থাকে।

অপু বলিল—দুটো বিয়ে কেন?

—পেটে বিদ্যে না থাকলে যা হয়। প্রথম পক্ষের বৌয়ের বাপের সঙ্গে কি ঝগড়া হ'ল, তাকে জব্দ করার জন্যে আবার বিয়ে করলে। এখন নিজেই জব্দ হচ্ছেন, দুই বৌ ঘাড়ে—তার ওপর দুই বৌয়ের ছেলেপিলে। তার ওপর রাণুও ওখানেই কিনা!

—রাণুদি? ওখানে কেন?

—তারও কপাল ভাল নয়। আজ বছর সাত-আট বিধবা হয়েছে, তার আর কোনও উপায় নেই, সতুর সংসারেই আছে। শ্বশুরবাড়িতে এক দেওর আছে, মাঝে মাঝে নিয়ে যায়, বেশির ভাগ নিশ্চিন্দিপুরেই থাকে।

অপু অনেকক্ষণ ধরিয়া রাণুদির কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতেছিল, কিন্তু কেন প্রশ্নটা করিতে পারে নাই সে-ই-জানে। লীলার কথার পরে অপু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। হঠাৎ লীলা বলিল—দ্যাখ্ ভাই অপু, নিশ্চিন্দিপুরের সেই বাঁশবাগানের ভিটে এত মিষ্টি লাগে, কি মধু যে মাখানো ছিল তাতে! ভেবে দ্যাখ্, মা নেই, বাবা নেই, কিছু তো নেই,—তবুও তার কথা ভাবি। সেই বাপের ভিটে আজ দেখি নি এগারো বছর। সেবার সতুকে চিঠি লিখলাম, উত্তর দিলে এখানে কোথায় থাকবে, থাকবার ঘরদোর নেই, পুবের দালান ভেঙে পড়ে গিয়েছে, পশ্চিমের কুঠুরিদুটোও নেই, ছেলেপিলে কোথায় থাকবে,—এই সব একরাশ ওজর। বলি থাক তবে, ভগবান যদি মুখ তুলে চান কোনদিন, দেখব—নয় তো বাবা বিশ্বনাথ তো চরণে রেখেইছেন—

আবার লীলা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অপু বলিল, ঠিক বলেছ লীলাদি, আমারও গাঁয়ের কথা এত মনে পড়ে! সত্যিই, কি মধুমাখানো ছিল, তাই এখন ভাবি।

লীলা বলিল, পদ্মপাতায় খাবার খাস নি কতদিন বল দিকি? এ-সব দেশে শালপাতায় খাবার খেতে খেতে পদ্মপাতার কথা ভুলেই গিইছি, না? আবার এক একদিন এক একটা দোকানে কাগজে খাবার দেয়। সেদিন আমার মেজ ছেলে এনেছে, আমি বলি দূর দূর, ফেলে দিয়ে আয়, কাগজে আবার মিষ্টি খাবার কেউ দেয় আমাদের দেশে?

অপুর সারা দেহ স্মৃতির পুলকে যেন অবশ হইয়া গেল। লীলাদি মেয়েমানুষ

কিনা, এত খুঁটিনাটি জিনিসও মনে রাখে। ঠিকই বটে, সেও পদ্মের পাতায় কতকাল খাবার খায় নাই, ভুলিয়াই গিয়াছিল কথাটা। তাহাদের দেশে বড় বড় বিল, পদ্মপাতা সস্তা, শালপাতার রেওয়াজ ছিল না। নিমন্ত্রণ-বাড়িতেও পদ্মপাতাতে ব্রাহ্মণভোজন হইত, লীলাদির কথায় আজ আবার সব মনে পড়িয়া গেল।

লীলা চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কতদিন যাস নি সেখানে অপু? তেইশ বছর? কেন, কেন? আমি না হয় মেয়েমানুষ—তুই তো ইচ্ছে করলেই যেতে—

—তা নয় লীলাদি, প্রথমে ভাবতুম বড় হয়ে যখন রোজগার করব, মাকে নিয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুরের ভিটেতে গিয়ে বাস করব, মার বড় সাধ ছিল। মা মারা যাওয়ার পরেও ভেবেছিলুম, কিন্তু তার পরে—ইয়ে—

স্ত্রীবিয়োগের কথাটা অপু বয়োজ্যেষ্ঠা লীলাদির নিকট প্রথমটা তুলিতে পারিল না। পরে বলিল। লীলা বলিল, বৌ কতদিন বেঁচে ছিলেন?

অপু লাজুক সুরে বলিল—বছর চারেক—

—তা এ তোমার অন্যায় কাজ ভাই—তোমার এ বয়সে বিয়ে করবে না কেন?···তোমাকে তো এতটুকু দেখেছি, এখনও বেশ মনে হচ্ছে ছোট্ট, পাতলা টুকটুকে ছেলেটি—একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে আমাদের ঘাটের পথের বাঁশতলাটায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ—কালকের কথা যেন সব, না না, ও কি, ছিঃ—বিয়ে কর ভাই। খোকাকে কলকাতায় রেখে এলে কেন—দেখতাম একবারটি।

লীলাও উঠিতে দেয় না অপুও উঠিতে চায় না। লীলার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিল—ছেলেমেয়েগুলিকে আদর করিল। উঠিবার সময় লীলা বলিল —কাল আসিস অপু, নেমন্তন্ন রইল, এখানে দুপুরে খাবি। পরদিন নেমন্তন্ন রাখিতে গিয়া কিন্তু অপু লীলাদির পরাধীনতা মর্মে মর্মে বুঝিল—সকাল হইতে সমুদয় সংসারের রান্নার ভার একা লীলাদির উপর। কৈশোরে লীলাদি দেখিতে ছিল খুব ভাল—এখন কিন্তু সে লাবণ্যের কিছুই অবশিষ্ট নাই—চুল দু-চার গাছা এরই মধ্যে পাকিয়াছে, শীর্ণ মুখ, শিরা-বাহির হওয়া হাত, আধময়লা শাড়ি পরনে, রাঁধিবার আলাদা ঘরদোর নাই, ছোট্ট দালানের অর্ধেকটা দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা, তারই ও-ধারে রান্না হয়। লীলাদি সমস্ত রান্না সারিয়া তার জন্য মাছের ডিমের বড়া ভাজিতে বসিল, একবার কড়াখানা উনুন হইতে নামায়, আবার তোলে, আবার নামায়, আবার ভাজে! আগুনের তাতে মুখ তার রাঙা দেখাইতে-

ছিল—অপু ভাবিল কেন এত কষ্ট করছে লীলাদি, আহা রোজ রোজ ওর এই কষ্ট, তার ওপর আমার জন্যে আর কেন কষ্ট করা ?

বিদায় লইবার সময় লীলা বলিল—কিছুই করতে পারলুম না ভাই—এলি যদি এত কাল পরে, কি করি বল, পরের ঘরকন্না, পরের সংসার, মাথা নিচু ক'রে থাকা, উদয়াস্ত খাটুনিটা দেখলি তো ? কি আর করি, তবুও একটা ধরে আছি। মেয়েটা বড় হয়ে উঠল, বিয়ে তো দিতে হবে ? ঐ বটঠাকুর ছাড়া আর ভরসা নেই। সন্ধ্যেবেলাটা বেশ ভাল লাগে—দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যের সময় বেশ কথা হয়, পাঁচালী হয়, গান হয়—বেশ লাগে। দেখিস নি ?···আসিস্ না আজ ওবেলা—বেশ জায়গা, আসিস্, দেখিস্ এখন। এসো, এসো, কল্যাণ হোক।—তারপর সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল—তোদের দেখলে যে কত কথা মনে পড়ে—কি সব দিন ছিল—

এবার অপু অতিকষ্টে চোখের জল চাপিল।

আর একটি কর্তব্য আছে তাহার কাশীতে—লীলার মায়ের সঙ্গে দেখা করা। বাঙালীটোলার নারদ ঘাটে তাঁদের নিজেদের বাড়ি আছে—খুঁজিয়া বাড়ি বাহির করিল। মেজ-বৌরানী অপুকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। চোখের জল ফেলিলেন।

কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় ঘরে একটি ছোট মেয়ে ঢুকিল—বয়স ছয়সাত হইবে, ফ্রক-পরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—অপু তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—লীলার মেয়ে। কি সুন্দর দেখিতে ! এত সুন্দরও মানুষ হয় ? স্নেহে, স্মৃতিতে, বেদনায় অপুর চোখে জল আসিল—সে ডাক দিল—শোন খুকী মা, শোন তো।

খুকী হাসিয়া পলাইতেছিল, মেজ-বৌরানী ডাকিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া দিলেন। সে তার দিদিমার কাছেই কাশীতে থাকে আজকাল। গত বৈশাখ মাসে তাহার বাবা মারা গিয়াছেন—লীলার মৃত্যুর পূর্বে। কিন্তু লীলাকে সে সংবাদ জানানো হয় নাই। দেখিতে অবিকল লীলা—এ বয়সে লীলা যা ছিল তাই। কেমন করিয়া অপুর মনে পড়িল শৈশবের একটি দিনে বর্ধমানে লীলাদের বাড়িতে সেই বিবাহ উপলক্ষে মেয়ে মজলিসের কথা—লীলা যেখানে হাসির কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে হাসাইয়াছিল—সে-ই লীলাকে সে প্রথম দেখে এবং লীলা তখন দেখিতে ছিল ঠিক এই খুকীর মত অবিকল !

মেজ-বৌরানী বলিলেন—মেয়ে তো ভাল, কিন্তু বাবা, ওর কি আর বিয়ে দিতে পারব ? ওর মার কথা যখন সকলে শুনবে—আর তা না জানে কে—ওই মেয়ের

কি আর বিয়ে হবে বাবা ?

অপুর দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইল একটি কথা বলিবার জন্য—সেটা কিন্তু সে চাপিয়া রাখিল। মুখে বলিল—দেখুন, বিয়ের জন্যে ভাববেন কেন ? লেখাপড়া শিখুক, বিয়ে নাই বা হ'ল, তাতে কি ? মনে ভাবিল—এখন সে কথা বলব না, খোকা যদি বাঁচে, মানুষ হয়ে ওঠে—তবে সে কথা তুলব। যাইবার সময়ে অপু লীলার মেয়েকে আবার কাছে ডাকিল। এবার খুকী তাহার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ডাগর ডাগর উৎসুক চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেদিনের বাকী সময়টুকু অপু বন্ধুর সঙ্গে সারনাথ দেখিয়া কাটাইল। সন্ধ্যার দিকে একবার কালীতলার গলিতে লীলাদের বাসায় বিদায় লইতে গেল—কাল সকালেই এখান হইতে রওনা হইবে। নিশ্চিন্দিপুরের মেয়ে, শৈশব দিনের এক সুন্দর আনন্দ-মুহূর্তের সঙ্গে লীলাদির নাম জড়ানো—বার বার কথা কহিয়াও যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না।

আসিবার সময় অপু মুগ্ধ হইল লীলাদির আন্তরিকতা দেখিয়া। তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়া সে নিচে নামিয়া আসিল, আবার চিবুক ছুঁইয়া আদর করিল, চোখের জল ফেলিল, যেন না, কি মায়ের পেটের বড় বোন। কতকগুলো কাঠের খেলনা হাতে দিয়া বলিল—খোকাকে দিস্—তার জন্যে কাল কিনে এনেছি।

অপু ভাবিল—কি চমৎকার মানুষ লীলাদি !···আহা পরের সংসারে কি কষ্টটাই না পাচ্ছে ! মুখে কিছু বললুম না—তোমায় আমি বাপের ভিটে দেখাব লীলাদি, এই বছরেরর মধ্যেই।

ট্রেনে উঠিয়া সারাপথ কত কি কথা তাহার মনে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। রাজঘাটের স্টেশনে ট্রেনে উঠিল আজ কতকাল পরে ! বাল্যকালে এই স্টেশনেই সে প্রথম জলের কল দেখে, কাশী নামিয়াই ছুটিয়া গিয়াছিল আগে জলের কলটার কাছে। চেঁচাইয়া বলিয়াছিল, দেখো দেখো মা জলের কল !—সে সব কি আজ ?

আজ কতদিন হইতে সে আর একটি অদ্ভুত জিনিস নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিতেছে, কি তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছে। আগে তো সে এ রকম ছিল না ? অন্ততঃ এ ভাবে তো কই কখনও এর আগে—সেটা হইতেছে ছেলের জন্য মন-কেমন করা।

কত কথাই মনে হইতেছে এই কয়দিনে—পাশের বাড়ির বাঁড়ুয্যে-গৃহিণ:

কাজলকে বড় ভালবাসে সেখানেই তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। কখনও মনে হইতেছে, কাজল যে দুষ্টু ছেলে, হয়ত গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল, কোনও বদ্‌মাইস লোকে ভুলাইয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে কিংবা হয়ত চুপি চুপি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তা পার হইতে যাইতেছিল, মোটর চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি বাঁড়ুয্যেরা একটা তার করিত না? হয়ত তার করিয়াছিল, ভুল ঠিকানায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। উহাদের আলিসাবিহীন নেড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে উঠিয়া পড়িয়া যায় নাই তো? কিন্তু কাজল তো কখনও ঘুড়ি ওড়ায় না? একটু আনাড়ি, ঘুড়ি ওড়ানো কাজ একেবারে পারে না। না—সে উড়াইতে যায় নাই, তবে হয়ত বাঁড়ুয্যে-বাড়ির ছেলেদের দলে মিশিয়া উঠিয়াছিল, আশ্চর্য কি!

আর্টিস্ট বন্ধুর কথার উত্তরে সে খানিকটা আগে বলিয়াছিল—সে জাভা, বালি, সুমাত্রা দেখিবে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দেখিবে, আফ্রিকা দেখিবে—ওদের বিষয় লইয়া উপন্যাস লিখিবে। সাহেবরা দেখিয়াছে তাদের চোখে—সে নিজের চোখে দেখিতে চায়, তার মনের রঙে কোন্ রঙ ধরায়—ইউগাণ্ডার দিক্‌দিশাহীন তৃণভূমি, কেনিয়ার অরণ্য। বুড়ো বেবুন রাত্রে কর্কশ চীৎকার করিবে, হায়েনা পচা জীবজন্তুর গন্ধে উন্মাদের মত আনন্দে হি-হি করিয়া হাসিবে. দুপুরে অগ্নিবর্ষী খররৌদ্রে কম্পমান উত্তাপতরঙ্গ মাঠে প্রান্তরে,জনহীন বনের ধারে কতকগুলি উঁচুনীচু সদাচঞ্চল বাঁকা রেখার সৃষ্টি করিবে। সিংহেরা দল পাকাইয়া ছোট কণ্টকবৃক্ষের এতটুকু ক্ষুদ্র ছায়ায় গোলাকারে দাঁড়াইয়া অগ্নিবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করে—পার্ক ন্যাশন্যল আলবার্ত...wild celery-র বন...

কিন্তু খোকা যে টানিতেছে আজকাল, কোনও জায়গায় যাইতে মন চায় না খোকাকে ফেলিয়া। কাজল, খোকা, কাজল, খোকা, খোকন, ও ঘুড়ি উড়াইতে পারে না, কিছু বুঝিতে পারে না, কিছু পারে না, বড় নির্বোধে। কিন্তু ওর আনাড়ি মুঠাতে বুকের তার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। টানিতেছে, প্রাণপণে টানিতেছে—ছোট্ট দুর্বল হাত দু'টি নির্দয়ভাবে মুচড়াইয়া সরাইয়া লওয়া? সর্বনাশ! ধাপা চাপা থাকুক বিদেশযাত্রা।

ট্রেন হু-হু চলিতেছে...মাঝে মাঝে আম বন, জলার ধারে লালহাঁস বসিয়া আছে, আখের ক্ষেতে জল দিতেছে, গম কাটিতেছে। রেলের ধারের বস্তিতে উদুখলে শস্য কুটিতেছে, মহিষের পাল চরিয়া ফিরিতেছে। বড় বড় মাঠে দুপুর গড়াইয়া গিয়া ক্রমে রোদ পড়িয়া আসিল। দূরে দূরে চক্রবাল-সীমায় এক-আধটা

পাহাড় ঘন নীল ও কালো হইয়া উঠিতেছে।

কি জানি কেন আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে, বিশেষ করিয়া নিশ্চিন্দি-পুরের কথা। হয়ত এতকাল পরে লীলাদির সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যই। ঠিক তাই। বহু দূরে আর একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবন-ধারা, বাঁশবনের আমবনের ছায়ায় পাখির কলকাকলীর মধ্য দিয়া, জানা-অজানা বন্যপুষ্পের সুবাসের মধ্য দিয়া সুখে-দুঃখে বহুকাল আগে বহিত—এককালে যার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তার—আজ তা স্বপ্ন· স্বপ্ন· কতকাল আগে দেখা স্বপ্ন! গোটা নিশ্চিন্দিপুর, তার ছেলেবেলাকার দিদি, মা ও রাণুদি· মাঠ বন, ইছামতী সব অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে· ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়, স্বপ্নের মতই অবাস্তব। সেখানকার সব কিছুই অস্পষ্ট স্মৃতিতে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এই তো ফাল্গুন-চৈত্র মাস—সেই বাঁশপাতা ও বাঁশের খোলার রাশি—শৈশবের ভাঙা জানালাটার ধারে বসিয়া বসিয়া কতকাল আগের সে সব কল্পনা, আনন্দপূর্ণ দিনগুলি, শীতরাত্রির সুখস্পর্শ কাঁথার তলা···অনন্ত কালসমুদ্রে সে সব ভাসিয়া গিয়াছে, কত কাল আগে।···

কেবল স্বপ্নে, এক একদিন যেন বাল্যের সেই রূপো চৌকিদার গভীর রাত্রের ঘুমের মধ্যে কড়া হাঁক দিয়া যায় ও রায় ম—শ—য়—য়, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া আসে, আবার বাড়ির পাশেই সেই পোড়ো ভিটাতে বহুকাল আগের বসন্ত নামে, প্রথম চৈত্রের নানা জানা-অজানা ফুলে বনভূমি ভরিয়া যায়, তাহাদের পুরানো কোঠাবাড়ির ভাঙা জানালার ধারে অতীত দিনের শত সুখদুঃখে পরিচিত পাখির দল কলকণ্ঠে গান গাহিয়া উঠে, ঠাকুরমাদের নারিকেল গাছে কাঠঠোকরার শব্দ বিচিত্র গোপনতায় তন্দ্রারত হইয়া পড়ে···স্বপ্নে দশ বৎসরের শৈশবটি আবার নবীন হইয়া ফিরিয়া আসে···

এতদিন সে বাড়িটা আর নাই···কতকাল আগে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ইট-কাঠ স্তূপাকার হইয়া আছে—তাহাও হয়তো মাটির তলায় চাপা পড়িতে চলিল—সে শৈশবের জানালাটার কোনও চিহ্ন নাই—দীর্ঘদিনের শেষে সোনালী রোদ যখন বনগাছের ছায়া দীর্ঘতর করিয়া তোলে, ফিঙে-দোয়েল ডাক শুরু করে—তখন আর কোনও মুগ্ধ শিশু জানালার ধারে বসিয়া থাকে না—হাত তুলিয়া অনুযোগের সুরে বলে না—আজ রাতে যদি মা ঘরে জল পড়ে, কাল কিন্তু ঠিক রাণুদিদিদের বাড়ি গিয়ে শোবো—রোজ রোজ রাত জাগতে পারি নে বলে দিচ্ছি।

অপুর একটা কথা মনে হইয়া হাসি পাইল।

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার বছরখানেক আগে অপু একরাশ কড়ি পাইয়াছিল। তাহার বাবা শিষ্যবাড়ি হইতে এগুলি আনেন। এত কড়ি কখনও অপু ছেলেবেলায় একসঙ্গে দেখে নাই। তাহার মনে হইল সে হঠাৎ অত্যন্ত বড়লোক হইয়া গিয়াছে—কড়ি খেলায় সে যতই হারিয়া যাক্ তাহার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের শেষ হইবে না। একটা গোল বিস্কুটের ঠোঙায় কড়ির রাশি রাখিয়া দিয়াছিল। সে ঠোঙাটা আবার তোলা থাকিত তাদের বনের ধারের দিকের ঘরটায় উঁচু কুলুঙ্গিটাতে।

তারপর নানা গোলমালে খেলাধুলায় অপুর উৎসাহ গেল কমিয়া, তার পরই গ্রাম ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবার কথা হইতে লাগিল। অপু আর একদিনও ঠোঙার কড়িগুলি লইয়া খেলা করিল না. এমন কি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার সময়েও গোলমালে. ব্যস্ততায়, প্রথম দূর বিদেশে রওনা হইবার উত্তেজনার মুহূর্তে সেটার কথা মনেও উঠে নাই। অত সাধের কড়িভরা ঠোঙাটা সেই কড়িকাঠের নিচেকার বড় কুলুঙ্গিটাতেই রহিয়া গিয়াছিল।

তারপর অনেককাল পরে সে কথা অপুর মনে হয় আবার। তখন অপর্ণা মারা গিয়াছে। একদিন অন্যমনস্ক ভাবে ইডেন গার্ডেনের কেয়াঝোপে বসিয়া ছিল, গঙ্গার ও-পারের দিকে সূর্যাস্ত দেখিতে দেখিতে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে।

আজও মনে হইল।

কড়ির কৌটো!···একবার সে মনে মনে হাসিল···বহুকাল আগে নিশ্চিহ্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাওয়া ছেলেবেলার বাড়ির উত্তর দিকের ঘরের কুলুঙ্গিতে বসানো সেই টিনের ঠোঙাটা!—দূরে সেটা যেন শূন্যে কোথায় এখনও ঝুলিতেছে, তাহার শৈশবজীবনের প্রতীকস্বরূপ···অস্পষ্ট, অবাস্তব, স্বপ্নময় ঠোঙাটা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, পয়সায় চার গণ্ডা করিয়া মাকড়সার ডিমের মত সেই যে ছোট ছোট বিস্কুট, তারই ঠোঙাটি—উপরে একটা বিবর্ণ-প্রায় হাঁ-করা রাক্ষসের মুখের ছবি ···দূরের কোন্ কুলুঙ্গিতে বসানো আছে···তার পিছনে বাঁশবন, শিমুলবন, তার পিছনে সোনাডাঙার মাঠ, ঘুঘুর ডাক···তাদেরও পিছনে তেইশ বছর আগেকার অপূর্ব মায়ামাখানো নিঝুম চৈত্র-দুপুরের রৌদ্রভরা নীলাকাশ···

চত্র মাসের প্রথমে একটা বড় পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া গেল। খুব বড় গাড়ি-
ারান্দা, সামনের 'লনে' ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা, খানিকটা জায়গা
ামিয়ানা টাঙানো। নিমন্ত্রিত পুরুষ মহিলাগণ যাঁহার যেখানে ইচ্ছা বেড়াই-
তছেন। •একটা মার্বেলের বড় চৌবাচ্চায় গোটাকতক কুন্দ ফুল, ঠিক মাঝখানে
কটা মার্বেলের ফোয়ারা—গৃহকর্ত্রী তাহাকে লইয়া গিয়া জায়গাটা দেখাইলেন,
সটা নাকি তাঁদের 'লিলি পণ্ড'। জয়পুর হইতে ফোয়ারাটা তৈয়ারী করাইয়া
ানিতে কত খরচ পড়িয়াছে, তাহাও জানাইলেন।

পার্টির সকল আমোদ-প্রমোদের মধ্যে একটি মেয়ের কণ্ঠ-সঙ্গীত সর্বাপেক্ষা
আনন্দদায়ক মনে হইল। ব্রিজের টেবিলে সে যোগ দিতে পারিল না, কারণ ব্রিজ-
খেলা সে জানে না, গান শেষ হইলে খানিকটা বসিয়া বসিয়া খেলাটা দেখিল।
া, কেক, স্যাণ্ডউইচ, সন্দেশ, রসগোল্লা, গল্প-গুজব, আবার গান! ফিরিবার
সময় মনটা খুব খুশী ছিল। ভাবিল—এদের পার্টিতে নেমন্তন্ন পেয়ে আসা
একটা ভাগ্যের কথা। আমি লিখে নাম করেছি, তাই আমার হ'ল। যার-তার
হোক্ দিকি? কেমন কাটল সন্ধ্যেটা। আহা, খোকাকে আনলে হ'ত, ঘুমিয়ে
পড়বে এই ভয়ে আনতে সাহস হ'ল না যে।—খান-দুই কেক খোকার জন্য চুপি-
চুপি কাগজে জড়াইয়া পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দেখিল সেগুলি ঠিক
আছে কি না।

খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া উঠাইতে গিয়া বলিল, ও খোকা, খোকা,
ওঠ, খুব ঘুমুচ্ছিস যে—হি-হি—ওঠ রে। কাজলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।
খনই সে বোঝে বাবা আদর করিতেছে, মুখে কেমন ধরণের মধুর দুষ্টামির হাসি
হাসিয়া ঘাড় কাৎ করিয়া কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া আদরের প্রতীক্ষায়
থাকে, আর এত আদর খাইতেও পারে!

অপু বলিল, শোন্ খোকা গল্প করি,—ঘুমুস্‌নে—

কাজল হাসিমুখে বলে, বলো দিকি বাবা একটা অর্থ?

হাত কন্ কন্ মাণিকলতা, এ ধন তুমি পেলে কোথা,
রাজার ভাণ্ডারে নেই, বেনের দোকানে নেই—

অপু মনে মনে ভাবে—খোকা, তুই—তুই আমার সেই বাবা। ছেলেবেলায়
ল গিয়েছিলে, তখন তো কিছু বুঝি নি, বুঝতামও না—শিশু ছিলাম। তাই

আবার আমার কোলে আদর কাড়াতে এসেছ বুঝি? মুখে বলে, কি জানি, জাঁতি বুঝি?

—আহা হা, জাঁতি কি আর দোকানে পাওয়া যায় না! তুমি বাবা কিছু জান না—

—ভাল কথা, কেক্ এনেছি, দ্যাখ্, বড়লোকের বাড়ির কেক্, ওঠ্—

—বাবা তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে. ঐ বইখানা তোলো তো।...

আর্টিস্ট বন্ধুটির পত্র। বন্ধু লিখিয়াছে,—সমুদ্রপারের বৃহত্তর ভারতবর্ষ শুধু কুলী-আমদানীর সার্থকতা ঘোষণা করিয়া নীরব থাকিয়া যাইবে? তোমাদের মত আর্টিস্ট লোকের এখানে আসার যে নিতান্ত দরকার। চোখ থাকিয়াও নাই শতকরা নিরানব্বই জনের, তাই চক্ষুষ্মান মানুষদের একবার এ-সব স্থানে আসিতে বলি। পত্রপাঠ এসো, ফিজিতে মিশনারীরা স্কুল খুলিতেছে, হিন্দী জানা ভারতীয় শিক্ষক চায়, দিনকতক মাস্টারী তো করো, তারপর একটা কিছু ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ চিরদিন মাস্টারী করিবার মত শান্ত ধাত তোমার নয়, তা জানি। আসিতে বিলম্ব করিও না।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া সে খানিকক্ষণ কি ভাবিল. ছেলেকে বলিল, আচ্ছা খোকা, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যদি চলে যাই, তুই থাকতে পারবি নে? যদি তোকে মামার বাড়ি রেখে যাই?

কাজল কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, হ্যাঁ তাই যাবে বৈকি! তুমি ভারী দেরি কর, কাশীতে বলে গেলে তিন দিন হবে, ক'দিন পরে এলে? না বাবা—

অপু ভাবিল—অবোধ শিশু! এ কি কাশী? এ বহুদূর, দিনের কথা কি এখানে ওঠে?—থাক, কোথায় যাইবে সে? কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে খোকাকে? অসম্ভব!

কাজল ঘুমাইয়া পড়িলে ছাদে উঠিয়া সে অনেকক্ষণ একা বসিয়া রহিল।

দূরে বাড়িটার মাথায় সার্কুলার রোডের দিকে ভাঙা চাঁদ উঠিতেছে, রাত্রি বারোটার বেশী— নীচে একটা মোটর লরী ঘস্ ঘস্ আওয়াজ করিতেছে। এই রকম সময়ে এই রকম ভাঙা চাঁদ উঠিত দূরে জঙ্গলের মাথায় পাহাড়ের একটা জায়গায়, যেখানে উটের পিঠের মত ফুলিয়া উঠিয়াই পরে বসিয়া গিয়া একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই খাঁজটার কাছে, পাহাড়ী ঢালুতে বাদাম গাছের বনে দিনমানে পাকা:পাতায় বনশীর্ষ যেখানে রক্তাভ দেখায়। এতক্ষণে বন-মোরগেরা ডাকিয়া উঠিত, কক্ কক্ কক্—

সে মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল, সার্কুলার রোড নাই, বাড়িঘর নাই, মোটর লরীর আওয়াজ নাই, ব্রিজের আড্ডা নাই, 'লিলি পণ্ড' নাই, তার ছোট্ট খড়ের বাংলো ঘরখানায় রামচরিত মিশ্র মেজেতে ঘুমাইতেছে, সামনে পিছনে ঘর অরণ্যভূমি, নির্জন, নিস্তব্ধ, আধ-অন্ধকার রাত্রি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, শুধু উঁচু-নীচু ডাঙ্গা, শুকনা ঘাসের বন, সাজা ও আবলুসের বন, শালবন, পাহাড়ী চামেলি ও লোহিয়ার বন—বনফুলের অফুরন্ত জঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিল সেই মুক্তি, সেই রহস্য, সে সব অনুভূতি, ঘোড়ার পিঠে মাঠের পর মাঠ উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলা, সেই দৃঢ়-পৌরুষ জীবন, আকাশের সঙ্গে, ছায়াপথের সঙ্গে, নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি রাত্রে যে অপূর্ব মানসিক সম্পর্ক।

এ কি জীবন সে যাপন করিতেছে এখানে? প্রতিদিন একই রকম একঘেয়ে নীরস, বৈচিত্র্যহীন—আজও যা, কালও তা। অর্থহীন কোলাহলে ও সার্থকতা-হীন ব্রিজের আড্ডার আবহাওয়ায়, টাকা রোজগারের মৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ জীবন-নদীর শুভ্র, সহজ সাবলীল ধারা যে দিনে দিনে শুকাইয়া আসিতেছে, এ কি সে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না?

ঘুমের ঘোরে কাজল বিছানার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এক পাশে সরাইয়া শোয়াইল। একেই তো সুন্দর, তার উপর কি যে সুন্দর দেখাইতেছে খোকাকে ঘুমন্ত অবস্থায়!

কাশী হইতে ফিরিবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে অপু 'বিভাবরী' ও 'বঙ্গ-সুহৃৎ' দুখানা পত্রিকার তরফ হইতে উপন্যাস লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। দুখানাই প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র, দুখানারই গ্রাহক সারা বাংলা জুড়িয়া এবং পৃথিবীর যেখানে যেখানে বাঙালী আছে, সর্বত্র। 'বিভাবরী' তাহাকে সম্প্রতি আগাম কিছু টাকা দিল—'বঙ্গ-সুহৃৎ'-এর নিজেদের বড় প্রেস আছে—তাহারা নিজের খরচে অপুর একখানা ছোট গল্পের বই ছাপাইতে রাজী হইল। অপুর বইখানির বিক্রয়ও হঠাৎ বাড়িয়া গেল, আগে যে সব দোকানে তাহাকে পুঁছিতও না—সে সব দোকান হইতে বই চাহিয়া পাঠাইতে লাগিল। এই সময়ে একটি বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ফার্মের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইল, অপু যেন একবার গিয়া দেখা করে।

অপু বৈকালের দিকে দোকানে গেল। তাহারা বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ নিজেদের খরচে ছাপাইতে ইচ্ছুক—অপু কি চায়? অপু ভাবিয়া দেখিল। প্রথম সংস্করণ হু-হু কাটিতেছে—অপর্ণার গহনা বিক্রয় করিয়া বই ছাপাইয়াছিল, লাভটা তার সবই নিজের। ইহাদের দিলে লাভ কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু

দোকানে দোকানে ছুটাছুটি, তাগাদা—এসব হাঙ্গামাও কমিবে। তা ছাড়া নগদ টাকার মোহ আছে, সাত পাঁচ ভাবিয়া সে রাজী হইল। ফার্মের কর্তা তখনই একটা লেখাপড়া করিয়া লইলেন—আপাততঃ ছ'শো টাকায় কথাবার্তা মিটিল, শ'-দুই সে নগদ পাইল।

দু'শো টাকা খুচরা ও নোটে। এক গাদা টাকা! হাতে ধরে না। কি করা যায় এত টাকায়? পুরানো দিন হইলে সে ট্যাক্সি করিয়া খানিকটা বেড়াইত, রেস্টুরেণ্টে খাইত, বায়োস্কোপ দেখিত। কিন্তু আজকাল আগেই খোকার কথা মনে হয়। খোকাকে কি আনন্দ দেওয়া যায় এ টাকায়? মনে হয় লীলার কথা লীলা কত আনন্দ করিত আজ!

একটা ছোট গলি দিয়া যাইতে যাইতে একটা শরবৎ-এর দোকান। দোকানটাতে পান বিড়ি বিস্কুট বিক্রি হয়, আবার গোটা দুই তিন সিরাপের বোতলও রহিয়াছে দিনটা খুব গরম, অপু শরবৎ খাওয়ার জন্য দোকানটাতে দাঁড়াইল। অপুর একটু পরেই দু'টি ছেলেমেয়ে সেখানে কি কিনিতে আসিল। গলিরই কোন গরীব ভাড়াটে গৃহস্থ ঘরের ছোট ছেলে মেয়ে—মেয়েটির বছর সাত, ছেলেটি একটু বড়। মেয়েটি আঙ্গুল দিয়া সিরাপের বোতল দেখাইয়া বলিল— ওই দ্যাখ দাদা সবুজ —বেশ ভালো. না? ছেলেটি বলিল—সব মিশিয়ে দ্যায়। বরফ আছে, ওই যে—

—ক' পয়সা নেয়?

—চার পয়সা।

অপুর জন্য দোকানী শরবৎ মিশাইতেছে, বরফ ভাঙ্গিতেছে, ছেলেমেয়ে দু'টি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি অপুর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাকে ওই সবুজ বোতল থেকে দেবে, না?

যেন সবুজ বোতলের মধ্যে শচীদেবীর পায়েস পোরা আছে।

অপুর মন করুণাদ্র্র হইল। ভাবিল—এরা বোধ হয় কখনও কিছু দেখে নি—এই রং-বরা টক চিনির রসকে কি ভাবছে. ভালো সিরাপ কি জানে না। বলিল —খুকী, খোকা শরবৎ খাবে? খাও না– ওদের দু'গ্লাস শরবৎ দাও তো–

প্রথমটা তারা খাইতে রাজী হয় না, অনেক করিয়া অপু তাহাদের লজ্জা ভাঙ্গিল। অপু বলিল—ভালো সিরাপ তোমার আছে? থাকে তো দাও, আমি দাম দোব। কোন জায়গা থেকে এনে দিতে পার না?

বোতলে যাহা আছে তাহার অপেক্ষা ভাল সিরাপ এ অঞ্চলে নাকি কুত্রাপি

মেলা সম্ভবপর নয়। অবশেষে সেই শরবৎই এক এক বড় গ্লাস দুই ভাই-বোন মহাতৃপ্তি ও আনন্দের সহিত খাইয়া ফেলিল, সবুজ বোতলের সেই টক চিনির রসই।

অপু তাহাদের বিস্কুট ও এক পয়সা মোড়কের বাজে চকলেট্ কিনিয়া দিল,—দোকানটাতে ভালো কিছু যদি পাওয়া যায় ছাই। তবুও অপুর মনে হইল পয়সা তার সার্থক হইয়াছে আজ।

বাসায় ফিরিয়া তাহার মনে হইল বড় সাহিত্যের প্রেরণার মূলে এই মানব-বেদনা। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রজাস্বত্ব আইন, 'সার্ফ'নীতি, জার-শাসিত রাশিয়ার সাইবেরিয়া, শীত, অত্যাচার, কুসংস্কার, দারিদ্র্য—গোগোল, ডস্টয়ভস্কি, গোর্কি, টলস্টয় ও শেকভের সাহিত্য সম্ভব করিয়াছে। সে বেশ কল্পনা করিতে পারে, দাসব্যবসায়ের দুর্দিনে, আফ্রিকার এক মরু-বেষ্টিত পল্লী-কুটির হইতে কোমল বয়স্ক এক নিগ্রো বালক পিতামাতার স্নেহকোল হইতে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্যুত হইয়া বহু দূর বিদেশের দাসের হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল, বহুকাল আর সে বাপ-মাকে দেখিল না, ভাই-বোনেদের দেখিল না—দেশে দেশে তাহার অভিনব জীবনধারার দৈন্য, অত্যাচার ও গোপন অশ্রুজলের কাহিনী, তাহার জীবনের সে অপূর্ব ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা সে যদি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারিত! আফ্রিকার নীরব নৈশ আকাশ তাহাকে প্রেরণা দিত, তাম্রবর্ণ মরুদিগন্তের স্বপ্নমায়া তাহার চোখে অঞ্জন মাখাইয়া দিত; কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাহারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া বিশ্ব হইতে বিদায় লইল।

দিন-দুই পরে একদিন সন্ধ্যার পর গড়ের মাঠ হইতে একা বেড়াইয়া ফিরিবার মুখে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের সামনে একটুখানি দাঁড়াইয়াছে—একজন আধাবয়সী লোক কাছে আসিয়া বলিল—বাবু, প্রেমারা খেলবেন? খুব ভাল জায়গা। আমি নিয়ে যাব, এখন থেকে পাঁচ মিনিট। ভদ্র জায়গা, কোন হাঙ্গামায় পড়তে হবে না। আসবেন?

অপু বিস্মিত মুখে লোকটার মুখের দিকে চাহিল। আধময়লা কাপড় পরনে, খোঁচা খোঁচা কড়া দাড়ি-গোঁফ, ময়লা দেশী টুইলের সার্ট, কব্জির বোতাম নাই—পানে ঠোঁট দুটো কালো। দেখিয়াই চিনিল—সেই ছাত্রজীবনের পরিচিত বন্ধু হরেন—সেই যে ছেলেটি একবার তাহাদের কলেজ হইতে বই চুরি করিয়া পলাইতে গিয়া ধরা পড়ে। বহুকাল আর দেখাসাক্ষাৎ নাই—অপু লেখাপড়া

ছাড়িয়া দিবার পর আর কখনো নয়। লোকটাও অপুকে চিনিল, থতমত খাইয়া গেল। অপুও বিস্মিত হইয়াছিল—এসব ব্যাপারের অভিজ্ঞতা তাহার নাই—জীবনে কখনও না—তবুও সে বুঝিয়াছিল তাহার এই ছাত্রজীবনের বন্ধুটি কোন্ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কিছু উত্তর করিবার পূর্বে হরেন আসিয়া তাহার হাত দুটি ধরিল—বলিল, মাপ কর ভাই, আগে টের পাই নি। বহুকাল পরে দেখা—থাক কোথায় ?—

অপু বলিল—তুমি থাক কোথায়—এখানেই আছ—কত দিন ?···

—এই নিকটেই। তালতলা লেন—আসবে···অনেক কথা আছে—

—আজ আর হবে না ; আসছে সোমবার পাঁচটার সময় যাব। নম্বরটা লিখে নিই।

—সে হবে না ভাই—তুমি আর আসবে না—তোমার দেখা আর পাবার ভরসা রাখি নে। আজই চলো।

অতি অপরিচ্ছন্ন বাসা। একটি মাত্র ছোট ঘর।

অপু ঘরে ঢুকিতেই একটা কেমন ভ্যাপ্‌সা গন্ধ তাহার নাকে গেল ! ছোট্ট ঘর, জিনিসপত্রে ভর্তি, মেঝেতে বিছানা-পাড়া, তাহারই একপাশে হরেন অপুর বসিবার জায়গা করিয়া দিল। ময়লা চাদর, ময়লা কাঁথা, ময়লা বালিশ, ময়লা কাপড়, ছেঁড়া মাদুর—কলাই-করা গ্লাস, থালা, কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন. কাঁথার আড়াল হইতে তিন-চারটি শীর্ণ কালো কালো ছোট হাত পা বাহির হইয়া আছে—একটি সাত-আট বছরের মেয়ে ওদিকের দালানে দুয়ারের চৌকাঠের উপর বসিয়া। দালানের ওপাশটা রান্নাঘর—হরেনের স্ত্রী সম্ভবতঃ রাঁধিতেছে।

হরেন মেয়েটিকে বলিল—ওরে টেঁপি, তামাক সাজ তো—

অপু বলিল—ছোট ছেলেমেয়েকে দিয়ে তামাক সাজাও কেন ?···নিজে সাজো—ও শিক্ষা ভালো নয়—

হরেন স্ত্রীর উদ্দেশে চীৎকার করিয়া বলিল—কোথায় রৈলে গো, এদিকে এসো, ইনি আমার কলেজ-আমলের সকলের চেয়ে বড় বন্ধু, এত বড় বন্ধু আর কেউ ছিল না—এঁর কাছে লজ্জা করতে হবে না—একটু চা-টা খাওয়াও—এসো এদিকে।

তারপর হরেন নিজের কাহিনী পাড়িল। কলেজ ছাড়িয়াই বিবাহ হয়—তারপর এই দুঃখ-দুর্দশা—বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে—বিশেষতঃ এই সব লেণ্ডি-গেণ্ডি। কত রকম করিয়া দেখিয়াছে—কিছুতেই কিছু হয় না। স্কুলমাস্টারী, দোকান,

চালানী ব্যবসা, ফটোগ্রাফের কাজ, কিছুই বাকী রাখে নাই। আজকাল যাহা করে তা তো অপু দেখিয়াছে! বাসায় কেহ জানে না—উপায় কি?—এতগুলি মুখে অন্ন তো—এই বাজার ইত্যাদি।

হরেনের কথাবার্তার ধরণ অপুর ভাল লাগিল না। চোখেমুখে কেমন যেন একটা—ঠিক বোঝানো যায় না—অপুর মনে হইল হরেন এই সব নীচ ব্যবসায়ে পোক্ত হইয়া গিয়াছে।

হরেনের স্ত্রীকে দেখিয়া অপুর মন সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। কালো, শীর্ণ চেহারা, হাতে গাছকতক কাচের চুড়ি। মাথায় সামনের দিকে চুল উঠিয়া যাইতেছে, হাতে কাপড়ে বাটনার হলুদ-মাখা! সে এমন আনন্দ ও ক্ষিপ্রতার সহিত চা আনিয়া দিল যে-সে মনে করে যেন এতদিনে স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধুর সাক্ষাৎ যখন পাওয়া গিয়াছে—দুঃখ বুঝি ঘুচিল। উঠিবার সময় হরেন বলিল—ভাই বাড়ি-ভাড়া কাল না দিলে অপমান হ'ব—পাঁচটা টাকা থাকে তো দাও তো।

অপু টাকাটা দিয়া দিল। বাহির হইতে যাইতেছে, বড় ছেলেটিকে তার মা যেন কি শিখাইয়া দিল, সে দরজার কাছে আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু, আমার দু'খানা ইস্কুলের বই এখনও কেনা হয় নি—কিনে দেবেন? বই না কিনলে মাস্টার মারবে—

হরেন ভানের সুরে বলিল—যা যা আবার বই—হ্যাঁঃ, ইস্কুলও যত—ফি বছর বই বদলাবে—যা এখন—

অপু তাহাকে বলিল—এখন তো আর কিছু হাতে নেই খোকা, পকেট একেবারে খালি।

হরেন অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিল। সে চাষবাস করিবার জন্য উত্তরপাড়ায় জমি দেখিয়া আসিয়াছে, দুই হাজার টাকা হইলে হয়—অপূর্ব কি টাকাটা ধার দিতে পারিবে? না হয়, আধাআধি বখরা—খুব লাভের ব্যবসা।

প্রথম দিনের সাক্ষাতেই এ সব?

কেমন একটা অপ্রীতিকর মনোভাব লইয়া অপু বাসায় ফিরিল। শেষে কিনা জুয়ার দালালী? প্রথম যৌবনে ছিল চোর, আরও কত কি করিয়াছে, কে খোঁজ রাখে? এ আর ভাল হইল না!

দিন তিনেক পর একদিন সকালে হরেন আসিয়া হাজির অপুর বাসায়। নানা বাজে কথার পর উত্তরপাড়ার জমি লওয়ার কথা পাড়িল। টিউব-ওয়েল বসাইতে

হইবে। কারণ জলের সুবিধা নাই—অপূর্ব কত টাকা দিতে পারে? উঠিবার সময় বলিল—ওহে, তুমি মানিককে কি বই কিনে দেবে বলেছিলে, আমায় বলছিল। অপু ভাবিয়া দেখিল এরূপ কোন কথা মানিককে সে বলে নাই—যাহা হউক, না হয় দিয়া দিবে এখন। মানিককে বইয়ের দরুন টাকা হরেনের হাতে দিয়া দিল।

তাহার পর হইতে হরেনের যাতায়াত শুরু হইল একটু ঘন ঘন। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে ছেলে মানিকও আসিতে লাগিল। কখনও সে আসিয়া বলে, তাহারা বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে, টাকা দিন কাকাবাবু। কখনও তাহার জুতা নাই, কখনও ছোট খোকার জামা নাই—কখনও তাহার বড় দিদি, ছোট দিদির বায়না ইহারা আসিলেই দু-তিন টাকার কমে অপুর পার হইবার উপায় নাই। হরেনও নানা ছুতায় টাকা চায়, বাড়ি ভাড়া—স্ত্রীর অসুখ।

একদিন কাজলের একটা সেলুলয়েডের ঘর-সাজানো জাপানী সামুরাই পুতুল খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তার দিন-দুই আগে মানিকের সঙ্গে তার ছোট বোন টেঁপি আসিয়াছিল—অনেকক্ষণ পুতুলটা নাড়াচাড়া করিতেছিল, কাজল দেখিয়াছে। তারপর দিন-দুই আর সেটার খোঁজ নাই. কাজল আজ দেখিল পুতুলটা নাই। ইহার দিন পনেরো পরে হরেনের বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়া অপু দেখিল, কাজলের জাপানী পুতুলটা একেবারে সামনেই একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের পাশে বসানো। পাছে ইহারা লজ্জায় পড়ে তাই সেদিকটা পিছু ফিরিয়া বসিল ও যতক্ষণ রহিল, লণ্ঠনটার দিকে আদৌ চাহিল না। ভাবিল—যাক গে, খুকী লোভ সামলাতে না পেরে এনেছে, খোকাকে আর একটা কিনে দেবো!

উঠিয়া আসিবার সময় মানিক বলিল—মা বললেন, তোর কাকাবাবুকে বল—একদিন আমাদের কালীঘাট দেখিয়ে আনতে—সামনের রবিবার চলুন কাকাবাবু, আমাদের ছুটি আছে, আমিও যাব।

অপুর বেশ কিছু খরচ হইল রবিবারে। ট্যাক্সিভাড়া, জলখাবার, ছেলে-পিলেদের খেলনা ক্রয়, এমন কি বড় মেয়েটির একখানা কাপড় পর্যন্ত। কাজলও গিয়াছিল, সে এই প্রথম কালীঘাট দেখিয়া খুব খুশী।

সেদিন নিজের অলক্ষিতে অপুর মনে হইল, তাহার কবিরাজ বন্ধুটি ও তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা—তাদের প্রথম জীবনের সেই দারিদ্র্য—সেই পরিশ্রম—কখনও বিশেষ কিছু তো চাহে নাই কোনদিন—বরং কিছু দিতে গেলে ক্ষুণ্ণ হইত। কিন্তু আন্তরিক স্নেহটুকু ছিল তাহার উপর। এখনও ভাবিলে অপুর মন উদাস

হইয়া পড়ে।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছোকরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিতে শুনিতে বেশ, সুন্দর চোখ-মুখ, একটু লাজুক, কথা বলিতে গেলে মুখ রাঙ্গা হইয়া যায়।

অপু তাহাকে চিনিল—চাঁপদানীর পূর্ণ দিঘড়ীর ছেলে রসিকলাল—যাহাকে সে টাইফয়েড হইতে বাঁচাইয়াছিল। অপু বলিল—রসিক, তুমি আমার বাসা জানলে কি ক'রে?...

—আপনার লেখা বেরুচ্চে 'বিভাবরী' কাগজে—তাদের অফিস থেকে নিয়েছি—

—তারপর, অনেককাল পর দেখা—কি খবর বলো।

—শুনুন, দিদিকে মনে আছে তো? দিদি আমায় পাঠিয়ে দিয়েচে—বলে দিয়েচে যদি কলকাতায় যাস, তবে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করিস। আপনার কথা বড্ড বলে, আপনি একবার আসুন না চাঁপদানীতে!

—পটেশ্বরী? সে এখনও মনে ক'রে রেখেছে আমার কথা?

রসিক সুর নিচু করিয়া বলিল—আপনার কথা এমন দিন নেই—আপনি চলে এসেচেন আট-দশ বছর হোল—এই আট-দশ বছরের মধ্যে আপনার কথা বলে নি—এমন একটা দিনও বোধ হয় যায় নি। আপনি কি কি খেতে ভালবাসতেন—সে সব দিদির এখনও মুখস্থ। কলকাতায় এলেই আমায় বলে মাস্টার মশায়ের খোঁজ করিস না রে? আমি কোথায় জানব আপনার খোঁজ—কলকাতা শহর কি চাঁপদানী? দিদি তা বোঝে না। তাই এবার 'বিভাবরী'তে আপনার লেখা—

—পটেশ্বরী কেমন আছে? আজকাল আর সে-সব শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার—

—শাশুড়ী মারা গিয়েচে, আজকাল কোন অত্যাচার নেই, দু'তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে,—সে-ই আজকাল গিন্নী, তবে সংসারের বড় কষ্ট। আমাকে বলে দেয় বোতলের চাট্‌নি কিনতে—দশ আনা দাম—আমি কোথা থেকে পাব—তাই একটা ছোট বোতল আজ এই দেখুন কিনে নিয়ে যাচ্ছি ছ' আনায়। টেঁপারির আচার। ভালো না?

—এক কাজ করো। চলো আমি তোমাকে আচার কিনে দিচ্ছি, আমের আচার ভালোবাসে? চলো দেশী চাট্‌নি কিনি। ভিনিগার দেওয়া বিলিতি চাট্‌নি হয়তো পছন্দ করবে না।

—আপনি কবে আসবেন? আপনার সঙ্গে দেখা হয়েচে অথচ আপনা৻ নিয়ে যাই নি শুনলে দিদি আমাকে বাড়িতে তিষ্ঠুতে দেবে না কিন্তু, আজ আসুন না?

—সে এখন হবে না, সময় নেই। সুবিধে মত দেখব।

অপু অনেকগুলি ছেলেমেয়ের খেলনা, খাবার চাটনি কিনিয়া দিল। রসিকে স্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিল। রসিক বলিল—আপনি কিন্তু ঠিক যাবেন একদি এর মধ্যে—নৈলে ওই বললুম যে—

কি চমৎকার নীল আকাশ আজ! গরম আজ একটু কম।

চৈত্র দুপুরের এই ঘন নীল আকাশের দিকে চাহিলেই আজকাল কেন শৈশ কথাই তাহার মনে পড়ে?

একটা জিনিস সে লক্ষ্য করিয়াছে। বাল্যে যখন অন্য কোনও স্থানে সে যা নাই—যখন যাহা পড়িত—মনে মনে তাহার ঘটনাস্থলের কল্পনা করিতে গি নিশ্চিন্দিপুরেরই বাঁশবন, আমবাগান, নদীর ঘাট, কুটির মাঠের ছবি মনে ফুটি উঠিত—তাও আবার তাদের পাড়ার ও তাদের বাড়ির আশেপাশের জায়গা তাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন তো রামায়ণ মহাভারত মাখানো ছিল—দশরথে রাজপ্রাসাদ ছিল তাদের পাড়ার ফণি মুখুয্যেদের ভাঙা দোতলা বাড়িটা- মাধবীকঙ্কণে পড়া একলিঙ্গের মন্দির ছিল ছিরে পুকুরের পশ্চিমদিকের সীমা বড় বাঁশঝাড়টার তলায়—বঙ্গবাসীতে পড়া জোয়ান-অব্-আর্ক মেষপাল চরাই নদীপারের দেয়াড়ের কাশবনের চরে, শিমুল গাছের ছায়ায়…তারপর বড় হ কত নতুন স্থানে একে একে গেল, মনের ছবি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে লাগিল- ম্যাপ চিনিল, ভূগোল পড়িল, বড় হইয়া যে সব বই পড়িল তাদের ঘটনা নিশ্চি পুরের মাঠে, বনে, নদীর পথেঘাটে থাকে না কিন্তু এতকালের পরেও বাল্যে যে ছবিগুলি একবার অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তা অপরিবর্তিত আছে—এতকা পরেও যদি রামায়ণ মহাভারতের কোনও ঘটনা কল্পনা করে—নিশ্চিন্দিপুরে সেই অস্পষ্ট, বিস্মৃত-প্রায় স্থানগুলিই তার রথীভূমি হইয়া দাঁড়ায়—অনেককা পর সেদিন আর একবার পুরনো বইয়ের দোকানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাধবীকঙ্ক ও জীবনসন্ধ্যা পড়িতেছিল—কি অদ্ভুত!—পাতায় পাতায় নিশ্চিন্দিপু মাখানো, বাল্যের ছবি এখনও সেই অস্পষ্ট-ভাবে-মনে-হওয়া জঙ্গলে-ভরা পোে পুকুরটার পশ্চিম সীমানায় বাঁশঝাড়ের তলায়!…

এবার মাঝে মাঝে দু-একটি পূর্ব-পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে অপুর দেখা হইতে লাগিল। প্রায়ই কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার—জানকী মফঃস্বলের একটা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাস্টার, মন্মথ এটর্নির ব্যবসায়ে বেশ উপার্জন করে। দেবব্রত একবার ইতিমধ্যে সস্ত্রীক কলিকাতা আসিয়াছিল, স্ত্রীর পা সারিয়া গিয়াছে, দু'টি মেয়ে হইয়াছে। চাকরিতে সে বেশ নাম করিয়াছে, তবে চেষ্টায় আছে কণ্ট্রাক্টরী ব্যবসায় স্বাধীনভাবে আরম্ভ করিতে। দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু সেই সমীর আজকাল ইন্সিওরেন্সের বড় দালাল। সে চিরকাল পয়সা চিনিত, হিসাবী ছিল—আজকাল অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। কষ্টদুঃখ করিতে করিতে একবারও সে ইহাদিগকে হিংসা করে না। তারপর এবার জানকীর সঙ্গে একদিন কলিকাতায় দেখা হইল। মোটা হইয়া গিয়াছে বেজায়, মনের তেজ নাই, গৃহস্থালির কথা-বার্তা—অপুর মনে হইল সে যেন একটা বন্ধ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে।

তাহার এটর্নি বন্ধু মন্মথ একদিন বলিল—ভাই, সকাল থেকে ব্রিফ নিয়ে বসি, সারাদিনের মধ্যে আর বিশ্রাম নেই—খেয়েই হাইকোর্ট, পাঁচটায় ফিরে একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারী করি ঘণ্টা-তিনেক—তারপর বাড়ি ফিরে আবার কাজ—খবরের কাগজখানা পড়বারও সময় পাইনে, কিন্তু এত টাকা রোজগার করি, তবু মনে হয়, ছাত্রজীবনই ছিল ভাল। তখন কোন একটা জিনিস থেকে বেশী আনন্দ পেতুম—এখন মনে হয়, আই হ্যাভ লস্ট দি সস্ অফ লাইফ—

অপু নিজের কথা ভাবিয়া দেখে। কৈ, এত বিরুদ্ধ ঘটনার ভিতর দিয়াও তাহার মনের আনন্দ—কেন নষ্ট হয় নাই? নষ্ট হয় তো নাই-ই, কেন তাহা দিনে দিনে এমন অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যে বাড়িয়া চলিয়াছে? কেন পৃথিবীটা, পৃথিবী নয়—সারা বিশ্বটা, সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বটা এক অপরূপ রঙে তাহার কাছে রঙীন? আর দিনে দিনে এ কি গহন গভীর রহস্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া প্রতি বিষয়ে অতি তীব্রভাবে সচেতন করিয়া দিতেছে?...

সে দেখিতে পায় তার ইতিহাস, তার এই মনের আনন্দের প্রগতির ইতিহাস, তার ক্রমবর্ধমান চেতনার ইতিহাস।

এই জগতের পিছনে আর একটা যেন জগৎ আছে। এই দৃশ্যমান আকাশ, পাখির ডাক, এই সমস্ত সংসার-জীবন-যাত্রা—তারই ইঙ্গিত আনে মাত্র—দূর দিগন্তের বহুদূর ওপারে কোথায় যেন সে জগৎটা—পিঁয়াজের একটা খোসার মধ্যে যেমন আর একটা খোসা তার মধ্যে আর একটা খোসা, সেটাও তেমনি এই

আকাশ, বাতাস, সংসারের আবরণে কোথায় যেন ঢাকা আছে, কোন্ জীবন-পারের মনের পারের দেশে। স্থির সন্ধ্যায় নির্জনে একা কোথাও বসিয়া ভাবিলেই সেই জগৎটা একটু একটু নজরে আসে।

সেই জগৎটার সঙ্গে যোগ-সেতু প্রথম স্থাপিত হয় তার বাল্যে—দিদি যখন মারা যায়। তারপর অনিল—মা—অপর্ণা—সর্বশেষে লীলা। দুস্তর অশ্রুর পারাবার সারাজীবন ধরিয়া পাড়ি দিয়া আসিয়া আজ যেন বহু দূরে সে-দেশের তালীবন-রেখা অস্পষ্ট নজরে আসে।

আজ গোলদীঘির বেঞ্চিখানায় বসিয়া তাই সে ভাবিয়া দেখিল, অনেক দিন আগে তার বন্ধু অনিল যে-কথা বলিয়াছিল, এ জেনারেশনের হাত হইতে কাজের ভার লওয়া—আর সবাই তা লইয়াছে, তার সকল সহপাঠীই এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, দিকে দিকে জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে তারা নামিয়া পড়িয়াছে, কেবল ভবঘুরে হইয়াছে সে ও প্রণব। কিন্তু সত্য কথা সে বলিবে?···মন তার কি বলে?

তার মনে হয় সে যাহা পাইয়াছে জীবনে, তাহাতেই তার জীবন হইয়াছে সার্থক। সে চায় না অর্থ, চায় না—কি সে চায়?

সেটাও তো খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে না। সে কি অপরূপ জীবন-পুলক এক একদিন দুপুরের রোদে ছাদটাতে সে অনুভব করে, তাকে অভিভূত, উত্তেজিত করিয়া তোলে, আকাশের দিকে উৎসুক চোখে চাহিয়া থাকে, যেন সে দৈববাণীর প্রত্যাশা করিতেছে।···

কাজল কি একটা বই আগ্রহের সঙ্গে পড়িতেছিল—অপু ঘরে ঢুকিতেই চোখ তুলিয়া ব্যগ্র উৎসাহের সুরে উজ্জ্বলমুখে বলিল—ওঃ, কি চমৎকার গল্পটা বাবা! —শোনো না বাবা—এখানে বসো—। পরে সে আরও কি সব বলিয়া যাইতে লাগিল। অপু অন্যমনস্ক মনে ভাবিতেছিল—বিদেশে যাওয়ার ভাড়া সে যোগাড় করিতে পারে—কিন্তু খোকা—খোকাকে কোথায় রাখিয়া যায়?···মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিবে? মন্দ কি?···কিছুদিন না হয় সেখানেই থাকুক—বছর দুই তিন—তারপর সে তো ঘুরিয়া আসিবেই। তাই করিবে? মন্দ কি?

কাজল অভিমানের সুরে বলিল—তুমি কিছু শুনছ না, বাবা—

— শুনব না কেন রে, সব শুনছি। তুই বলে যা না?

—ছাই শুনছো, বল দিকি শ্বেত পরী কোন্ বাগানে আগে গেল?

বলিল—কোন্ বাগানে?—আচ্ছা একটু আগে থেকে বল্ তো খোকা—

ওটা ভাল মনে নেই! খোকা অতশত ঘোরপ্যাঁচ বুঝিতে পারে না—সে আবার গোড়া হইতে গল্প-বলা শুরু করিল—বলিল—এইবার তো রাজকন্যে শেকড় খুঁজতে যাচ্ছে, কেমন না! মনে আছে তো?—(অপু এক বর্ণও শোনে নাই) তারপর শোনো বাবা—

কাজলের মাথার চুলের কি সুন্দর ছেলেমানুষি গন্ধ!—দোলা, চুষিকাটি, ঝুনঝুকবাটি, মায়ের কোল—এই সব মনে করাইয়া দেয়—নিতান্ত কচি। সত্যি ওর দিকে চাহিয়া দেখিলে আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না—কি হাসে, কি চোখ দুটি—মুখ কি সুন্দর—ঐটুকু একরত্তি ছেলে—যেন বাস্তব নয়, যেন এ পৃথিবীর নয়—কোন্ সময় জ্যোৎস্নাপরী আসিয়া ওকে যেন উড়াইয়া লইয়া কোনও স্বপ্নপারের দেশে লইয়া যাইবে—দিনরাত কি চঞ্চলতা, কি সব অদ্ভুত খেয়াল ও আবদার—অথচ কি অবোধ ও অসহায়!—ওকে কি করিয়া প্রতারণা করা যাইবে?—ও তো একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—ওকে কি বলিয়া ভুলানো যায়? অপু মনে মনে সেই ফন্দিটাই ভাবিতে লাগিল।

ছেলেকে বলিল—চিনি নিয়ে আয় তো খোকা—একটু হালুয়া করি।

কাজল মিনিট দশেক মাত্র বাহিরে গিয়াছে—এমন সময় গলির বাইরে রাস্তায় কিসের একটা গোলমাল অপুর কানে গেল। বাহির হইয়া ঘরের দোরে দাঁড়াইল—গলির ভিতর হইতে লোক দৌড়াইয়া বাহিরের দিকে ছুটিতেছে—

একজন বলিল—একটা কে লরি চাপা পড়েছে—

অপু দৌড়িয়া গলির মুখে গেল। বেজায় ভিড়, সবাই আগাইতে চায়, সবাই ঠেলাঠেলি করিতেছে। অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিয়াছে। একজন কে বলিল—কে চাপা পড়েছে মশাই—

—ওই যে ওখানে একটি ছেলে—আহা মশায়, তখনই হয়ে গিয়েছে—মাথাটা আর নেই—

অপু রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—বয়স কত?

—বছর নয় হবে—ভদ্রলোকের ছেলে, বেশ ফর্সা দেখতে—আহা!—

অপু এ প্রশ্নটা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না—তাহার গায়ে কি ছিল। কাজল তার নতুন তৈরী খদ্দরের শার্ট পরিয়া এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছে—

কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ অপু হাতে পায়ে অদ্ভুত ধরণের বল পাইল—বোধ

হয় যে খুব ভালবাসে, সে ছাড়া এমন বল আর কেহ পায় না এমন সময়ে। খোকার কাছে এখনি যাইতে হইবে—যদি একটুও বাঁচিয়া থাকে—সে বোধ হয় জল খাইবে, হয়তো ভয় পাইয়াছে—

ওপারের ফুটপাতে গ্যাসপোস্টের পাশে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পুলিশ আসিয়াছে—ট্যাক্সিতে ধরাধরি করিয়া দেহটা উঠাইতেছে। অপু ধাক্কা মারিয়া সামনের লোকজনকে হঠাইয়া খানিকটা জায়গা ফাঁকা করিয়া ফেলিল। কিন্তু ফাঁকায় আসিয়া সামনে ট্যাক্সিটার দিকে চাহিয়াই তাহার মাথাটা এমন ঘুরিয়া উঠিল যে, পাশের লোকের কাঁধে নিজের অজ্ঞাতসারে ভর না দিলে সে হয়তো পড়িয়াই যাইত। ট্যাক্সির সামনে যে ভিড় জমিয়াছে তারই মধ্যে দাঁড়াইয়া ডিঙি মারিয়া কাণ্ডটা দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে—কাজল। অপু ছুটিয়া গিয়া ছেলের হাত ধরিল—কাজল ভীত অথচ কৌতূহলী চোখে মৃতদেহটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল—অপু তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিল।—কি দেখছিলি ওখানে?···আয় বাসায়—

অপু অনুভব করিল, তাহার মাথা যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছে—সারা দেহে যেন এইমাত্র কে ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারির শক্‌ লাগাইয়া দিয়াছে।

গলির পথে কাজল একটু ইতস্ততঃ করিয়া অপ্রতিভের সুরে বলিল—বাবা, গোলমালে আমায় যে সিকিটা দিয়েছিলে চিনি আনতে, কোথায় পড়ে গিয়েচে খুঁজে পাই নি।

—যাক গে। চিনি নিয়ে চলে আসতে পারতিস্‌ কোন্‌কালে—তুই বড় চঞ্চল ছেলে খোকা।

দিন দুই পরে সে কি কাজে হ্যারিসন্‌ রোড দিয়া চিৎপুরের দিকে ট্রামে চড়িয়া যাইতেছিল, মোড়ের কাছে শীলেদের বাড়ির রোকড়নবিশ রামধনবাবুকে ছাতি মাথায় যাইতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিল, কাছে গিয়া বলিল, কি রামধনবাবু, চিনতে পারেন? রামধনবাবু হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, আরে অপূর্ববাবু যে! তারপর কোথা থেকে আজ এতকাল পরে! ওঃ, আপনি একটু অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েছেন, তখন ছিলেন ছোকরা—

অপু হাসিয়া বলিল—তা বটে। এদিকেও চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হ'ল—কতকাল আর ছোকরা থাকব—আপনি কোথায় চলেছেন?

—অফিস যাচ্ছি, বেলা প্রায় এগারোটা বাজে—না? একটু দেরি হয়ে গেল।

একদিন আসুন না ? কতদিন তো কাজ করেছেন, আপনার পুরানো অফিস, হঠাৎ চাকরিটা দিলেন ছেড়ে, তা নইলে আজ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার হ'তে পারতেন, হরিচরণবাবু মারা গিয়েছেন কিনা।

সত্যিই বটে বেলা সাড়ে দশটা। রামধনবাবু পুরানো দিনের মত ছাতি মাথায় লংক্লথের ময়লা ও হাত-ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে, ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে দিয়া, অপু দশ বৎসর পূর্বে যে আফিসটাতে কাজ করিত সেখানে গুটি গুটি চলিয়াছেন।

অপু জিজ্ঞাসা করিল, রামধনবাবু, কতদিন কাজ হ'ল ওদের ওখানে আপনার সবসুদ্ধ ?

রামধনবাবু পুরনো দিনের মত গর্বিত সুরে বলিলেন, এই সাঁইত্রিশ বছর যাচ্ছে। কেউ পারবে না বলে দিচ্ছি,—এক কলমে এক সেরেস্তায়। আমার দাখিলায় পাঁচ-পাঁচটা ম্যানেজার বদল হ'ল—কত এল, কত গেল—আমি ঠিক বজায় আছি। এ শর্মার চাকরি ওখান থেকে কেউ নড়াতে পারছেন না— যিনিই আসুন। হাসিয়া বলিলেন,—এবার মাইনে বেড়েছে, পঁয়তাল্লিশ হ'ল।

অপুর মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—সাঁইত্রিশ বছর একই অন্ধকার ঘরে একই হাতবাক্সের উপর ভারী খেরো-বাঁধানো রোকড়ের খাতা খুলিয়া বালি ও স্টিল-পেনের সাহায্যে শীলেদের সংসারের চালডালের হিসাব লিখিয়া চলা—চারিধারে সেই একই দোকান-পসার, একই পরিচিত গলি, একই সহকর্মীর দল, একই কথা ও আলোচনা—বারো মাস, তিনশো তিরিশ দিন!—সে ভাবিতে পারে না—এই বদ্ধজল, পঙ্কিল, পচা পানা পুকুরের মত গতিহীন, প্রাণহীন, ক্ষুদ্র জীবনের কথা ভাবিলেও তাহার গা কেমন করিয়া উঠে!

বেচারী রামধনবাবু—দরিদ্র, বৃদ্ধ, ওর দোষ নাই, তাও সে জানে। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে, আড্ডায়, ক্লাবে সে মিশিয়াছে। বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে জীবন—অর্থহীন, ছন্দহীন, ঘটনাহীন দিনগুলি। শুধু টাকা, টাকা—শুধু খাওয়া—পানাসক্তি, ব্রিজখেলা, ধূমপান, একই তুচ্ছ বিষয়ে একঘেয়ে অসার বকুনি —তরুণ মনের শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়, আনন্দকে ধ্বংস করে, দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে, শেষে ঘোর কুয়াশা আসিয়া সূর্যালোককে রুদ্ধ করিয়া দেয়—ক্ষুদ্র, পঙ্কিল, অকিঞ্চিৎকর জীবন কোন রকমে খাত বাহিয়া চলে।...সে শক্তিহীন নয়—পরিণাম হইতে সে নিজেকে বাঁচাইবে।

তারপর সে রামধনবাবুর অনুরোধে কতকটা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া শীলেদের বাড়ি গেল। সেই আফিস, ঘরদোর, লোকের দল বজায় আছে।

প্রবোধ মুহুরী বড়লোক হইবার জন্য কোন লটারীতে প্রতি বৎসর একখানি টিকিট কিনিতেন, বলিতেন—ও পাঁচটা টাকা বাজে খরচের সামিল ধরে রেখেছি দাদা। যদি একবার লেগে যায়, তবে সুদে আসলে সব উঠে আসবে। তাহা আজও আসে নাই, কারণ তিনি আজও দেবোত্তর এস্টেটের হিসাব কষিতেছেন।

খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল সকলে। মেজবাবু কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বেলা এগারোটা বাজে, তিনি এইমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছেন—বিলিয়ার্ড ঘরের সামনের বারান্দাতে চাকর তাঁহাকে এখনি তৈল মাখাইবে, বড় রূপার গড়গড়িতে রেশমের গলাবন্ধ-ওয়ালা নলে বেহারা তামাক দিয়া গেল।

এ বাড়ির একটি ছেলেকে অপু পূর্বে দিনকতক পড়াইয়াছিল, তখন সে ছোট ছিল, বেশ সুন্দর দেখিতে ছিল—ভারী পবিত্র মুখশ্রী, স্বভাবটিও ছিল ভারী মধুর। সে এখন আঠার-উনিশ বছরের ছেলে, কাছে আসিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল—অপু দেখিয়া ব্যথিত হইল যে, সে এই সকালেই অন্ততঃ দশটা পান খাইয়াছে—পান খাইয়া খাইয়া ঠোঁট কালো—হাতে রূপার পানের কৌটা—পান জর্দা। এবার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল মারিয়াছে, খানিকক্ষণ কেবল নানা ফিল্মের গল্প করিল, বাস্টার কিটনকে মাস্টারমশায়ের কেমন লাগে?··· চার্লি চ্যাপলিন? নর্মা শিয়ারার—ও সে অদ্ভুত!

ফিরিবার সময় অপুর মনটা বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। বালক, ওর দোষ কি? এই আবহাওয়ায় খুব বড় প্রতিভাও শুকাইয়া যায়—ও তো অসহায় বালক—

রামধনবাবু বলিলেন, চললেন অপূর্ববাবু? নমস্কার। আসবেন মাঝে মাঝে।

গলির বাহিরে সেই পচা খড় বিচালি, পচা আপেলের খোলা, শুঁটকি মাছের গন্ধ।

রাত্রিতে অপুর মনে হইল সে একটা বড় অন্যায় করিতেছে, কাজলের প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিতেছে। ওরও তো সেই শৈশব। কাজলের এই অমূল্য শৈশবের দিনগুলিতে সে তাহাকে এই ইট, কংক্রিট, সিমেন্ট ও বার্ড-কোম্পানীর পেটেন্ট স্টোনে বাঁধানো কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া দিনের পর দিন তাহার কাঁচা, উৎসুক, স্বপ্নপ্রবণ শিশুমন তুচ্ছ বৈচিত্র্যহীন অনুভূতিতে ভরাইয়া তুলিতেছে—তাহার জীবনে বন-বনানী নাই, নদীর মর্মর নাই, পাখির কলস্বর, মাঠ, জ্যোৎস্না, সঙ্গী-সাথীদের সুখদুঃখ—এসব কিছুই নাই, অথচ কাজল অতি

সুন্দর ভাবপ্রবণ বালক—তাহার পরিচয় সে অনেকবার পাইয়াছে।

কাজল দুঃখ জানুক, জানিয়া মানুষ হউক। দুঃখ তার শৈশবে গল্পে-পড়া সেই সোনা-করা জাদুকর! ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়, ঝুলি ঘাড়ে বেড়ায়, এই চাপ-দাড়ি, কোণে-কাঁদাড়ে ফেরে, কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কেউ পোছে না, সকলে পাগল বলে, দূর দূর করে, রাতদিন হাপর জ্বালায়, রাতদিন হাপর জ্বালায়।

পেতল থেকে, রাং থেকে, সীসে থেকে ও-লোক কিন্তু সোনা করিতে জানে, করিয়াও থাকে।

এই দিনটিতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সর্বপ্রথম এতকাল পরে একটা চিন্তা মনে উদয় হইল। নিশ্চিন্দিপুর একবারটি ফিরিলে কেমন হয়? সেখানে আর কেউ না থাক্, শৈশব-সঙ্গিনী রাণুদিদি তো আছে। সে যদি বিদেশে চলিয়া যায়, তার আগে খোকাকে তার পিতামহের ভিটাটা দেখাইয়া আনাও তো একটা কর্তব্য?

পরদিনই সে কাশীতে লীলাদিকে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিল, সে খোকাকে লইয়া একবার নিশ্চিন্দিপুর যাইতেছে, খোকাকে পিতামহের গ্রামটা দেখাইয়া আনিবে। পত্রপাঠ যেন লীলাদি তার দেওরকে সঙ্গে লইয়া সোজা নিশ্চিন্দিপুর চলিয়া যায়।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

...নে উঠিয়াও যেন অপুর বিশ্বাস হইতেছিল না, সে সত্যই নিশ্চিন্দিপুরের ...টিতে আবার পা দিতে পারিবে—নিশ্চিন্দিপুর, সে তো শৈশবের স্বপ্নলোক! ...তো মুছিয়া গিয়াছে, মিলাইয়া গিয়াছে, সে শুধু একটা অনতিস্পষ্ট সুখস্মৃতি ...ত্র, কখনও ছিল না, নাইও।

মাঝেরপাড়া স্টেশনে ট্রেন আসিল বেলা একটার সময়। খোকা লাফ দিয়া ...মিল, কারণ প্লাটফর্ম খুব নিচু। অনেক পরিবর্তন হইয়াছে স্টেশনটার, প্লাট-...র্মের মাঝখানে জাহাজের মাস্তুলের মত উঁচু যে সিগন্যালটা ছেলেবেলায় তাহাকে ...ক লাগাইয়া দিয়াছিল সেটা আর এখন নাই। স্টেশনের বাইরে ...থের উপর একটা বড় জাম গাছ, অপুর মনে আছে, এটা আগে ছিল না। ওই ...ই বড় মাদার গাছটা, যেটার তলায় অনেককাল আগে তাহাদের এদেশ ছাড়িবার

দিনটাতে মা খিচুড়ি রাঁধিয়াছিলেন। গাছের তলায় দুখানা মোটর-বাস যাত্রীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া, অপুরা থাকিতে থাকিতে দুখানা পুরনো ফোর্ড ট্যাক্সিও আসিয়া জুটিল। আজকাল নাকি নবাবগঞ্জ পর্যন্ত বাস ও ট্যাক্সি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—জিনিসটা অপুর কেমন যেন ভাল লাগিল না। কাজল নবীন যুগের মানুষ, সাগ্রহে বলিল—মোটর কার্টে ক'রে যাব বাবা? অপু ছেলেকে জিনিসপত্রসমেত ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিল, বটের ঝুরি দোলানো, স্নিগ্ধ ছায়াভরা সেই প্রাচীন দিনের পথটা দিয়া সে নিজে মোটরে চাড়িয়া যাইতে পারিবে না কখনই। এ দেশের সঙ্গে পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ কি খাপ খায়?

চৈত্রমাসের শেষ। বাংলায় সত্যিকার বসন্ত এই সময়েই নামে। পথ চলিতে চলিতে পথের ধারে ফুলেভরা ঘেঁটুবনের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। এই কম্পমান চৈত্রদুপুরের রৌদ্রের সঙ্গে, আকন্দ ফুলের গন্ধের সঙ্গে শৈশব যেন মিশানো আছে—পশ্চিম বাংলার পল্লীতে এ রমনীয় বসন্তের রূপ সে তো ভুলিয়াই গিয়াছিল।

এই সেই বেত্রবতী! এমন মধুর স্বপ্নভরা নামটি কোন্ নদীর আছে পৃথিবীতে? খেয়া পার হইয়া আবার সেই আষাঢ়ুর বাজার। ভিডোল ও ডানলপ টায়ারের বিজ্ঞাপন-ওয়ালা পেট্রোলের দোকান নদীর উপরেই। বাজারেরও চেহারা অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। তেইশ বছর আগে এত কোঠাবাড়ি ছিল না। আষাঢ়ু হইতে হাঁটিয়া যাওয়া সহজ, মাত্র দু মাইল. জিনিসপত্রের জন্য একটা মুটে পাওয়া গেল, মোটরবাস ও ট্যাক্সির দরুন ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ি আজকাল নাকি এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মুটে বলিল—ধঞ্চেপলাশগাছির ওই কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে যাবেন তো বাবু? ধঞ্চেপলাশগাছি?···নামটাই তো কতকাল শোনে নাই, এতদিন মনেও ছিল না। উঃ, কতকাল পরে এই অতি সুন্দর নামটা সে আবার শুনিতেছে!

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে এমন সময়ে পথটা সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—পাশেই মধুখালির বিল—পদ্মবনে ভরিয়া আছে। এই সেই অপূর্ব সৌন্দর্যভূমি, সোনাডাঙার স্বপ্নমাখানো মাঠটা—মনে হইল এত জায়গায় তো বেড়াইল, এমন অপরূপ মাঠ ও বন কই কোথাও তো দেখে নাই! সেই বনঝোপ, ঢিবি, বন, ফুলে ভর্তি বাবলা—বৈকালের এ কী অপূর্ব রূপ!

তারপরই দূর হইতে ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার উঁচু ঝাঁকড়া মাথাটা নজরে পড়িল—যেন দিক্‌সমুদ্রে ডুবিয়া আছে—ওর পরেই নিশ্চিন্দিপুর।

—ক্রমে বটগাছটা পিছনে পড়িল—অপুর বুকের রক্ত চল্‌কাইয়া যেন মাথায় উঠিতে চাহিতেছে, সারা দেহ এক অপূর্ব অনুভূতিতে যেন অবশ হইয়া আসিতেছে। ক্রমে মাঠ শেষ হইল, ঘাটের পথের সেই আমবাগানগুলো—সে রুমাল কুড়াইবার ছলে পথের মাটি একটু তুলিয়া মাথায় ঠেকাইল। ছেলেকে বলিল—এই হ'ল তোমার ঠাকুরদাদার গাঁ, খোকা, ঠাকুরদাদার নামটা মনে আছে তো—বল তো বাবা কি?

কাজল হাসিয়া বলিল—শ্রীহরিহর রায়, আহা, তা কি আর মনে আছে!

অপু বলিল, শ্রী নয় বাবা, ঈশ্বর বলতে হয়, শিখিয়ে দিলাম যে সেদিন?

রানুদিদির সঙ্গে দেখা হইল পরদিন বৈকালে।

সাক্ষাতের পূর্ব-ইতিহাসটা কৌতুকপূর্ণ, কথাটা রানীর মুখেই শুনিল।

রানী অপু আসিবার কথা শুনে নাই, নদীর ঘাট হইতে বৈকালে ফিরিতেছে, বাঁশবনের পথে কাজল দাঁড়াইয়া আছে, সে একা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

রানী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল—অনেককাল আগেকার একটা ছবি অস্পষ্ট মনে পড়িল—ছেলেবেলায় ও ঘাটের ধারের জঙ্গলে-ভরা ভিটাটাতে হরিকাকারা বাস করিত, কোথায় যেন তাহারা উঠিয়া গিয়াছিল তারপরে। তাদের বাড়ির সেই অপু না?···ছেলেবেলার সেই অপু! পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সে কাছে গিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিল—অপুও বটে, নাও বটে। যে বয়সে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তার সে সময়ের চেহারাখানা রানীর মনে আঁকা আছে, কখনও ভুলিবে না—সেই বয়স, সেই চেহারা, অবিকল। রানী বলিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেছ খোকা?

কাজল বলিল—গাঙ্গুলীদের বাড়ি—

রানী ভাবিল, গাঙ্গুলীরা বড়লোক, কলিকাতা হইতে কেহ কুটুম্ব আসিয়া থাকিবে, তাদেরই ছেলে। কিন্তু মানুষের মতও মানুষ হয়! বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল একেবারে। গাঙ্গুলীবাড়ির বড় মেয়ের নাম করিয়া বলিল—তুমি বুঝি কাদুপিসির নাতি?

কাজল লাজুক চোখে চাহিয়া বলিল—কাদুপিসি কে জানি নে তো? আমার ঠাকুরদাদার এই গাঁয়ে বাড়ি ছিল—তাঁর নাম ঈশ্বর হরিহর রায় —আমার নাম অমিতাভ রায়।

বিস্ময়ে ও আনন্দে রানীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না অনেকক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ভয়ও হইল। রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল—তোমার বাবা খোকা?...

কাজল বলিল—বাবার সঙ্গেই তো কাল এলাম। গাঙ্গুলীবাড়িতে এসে উঠলাম রাত্রে। বাবা ওদের বাইরের ঘরে বসে গল্প করচে, মেলা লোক দেখা করতে এসেচে কিনা তাই।...

রানী দুই হাতের তালুর মধ্যে কাজলের সুন্দর মুখখানা লইয়া আদরের সুরে বলিল—খোকন, খোকন ঠিক বাবার মত দেখতে—চোখ দুটি অবিকল। তোমার বাবাকে এ পাড়ায় ডেকে নিয়ে এসো খোকন। বলগে রাণুপিসি ডাকচে।

সন্ধ্যার আগেই ছেলের হাত ধরিয়া অপু রানীদের বাড়ি ঢুকিয়া বলিল—কোথায় গেলে রাণুদি, চিনতে পার?...রাণু ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল অবাক হইয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল—মনে করে যে এলি এতকাল পরে?—তা ও-পাড়ায় গিয়ে উঠলি কেন? গাঙ্গুলীরা আপনার লোক হ'ল তোর?...পরে লীলাদির মত সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

কি অদ্ভুত পরিবর্তন! অপুও অবাক হইয়া দেখিতেছিল, চৌদ্দ বছরের সে বালিকা রাণুদি কোথায়! বিধবার বেশ, বাল্যের সে লাবণ্যের কোনও চিহ্ন না থাকিলেও রানী এখনও সুন্দরী। কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, শৈশব-সঙ্গিনী রাণুদির সঙ্গে ইহার মিল কোথায়?...এই সেই রাণুদি!...

সে কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য হইল ইহাদের বাড়িটার পরিবর্তন দেখিয়া ভুবন মুখুয্যেরা ছিলেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, ছেলেবেলার সে আট-দশটা গোলা প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, গরুবাছুর, লোকজনের কিছু নাই। চণ্ডীমণ্ডপের ভিটা মাত্র পড়িয়া আছে, পশ্চিমের কোঠা ভাঙিয়া কাহারা ইট লইয়া গিয়াছে—বাড়িটার ভাঙা, ধ্বসা, ছন্নছাড়া চেহারা, এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন?

রানী সজলচোখে বলিল—দেখছিস্ কি, কিছু নেই আর। মা বাবা মারা গেলেন, টুনু, খুড়ীমা এঁরাও গেলেন, সতুর মা-ও মারা গেল, সতু মানুষ হ'ল না তো, এতদিন বিষয় বেচে বেচে চালাচ্ছে। আমরাও—

অপু বলিল—হ্যাঁ, লীলাদের কাছে সব শুনলাম সেদিন কাশীতে—

—কাশীতে? দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর? কবে—কবে?...

পরে অপুর মুখে সব শুনিয়া সে ভারী খুশী হইল। দিদি আসিতেছে তাহা হইলে? কতকাল দেখা হয় নাই।

রানী বলিল—বৌ কোথায় ? বাসায়—তোর কাছে ?

অপু হাসিয়া বলিল—স্বর্গে ।

—ও আমার কপাল ! কত দিন ? বিয়ে করিস নি আর ?···

সেই দিনই আবার বৈকালে চড়ক । আর তেমন জাঁকজমক হয় না, চড়ক গাছ পুঁতিয়া কেহ ঘুরপাক খায় না । সে বাল্যমন কোথায়, মেলা দেখার অধীর আনন্দে ছুটিয়া যাওয়া—সে মনটা আর নাই. কেবল সে-সব অর্থহীন আশা, উৎসাহ, অপূর্ব অনুভূতির স্মৃতিটা মাত্র আছে । এখন যেন সে দর্শক আর বিচারক মাত্র. চব্বিশ বৎসরে মনটা কেমন বদলাইয়া গিয়াছে, বাড়িয়াছে—তাহারই একটা মাপ-কাটি আজ খুঁজিয়া পাইয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল । চড়কতলায় পুরানো আমলের কত পরিচিত বন্ধু নাই, নিবারণ গোয়ালা লাঠি খেলিত, ক্ষেত্র কাপালী বহুরূপীর সাজ দিত, হারাণ মাল বাঁশের বাঁশি বাজাইয়া বিক্রয় করিত, ইহারা কেহ আর নাই, কেবল পুরাতনের সঙ্গে একটা যোগ এখনও আছে। চিনিবাস বৈরাগী এখনও তেলেভাজা খাবারের দোকান করে ।

আজ চব্বিশ বছর আগে এই চড়কের মেলার পরদিনই তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—তারপর কত ঘটনা. কত দুঃখ বিপদ, কত নূতন বন্ধুবান্ধব সব, গোটা জীবনটাই—কিন্তু কেমন করিয়া এত পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও সেই দিনটির অনুভূতিগুলির স্মৃতি এত সজীব. টাট্‌কা, তাজা অবস্থায় আজ আবার ফিরিয়া আসিল !

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চড়কের মেলা দেখিয়া হাসিমুখে ছেলেমেয়েরা ফিরিয়া যাইতেছে. কারও হাতে বাঁশের বাঁশি, কারও হাতে মাটির রং করা ছোবা পালকি । একদল গেল গাঙ্গুলী পাড়ার দিকে, একদল সোনাডাঙ্গা মাঠের মাটির পথ বাহিয়া, ছাতিমবনের তলায় ধুলজুড়ি মাধবপুরের খেয়াঘাটে—চব্বিশ বছর আগে যাহারা ছিল ছোট, এই রকম মেলা দেখিয়া ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে তেলেভাজা, জিবেগজা হাতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারা অনেকদিন বড় হইয়া নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—কেউ বা মারা গিয়াছে ; আজ তাহাদের ছেলেমেয়েদের দল ঠিক আবার তাহাই করিতেছে, মনে মনে আজিকার এই নিষ্পাপ দায়িত্বহীন জীবনকোরকগুলিকে সে আশীর্বাদ করিল ।

·

বৈশাখের প্রথমেই লীলা তার দেওরের সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরে আসিল। দুই বোনে অনেকদিন পরে দেখা, দুই জনে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। অপুকে

লীলা বলিল—তোর মনে যে এত ছিল, তা তখন কি জানি? তোর কল্যাণেই থাপের ভিটে আবার দেখলুম, কখনও আশা ছিল না যে আবার দেখব।

খোকার জন্য কাশী হইতে একরাশ খেলনা ও খাবার আনিয়াছে, মহা খুশীর সহিত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিল।

অপু বৈকালে ছেলেকে লইয়া নৌকায় খাবরাপোতার ঘাট পর্যন্ত বেড়াইতে গেল। তেঁতুলতলার ঘাটের পাশে দক্ষিণদেশের ঝিনুকতোলা বড় নৌকা বাঁধা ছিল, হাওয়ায় আলকাতরা ও গাবের রস মাখানো বড় ডিঙিগুলার শৈশবের সেই অতি পুরাতন বিস্মৃত গন্ধ···নদীর উত্তর পাড়ে ক্রমাগত নলবন, ওকড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ, ঢালু ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁইয়া আছে, মাঝে মাঝে ঝিঙে পটলের ক্ষেতে উত্তুরে মজুরেরা টোকা মাথায় নিড়ান দেয়, এক এক স্থানে নদীর জল ঘন কালো, নিথর, কলার পাটির মত সমতল—যেন মনে হয়, নদী এখানে গহন, গভীর, অতলস্পর্শ,—ফুলে ভরা উলুখড়ের মাঠ, আকন্দবন, ডাঁসা খেজুরের কাঁদি দুলানো খেজুর গাছ, উইঢিবি, বকের দল, উঁচু শিমুল ডালে চিলের বাসা—সবাইপুরের মাঠের দিক হইতে বড় এক ঝাঁক শামকুট পাখি মধুখালির বিলের দিকে গেল—একটা বাবলাগাছে অজস্র বন-ধুঁধুল ফল দুলিতে দেখিয়া খোকা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই দেখ বাবা, সেই যে কলকাতায় আমাদের গলির মোড়ে বিক্রী হয় গায়ে সাবান মাখবার জন্যে, কত ঝুলচে দেখ, ও কি ফল বাবা?

অপু কিন্তু নির্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। কতকাল সে এ সব দেখে নাই!··· পৃথিবীর এই মুক্ত রূপ তাহাকে যে আনন্দ দেয়, সে আনন্দ উগ্রবীর্য সুরার মত নেশার ঘোর আনে তাহার শিরার রক্তে, তাহা অভিভূত করিয়া ফেলে, আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা অবর্ণনীয়। ইহাদের যে গোপন বাণী শুধু তাহারই মনের কানে কানে, মুখে তাহা বলিয়া বুঝাইবে সে কাহাকে?

দূর গ্রামের জাওয়া-বাঁশের বন অস্ত-আকাশের রাঙা পটে অতিকায় লায়ার পাখির পুচ্ছের মত খাড়া হইয়া আছে,একধারে খুব উঁচু পাড়ে সারি-বাঁধা গাঙ্শালিকের গর্ত, কি অপূর্ব শ্যামলতা, কি সান্ধ্য-শ্রী!

কাজল বলিল – বেশ দেশ বাবা— না?

—তুই এখানে থাক খোকা—আমি যদি রেখে যাই এখানে, থাকতে পারবি নে? তোর পিসিমার কাছে থাকবি, কেমন তো?

কাজল বলিল—হ্যাঁ, ফেলে রেখে যাবে বৈ কি! আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

অপু ভাবিতেছিল শৈশবে এই ইছামতী ছিল তার কাছে কি অপূর্ব কল্পনায় ভরা! গ্রামের মধ্যের বর্ষাদিনের জলকাদা-ভরা পথঘাট, বাঁশপাতা পচা আঁটাল মাটির গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাইয়া সে মুক্ত আকাশের তলে নদীর ধারটিতে আসিয়া বসিত। কত বড় নৌকা ওর ওপর দিয়া দূর দেশে চলিয়া যাইত। কোথায় ঝালকাটি, কোথায় বরিশাল, কোথায় রায়মঙ্গল—অজানা দেশের কল্পনায় মুগ্ধ মনে কতদিন সে না ভাবিয়াছে, সেও একদিন ওই রকম নেপাল মাঝির বড় ডিঙিটা করিয়া নিরুদ্দেশ বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইয়া যাইবে।

ইছামতী ছিল পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মা। তার তীরের আকাশে-বাতাসের সঙ্গীত মায়ের মুখের ঘুম-পাড়ানি গানের মত শত স্নেহে তার নব-মুকুলিত কাঁচ মনকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, তার তীরে সে সময়ের কত আকাঙ্ক্ষা, বৈচিত্র্য, রোমান্স,—তার তীর ছিল দূরের অদেখা বিদেশ, বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে-কূলে ভরা ঢলঢল গৈরিক রূপে সে অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখিত—ইংরাজী বই-এ পড়া Cape Nun-এর ওদিকের দেশটা—যে দেশ হইতে লোক আর ফেরে না—He who passes Cape Nun, will either return or not—মুগ্ধচোখে কূলছাপানো ইছামতী দেখিয়া তখন সে ভাবিত—ওঃ, কত বড় আমাদের এই গাঙটা!···

এখন সে আর বালক নাই, কত বড় বড় নদীর দুকূল-ছাপানো লীলা দেখিয়াছে—গঙ্গা, শোণ, বড়দল, নর্মদা—তাদের অপূর্ব সন্ধ্যা, অপূর্ব বর্ণসম্ভার দেখিয়াছে—সে বৈচিত্র্য, সে প্রখরতা ইছামতীর নাই, এখন তার চোখে ইছামতী ছোট নদী। এখন সে বুঝিয়াছে তার গরীব ঘরের মা উৎসব-দিনের বেশভূষায় তার শৈশব-কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া দিত, এসব বনেদী বড় ঘরের মেয়েদের হীরামুক্তার ঘটা, বারানসী শাড়ির রংঢং-এর কাছে তার মায়ের সেই কাচের চুড়ি, শাঁখা কিছুই নয়।

কিন্তু তা বলিয়া ইছামতীকে সে কি কখনো ভুলিবে?

দুপুরে সে ঘরে থাকিতে পারে না। এই চৈত্রদুপুরের রোদের উষ্ণ নিঃশ্বাস কত পরিচিত গন্ধ বহিয়া আনে—শুক্‌নো বাঁশের খোলার, ফুটন্ত ঘেঁটুবনের, ঝরা পাতার, সোঁদা সোঁদা রোদপোড়া মাটির, নিম ফুলের, আরও কত কি কত কি,—বাল্যে এই সব দুপুর তাকে ও তাহার দিদিকে পাগল করিয়া দিয়া টো টো করিয়া শুধু মাঠে, বাগানে, বাঁশতলায়, নদীর ধারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত—

আজও সেই রকমই পাগল করিয়া দিল। গ্রামসুদ্ধ সবাই দুপুরে ঘুমায়—সে একা বাহির হয়—উদ্‌ভ্রান্তের মত মাঠের ঘেঁটুফুলে ভরা উঁচু ডাঙায়, পথে পথে নিঝুম দুপুরে বেড়াইয়া ফেরে—কিন্তু তবু মনে হয়, বাল্যের স্মৃতিতে যতটা আনন্দ পাইতেছে, বর্তমানের আসল আনন্দ সে ধরণের নয়—আনন্দ আছে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে দেবদেবীরা নিশ্চিন্দিপুরে বাঁশবনের ছায়ায় এই সব দুপুরে নামিয়া আসিতেন। এক একদিন সে নদীর ধারের সুগন্ধ তৃণভূমিতে চুপ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিছুই করে না, রৌদ্রভরা নীল আকাশটার দিকে চাহিয়া শুধু চুপ করিয়া থাকে—কিছু ভাবেও না···সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবাইয়া মনে মনে বলে—ওগো মাতৃভূমি, তুমি ছেলেবেলায় যে অমৃতদানে মানুষ করেছিলে, সেই অমৃত হ'ল আমার জীবন-পথের পাথেয়—তোমার বনের ছায়ায় আমার সকল স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল একদিন, তুমি আবার শক্তি দাও, হে শক্তিরূপিণী!

দুঃখ হয় কলিকাতার ছাত্রটির জন্য। এদের বাপের বাড়ি বৌবাজারে, মামার বাড়ি পটুয়াটোলায়, পিসির বাড়ি বাগবাজারে—বাংলাদেশকে দেখিল না কখনও। এরা কি মাধবপুর গ্রামের উলুখড়ের মাঠের ওপারের আকাশে রং-ধরা দেখিল? স্তব্ধ শরৎ-দুপুরের ঘন বনানীর মধ্যে ঘুঘুর ডাক শুনিয়াছে? বন-অপরাজিতা ফুলের নীরব মহোৎসব এদের শিশু-আত্মায় তার আনন্দের স্পর্শ দিয়াছে কোনও কালে? ছোট্ট মাটির ঘরের দাওয়ায় আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া নারিকেল পত্র-শাখায় জ্যোৎস্নার কাঁপন দেখে নাই কখনও—এরা অতি হতভাগ্য।

রাণীর যত্নে আদরে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সতুদের বাড়ির সে-ই আজকাল কর্ত্রী, নিজের ছেলেমেয়ে হয় নাই, ভাইপোদের মানুষ করে। অপুকে রানী বাড়িতে আনিয়া রাখিল,—কাজলকে দু'দিনে এমন আপন করিয়া লইয়া ফেলিয়াছে যে, সে পিসিমা বলিতে অজ্ঞান। রানীর মনে মনে ধারণা, অপু শহরে থাকে যখন, তখন খুব চায়ের ভক্ত,—দু'টি বেলা ঠিক সময়ে চা দিবার জন্য তাহার প্রাণপণ চেষ্টা। চায়ের কোন সরঞ্জাম ছিল না, লুকাইয়া নিজের পয়সায় সতুকে দিয়া নবাবগঞ্জের বাজার হইতে চায়ের ডিস্ পেয়ালা আনাইয়া লইয়াছে—অপু চা তেমন খায় না কখনও, কিন্তু এখানে সে সে-কথা বলে না। ভাবে—যত্ন করছে রাণুদি, করুক না। এমন যত্ন আর জুটবে কোথাও? তুমিও যেমন!

দুপুরে একদিন খাইতে বসিয়া অপু চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে।

রানীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল— একটা বড় চমৎকার ব্যাপার হ'ল— দেখো, এই টকে-যাওয়া এ'চড়-চচ্চাড় কতকাল খাই নি—নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে আর কখনও নয়— তাই মুখে দিয়েই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল রাণুদি—

রাণুদি বোঝে এসব কথা—তাই রাণুদির কাছে বলিয়াও সুখ।

এ কয়দিন আকাশটা ছিল মেঘ-মেঘ। কিন্তু হঠাৎ কখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে সে জানে না—বৈকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া সে অবাক চোখে চুপ করিয়া বাহিরের রোয়াকে বসিয়া রহিল—বাল্যের সেই অপূর্ব বৈকাল—যাহার জন্য প্রথম প্রথম বিরহী বালক-মন কত হাঁপাইয়াছে বিদেশে, ক্রমে একটা অস্পষ্ট মধুর স্মৃতিমাত্র মনে আঁকিয়া রাখিয়া যেটা কবে মন হইতে বেমালুম অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল—

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় এই সব সময়ে ঘুম ভাঙিয়া তাহার মনটা কেমন অকারণে খারাপ হইত—এক একদিন এমন কান্না আসিত, বিছানায় বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিত—তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলিত—ও-ওই উড়ে গেল—ও-ও ওই!···কেঁদো না খোকা, বাইরে এসে পাখি দেখসে। আহা-হা, তোমার বড় দুখ্খু খোকন—তোমার নাতি মরেছে, পুতি মরেছে, সাত ডিঙে ধন-সুমুদ্দুরে ডুবে গিয়েছে, তোমার বড় দুখ্খু—কেঁদো না কেঁদো না, আহা হা!···

রানী পাতকুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিতে যাইতেছে, অপু বলিল—মনে পড়ে রাণুদি, এই উঠানে এমন সব বিকেলে বৌ-চুরি খেলা খেলতুম কত, তুমি, আমি, দিদি, সতু, নেড়া— ?

রানী বলিল—আহা, তাই বুঝি ভাবচিস্ বসে বসে! কত মালা গাঁথতুম মনে আছে বকুলতলায়? সারাদিন বকুলতলাতেই পড়ে আছি, আমি, দুগ্গা—আজকাল ছেলেমেয়েরা আর মালা গাঁথে না, বকুল ফুলও আর তেমন পড়ে থাকে না—কালে কালে সবই যাচ্চে।

কিছু পরে জল লইয়া ফিরিবার সময়ে বলিল—এক কাজ কর না কেন অপু, সতু তো তোদের নীলমণি জ্যাঠার দরুন জমাটা ছেড়ে দেবে, তুই কেন গিয়ে বাগানটা নিগে যা না? তোদেরই তো ছিল—ও যা, নিজের জমি-জমাই বিক্রী ক'রে ফেললে সব, তা আবার জমার বাগান রাখবে—নিবি তুই?

অপু বলিল,—মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল, রাণুদি। মরবার কিছুদিন আগেও বলত বড় হ'লে বাগানখানা নিস্ অপু। আমার আপত্তি নেই, যা দাম হবে

আমি দেব।

প্রতি সন্ধ্যায় সতুদের রোয়াকে মাদুর পাতা হয়, রানী, লীলা, অপু, ছেলেপিলেদের মজলিস বসে। সতুও যোগ দেয়, তবে তামাকের দোকান বন্ধ করিয়া আসিতে তাহার রাত হইয়া যায়। অপু বলে—আচ্ছা, আজকাল তোমরা ঘাটের পথে ষাঁড়াতলায় পিঠে দাও না রাণুদি? কই সেই ষাঁড়াগাছটা তো নেই সেখানে? রানী বলে—সেটা মরে গিয়েছে—তার পাশেই একটা চারা, দেখিস নি সিঁদুর দেওয়া আছে?···নানা পুরানো কথা হয়। অপু জিজ্ঞাসা করে—ছেলেবেলায় একবার পঙ্গপালের দল এসেছিল, মনে আছে লীলাদি?···গ্রামের একটি বিধবা যখন নববধূরূপে এ গ্রামে প্রথম আসেন, অপু তখন ছেলেমানুষ। তিনিও সন্ধ্যার পরে এ বাড়িতে আসেন। অপু বলে—খুড়ীমা, আপনি নতুন এসে কোথায় দুধে-আলতার পাথরে দাঁড়িয়েছিলেন মনে আছে আপনার? বিধবাটি বললেন—সে সব কি আর এ জন্মের কথা, বাবা? সে সব কি আর মনে আছে?

অপু বলে—আমি বলি শুনুন, আপনাদের দক্ষিণের উঠোনে যে নিচু গোয়ালঘরটা ছিল, তারই ঠিক সামনে। বিধবা মেয়েটি আশ্চর্য হইয়া বলেন—ঠিক, ঠিক, এখন মনে পড়েছে, এত দিনের কথা তোমার মনে আছে বাবা!

তাঁদেরই বাড়ির আর এক বিবাহে কোথা হইতে তাঁদের এক কুটুম্বিনী আসেন, খুব সুন্দরী—এতকাল পর তাঁর কথা উঠে। সবাই তাকে দেখিয়াছিল সে সময়, কিন্তু নামটা কাহারও মনে নেই এখন। অপু বলে—দাঁড়াও রাণুদি, নাম বলছি—তার নাম সুবাসিনী। সবাই আশ্চর্য হইয়া যায়। লীলা বলে—তোর তখন বয়েস আট কি নয়, তোর মনে আছে তার নাম?—ঠিক, সুবাসিনীই বটে। সবারই মনে পড়ে নামটা। অপু মৃদু মৃদু হাসিমুখে বলে—আরও বলছি শোনো, ডুরে শাড়ি পরত, রাঙা জমির ওপর ডুরে দেওয়া—না? বিধবা বধূটি বলেন, ধন্যি বাপু যা হোক্, রাঙা ডুরে পরত ঠিকই, বয়েস ছিল বাইশ-তেইশ। তখন তোমার বয়েস বছর আস্টেক হবে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগেকার কথা যে!

অপুর খুব মনে আছে, অত সুন্দরী মেয়ে তাদের গাঁয়ে আর আসে নাই ছেলেবেলায়। সে বলিল—রাঙা শাড়ি পরে আমাদের উঠোনের কাঁঠালতলায় জল সইতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখনও।

এখানকার বৈকালগুলি সত্যই অপূর্ব। এত জায়গায় তো সে বেড়াইল, মাসখানেক এখানে থাকিয়া মনে হইল এমন বৈকাল সে কোথাও দেখে নাই।

বিশেষ করিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন এই বৈকালগুলিতে সূর্য যেদিন অস্ত যাইবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোটুকু পর্যন্ত বড় গাছের মগডালে, বাঁশঝাড়ের আগায় হাল্কা সিঁদুরের রং মাখাইয়া দেয়, সেদিনের বৈকাল। এমন বিল্বফুলের অপূর্ব সুরভি-মাখানো, এমন পাখি-ডাকা উদাস বৈকাল—কোথায় এর তুলনা? এত বেলগাছও কি এদেশটায়, ঘাটে, পথে, এ-পাড়া, ও-পাড়া, সর্বত্র বিল্বফুলের সুগন্ধ।

একদিন—জ্যৈষ্ঠের প্রথমটা, বৈকালে আকাশ অন্ধকার করিয়া ঈশান কোণ হইতে কালবৈশাখীর মেঘ উঠিল, তারপরেই খুব ঝড়, এ বছরের প্রথম কালবৈশাখী। অপু আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—তাদের পোড়োভিটার বাঁশবনের মাথার উপরকার দৃশ্যটা কি সুপরিচিত! বাল্যে এই মাথাদুলানো বাঁশঝাড়ের উপরকারের নীলকৃষ্ণ মেঘসজ্জা মনে কেমন সব অনতিস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইত, কত কথা যেন বলিতে চাহিত, আজও সেই মেঘ, সেই বাঁশবন, সেই বৈকাল সবই আছে, কিন্তু সে অপূর্ব জগৎটা আর নাই। এখন যা আনন্দ সে শুধু স্মৃতির আনন্দ মাত্র। এবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া অবধি সে ইহা লক্ষ্য করিতেছে—এই বন, এই দুপুর, এই গভীর রাত্রে চৌকিদারের হাঁকুনি, কি লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের সঙ্গে এক অপূর্ব স্বপ্ন-মাখানো ছিল, দিগন্তরেখার ওপারের এক রহস্যময় কল্পলোক তখন সদাসর্বদা হাতছানি দিয়া আহ্বান করিত—তাদের সন্ধান আর মেলে না।

সে পাখির দল মরিয়া গিয়াছে, তেমন দুপুর আর হয় না; যে চাঁদ এমন বৈশাখীরাত্রে খড়ের ঘরের দাওয়ার ধারের নারিকেল পত্রশাখায় জ্যোৎস্নার কম্পন আনিয়া এক ক্ষুদ্র কল্পনাপ্রবণ গ্রাম্য বালকের মনে মূলহীন, কারণহীন আনন্দের বান ডাকাইত, সে সব চাঁদ নিভিয়া গিয়াছে। সে বালকটিই বা কোথায়? পঁচিশ বৎসর আগেকার এক দুপুরে বাপ-মায়ের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফেরে নাই, জাওয়া-বাঁশের বনের পথে তার ছোট ছোট পায়ের দাগ অস্পষ্ট হইয়া মুছিয়া গিয়াছে বহুদিন।

তার ও তার দিদির সে সব আশা পূর্ণ হইয়াছিল কি?

হায় অবোধ বালক-বালিকা!···

রোজ রোজ বৈকালে মেঘ হয়, ঝড় ওঠে। অপু বলে, রাণুদি, আম কুড়িয়ে আনি? রানী হাসে। অপু ছেলেকে লইয়া নতুন-কেনা বাগানে আসিয়া দাঁড়ায়—সবাইকে আম কুড়াইতে ডাকে, কাহাকেও বাধা দেয় না। বাল্যের সেই পটুলে,

তেঁতুলতলী, নেকো, বাঁশতলা,—ঘন মেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার তো আবাল-বৃদ্ধবনিতা ধামা হাতে আম কুড়াইতে আসে। অপু ভাবে, আহা, জীবনে এই এদের কত আনন্দের কত সার্থকতার জিনিস। চারিধারে চাহিয়া দেখে, সমস্ত বাগানের তলাটা ধাবমান, কৌতুকপর, চীৎকাররত বালক-বালিকাতে ভরিয়া গিয়াছে!

দিদি দুর্গা, ছোট্ট মেয়েটি, এই কাজলের চেয়ে কিছু বড়, পরের বাগানে আম কুড়াইবার অপরাধে বকুনি খাওয়া কৃত্রিম উল্লাসভরা হাসিমুখে একদিন ওই ফণি-মনসার ঝোপের পাশের বেড়াটা গলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল—বহুকালের কথাটা।

অপু কি করিবে আমবাগানে? এই সব গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা সাধ মিটাইয়া আম কুড়াইবে এ বাগানে, কেহ তাহাদের বারণ করিবার থাকিবে না, বকিবার থাকিবে না, অপমান করিবার থাকিবে না. ফণিমনসার ঝোপের আড়ালে অপমানিতা ছোট্ট খুকীটি ধুলামাখা আঁচল গুছাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু তৃপ্তির হাসি হাসিবে···

এত দিন এখানে আসিলেও নিজেদের ভিটাটাতে ঢুকিতে পারে নাই, যদিও বাহির হইতে সেটা প্রতিদিনই দেখিত; কারণ ঘাটের পথটা তার পাশ দিয়াই। বৈকালের দিকে সে একদিন একা চুপি চুপি বনজঙ্গল ঠেলিয়া সেখানে ঢুকিল। বাড়িটা আর নাই, পড়িয়া ইট স্তূপাকার হইয়া আছে—লতাপাতা, শ্যাওড়াবন, বনচালতার গাছ, ছেলেবেলাকার মত কালমেঘের জঙ্গল। পিছনের বাঁশঝাড়গুলা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাড়িয়া চারিধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কোনও ঘরের চিহ্ন নাই, বন জঙ্গল, রাঙা রোদ বাঁশের মগডালে। পশ্চিমের পাঁচিলের গায়ে সেই কুলুঙ্গিটা আজও আছে, ছেলেবেলায় যে কুলুঙ্গিটাতে সে ভাঁটা, বাতাবীলেবুর বল, কড়ি রাখিত। এত নিচু কুলুঙ্গিটা তখন কত উঁচু বলিয়া মনে হইত, তাহার মাথা ছাড়াইয়া উঁচু ছিল, ডিঙ্গাইয়া দাঁড়াইলে তবে নাগাল পাওয়া যাইত! ঠেসদেওয়ালের গায়ে ছুরি দিয়া ছেলেবেলায় একটা ভূত আঁকিয়াছিল, সেটা এখনও আছে। পাশেই নীলমণি জ্যাঠামশায়ের পোড়োভিটা —সেও ঘন বনে ভরা, চারিধার নিঃশব্দ, নির্জন—এ পাড়াটাই জনহীন হইয়া গিয়াছে, এধার দিয়া লোকজনের যাতায়াত বড় কম। এই সে স্থানটি, কতকাল আগে যেখানে দিদি ও সে একদিন চড়ুইভাতি করিয়াছিল! কণ্টকাকীর্ণ শেঁয়াকুল বনে দুর্গম দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িয়াছে সারা জায়গাটা। পোড়ো ভিটার সে

বেলগাছটা—একদিন যার তলায় ভীষ্মদেব শরশয্যা পাতিতেন তাহার নয় বৎসরের শৈশবে—সেটা এখনও আছে, পুষ্পিত শাখা-প্রশাখার অপূর্ব সুবাসে অপরাহ্নের বাতাস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

পাঁচিলের ঘুলঘুলিটা কত নিচু বলিয়া মনে হইতেছে, এইটাতেই অপু আশ্চর্য হইল—বার বার কথাটা তার মনে হইতেছিল। কত ছোট ছিল সে তখন! খোকার মত অতটুকু বোধ হয়।

কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই কি লতার গন্ধ বাহির হইতেছে!…কতদিন গন্ধটা মনে ছিল না, বিদেশে আর সব কথা হয়ত মনে পড়িতে পারে, কিন্তু পুরাতন দিনের গন্ধগুলা তো মনে পড়ে না—

এ অভিজ্ঞতাটা অপুর এতদিন ছিল না! সেদিন বাঁওড়ের ধারে বেড়াইতে গিয়া পাকা বটফলের গন্ধে অনেকদিনের একটা স্মৃতি মনে উদয় হইয়াছিল—ছোট্ট কাচের পরকলা বসানো মোমবাতির সেকেলে লণ্ঠন হাতে তাহার বাবা শশী যোগীর দোকানে আলকাতরা কিনিতে আসিয়াছে—সেও আসিয়াছে বাবার কাঁধে চড়িয়া বাবার সঙ্গে—কাচের লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো, আধ-অন্ধকার বাঁশবন, বাঁওড় হইতে নাল ফুল তুলিয়া বাবা তাহার হাতে দিয়াছে—কোন্ শৈশবের অস্পষ্ট ছবিটা, অবাস্তব, ধোঁয়া-ধোঁয়া! পাকা বটফলের গন্ধে কতকাল পরে তাহার সেই অত্যন্ত শৈশবের একটা সন্ধ্যা আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল সেদিন।

পোড়োভিটার সীমানায় প্রকাণ্ড একটা খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি ডাঁসা খেজুর ঝুলিতেছে—এটা সেই চারা খেজুর গাছটা, দিদি যার ডাল কাটারি দিয়া কাটিয়া গোড়ার দিকে দড়ি বাঁধিয়া খেলাঘরের গরু করিত—কত বড় ও উঁচু হইয়া গিয়াছে গাছটা!

এইখানে খিড়কীদোরটা ছিল, চিহ্নও নাই কোনও! এইখানে দাঁড়াইয়া দিদির চুরি-করা সেই সোনার কৌটাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল একদিন। কত সুপরিচিত জিনিস এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আজও আছে! রাঙী গাইয়ের বিচালি খাওয়ার মাটির নাদাটা কাঁঠালতলায় বাঁশপাতা ও মাটি বোঝাই হইয়া এখনও পড়িয়া আছে। ছেলেবেলায় ঠেসদেওয়াল গাঁথার জন্য বাবা মজুর দিয়া এক জায়গায় ইট জড় করিয়া রাখিয়াছিলেন…অর্থাভাবে গাঁথা হয় নাই। ইটগুলা এখনও বাঁশবনের ছায়ায় তেমনি পড়িয়া আছে। কতকাল আগে মা তাকের উপর জলদানে পাওয়া মেটে কলসী তুলিয়া রাখিয়াছিল, সংসারের প্রয়োজনের জন্য—পড়িয়া মাটিতে অর্ধপ্রোথিত হইয়া আছে। সকলের অপেক্ষা

সে যেন অবাক হইয়া গেল···পাঁচিলের সেই ঘুলঘুলিটা আজও নতুন অবিকৃত অবস্থায় দেখিয়া—বালিচুণ একটুও খসে নাই, যেন কালকের তৈরী—এই জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কি হইবে ও কুলুঙ্গিতে ?

খিড়কীদোরের পাশে উঁচু জমিটাতে মায়ের হাতে পোঁতা সজনে গাছ এখনও আছে। যাইবার বছরখানেক আগে মাত্র মা ডালটা পুঁতিয়াছিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গাছটা বাড়িয়া বুড়া হইয়া গিয়াছে—ফল খাইতে আর কেহ আসে নাই—জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়া আছে এতকাল—অপরাহ্নের রাঙা রোদ গাছটার গায়ে পড়িয়া কি উদাস, বিষাদমাখা দৃশ্যটা ফুটাইয়াছে যে !···ছায়া ঘন হইয়া আসে, কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই লতাটার গন্ধ আরও ঘন হয়—অপুর শরীর যেন শিহরিয়া ওঠে—এ গন্ধ তো শুধু গন্ধ নয়—এই অপরাহ্ন, এই গন্ধের সঙ্গে জড়ানো আছে মায়ের কত রাত্রের আদরের ডাক, দিদির কত কথা, বাবার পদাবলী গানের সুর, বাল্যের ঘরকন্নার সুধাময় দারিদ্র্য—কত কি—কত কি—

ঘন বনে ঘুঘু ডাকে, ঘুঘু—ঘু—

সে অবাক্ চোখে রাঙ্গারোদ-মাখানো সজনে গাছটার দিকে আবার চায়—মনে হয় এ বন, এ স্তূপাকার ইটের রাশি, এ সব স্বপ্ন—এখনি মা ঘাট হইতে সন্ধ্যায় গা ধুইয়া ফিরিয়া ফরসা কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড়খানা উঠানের বাঁশের আলনায় মেলিয়া দিবে, তারপরে প্রদীপ হাতে সন্ধ্যা দিতে দিতে তাহাকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিবে—এত সন্ধ্যে ক'রে বাড়ি ফিরলি অপু ?

ভিটার চারিদিকে খোলামকুচি, ভাঙা কলসী ; কত কি ছড়ানো—ঠাকুরমায়ের পোড়োভিটাতে তো পা রাখিবার স্থান নাই, বৃষ্টির ধোয়াটে কতদিনের ভাঙা খাপ্রা, খোলামকুচি বাহির হইয়াছে। এগুলি অপুকে বড় মুগ্ধ করিল, সে হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতদিনের গৃহস্থ-জীবনের সুখ-দুঃখ এগুলোর সঙ্গে জড়ানো! মা পিছনের বাঁশবনে এক জায়গায় সংসারের হাঁড়িকুড়ি ফেলিত, সেগুলি এখনও সেইখানেই আছে। একটা আস্কে-পিঠে গড়িবার মাটির মুচি এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। অপু অবাক হইয়া ভাবে, কোন্ আনন্দ-ভরা শৈশব-সন্ধ্যার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ছিল না জানি! উঠানের মাটির খোলামকুচির মধ্যে সবুজ কাচের চুড়ির টুকরা পাওয়া গেল। হয়ত তার দিদির হাতের চুড়ির টুকরা!—এ ধরণের চুড়ি ছোট মেয়েরাই পরে—টুকরাটা সে হাতে তুলিয়া লইল। এক জায়গায় আধখানা বোতল ভাঙা—ছেলেবেলায় এ ধরণের বোতলে মা

নারিকেল তৈল রাখিত—হয়ত' সেটাই।

একটা দৃশ্য তাকে বড় মুগ্ধ করিল। তাদের রান্নাঘরের ভিটার ঠিক যে কোণে মা রাঁধিবার হাঁড়িকুড়ি রাখিত—সেখানে একখানা কড়া এখনও বসানো আছে, মরিচা ধরিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আংটা খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাটিতে বসিয়া যাওয়ার দরুন একটুও নড়ে নাই।

তাহারা যেদিন রান্না-খাওয়া সারিয়া এ গাঁ ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিল—আজ চব্বিশ বৎসর পূর্বে,মা এঁটো কড়াখানাকে ওখানেই বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল—কে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ওখানা ঠিক আছে এখনও।

কত কথা মনে ওঠে। একজন মানুষের অন্তরতম অন্তরের কাহিনী কি অন্য মানুষ বোঝে! বাহিরের মানুষের কাছে একটা জঙ্গলে-ভরা পোড়ো-ভিটা মাত্র—মশার ডিপো। তুচ্ছ জিনিস। কে বুঝিবে চব্বিশ বৎসর পূর্বের এক দরিদ্র ঘরের অবোধ বালকের জীবনের আনন্দ-মুহূর্তগুলির সহিত এ জায়গার কত যোগ ছিল?

ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার, তিন হাজার বছর কাটিয়া যাইবে—তখন এ গ্রাম লুপ্ত হইবে, ইছামতীই চলিয়া যাইবে, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সভ্যতা, নতুন ধরণের রাজনৈতিক অবস্থা—যাদের বিষয় এখন কল্পনা করিতেও কেহ সাহস করে না, তখন আসিবে জগতে। ইংরেজ জাতির কথা প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইবে, বর্তমান বাংলা ভাষাকে তখন হয়তো আর কেহ বুঝিবে না, একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়া সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ভাষা এদেশে প্রচলিত হইবে।

তখনও এই রকম বৈকাল, এই রকম কালবৈশাখী নামিবে তিন হাজার বর্ষ পরের বৈশাখ দিনের শেষে। তখনও এই রকম পাখি ডাকিবে, এই রকম চাঁদ উঠিবে। তখন কি কেহ ভাবিবে তিন হাজার বছর পূর্বের এক বিস্মৃত বৈশাখী বৈকালের এক গ্রাম্যবালকের ক্ষুদ্র জগৎটি এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব আনন্দে দুলিয়া উঠিত—এই স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ তার মনে কি আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিত? তিন হাজার বছরের প্রাচীন জ্যোৎস্না একদিন কোন্ মায়াস্বপ্ন তাহার শৈশব-মনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল? নিঃশব্দে শরৎ-দুপুরে বনপথে ক্রীড়ারত সে ক্ষুদ্র নয় বৎসরের বালকের মনের বিচিত্র অনুভূতিরাজির ইতিহাস কোথায় লেখা থাকিবে? কোথায় লেখা থাকিবে বিস্মৃত অতীতে তার সে সব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বিদেশ হইতে বহুদিন পরে বাড়ি ফিরিয়া মায়ের হাতে বেলের শরবৎ খাওয়ার সে মধুময় চৈত্র অপরাহ্ণটি, বাঁশ বনের ছায়ায় অপরাহ্ণের নিদ্রা ভাঙিয়া পাপিয়ার সে মনমাতানো ডাক, কোথায় লেখা থাকিবে

বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলির সে সব আনন্দ-কাহিনী।

দূর ভবিষ্যতের যেসব তরুণ বালকবালিকার মনে এই সব কালবৈশাখী নব আনন্দের বার্তা আনিবে, কোন্ পথে তারা আসিবে?

বাহির হইয়া আবার সে ফিরিয়া চাহিল।

সারা ভিটার উপর আসন্ন সন্ধ্যা এক অদ্ভুত, করুণামাখা ছায়া ফেলিয়াছে, মনে হয়, বাড়িটার এই অপূর্ব বৈকাল কাহার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিয়া করিয়া ক্লান্ত, জীর্ণ, অবসন্ন ও অনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে—আর সাড়া দেয় না, প্রাণ আর নাই।

বার বার করিয়া ঘুলঘুলিটার কথা মনে পড়িতেছিল। ঘুলঘুলি দুটা এত ভাল আছে এখনও, অথচ মানুষেরাই গেল চলিয়া!

সে নিশ্চিন্দিপুরও আর নাই। এখন যদি সে এখানে আবার বাসও করে সে অপূর্ব আনন্দ আর পাইবে না—এখন সে তুলনা করিতে শিখিয়াছে, সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে, ছেলেবেলায় যারা ছিল সাথী—এখন তাদের সঙ্গে আর অপুর কোনদিকেই মিশ খায় না—তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া আর সে সুখ নাই, তারা লেখাপড়া শিখে নাই, এই পঁচিশ বৎসরে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকেই কোথাও যায় নাই—সবারই পৈতৃক কিছু জমি-জমা আছে, তাহাই হইয়াছে তাদের কাল। তাদের মন, তাদের দৃষ্টি পঁচিশ বৎসর পূর্বের সেই বাল্যকালের কোঠায় আজও নিশ্চল।...কোন দিক হইতেই অপুর আর কোন যোগ নাই তাহাদের সহিত। বাল্যে কিন্তু এসব দৃষ্টি খোলে নাই—সব জিনিসের উপর একটা অপরিসীম নির্ভরতার ভাব ছিল—সব অবস্থাকেই মানিয়া লইত বিনা বিচারে। সত্যকার জীবন তখনই যাপন করিয়াছিল নিশ্চিন্দিপুরে।

তাহা ছাড়া বাল্যের সুপরিচিত ও অতি প্রিয় সাথীদের অনেকে বাঁচিয়া নাই বোষ্টম দাদু নাই, জ্যাঠাইমা—রাণুদির মা নাই, আশালতাদি বিবাহের পর মরিয়া গিয়াছে, পটু এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়া অন্য কোথায় বাস করিতেছে, নেড়া, রাজু রায়, প্রসন্ন গুরুমশায় কেহই আর নাই—স্বামী মারা যাওয়ার পরে গোকুলের বউ খুড়িমাকে তাহার ভাই আসিয়া লইয়া গিয়াছে—দশ বারো বৎসর তিনি এখানে আসেন নাই, বাঁচিয়া আছেন কিনা কেহ জানে না।

তবু মেয়েদের ভাল লাগে। রাণুদি, ও-বাড়ির খুড়িমা, রাজলক্ষ্মী, লীলাদি, এরা স্নেহে, প্রেমে, দুঃখে শোকে যেন অনেক বাড়িয়াছে, এতকাল পরে অপুকে পাইয়া ইহারা সকলেই খুশী, কথায় কাজে এদের ব্যবহার মধুর ও

অকপট। পুরাতন দিনের কথা এদের সহিত কহিয়া সুখ আছে—বহুকালের খুঁটিনাটি কথাও মনে রহিয়াছে—হয়তো বা জীবনের পরিধি ইহাদের সংকীর্ণ বলিয়াই, ক্ষুদ্র বলিয়াই এতটুকু তুচ্ছ জিনিসও আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে।

আজ সে একথা বুঝিয়াছে, জীবনে অনবরত বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিতে হইয়াছিল বলিয়াই আজ সে যাহা পাইয়াছে—এখানে পৈতৃক জমি-জমার মালিক হইয়া নির্ভাবনায় বসিয়া থাকিলে তাহা পাইত না। আজ যদি সে বিদেশে যায়, সমুদ্রপারে যায়—যে চোখ লইয়া সে যাইবে, নিশ্চিন্দিপুরে গত পঁচিশ বৎসর নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিলে সে চোখ খুলিত না। একদিন নিশ্চিন্দিপুরকে যেমন সে সুখ-দুঃখ দ্বারা অর্জন করিয়াছিল—আজ তেমনি সুখ-দুঃখ দিয়া বাহিরকে অর্জন করিয়াছে।

নদীতে গা ধুইতে গিয়া নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এই সব কথাই সে ভাবিতেছিল। সারাদিনটা আজ গুমট গরম, প্রতিপদ তিথি—কাল গিয়াছে পূর্ণিমা। আজ এখনি জ্যোৎস্না উঠিবে।

এই নদীতে ছেলেবেলায় যে-সব বধূ জল লইতে আসিত, তারা এখন প্রৌঢ়া, কত নাইও—মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে, যে-সব কোকিল সেই ছেলেবেলাকার রাম-নবমী দিনের পুলকমুহূর্তগুলি ভরাইয়া দুপুরে কু কু ডাক দিত, কচিপাতা-ওঠা বাঁশবনে তাদের ছেলেমেয়েরা আবার তেমনি গায়।

শুধু তাহার দিদি শুইয়া আছে। রায়পাড়ার ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন ছাতিম গাছটার তলায় তাহাদের গ্রামের শ্মশান, সেখানে। সে-দিদির বয়স আর বাড়ে নাই, মুখের তারুণ্য বিলুপ্ত হয় নাই—তার কাচের চুড়ি, নাটাফলের পুঁটুলি অক্ষয় হইয়া আছে এখনও। প্রাণের গোপন অন্তরে যেখানে অপুর শৈশবকালের কাঁচা শিশুমনটি প্রবুদ্ধ জীবনের শত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উচ্চাশা ও কর্মস্তূপের নিচে চাপা পড়িয়া মরিয়া আছে—সেখানে সে চিরবালিকা, শৈশব জীবনের সে সমাধিতে জনহীন অন্ধকার রাত্রে সে-ই আসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলে—শিশু প্রাণের সাথীকে আবার খুঁজিয়া ফেরে।

আজ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া সাঁঝ-সকালে তার আশ্রয়স্থানটিতে সোনার সূর্য-কিরণ পড়ে। বর্ষাকালের নিশীথে মেঘ ঝর ঝর জল ঢালে, ফাল্গুন দিনে ঘেঁটুফুল, হেমন্ত দিনে ছাতিমফুল ফোটে। জ্যোৎস্না উঠে। কত পাখি গান গায়। সে এ সবই ভালবাসিত। এ সব ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই কোথাও।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একবার কলিকাতা আসিল—ফিরিতে কুড়ি পঁচিশ দিন দেরি হইয়া গেল—আষাঢ় মাসের শেষ, বর্ষা ইতিমধ্যে খুব পড়িয়াছিল, সম্প্রতি দু-একদিন একটু ধরিল, কখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দিন ঠাণ্ডা, কোনদিন বা সারাদিন খররৌদ্র।—

এই ক'দিনে দেশের চেহারা বদলাইয়াছে, গাছপালা আরও ঘন সবুজ, উঁচু গাছের মাথা হইতে কাঁচ মাকাল-লতা লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে—বাল্যের অতীব পরিচিত দৃশ্য, এখনও বউ-কথা-কও ডাকে, কিন্তু কোকিল ও পাপিয়া আর নাই—এখনও বনে সোঁদালি ফুলের ঝাড় অজস্র, কাঁচ পট্‌পটি ফলের থোলো বাঁধিয়াছে গাছে গাছে—কটু গন্ধ ঘেঁটকোল রোজ বেলাশেষে কোন্ ঝোপঝাপের অন্ধকারে ফোটে, ঘাটের পথে ফিরিবার সময় মেয়েরা নাকে কাপড় চাপা দেয়—কি পরিচিত, কি অপূর্ব ধরণের পরিচিত সবই, অথচ বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিল সবটা এতদিন।···বাহিরের মাঠ সবুজ হইয়াছে নবীন আউশ ধানে—এই সময় একদিন সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করিল।

খুব রৌদ্র, দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে, বেলা তিনটার কম নয়, অপু কি কাজে গ্রামের পিছনদিকের বনের পথ ধরিয়া যাইতেছিল। দুধারে বর্ষার বনঝোপ ঘন সবুজ, বাঁশবনে একটা কঞ্চি হইতে হলদে পাখি উড়িয়া আর একটা কঞ্চিতে বসিতেছে।

একটা জায়গায় ঘন বনের মধ্যে সুঁড়ি পথ, বড়গাছের পাতার ফাঁক দিয়া ঝলমলে পরিপূর্ণ রৌদ্র পড়িয়া কাঁচ, সবুজ পাতার রাশি স্বচ্ছ দেখাইতেছে, কেমন একটা অপূর্ব সুগন্ধ উঠিতেছে বনঝোপ হইতে—সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল সেদিকে চাহিয়াই।···তাহার সেই অপূর্ব শৈশব জগৎটা!

ঠিক এইরকম সুঁড়ি বনের পথ বাহিয়া এমনি রৌদ্রালোকিত ঘুঘুডাকা দীর্ঘ শ্রাবণ দিনে, দুপুর ঘুরিয়া বৈকাল আসিবার পূর্ব সময়টিতে সে ও দিদি চোখগেলকের বাসা, পাকা মাকালফল, মিষ্ট রাংচিতার ফল খুঁজিয়া বেড়াইত—দুপুর রোদের গন্ধমাখানো, কত লতা দোলানো, সেই রহস্যভরা, করুণ, মধুর আনন্দলোকটি।···মাইল বাহিয়া এ গতি নয়, সেখানে যাওয়ার যানবাহন নাই—পৃথিবীর কোথায় যেন একটি পথ আছে যাহা সময়ের বীথিতল বাহিয়া মানুষকে

লইয়া চলে তার অলক্ষিতে। ঘন ঝোপের ভিতর উঁকি মারিতেই চক্ষের নিমেষে তাহার ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের শৈশবলোকটিতে আবার সে ফিরিয়া গেল, যখন এই বন, এই নীল আকাশ, উজ্জ্বল আনন্দভরা এই রৌদ্রমাখানো শ্রাবণ দুপুরটাই ছিল জগতের সবটুকু—বাহিরের বিশ্বটা ছিল অজানা, সে সম্বন্ধে কিছু জানিতও না, ভাবিতও না—রঙে রঙে রঙীন রহস্যঘন সেই তার প্রাচীন দিনের জগৎটা···

এ যেন নবযৌবনের উৎস-মুখ, মন বার বার এর ধারায় স্নান করিয়া হারানো নবীনত্বকে ফিরিয়া পায়—গাছপালার সবুজ, রৌদ্রালোকের প্রাচুর্য, দুর্গাটুনটুনির অবাধ কাকলী—ঘন সুঁড়ি পথের দূরপারে শৈশবসঙ্গিনী দিদির ডাক যেন শুনা যায়।···

কতক্ষণ সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—বুঝাইবার ভাষা নাই, এ অনুভূতি মানুষকে বোবা করিয়া দেয়! অপুর চোখ ঝাপ্সা হইয়া আসিল—কোন্ দেবতা তার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন? তার নিশ্চিন্দিপুর আসা সার্থক হইল।

আজ মনে হইতেছে যৌবন তার স্বর্গের দেবতাদের মত অক্ষয়, অনন্ত··· সে জগৎটা আছে—তার মধ্যেই আছে। হয়তো কোনও বিশেষ পাখির গানের সুরে, কি কোনও বনফুলের গন্ধে শৈশবের সে হারানো জগৎটা আবার ফিরিবে। অপুর কাছে সেটা একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সৌন্দর্যের প্লাবন বহাইয়া ও মুক্তির বিচিত্র বার্তা বহন করিয়া তা আসে, যখনই আসে। কিন্তু ধ্যানে তাকে পাইতে হয়, শুধু অনুভূতিতেই সে রহস্য-লোকের সন্ধান মিলে।

তার ছেলে কাজল বর্তমানে সেই জগতের অধিবাসী। এজন্য ওর কল্পনাকে অপু সঞ্জীবিত রাখিতে প্রাণপণ করে—শক ও হূণের মত বৈষয়িকতা ও পাকাবুদ্ধির চাপে সে-সব সোনারস্বপ্নকে রূঢ়হস্তে কেহ পাছে ভাঙিয়া দেয়—তাই সে কাজলকে তার বৈষয়িক শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে সরাইয়া আনিয়াছে—নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনে, মাঠে, ফুলে ভরা বনঝোপে, নদীতীরের উলুখড়ের নির্জন চরে সেই অদৃশ্য জগৎটার সঙ্গে ওর সেই সংযোগ স্থাপিত হউক—যা একদিন বাল্যে তার নিজের একমাত্র পার্থিব ঐশ্বর্য ছিল···

নিশ্চিন্দিপুর
১০ই আষাঢ়

ভাই প্রণব,

অনেকদিন তোমার কোনো সংবাদ পাই নি, কোনো সন্ধানও জানতুম না, হঠাৎ সেদিন কাগজে দেখলুম তুমি আদালতে কম্যুনিজম নিয়ে এক বক্তৃতা দিয়েছ, তা থেকেই তোমার বর্তমান অবস্থা জানতে পারি।

তুমি জান না বোধ হয় আমি অনেকদিন পর আমার গ্রামে ফিরেছি। অবশ্য দু'দিনের জন্য, সে-সব কথা পরে লিখব। খোকাকেও এনেছি। সে তোমায় বড় মনে রেখেছে, তুমি ওর মাথায় জল দিয়ে বাতাস করে জ্বর সারিয়েছিলে সে-কথা ও এখনও ভোলে নি।

দেখ প্রণব, আজকাল আমার মনে হয়,—অনুভূতি, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন—এসবই জীবন! এবার এখানে এসে জীবনটাকে নতুন চোখে দেখতে পাই, এমন সুবিধে ও অবকাশ আর কোথাও হয় নি—এক নাগপুর ছাড়া! কত আনন্দের দিনের যাওয়া-আসা হ'ল জীবনে। যেদিনটিতে ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে প্রথম কুঠির মাঠ দেখতে যাই সরস্বতী পুজোর বিকেলে—যেদিন আমি ও দিদি রেলরাস্তা দেখতে ছুটে যাই—যেদিন বিয়ের আগের রাত্রে তোমার মামার বাড়ির ছাদটিতে বসেছিলুম সন্ধ্যায়,—জন্মাষ্টমীর তিমিরভরা বর্ষণসিক্ত রাত জেগে কাটিয়েছিলুম আমি ও অপর্ণা মনসাপোতার খড়ের ঘরে, জীবনের পথে এরাই তো আনন্দের অক্ষয় পাথেয়—যে আনন্দ অর্থের উপর নির্ভর করে না, ঐশ্বর্যের ওপর নির্ভর করে না, মান-সম্মান বা সাফল্যের উপরও নির্ভর করে না, যা সূর্যের কিরণের মত অকৃপণ, অপক্ষপাতী, উদার, ধনী-দরিদ্র বিচার করে না, উপকরণের স্বল্পতা বা বাহুল্যের উপর নির্ভর করে না। বড়লোকের মেয়েরা নতুন মোটর কিনে যে আনন্দ পায়, মা অবিকল সেই আনন্দই পেতেন যদি নেমন্তন্ন থেকে আমি ভাল ছাঁদা বেঁধে আনতে পারতুম, আমার দিদি সেই আনন্দই পেত যদি বনঝোপে কোথাও পাকা-ফলে ভরা মাকাললতা কি বৈঁচিগাছের সন্ধান পেত।

জীবনে সর্বপ্রথম যেবার একা বিদেশে গেলুম পিসিমার বাড়ি সিদ্ধেশ্বরী কালীর পুজো দিতে, বছর নয়েক বয়স তখন—হাজার বছর যদি বাঁচি, কে ভুলে যাবে সেদিনের সে আনন্দ ও অনুভূতির কথা? বহু পয়সা খরচ করে মেরু পর্যটকেরা তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে, উত্তর-হিম-কটিবন্ধের বরফ-জমা নদী ও

অন্ধকার আরণ্যভূমির নির্জনতারমধ্যে Northern light জ্বলা আকাশের তলায়, অবাস্তব, হলুদরঙের চাঁদের আলোয়, শুভ্রতুষারাবৃত পাইন ও সিলভার স্প্রুসের অরণ্যে নেকড়ে বাঘের ডাক শুনে সে আনন্দ পান না—আমি সেদিন খালি পায়ে বালুমাটির পথে শিমুল সোঁদালি বনের ছায়ার ছায়ায় ভিন্-গাঁয়ে যেতে যেতে যে আনন্দ পেয়েছিলুম, আমি তো বড় হয়ে জীবনে কত জায়গায় গেলুম, কিন্তু জীবনের উষায় মুক্তির প্রথম আস্বাদের সে পাগল-করা আনন্দের সাক্ষাৎ আর পাই নি—তাই রেবাতটের সেই বেতস তরুতলেই অবুঝ মন বার বার ছুটে ছুটে যায় যদি, তাকে দোষ দিতে পারি কৈ ?···

আজ একথা বুঝি ভাই যে, সুখ ও দুঃখ দুই-ই অপূর্ব। জীবন খুব বড় একটা রোমান্স— বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স— অতি তুচ্ছতম, হীনতম একঘেয়ে জীবনও রোমান্স। এ বিশ্বাসটা এতদিন আমার ছিল না— ভাবতুম লাফালাফি ক'রে বেড়ালেই বুঝি জীবন সার্থক হয়ে গেল— তা নয়, দেখলুম ভাই।

এর সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা—আত্মার যে কি বিচিত্র, অমূল্য য়্যাডভেঞ্চার —তা বুঝে দেখতে ধ্যানদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে, তা আসে এই রহস্যমাখা যাত্রাপথের অমানবীয় সৌন্দর্যের ধারণা থেকে।···

শৈশবের গ্রামখানাতে ফিরে এসে জীবনের এই সৌন্দর্যরূপটাই শুধু চোখে দেখছি। এতদিনের জীবনটা একচমকে দেখবার এমন সুযোগ আর হয় নি কখনও। এর বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্তন, এত রস— অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে চারিধারের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অপূর্ব শান্তির মধ্যে কত কথাই মনে আসে, কত বছর আগেকার সে শৈশব-সুরটা যেন কানে বাজে, এক পুরনো শান্ত দুপুরের রহস্যময় সুর···কত দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে এই শান্ত দুপুরে কত বটের তলা, রাখালের বাঁশির সুরের ওপারের যে দেশটি অনন্ত তার কথাই মনে ওঠে।

কিছুতেই আমাদের দেশের লোকে বিস্মিত হয় না কেন বলতে পার, প্রণব ? বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা। যে মানুষ কোনও কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে তো প্রাণহীন। কলকাতায় দেখেছি কি তুচ্ছ জিনিস নিয়েই সেখানকার বড় বড় লোকে দিন কাটায়। জীবনকে যাপন করা একটা আর্ট—তা এরা জানে না বলেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে পড়ে।

দিনের মধ্যে খানিকটা অন্তত নির্জনে বসে একে ভাবতে হয়—উঃ সে

দেখেছিলুম নাগপুরে ভাই—সে কী অবর্ণনীয় আনন্দ পেতুম। বৈকালটিতে যখন কোনো শালবনের ছায়ায় পাথরের ওপর গিয়ে বসতুম—লোকাতীত যে বড় জীবন শত শত জন্মমৃত্যুর দূরে পারে অক্ষুণ্ণ, তার অস্তিত্বকে মন যেন চিনে নিত···ডি সিটারের, আইনস্টাইনের বিশ্বটার চেয়েও তা বড়।

এখানে এসেও তাই মনে হচ্ছে প্রণব।···এখানে বুঝেছি জগতে কত সামান্য জিনিস থেকে কত গভীর আনন্দ আসতে পারে। তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ যশমান। আমার জীবনে এরাই হোক অক্ষয়। এত ছায়া, এত ডাঁসা খেজুরের আতাফুলের সুগন্ধ, এত স্মৃতির আনন্দ কোথায় আর পাব? হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারি এখানে, তবু এ পুরনো হবে না যেন।

লীলাকে জানতে? আমার মুখে দু'একবার শুনেছ। সে আর নেই। সে সব অনেক কথা। কিন্তু যখনই তার কথা ভাবি, অপর্ণার কথা ভাবি, তখন মনে হয় এদের দু'জনের সঙ্গ পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে—বাইবেলে পড়েছ তো—And I Saw a new Heaven and a New Earth—এর জীবন দিয়ে আমার সে চোখ খুলে দিয়েছে।

হ্যাঁ, তোমায় লিখি। আমি বাইরে যাচ্ছি। খুব সম্ভব যাব ফিজি ও সামোয়া—এক বন্ধুর কাছ থেকে ভরসা পেয়েছি। কাজলকে কোথায় রেখে যাই এই ছিল সমস্যা। তোমার মামার বাড়ি রাখব না—তোমার মেজমামীমা লিখেছেন কাজলের জন্যে তাঁদের মন খারাপ, সে চলে গিয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। হোক অন্ধকার, সেখানে আর নয়। আমার এক বাল্যসঙ্গিনী এখানে আছেন। তাঁর কাছেই ওকে রেখে যাব। এঁর সন্ধান না পেলে বিদেশে যাওয়া কখনও ঘটে উঠত না, খোকাকে যেখানে-সেখানে ফেলে যেতে পারতুম না তো!

আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি, মেঘশূন্য আকাশ সুনীল। খুব জ্যোৎস্না উঠবে—ইচ্ছা হয় তোমায় নিয়ে দেখাই এ-সব, তোমার ঋণ শোধ দিতে পারব না জীবনে ভাই—তুমিই অপর্ণাকে জুটিয়ে দিয়েছিলে—কত বড় দান যে সে জীবনের, তা তুমিও হয়তো বুঝবে না।

তোমারই চিরদিনের বন্ধু
অপূর্ব

দুপুরে একদিন রাণু বলিল, অপু তোর কিছু দেনা আছে—

—কি দেনা রাণুদি ?

—মনে আছে আমার খাতায় একটা গল্প শেষ করিস নি ?

রাণু একটা খাতা বাহির করিয়া আনিল। অপু খাতাটা চিনিতে পারিল না। রাণু বলিল—এতে একটা গল্প আধখানা লিখেছিলি মনে আছে ছেলেবেলায় ? শেষ লিখে দে এবার।...অপু অবাক্ হইয়া গেল। বলিল—রাণুদি, সেই খাতাখানা এতকাল রেখে দিয়েছ তুমি ?

রাণু মৃদু মৃদু হাসিল।

—বেশ দাও! এখন আমার লেখা কাগজে বেরুচ্ছে, তোমার খাতাখানায় গল্পটা অর্ধেক রাখব না। কিন্তু কি ভেবে খাতাখানা রেখেছিলে রাণুদি এতদিন ?

—শুনবি ? একদিন তোর সঙ্গে দেখা হবেই, গল্প শেষ ক'রে দিবিই জানতুম!

অপু মনে ভাবিল—তোমাদের মত বাল্যসঙ্গিনী জন্ম জন্ম যেন পাই রাণুদি। মুখে বলিল—সত্যি ? দেখি—দেখি খাতাটা।

খাতা খুলিয়া বাল্যের হাতের লেখাটা দেখিয়া কৌতুক বোধ করিল। রাণীকে দেখাইয়া হাসিয়া বলিল—একটা পাতে সাতটা বানান ভুল ক'রে বসে আছি দ্যাখো।

সে এই মঙ্গলরূপিণী নারীকেই সারাজীবন দেখিয়া আসিয়াছে—এই স্নেহময়ী, করুণাময়ী নারীকে—হয়তো ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, নারীর সঙ্গে তার পরিচয় অল্পকালের ও ভাসা ভাসা ধরণের বলিয়া—অপর্ণা দু'দিনের জন্য তার ঘর করিয়াছিল—লীলার সহিত যে পরিচয় তাহা সংসারের শত সুখ ও দুঃখ ও সদাজাগ্রত স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নহে—পটেশ্বরী, রাণুদি, নির্মলা, নিরুদি, তেওয়ারী-বধূ—সবই তাই। তাই যদি হয় অপু দুঃখিত নয়—তাই ভালো, এই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়ানো ভবঘুরে পথিক-জীবনে সহচর-সহচরীগণের যে কল্যাণপাণি ক্ষুধার সময় তাহাকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে—তাহাতেই সে ধন্য, আরও বেশী মেশামিশি করিয়া তাহাদের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করিবার

শখ তাহার নাই—সে যাহা পাইয়াছে, চিরকাল সে নারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে ইহার জন্য।

ভাদ্রের শেষে আর একবার কলকাতায় আসিয়া খবরের কাগজে একদিন পড়িল, ফিজি-প্রত্যাগত কয়েকজন ভারতীয় আর্যমিশনে আসিয়া উঠিয়াছেন। তখনই সে আর্যমিশনে গেল। নিচে কেহ নাই, জিজ্ঞাসা করিলে একজন উপরের তলায় যাইতে বলিল।

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের একজন যুবক হিন্দীতে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল। অপু বলিল—আপনারা এসেছেন শুনে দেখা করতে এলুম। ফিজির সব খবর বলবেন দয়া ক'রে? আমার খুব ইচ্ছে সেখানে যেতে।

যুবকটি একজন আর্যসমাজী মিশনারী। সে ইস্ট আফ্রিকা, ট্রিনিডাড, মরিশস—নানা স্থানে প্রচার-কার্য করিয়াছে। অপুকে ঠিকানা দিল, পোস্ট বক্স ১১৭৫, লউটোকা, ফিজি। বলিল, অযোধ্যা জেলায় আমার বাড়ি—এবার যখন ফিজি যাব একসঙ্গেই যাব।

অপু যখন আর্যমিশন হইতে বাহির হইল, বেলা তখন সাড়ে দশটা।

বাসায় আসিয়া টিকিতে পারিল না। কাজল সেখানে নাই, ঘরটার সর্বত্র কাজলের স্মৃতি, ওই জানালাতে কাজল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিত —দেওয়ালের ঐ পেরেকটা সে-ই পুঁতিয়াছিল, একটা টিনের ভেঁপু ঝুলাইয়া রাখিত—ওই কোণটাতে টুলটার উপর বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া মুড়ি খাইত —অপুর যেন হাঁফ ধরে—ঘরটাতে সত্যই থাকা যায় না।

বৈকালে খানিকটা বেড়াইল। বাকী চারশ' টাকা আদায় হইল। আর কিছুদিন পর কলকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে—কত দূর, সপ্তসিন্ধু পারের দেশ!···কে জানে আর ফিরিবে কিনা?···ভিটা-লেভু, ভ্যান-লেভু, নিউ হেব্রিডিস্ —সামোয়া!—অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবালবাঁধে-ঘেরা নিস্তরঙ্গ ঘন নীল উপসাগর, একদিকে সিন্ধু সীমাহারা, অকূল!—দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত—অন্যদিকে ঘরোয়া ছোট্ট পুকুরের মত উপসাগরটির তীরে নারিকেল পত্র নির্মিত ছোট ছোট কুটির—মধ্যে লৌহ প্রস্তরের পাহাড়ের সূক্ষ্মাগ্র নাসা, উভয়কে দ্বিধাবিভক্ত করিতেছে —রৌদ্রালোকপ্লাবিত সাগরবেলা। পথিক জীবনের যাত্রা আবার নতুন দেশের নতুন আকাশতলে শুরু হইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে!

পুরাতন দিনের সঙ্গে যে সব জায়গার সম্পর্ক—আর একবার সে-সব দিকে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল...

মায়ের মৃত্যুর পূর্বে যে ছোট একতলা ঘরটাতে থাকিত অভয় নিয়োগী লেনের মধ্যে—সেটার পাশ দিয়াও গেল। বহুকাল এইদিকে আসে নাই!

গলির মুখে একটা গ্যাসপোস্টের কাছে সে চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—

একটি ছিপ্‌ছিপে চেহারার উনিশ-কুড়ি বছরের পাড়াগাঁয়ের যুবক সামনের ফুটপাতে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—বিছু মুখচোরা, কিছু নির্বোধ—বোধ হয় নতুন কলিকাতায় আসিয়াছে—বোধ হয় পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই—ক্ষুধাশীর্ণ মুখ—অপু ওকে চেনে—ওর নাম অপূর্ব রায়।—তেরো বছর আগে ও এই গলিটার মধ্যে একতলা বাড়িটাতে থাকিত। এক মুঠো হোটেলের রান্না ভাত-ডালের জন্য হোটেলওয়ালার কত মুখ-নাড়া সহ্য করিত—মায়ের সঙ্গে দেখা করিবার প্রত্যাশায় পাঁচিলের গায়ে দাগ কাটিয়া ছুটির আর কতদিন বাকি হিসাব রাখিত। দাগগুলি জামরুল গাছটার পাশে লোনাধরা পাঁচিলের গায়ে আজও হয়তো আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্যাস জ্বলিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে যুবকের ছবি মিলাইয়া গেল...

বাসার নির্জন ছাদে একা আসিয়া বসিল। মনে কি অদ্ভুত ভাব!—কি অদ্ভুত অনুভূতি!—নবমীর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—কেমন সব কথা মনে উঠে—বিচিত্র সব কথা—বসিয়া বসিয়া ভাবে, এই রকম জ্যোৎস্না আজ উঠিয়াছে তাদের মনসাপোতার বাড়িতে, নাগপুরের বনে তার সেই খড়ের বাংলোর সামনের মাঠে, বাল্যে সেই একটিবার গিয়াছিল লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি, তাদের উঠানের পাশে সেই পুকুর পাড়টাতে, নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো-ভিটাতে, অপর্ণা ও সে শ্বশুরবাড়ির যে ঘরটাতে শুইত—তারই জানালার গায়ে—চাঁপদানীতে পটেশ্বরীদের বাড়ির উঠানে—দেওয়ানপুরের বোর্ডিংয়ের কম্পাউণ্ডে, জীবনের সহিত জড়ানো এই সব স্থানের কথা ভাবিতেই জীবনের বিচিত্রতা, প্রগাঢ় রহস্য তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল...

এবার কলিকাতা হইতে বাড়ি ফিরিবার সময় মাঝেরপাড়া স্টেশনে নামিয়া অপু আর হাঁটিয়া বাড়ি যাইতে পারিল না—খোকাকে আজ দেড়মাস দেখে নাই—ছ'ক্রোশ রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া বাড়ি পেঁৗছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে—খোকার জন্য মন এত অধীর হইয়া উঠিয়াছে যে, এত দেরি করা একেবারেই অসম্ভব।—বাবার

কথা মনে হইল—বাবাও ঠিক তাকে দেখিবার জন্য, দিদিকে দেখিবার জন্য এমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন—প্রবাস হইতে ফিরিবার পথে তাদের বাল্যে। আজকাল পিতৃহৃদয়ের এসব কাহিনী সে বুঝিয়াছে—কিন্তু তখন তো হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া পন্থা ছিল না, এখন আর সেদিন নাই, মোটরবাসে এক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চিন্দপুর। যা একটু দেরি সে কেবল বেত্রবতীর খেয়াঘাটে।

গ্রামে পেঁাছিতে অপুর প্রায় বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মাদুর পাতিয়া রাণুদিদের রোয়াকে ছেলেকে লইয়া বসিল। লীলা আসিল, রাণু আসিল, ও-বাড়ির রাজলক্ষ্মী আসিয়া বসিল। রাণুদের বাড়ির চারিধারে হেমন্ত অপরাহ্ণ ঘনাইয়াছে—নানা লতাপাতায় সুগন্ধ উঠিতেছে···

কি অদ্ভুত ধরণের সোনালী রোদ এই হেমন্ত বৈকালের! আকাশ ঘন নীল—তার তলে রাণুদিদের বাড়ির পিছনে বাঁশের ঝাড়ে সোনালী সড়কির মত বাঁশের সুচালো ডগায় রাঙ্গা রোদ মাখানো, কোনটার উপর ফিঙে পাখি বসিয়া আছে—বাদুড়ের দল বাসায় ফিরিতেছে!···পাঁচিলের পাশের বনে এক একটা আমড়া গাছে থোলো থোলো কাঁচা আমড়া।

সন্ধ্যার শাঁখ বাজিল। জগতের কি অপূর্ব রূপ!···আবার অপুর মনে হয়, এদের পেছনে কোথায় আর একটা অসাধারণ জগৎ আছে—ওই বাঁশবনের মাথার উপরকার সিঁদুরে মেঘভরা আকাশ, বাঁশের সোনালী সড়কির আগায় বসা ফিঙে-পাখির দুলুনি—সেই অপূর্ব, অচিন্ত্য জগৎটার সীমানায় মনকে লইয়া গিয়া ফেলে। সন্ধ্যার শাঁখ কি তাদের পোড়ো-ভিটাতেও বাজিল?···পূজার সময় বাবার খরচপত্র আসিত না, মা কত কষ্ট পাইত—দিদির চিকিৎসা হয় নাই।—সে সব কথা মনে আসিল কেন এখন?

অন্য সবাই উঠিয়া যায়। কাজল পড়িবার বই বাহির করে। রাণু রান্নাঘরে রাঁধে, কুট্‌নো কোটে। অপুকে বলে—এইখানে আয় বসবি, পিঁড়ি পেতে দি—

অপু বলে, তোমার কাছে বেশ থাকি রাণুদি। গাঁয়ের ছেলেদের কথাবার্তা ভাল লাগে না।

রাণু বলে—দুটি মুড়ি মেখে দি—খা বসে বসে। দুধটা জ্বাল দিয়েই চা ক'রে দিচ্ছি।

—রাণুদি সেই ছেলেবেলাকার ঘটিটা তোমাদের—না?

রাণু বলে—আমার ঠাকুরমা জগন্নাথ থেকে এনেছিলেন তাঁর ছেলেবয়সে। আচ্ছা অপু, দুগ্‌গার মুখ তোর মনে পড়ে ?

অপু হাসিয়া বলে—না রাণুদি। একটু যেন আবছায়া—তাও সত্যি কিনা বুঝিনে।

রাণু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আহা! সব স্বপ্ন হয়ে গেল। অপু ভাবে, আজ যদি সে মারা যায়, খোকাও বোধ হয় তাহার মুখ এমনি ভুলিয়া যাইবে।

রাণুর মেয়ে বলিল—ও মামা, আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে আজ এইলোপেলেন্ গিইল।

কাজল বলিল—হাঁ বাবা, আজ দুপুরে। এই তেঁতুল গাছের ওপর দিয়ে গেল।

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি ?

—হাঁ তাই। কি ইংরেজি বুঝিনে—উড়ো জাহাজ যাকে বলে—কি আওয়াজটা!—

নিশ্চিন্দিপুরের সাত বছরের মেয়ে আজকাল এরোপ্লেন দেখিতে পায় তাহা হইলে ?

পরদিন সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না-রাত্রে অভ্যাসমত নদীর ধারে মাঠে বেড়াইতে গেল!

কতকাল আগে নদীর ধারের ওইখানটিতে একটা সাঁইবাব্‌লাতলায় বসিয়া এইরকম বৈকালে সে মাছ ধরিত—আজকাল সেখানে সাঁইবাব্‌লার বন, ছেলেবেলার সে গাছটা আর চিনিয়া লওয়া যায় না।

ইছামতী এই চঞ্চল জীবনধারার প্রতীক। ওর দু'পাড় ভরিয়া প্রতি চৈত্র বৈশাখে কত বনকুসুম, গাছপালা, পাখি-পাখালী, গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত ফুল ঝরিয়া পড়ে, কত পাখির দল আসে যায়, ধারে ধারে কত জেলেরা জাল ফেলে, তীরবর্তী গৃহস্থবাড়িতে হাসিকান্নার লীলাখেলা হয়, কত গৃহস্থ আসে, কত গৃহস্থ যায়—কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাহিতে নামে, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের নশ্বর দেহের রেণু কলস্বনা ইছামতীর স্রোতোজলে ভাসিয়া যায়—এমন কত মা, কত ছেলেমেয়ে, তরুণতরুণী মহাকালের বীথিপথে আসে যায়—অথচ নদী দেখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, নিরীহ।...

আজকাল নির্জনে বসিলেই তাহার মনে হয়, এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়ায় মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব

হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুণ এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিসে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন—যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত, এ সত্যটা হঠাৎ চোখে পড়ে না। যেমন সাহেব বন্ধুটি বলিত, "ভারতবর্ষের একটা রূপ আছে, সে তোমরা জান না। তোমরা এখানে জন্মেছ কিনা, অতি পরিচয়ের দোষে সে চোখ ফোটে নি তোমাদের।"

আকাশের রং আর এক রকম—দূরের সে গহন হিরাকসের সমুদ্র ঈষৎ কৃষ্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে—তার তলায় সারা সবুজ মাঠটা, মাধবপুরের বাঁশবনটা কি অপূর্ব, অদ্ভুত, অপার্থিব ধরণের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে!···ও যেন পরিচিত পৃথিবীটা নয়, অন্য কোন অজানা জগতের কোনও অজ্ঞাত দেবলোকের···

প্রকৃতির একটা যেন নিজস্ব ভাষা আছে। অপু দেখিয়াছে, কতদিন বক্রতোয়ার উপল-ছাওয়া-তটে শাল-ঝাড়ের নিচে ঠিক দুপুরে বসিয়া—দূরে নীল আকাশের পটভূমিতে একটা পত্রশূন্য প্রকাণ্ড কি গাছ—সেদিকে চাহিলেই এমন সব কথা মনে আসিত যা অন্য সময় আসার কল্পনাও করিতে পারিত না—পাহাড়ের নিচে বনফুলের জঙ্গলেরও একটা কি বলিবার ছিল যেন। এই ভাষাটা ছবির ভাষা—প্রকৃতি এই ছবির ভাষায় কথা বলেন—এখানেও সে দেখিল গাছপালায়, উইঢিপির পাশে শুকনো খড়ের ঝোপে, দূরের বাঁশবনের সারিতে—সেই সব কথাই বলে—সেই সব ভাবই মনে আনে। প্রকৃতির এই ছবির ভাষাটা সে বোঝে। তাই নির্জন মাঠে, প্রান্তরে বনের ধারে একা বেড়াইয়া সে যত প্রেরণা পায়—যে পুলক অনুভব করে তা অপূর্ব—সত্যিকার Joy of Life—পায়ের তলায় শুকনো লতা-কাটি, দেয়াড়ের চরে রাঙা-রোদ মাখানো কষাড় ঝোপ, আকন্দের বন, ঘেঁটুবন—তার আত্মাকে এরা ধ্যানের খোরাক যোগায়, এ যেন অদৃশ্য স্বাতী নক্ষত্রের বারি, তারই প্রাণে মুক্তার দানা বাঁধে।

সন্ধ্যার পূরবী কি গৌরীরাগিণীর মত বিষাদ ভরা আনন্দ, নির্লিপ্ত ও নির্বিকার—বহুদূরের ওই নীল কৃষ্ণাভ মেঘরাশি, ঘন নীল, নিথর, গহন আকাশটা মনে যে ছবি আঁকে, যে চিন্তা যোগায়, তার গতি গোমুখী-গঙ্গার মত অনন্তের দিকে, সে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কথা বলে, মৃত্যুপারের দেশের কথা কয়,—ভালবাসা—বেদনা—ভালবাসিয়া হারানো—বহুদূরের এক প্রীতিভরা পুনর্জন্মের বাণী···

এইসব শান্ত সন্ধ্যায় ইছামতীর তীরের মাঠে বসিলেই রক্তমেঘস্তূপ ও নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চারিপাশের সেই অনন্ত বিশ্বের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে বাল্যে এই কাঁটাভরা সাইবাব্লার ছায়ায় বসিয়া বসিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে সে দূর দেশের স্বপ্ন দেখিত—আজকাল চেতনা তাহার বাল্যের সে ক্ষুদ্র গণ্ডী পার হইয়া ক্রমেই দূর হইতে দূরে আলোকের পাখায় চলিয়াছে—এই ভাবিয়া এক এক সময় সে আনন্দ পায়—কোথাও না যাক্—যে বিশ্বের সে একজন নাগরিক, তা ক্ষুদ্র, দীন বিশ্ব নয়। লক্ষ কোটি আলোক-বর্ষ যার গণনার মাপকাঠি, দিকে দিকে অন্ধকারে ডুবিয়া ডুবিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকাদের দেশ, অদৃশ্য ঈথারের বিশ যেখানে মানুষের চিন্তাতীত, কল্পনাতীত দূরত্বের ক্রমবর্ধমান পরিধিপানে বিস্তৃত—সেই বিশ্বে সে জন্মিয়াছে...

ঐ অসীম শূন্য কত জীবলোকে ভরা—কি তাদের অদ্ভুত ইতিহাস! অজানা নদীতটে প্রণয়ীদের কত অশ্রুভরা আনন্দতীর্থ—সারা শূন্য ভরিয়া আনন্দ-স্পন্দনের মেলা—ঈথারের নীল সমুদ্র বাহিয়া বহু দূরের বৃহত্তর বিশ্বের সে-সব জীবনধারার ঢেউ প্রাতে, দুপুরে, রাতে, নির্জনে একা বসিলেই তাহারা মনের বেলায় আসিয়া লাগে—অসীম আনন্দ ও গভীর অনুভূতিতে মন ভরিয়া উঠে—পরে সে বুঝিতে পারে শুধু প্রসারতার দিকে নয়—যদিও তা বিপুল ও অপরিমেয়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-স্তরের আর একটা Dimension যেন তার মন খুঁজিয়া পায়—এই নিস্তব্ধ শরত-দুপুর যখন অতীতকালের এমনি এক মধুর মুগ্ধ শৈশব-দুপুরের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও করুণ হইয়া উঠে তখনই সে বুঝিতে পারে চেতনার এ স্তর বাহিয়া সে বহুদূর যাইতে পারে—হয়ত কোন অজ্ঞাত সৌন্দর্যময় রাজ্যে, দৈনন্দিন ঘটনার গতানুগতিক অনুভূতিরাজি ও একঘেয়ে মনোভাব যে রাজ্যের সন্ধান দিতে পারিতই না কোনদিন।...

নদীর ধারে আজিকার এই আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নব রূপ সে দেখিতে পাইল। মনে হইল, যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন্ বিশাল-আত্মা দেব-শিল্পীর হাতে আবর্তিত হইতেছে—তিনি জানেন কোন্ জীবনের পর কোন্ অবস্থার জীবনে আসিতে হয়, কখনও বা সঙ্গতি, কখনও বা বৈষম্য—সবটা মিলিয়া অপূর্ব রসসৃষ্টি—বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির আর্ট—

ছ'হাজার বছর আগে হয়ত সে জন্মিয়াছিল প্রাচীন ঈজিপ্টে—সেখানে নলখাগড়া প্যাপিরাসের বনে, নীলনদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন্ দরিদ্রঘরের মা বোন্, বাপ ভাই বন্ধুবান্ধবদের দলে কবে সে এক মধুর শৈশব কাটাইয়া গিয়াছে—

আবার হয়ত জন্ম নিয়াছিল রাইন নদীর ধারে—কর্ক-ওক্, বার্চ ও বীচ্‌বনের শ্যামল ছায়ায় বনেদী ঘরের প্রাচীন প্রাসাদে, মধ্যযুগের আড়ম্বরপূর্ণ আবহাওয়ায়, সুন্দরমুখ সখীদের দল। হাজার বছর পর আবার হয়ত সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে—তখন কি মনে পড়িবে এবারকারের এই জীবনটা? —কিংবা কে জানে আর হয়ত এ পৃথিবীতে আসিবে না—ওই যে বটগাছের সারির মাথায় সন্ধ্যার ক্ষীণ প্রথম তারকাটি—ওদের জগতে অজানা জীবন-ধারার মধ্যে হয়ত এবার নবজন্ম!—কতবার যেন সে আসিয়াছে…জন্ম হইতে জন্মান্তরে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া…বহু, বহু দূর অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল…কত নিশ্চিন্দিপুর, কত অপর্ণা, কত দুর্গা দিদি—জীবনের ও জন্মমৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সে কি অপরূপ অভিযান…শুধু আনন্দে, যৌবনে, জীবনে পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে।…এই সবটা লইয়া যে আসল বৃহত্তর জীবন—পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র—তার স্বপ্ন যে শুধুই কল্পনাবিলাস, এ যে হয় তা কে জানে —বৃহত্তর জীবনচক্র কোন্ দেবতার হাতে আবর্তিত হয় কে জানে?…হয়ত এমন সব প্রাণী আছেন যাঁরা মানুষের মত ছবিতে, উপন্যাসে, কবিতায় নিজেদের শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না—তাঁরা এক এক বিশ্ব সৃষ্টি করেন—তার মানুষের সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে আত্মপ্রকাশ করাই তাঁদের পদ্ধতি—কোন্ মহান্ বিবর্তনের জীব তাঁর অচিন্তনীয় কলাকুশলতাকে গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে এ-রকম রূপ দিয়াছেন—কে তাঁকে জানে?…

একটি অবর্ণনীয় আনন্দে, আশায়, অনুভূতিতে, রহস্যে মন ভরিয়া উঠিল। প্রাণবন্ত তার আশা, সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী বনলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখা-পত্রের তিক্ত গন্ধ আনে—নীলশূন্যে বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রবে শোনায়। সে জীবনের অধিকার হইতে তাহাকে কাহারও বঞ্চনা করিবার শক্তি নাই—তার মনে হইল সে দীন নয়, দুঃখী নয়, তুচ্ছ নয়—ওটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন্ সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বর্হিষদ পিতৃলোক—এই শত সহস্র শতাব্দী, তার পায়ে-চলার পথ—তার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পৃষ্ট সে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্তমান—নিঃসীম সময় বাহিয়া সে গতি সারা মানবের যুগে যুগে

বাধাহীন হউক।…

অপু তাহাদের ঘাটের ধারে আসিল। ওইখানটিতে এমন এক সন্ধ্যার অন্ধকারে বনদেবী বিশালাক্ষী স্বরূপ চক্রবর্তীকে দেখা দিয়াছিলেন কতকাল আগে।

আজ যদি আবার তাহাকে দেখা দেন।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে। তুমি কি বর চাও?

—অন্য কিছুই চাই নে, এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবাগানের ছায়ায় অবোধ, উদ্‌গ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি—তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী?—

"You enter it by the Ancient way
Through Ivory Gate and Golden"

ঠিক দুপুর বেলা।

রানী কাজলকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না—বেজায় চঞ্চল। এই আছে, কোথা দিয়া যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছে—কেহ বলিতে পারে না।

সে রোজ জিজ্ঞাসা করে—পিসিমা, বাবা কবে আসবে? কতদিন দেরি হবে?—

অপু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল—রাণুদি, খোকাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, ওকে এখানে রাখবে, ওকে ব'লো না আমি কোথা যাচ্ছি। যদি আমার জন্য কাঁদে, ভুলিয়ে রেখো—তুমি ছাড়া ও-কাজ আর কেউ পারবে না।

রাণু চোখ মুছিয়া বলিয়াছিল—ওকে এ-রকম ফাঁকি দিতে তোর মন সরছে? বোকা ছেলে তাই বুঝিয়ে গেলি—যদি চালাক হ'ত?

অপু বলিয়াছিল, দেখ আর একটা কথা বলি। ওই বাঁশবনের জায়গাটা—তোমায় চল দেখিয়ে রাখি—একটা সোনার কৌটো মাটিতে পোঁতা আছে আজ অনেকদিন—মাটি খুঁড়লেই পাবে। আর যদি না ফিরি আর খোকা যদি বাঁচে—বৌমাকে কৌটোটা দিও সিঁদুর রাখতে। খোকাও কষ্ট পেয়ে মানুষ হোক—এত তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্তি করবার দরকার নেই। যেখানে যায় যেতে দিও—কেবল যখন ঘাটে যাবে, তুমি নিজে নাইতে নিয়ে যেও—সাঁতার জানে না, ছেলেমানুষ ডুবে যাবে। ও একটু ভীতু আছে, কিন্তু সে ভয় এ নেই তা নেই

বলে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা ক'রো না—কি আছে কি নেই তা বলতে কেউ পারে না রাণুদি। কোনোদিকেই গোঁড়ামি ভাল নয়—তা ওর ওপর চাপাতে যাওয়ারও দরকার নেই। যা বোঝে বুঝুক, সেই ভাল।

অপু জানিত, কাজল শুধু তার কল্পনা-প্রবণতার জন্য ভীতু। এই কাল্পনিক ভয় সকল আনন্দ রোমান্স ও অজানা কল্পনার উৎস-মুখ। মুক্ত প্রকৃতির তলায় খোকার মনের সব বৈকাল ও রাত্রিগুলি অপূর্ব রহস্যে রঙীন হইয়া উঠুক—মনে-প্রাণে এই তাহার আশীর্বাদ।

ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হয়ত লীলার মুখের শেষ অনুরোধ রাখিতে কোন্ পোর্তো প্লাতার ডুবো জাহাজের সোনার সন্ধানেই বা বাহির হইয়াছে। গিয়াছেও প্রায় ছ'সাত মাস হইল।

সতুও অপুর ছেলেকে ভালবাসে। সে ছেলেবয়সের সেই দুষ্ট সতু আর নাই, এখন সংসারের কাছে ঠেকিয়া সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এখন সে আবার খুব হরিভক্ত। গলায় মালা, মাথায় লম্বা চুল। দোকান হইতে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া রোয়াকে বসিয়া খোল লইয়া কীর্তন গায়। নীলমণি রায়ের দরুণ জমার বাগান বিক্রয় করিয়া অপুর কাছে সত্তর টাকা পাইয়াছিল—তাহা ছাড়া কাটিহার তামাকের চালান আনিবার জন্য অপুর নিকট আরও পঞ্চাশটি টাকা ধার স্বরূপ লইয়াছিল। এটা রাণীকে লুকাইয়া—কারণ রাণী জানিতে পারিলে মহা অনর্থ বাধাইত—কখনই টাকা লইতে দিত না।

কাজলের ঝোঁক পাখির উপর। এত পাখি সে কখনও দেখে নাই—তাহার মামার বাড়ির দেশে ঘিঞ্জি বসতি, এত বড় বন, মাঠ নাই—এখানে আসিয়া সে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় পিছনের সমস্ত মাঠ, বন রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দৈত্যদানো, ভূত ও শিয়ালের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে—পিসিমার কাছে আরও ঘেঁষিয়া শোয়। কিন্তু দিনমানে আর ভয় থাকে না, তখন পাখির ডিম ও বাসা খুঁজিয়া বেড়াইবার খুব সুযোগ। রাণু বারণ করিয়াছে—গাঙের ধারের পাখির গর্তে হাত দিও না কাজল, সাপ থাকে। শোনে না, সেদিনও গিয়াছিল পিসিমাকে লুকাইয়া কিন্তু অন্ধকার হইয়া গেলেই তার যত ভয়।

দুপুরে সেদিন পিসিমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশবনে পাখির বাসা খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। সবে শীতকাল শেষ হইয়া রৌদ্র বেজায় চড়িয়াছে, আকাশে বাতাসে বনে কেমন গন্ধ। বাবা তাহাকে কত বনের গাছ, পাখি চিনাইয়া দিয়া

গিয়াছে, তাই সে জানে কোথায় বনমরিচার লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ ফুল ধরিয়াছে, বেলেকোঁড়ার লতার কচি ডগা ঝোপের মাথায় মাথায় সাপের মত দুলিতেছে।

কখনও সে ঠাকুরদাদার পোড়ো ভিটাটাতে ঢোকে নাই। বাহির হইতে তাহার বাবা তাহাকে দেখাইয়াছিল, বোধ হয় ঘন বন বলিয়া ভিতরে লইয়া যায় নাই। একবার ঢুকিয়া দেখিতে খুব কৌতূহল হইল।

জায়গাটা খুব উঁচু ঢিবিমত। কাজল এদিক ওদিক চাহিয়া ঢিবিটার উপরে উঠিল—তারপরে ঘন কুঁচকাটা ও শ্যাওড়া বনের বেড়া ঠেলিয়া নিচের উঠানে নামিল। চারিধারে ইট, বাঁশের কঞ্চি, ঝোপঝাপ। পাখি নাই এখানে? এখানে তো কেউ আসে না—কত পাখির বাসা আছে হয়ত—কে বা খোঁজ রাখে?

বসন্তবৌরী ডাকে—টুকলি, টুকলি—তাহার বাবা চিনাইয়াছিল, কোথায় বাসাটা? না, এমনি ডালে বসিয়া ডাকিতেছে?

মুখ উঁচু করিয়া খোকা ঝিকড়ে গাছের ঘন ডালপালার দিকে উৎসুক চোখে দেখিতে লাগিল।

এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা-অজানা সমস্ত পূর্বপুরুষ দিবসের প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি—আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি—আমাদের আশীর্বাদ নাও, বংশের উপযুক্ত হও।

আরও হইল। সোঁদালি বনের ছায়া হইতে জল আহরণরত সহদেব, ঠাকুরমাদের বেলতলা হইতে শরশয্যাশায়িত ভীষ্ম, এ ঝোপের ও ঝোপের তলা হইতে বীর কর্ণ, গাণ্ডীবধারী অর্জুন, অভাগিনী ভানুমতী, কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, পরাজিত রাজপুত্র দুর্যোধন, তমসাতীরের পর্ণকুটিরে প্রীতিমতী তাপসবধূবেষ্টিতা অশ্রুমুখী ভগবতী দেবী জানকী, স্বয়ংবর সভায় বরমাল্যহস্তে ভ্রাম্যমানা আনতবদনা সুন্দরী সুভদ্রা, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে মাঠে মাঠে গোচারণরত সহায়-সম্পদহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র ত্রিজট—হাতছানি দিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি, এই যে আবার ফিরে এসেছ! চেন না আমাদের? কত দুপুরে ভাঙা জানলাটায় বসে বসে আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি যে কত পরিচয়! এসো…এসো…এসো…

সঙ্গে সঙ্গে রাণুর গলা শোনা গেল—ও খোকা, ওরে দুষ্টু ছেলে, এই এক গলা বনের মধ্যে ঢুকে তোমার কি হচ্ছে জিজ্ঞেস করি—বেরিয়ে আয় বলছি! খোকা হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল। সে পিসিমাকে মোটেই ভয় করে না, সে জানে পিসিমা তাকে খুব ভালবাসে—দিদিমার পরে এক বাবা ছাড়া তা এমন ভাল আর কেউ বাসে নাই।

হঠাৎ সেই সময় রাণুর মনে হইল অপু ঠিক এমনি দুষ্টু মুখের ভঙ্গি করি ছেলেবেলায়—ঠিক এমনটি।

যুগে যুগে অপরাজিত জীবন-রহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকা করে!

খোকার বাবা একটু ভুল করিয়াছিল।

চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপু ফিরিয়া আসিয়াছে।

সমাপ্ত